উৎসর্গ

পিতা স্বর্গ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥

স্বর্গীয় পিতৃদেবের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে
—আর্য ভগীরথ

আর্য ভগীরথের অন্যান্য বই

দ্বিতীয় মহাভারত (প্রবন্ধ)

(মূল মহাভারতের নব মূল্যায়ণ)

মনের রঙ (গল্প সংকলন)

ছন্দ পতন (নাটক)

॥ ডঃ সুশীল রায় লিখিত ভূমিকা ॥

একটি বিস্তৃত গ্রাম্য পটভূমিকায় অজস্র চরিত্র নিয়ে রচিত এই উপাখ্যান। বইটির নাম 'মহাজীবনের গান', বস্তুতপক্ষে এটি তাই। এই উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র নীলাদ্রি, গ্রন্থে এর নাম নীলু বলে বহুবার উল্লেখিত হয়েছে। বয়সে তার চেয়ে কিছু বড় অথচ শিশুকাল থেকে তার খেলার সঙ্গী যে মেয়েটি তার নাম রাণী। নীলু ও রাণীর মধ্যে অন্তরঙ্গতার কথা লেখক নিপুণ ভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ অন্তরঙ্গতা প্রণয়ঘটিত কিছু নয়, এ জন্যে লেখককে বেশ সাবধানতার সঙ্গে তাদের কথা বলে যেতে হয়েছে। কিন্তু মানুষের মন মানুষেরই মন, এক ঝড়ের রাতে অসতর্কতার মুহূর্তে নীলুর মনে দুর্বলতা এল, সেদিন থেকে রাণীকে সে দেখতে লাগল অন্য চোখে, অন্য মন নিয়ে।

গ্রাম্যজীবনের খুঁটিনাটি বিষয় লেখক বর্ণনা করেছেন। তিনি যে স্বচক্ষে এ জীবন দেখেছেন তা তাঁর এই রচনা পাঠ করে স্পষ্টই বোঝা যায়। গ্রাম তিনি দেখেছেন, গ্রামের মানুষের আত্মার সঙ্গে তাদের আচার-আচরণের সঙ্গে তিনি যে বিশেষভাবে পরিচিত কাহিনীর বিন্যাসে তা পরিপুর্ণভাবে ধরা গেল। এই জন্যেই এর স্বাদ এমন টাটকা। এ জন্যে সাধুবাদ করি লেখক আর্য ভগীরথকে।

সময়ের পরিধি ছোট না। গান্ধীজির সেই অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২১) আমল থেকে ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষের আমল পেরিয়ে। এই দীর্ঘকালের কাহিনী লেখক সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের কাছে বলে গিয়েছেন। নীলাদ্রির পিতৃদেব হয়েছিলেন গান্ধীজির অনুগামী, সেই ভাবে জীবন পরিচর্যা করতে আরম্ভ করেন তিনি, সেই পরিবেশে মানুষ হয়েছে নীলাদ্রি। তারপর আগষ্ট বিপ্লব ইত্যাদি পার হয়ে চলেছে নীলাদ্রির জীবন। এসেছে অনেক চরিত্র, এসেছে রাসু, কালা, সবজান্তা রয়টার, এসেছে রাণী, এসেছে তুলি, এসেছে আরও অনেক চরিত্র।

একটা যুগের ইতিহাস বলা হয়েছে এই বইতে। একটা কালের কাহিনী। বেশ উপভোগ্য হয়েছে এই উপাখ্যান।

গ্রন্থের শেষ দিকে দুর্ভিক্ষে জীর্ণ রাণীর অবস্থা দেখে নীলু একাই বেদনার্ত নয়, পাঠকবর্গও তার সঙ্গে বেদনার্ত হয়ে উঠবেনই। নীলুর জীবন থেকে রাণী কি ভাবে সরে যেতে বাধ্য হল সেটাও যেমন করুণ, রাণীর জীর্ণ অবস্থাও ততোধিক ট্র্যাজিক।

গ্রামের কথা আমরা প্রায় ভুলে গিয়েছি, গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের কমে গিয়েছে। এই বই পড়ে সেই গ্রামের সঙ্গে নতুন করে আবার পরিচয় হল। বই পড়ার আনন্দ আছেই, তার সঙ্গে এই পরিচয়টা হল বাড়তি লাভ।

সুশীল রায়.

৫৯ বি, কাকুলিয়া রোড,
কলিকাতা-৭০০০১৯।

॥ এক ॥

পাট-ভক্ত যামিনী রায় শিবের মন্দিরের সামনের চাতালে অঙ্গভঙ্গি করে গাইছে ছড়াকাটার সুরে :—

'রাণী যায় বরন করতে
ডালা হাতে—
গা ছম্ ছম্ করে;
বরণডালা চুলোয় পড়ুক!
রাণী থরথরিয়ে মরে।'

পাশে বসা সঙ্গিনী রানীকে ঠ্যালা মেরে নীলু বলে ওঠে—এ্যাই, ত্যাখ্, ত্যাখ্, তোকে কি বল্‌ছে রে।

—দূর, আমাকে কেন বলবে? আমার নাম রানী বলেই বুঝি আমাকেই বলবে? তুই কিচ্ছু বুঝিস না, বোকা! এ রানী হলো পার্বতী রে।

রানী নীলুকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

নীলুর চোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে; বলে—পার্বতী কে রে?

—শিবের বৌ রে। তোদের বাড়ীর গাজন, তুই কিচ্ছু জানিস্ না। রানী বিরক্ত হয়,—চুপ করে শোন্ না। ওই ত্যাখ্, যামিনী রায় আবার কি বলছে।

যামিনী ততক্ষনে বলে চলেছে :

বলে রানী—

এমন সময় অন্য এক ভক্ত বলে ওঠে—কি বলে শুনি?

পাট-ভক্ত আবার বলে—

বলে রানী ভয়ের বাণী!

সেই ভক্তটি আবার বলে ওঠে—ভয় কি গো ? বাসর ঘরে বরকে ভয় করবে কেন ? বল, রানীর লজ্জা।

যামিনী বলে—আরে, রানী তো তার বরকে বুঝতেই পারে নি। ভাবল, এ বর নয়, বুঝি বরের বাপ।

দর্শকরা হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কাঁসি আর ঢাক বেজে উঠল। হাসির শব্দ ঢাক-কাঁসির শব্দে চাপা পড়ে গেল। বাজনা থামতেই যামিনী রায় আবার সুর করে বলে—

'বলে রানী ভয়ের বানী।
বলে, এটা কেটা ?···
মাথায় জটা,
এই কি বরের বাপ ?
তা' না হ'লে অঙ্গ নেই,
মাথায় কালোসাপ !'

আ-হা-হা—হাজার দর্শক আবার হাসিতে ফেটে পড়ে। নীলু তাদের হাসির অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না। রানীর দিকে আড়-চোখে তাকায় সে। দেখে, রানীও হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

—এ্যাই রানী, অত হাস্‌ছিস কেন রে ? নীলু শুধায়।

—হাসবো না ? ওঃ হোঃ হোঃ—মাগো, বরকে বলে কিনা বরের বাপ। হিঃ হিঃ হিঃ—

রানী আবার হেসে গড়াগড়ি যায়। নীলু অবাক চোখে তাকিয়ে দেখে শুধু। কিছু পরে হাসি থামিয়ে রানী গম্ভীর হয়ে বলে—আসলে কি জানিস, শিব গায়ে ছাই মেখে ছিল তো। তাই পার্বতী শিবকে বুঝতে পারে নি।

নীলু এবার যেন একটু একটু বুঝতে পারে হাসির অর্থ। ধীরে ধীরে তার মুখেও হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

—এ্যাই, তোরা এত কথা বলছিস কেন রে ? আর কথা বললে কান ধরে বার করে দেব, তা জানিস ? সঙ্গে সঙ্গে নীলুর পিঠে একটা হাল্‌কা চড় বসিয়ে দেয় ছেলেটি।

নীলু আরক্ত চোখে তাকিয়ে দেখে তার চেয়ে অনেক বড়—তার জেঠতুতো বড়দার বয়সী একটা ছেলে তাকে চড় মেরেছে। ছেলেটার বেশ টকটকে ফর্সা রং, সুন্দর চেহারা। কিন্তু নীলুর তখন অতশত দেখার মন ছিল না, সে রেগে গিয়েছিল।

নীলু রেগেই বলে ওঠে—তুই কে রে? আর একবার মার্ দেখি কই, বড়দাকে বলে দেব—হ্যাঁ, তোকে বড়দা পাঁচটা-সাতটা চড় কষিয়ে দেবে। ইস্, এটা আমাদের বাড়ীর গাজন। আমার যা ইচ্ছে করবো, তোর কি?

—আবার কথা? ছেলেটি আবার নীলুকে চড় কষাতে যায়। এবারে রানী চট করে ছেলেটির চড়ের সামনে এসে দাঁড়ায়। ছেলেটি মেয়েছেলে দেখে হাত গুটিয়ে নেয়। রানীর চোখে যেন শিবের তৃতীয় নয়নের আগুন ঝরছে—সে যেন ছেলেটিকে তার চোখের আগুণে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। কিন্তু নীলু লক্ষ্য করে, ছেলেটি রানীর চেয়েও অনেক বড় বলে সে কিছু করতে সাহস পাচ্ছে না।

পেছন থেকে হঠাৎ নীলুর বড়দার গলা শোনা গেল—আরে রাসু, কি করিস?

রাসু মুখ ঘুরিয়ে বড়দাকে প্রশ্ন করে—এ ছেলেটা কে?

বড়দা সহাস্যে বলে—ও নীলু, কাকার ছেলে।

রাসু এবারে গুটিয়ে যায়, বলে—ও তোর ভাই? তাই বল্। রাসু হেসে ফেলে। রানীর দিকে আঙ্গুল তুলে বলে—আর মেয়েটা কি তবে ওর দিদি?

বড়দা বলে···না, না, কেউ নয়, ও হলো ওদের পাশের বাড়ীর একটি মেয়ে। ক্যানেলের ওপারেই ওদের বাড়ী।

রাসু আর বড়দা এবার নিজেদের মধ্যে কথা বলতে থাকে। যামিনী রায় কি সব গেয়ে চলেছে। তা নীলুর কানে যাচ্ছে না। সে শুধু ওদের দুজনকে আড়-চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে যায়। বড়দা আর রাসু যে দুজনে বন্ধু, তা আর তার

বুঝতে বাকী থাকে না। তার মনে হয়, *ঠিক* যেমন সে আর রানী।

কিন্তু, নীলু ভাবে, রানী তো মেয়েছেলে। মেয়েছেলে কি বন্ধু হয়?

নীলু *ঠিক* বুঝতে পারে না। সে ভাবে, রানীকে একবার জিজ্ঞেস করবে নাকি? কিন্তু পরক্ষনেই আবার লজ্জা পায়। পরে আবার ভাবে, রানী হয়তো *ঠিক* তার বন্ধু না, বরং অনেকটা যেন তার অভিভাবকের মত। রানী তার চেয়ে বয়সে বড়। মার কাছে সে শুনেছে, রানী আর তার দিদি একই দিনে জন্মেছিল। নীলুর সে-দিদি আর বেঁচে নেই। তবে নীলু জানে, দিদি তার চেয়ে তু বছরের বড় ছিল। তাহলে রানীও তার চেয়ে তু' বছরের বড়।

পাট-ভক্ত ও অন্যান্য ভক্তেরা অনেক কি সব গান গেয়ে চলেছে। নীলুর সে দিকে আর কোন আগ্রহ নেই। সে ভাবতে বসে রাস্থর কথা। নিজের মনেই ছেলেটার রূপের প্রশংসা করে কিন্তু তার ঐ মারমুখো স্বভাবের জন্য কিছুতেই যেন সে ছেলেটাকে ক্ষমা করতে পারছে না।

—নীলু, আমি এবার যাই রে, সন্ধে হয়ে এল, বলতে বলতে রানী উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে নীলু ও উঠে দাঁড়ালো। নীলু আজ বাড়ী যাবে না, জেঠাদের বাড়ীতেই থাকবে। তার মাও আজ এখানে। বাবা এখানে কখনো-সখনো এলেও থাকেন না কোনদিন, সেকথা নীলু জানে।

নীলু শিবেব পুকুর পর্যন্ত রানীর সঙ্গে গেল। এই পুকুরে শিবের ভক্তরা স্নান করে। রানী চলে গেল। নীলু ফিরল কিন্তু নীল-উৎসবের তরজা গানের আসরে আর গেল না। গানগুলোর অর্থ সে তো বিশেষ কিছুই বোঝে না। তবে সুরগুলো তার ভালই লাগে। তার ক্ষিধে পেয়েছিল। তাই বাড়ীর ভেতরে গেল। সেই গানের সুরটা তার মনে পড়ছে। সুরটা অবিকল তার মনে পড়ল। গুনগুন করে সে গাইতে লাগল—

'এটা কেটা, মাথায় জটা
এই কি বরের বাপ ?—

হিঃ হিঃ হিঃ—নীলু হাসতে থাকে আপন মনে।

যতদিন সে দেশের বাড়ীতে কাটিয়েছে ততদিন অনেকবারই এই তরজা গান শুনেছে। পাঁচ বছর বয়সে রানীর সঙ্গে বসে সে সব গানের ভাষার সম্পূর্ণ অর্থ সে বুঝতে পারে নি, পরে তার সব অর্থ সে বুঝেছে। নীলু যখন আজ নিজেকে নিয়ে ভাবতে বসে তখনই সে বুঝতে পারে, গানের ভাষা না বুঝতে পারলেও তার ছন্দ, তাল, লয়, এ সমস্ত কিছুর আলাদা ব্যঞ্জনা আছে। এ সমস্ত কিছু মনে তাই দাগ না কেটে যায় না। অবশ্য অর্থের বোধগম্যতা সে দাগকে আরও গভীরে নিয়ে যেতে পারে।

নীলুর বাবা শংকরীপ্রসাদ গোস্বামীরা তিন ভাই। তিন ভাই-এর মধ্যে শংকরীপ্রসাদ ছোট। তাঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের শিষ্য। তাঁরা দশনামী সম্প্রদায় ভুক্ত। এরা সাধারণতঃ শক্তির উপাসক হয়। তাই দেখা যায়, শিব, কালী বা দুর্গার মন্দিরকে ঘিরে এরা পুরুষানুক্রমে বসবাস করে যাচ্ছে। শিবের মন্দিরের নিত্যপূজা জেঠা, বাবা, কাকা পালা করে চালাতেন।

স্থানীয় লোকদের এই শিবের উপর অগাধ বিশ্বাস। শিবের প্রায় পঞ্চাশ ষাট বিঘা দেবত্তর সম্পত্তি রয়েছে। তার বাপ-জেঠা শিবের মোহন্ত। নীলু এখন পুরান কথা ভাবতে গিয়ে আপন মনে হেসে বলে—আমি নিজেও তো এক মোহন্ত বটে।

শিবের মন্দিরে প্রণামী বাবতও আয় কম ছিল না। এ ছাড়া শিবের মন্দিরের পাশে ছিল চণ্ডীর মন্দির। সেখানেও নিত্যপূজা হত। এই শিব আর চণ্ডীর মন্দিরে বছরে তিনটি বড় উৎসব হয়। প্রথমটি হল দুর্গাপূজা, দ্বিতীয়টি শিবচতুর্দশী এবং তৃতীয়টি হলো শিবের গাজন। এই তিন উৎসবে মন্দিরে যা আয় হত, তাতে সারা বছরের নিত্যপূজার খরচ উঠে যেত।

এ ছাড়া শিবের জমি, পুকুর ও গাছ ইত্যাদির আয় তো ছিলই। কাজেই মোহন্তরা কেউ স্বল্পবিত্ত ছিলেন না।

নীলুর দুই জেঠা থাকতেন শিবমন্দির সংলগ্ন পৈত্রিক ভিটায়। ভাইদের সঙ্গে শংকরীপ্রসাদের মনান্তর হওয়ায় তিনি পৈত্রিক বাসস্থান ত্যাগ করে ক্যানেলের এপারে চলে আসেন। নীলু মার কাছে শুনেছে, তার বাবা রাগ করে চলে আসার সময় পৈত্রিক কিছু নিয়ে আসেন নি। এমন কি, মোহন্তের অধিকারও তিনি একরকম বিসর্জনই দিয়ে এসেছেন। সেই থেকে শংকরীপ্রসাদ পৈত্রিক ভিটায় আসেন কম। কিন্তু নীলু প্রায়ই আসে এ বাড়ী। নীলুর বড় জেঠা ভবানীপ্রসাদ নিঃসন্তান বলে নীলুকে বিশেষ স্নেহ করেন।

নীলুর পুরো নাম হল নীলাদ্রি গোস্বামী। নামটা ভবানীপ্রসাদই রেখেছিলেন। তখন শংকরীপ্রসাদ একান্নবর্তী পরিবারে ছিলেন। নীল-উৎসবের দিন জন্মেছিল বলে তার নাম নীলু রাখা হয়েছে। নীলুর ঠাকুর্দা তখন বেঁচে। নীলু পুরান বাস্তুতেই জন্মেছে।

চৈত্রের শেষে প্রত্যেক বছরই গাজন-উৎসব হয় তাদের শিব-মন্দিরে। গাজনের দিনটিতে হয় নীল উৎসব। সেদিন হর-পার্বতীর বিষয়ে তরজা গান চলে। গান শোনার জন্য আশে-পাশের গ্রাম থেকে লোক আসে। এখন আর নীলের সে জৌলুস নেই। যামিনী রায় যতদিন ছিল, ততদিন লোকে তার গান শোনার জন্য মন্দিরে এই দিনে ভীড় করত।

যামিনী রায় তার জীবদ্দশায় সকলের কাছে অনেকটা এক কিম্বদন্তীর পুরুষ ছিল। সে ছিল স্বচ্ছল কৃষক। সারাবছর চাষবাস ও নানা ঘর-গেরস্থের কাজকর্ম করত। তবু তার সঙ্গে অন্যদের কোথায় যেন একটা প্রভেদ ছিল। নীলু ছোটবয়সে যামিনীর আলাদা ব্যক্তিত্বটা উপলব্ধি করত। বড় হয়েও কিছুটা, বোধ হয় সংস্কারবশে।

লোকে নানা অভিলাষ পূরণের জন্য শিবের মন্দিরে ধর্না, হত্যা বা মানত করত। তারা গাজনে ভক্ত হবার জন্যেও মানত করত। সে ক'দিন তাদের শিবের মন্দিরে থাকতে হবে এবং নানা আচার নিষ্ঠা পালন করতে হবে। তারা গেরুয়া রঙের কাপড় পরে গলায় উত্তরীয় ঝুলাবে। তৈলহীন স্নান, ভূমিতে শয়ন এবং ভিক্ষান্নে উদরপূর্তি ইত্যাদি নানা কৃচ্ছ্র সাধন তাদের করতে হবে। এই সমস্ত ভক্তদের মধ্যে যে প্রধান তাকে বলা হয় পাট-ভক্ত। এই প্রাধান্যটুকু যামিনী রায় তার জীবদ্দশায় প্রতিবছরই পেত।

নীলু মায়ের কাছে কত গল্প শুনেছে যামিনী রায়ের। মা বলতেন—ও কি এমনি পাট-ভক্ত হয়েছে ভাবিস? শিবঠাকুর যে রাতের বেলায় প্রায়ই ওর সঙ্গে কথা বলে। ও রাতে ঘুমিয়ে থাকলে বাবার বাহন ষাঁড় ওকে শিঙের গুঁতোয় জাগিয়ে দেয়। তখন যামিনী জানতে পারে, বাবা তাকে ডাকছে। অমনি সে ষাঁড়ের পিছু পিছু মন্দিরে যাবে। সেখানে বাবা তার প্রিয় ভক্তকে যা বলার বা আদেশ দেবার দেবে।

অনেককাল আগে একবার দারুন খরায় মাঠ-ঘাট সব জ্বলে যায়। চারদিক অজন্মা। আসন্ন দুর্ভিক্ষের চিন্তায় লোকে দিশে-হারা হয়ে যায়। একদিনও কেউ মাঠে লাঙ্গল নিয়ে যায় নি সে বছর।

মা বলতেন—একদিন এই যামিনীই তোর বড় জেঠাকে গিয়ে বলে যে, সে রাতে বাবার আদেশ পেয়েছে, বাবার অভিষেক করলে বৃষ্টি হবে। বাবার মাথায় চব্বিশ ঘণ্টা ধরে কলসী কলসী জল ঢালতে হবে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে পূজানুষ্ঠান। বহুলোক জেনে গেল কথাটা। ভবানীপ্রসাদ অভিষেকের আয়োজন করলেন। চব্বিশঘণ্টার জন্য আটজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হল। সারা দিন-রাত ধরে বাবার মাথায় জল ঢালা হতে থাকল।

চব্বিশ ঘণ্টা শেষ হতে যায়। কিন্তু বৃষ্টি কই? কিন্তু ভোর হবার আগেই যামিনী এসে আবার জানায় যে, অভিষেক করে যেতেই হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না বৃষ্টি নামে। বাবার আদেশ, বৃষ্টি নামবেই।

কেউ.কেউ অবিশ্বাসী হয়ে পড়ে। কিন্তু সকল অবিশ্বাস দূর করে ঠিক আটচল্লিশ ঘণ্টার মাথায় আকাশে মেঘ দেখা গেল। আর তারপরই নামল অবিরল ধারায় বৃষ্টি—বৃষ্টি, বৃষ্টি, শুধু বৃষ্টি! —যেন একখানা রাগিনীর মত ঝরে পড়ল। সমস্ত তৃষিত প্রাণ জুড়িয়ে গেল। লোকে শিবকে যত না ধন্য ধন্য করল, তার চেয়ে বেশী করল তার ভক্ত যামিনী রায়কে। শিবের মহিমা শতগুণে প্রচার হয়ে গেল। সেই সঙ্গে যামিনীরও।

পরে যামিনী প্রচার করল—গাঁয়ের এই শিব হলো চন্দ্রনেশ্বর মহাদেবের ছোট তরফ।

লোকে সে কথা বিশ্বাস করল। আজো বিশ্বাসী মন সে বিশ্বাস করে। তারপর ভবানীপ্রসাদ যামিনীকে ডেকে এনে এই পাট-ভক্তের পদটি দেন। যামিনী আজীবন সে পদে বহাল ছিল।

গাজনের আগে বাবার মন্দিরের চূড়ার ধ্বজা উড়াতে হবে। তা' কি যে-সে কেউ বাঁধতে পারে? কারণ বাবা থাকবেন যে নীচে। তাঁর উপরে যে লোকের পা থাকবে। বড়দা বলত— শিবঠাকুর যামিনীকে চূড়ায় ওঠার অনুমতি দিয়েই রেখেছেন। যামিনীই বাবার মন্দিরের চূড়ার প্রতিবছর ধ্বজা উড়াত।

অনেক বছর পরে, নীলু তখন তার ছাত্রজীবন প্রায় শেষ করে এনেছে, সে সময়ও একবছর দেশে অনাবৃষ্টি হল। শিবের মন্দিরে সেবারেও বৃষ্টির প্রার্থনায় আবার অভিষেকের আয়োজন করা হল। ভবানীপ্রসাদ তখনও বেঁচে। তিনিই আয়োজন করলেন। নীলুর মন তখন অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। ছোটবেলার মত কোন জিনিসকে সে বিনা বিচারে মেনে নিতে পারে নি।

কিন্তু, কি আশ্চর্য, সেবারেও শিবঠাকুর ভক্তজনদের মনের আশা পূর্ণ করলেন! দেশে সেবছরও সুবৃষ্টিই হয়েছিল। কেন?

এই 'কেন'র উত্তর সারাজীবন ধরে নীলু খুঁজে বেড়িয়েছে। নিজের অধীত বিদ্যা ও বিচারশক্তির সাহায্যে এই 'কেন'র উত্তর নীলু পায় নি।

এমনি অনেক 'কেন' বোধ হয় মানুষের মনে সেই মহাশক্তি-ধরের চেতনা এনে দেয়। সেই শক্তিধর তো ঈশ্বর। কিন্তু কি তার রূপ? কি ভাবেই বা তাকে পাওয়া যায়? পরিণত নীলু—নীলাদ্রি নিজের মন থেকে উত্তর পেয়েছে—না, তাকে দেখা যায় না, অনুভব করা যায় না, উপলব্ধি করতে হয়। সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটা গানের ভাষার মধ্যে ধরা পড়ে নেই—আছে সুরের মধ্যে। সুরের তরঙ্গেই সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই কম্পন জাগে। আর সেই কম্পন ছড়িয়ে পড়ে এক প্রাণ হতে অন্য প্রাণে, অন্য প্রাণে···। এমনি করে সেই সুর সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেই আলোড়ন জাগাতে পারে। সেই সুরের দোলায় দোলায় মহাশক্তিধরকে সচকিত করে তোলা যায়। জীবনে তাঁর করুণা তখন ঠিক সুরের মতই ঝরে পড়ে।

কিন্তু কি সে সুর? নীলু যেন বুঝতে পারে, সেই সুর মানুষ তার বিশ্বাসের বীণায় বাজিয়ে যায় জীবনভোর।

সারাজীবন ধরে নীলাদ্রি যা করে এল, ভেবে এল, দেখে এল—সমস্তই যেন, মনে হয়, একটা পুরো গানের অসংখ্য, সুনির্দিষ্ট স্তবক দিয়ে রচিত। এতদিন ধরে এই যে আনন্দ, এই যে বেদনা ঘৃণা, প্রেম, ভয় ভালবাসা—সব কিছু তো এক একটা অনুভূতি। কখন উচ্চে, কখন নিম্নে, কখন বা তীব্র, কখন বা সহনীয়। এক একটা অনুভূতি দিয়েই এক একটা গান রচনা করা যেতে পারে। আর সেই গানের সুর হৃদয়ে বিশেষ কম্পন জাগাতে পারে।

আবার গানের সুর একখাতে বয় না। একটানা সুর হৃদয়ে রেখাপাত করে না। মানুষকে সুরের তরঙ্গে দোলায় না। সুর

তাই কখনও চড়ায় ওঠে, কখনও বা খাদে নামে। এই ওঠা নামার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ গানটা আবার মানুষের মনে একটা মাত্র সুরের আস্বাদন এনে দিতে পারে।

নীলাদ্রি আজ অনুভব করে, সারাজীবনের পরিক্রমাকে ভাষায় রূপ দিলে তা গান হয়ে যাবে। সে গান হবে বিভিন্ন রসে ভরা, কিন্তু সব মিলিয়ে সেটি আবার একটি মাত্রই গান—মহা-জীবনের গান। এই গানের সুরে ভুবন দোলে—যে গাইছে সে যেমন দোলে, তেমনি যে গাওয়ায় সেও দোলে। এ গান কোন-দিন থেমে থাকে না। মানুষ যতদিন বাঁচে, ততদিন এ গান সে গেয়ে চলে।

অনুভূতির কোন কোন চরম লগ্নে সেই গানের সুরের মাঝে সেই মহাশক্তিধরের উপলব্ধি মেলে—সহসা, হয়ত ক্ষণিকের জন্য। সেদিন শত শত ভক্ত মিলে আকুলস্বরে, ব্যাকুল প্রার্থনায় মহা-দেবকে যে গান শুনিয়েছিল, গানের সেই সুরের দোলায় সংগীত-স্রষ্টা মহাদেবের হৃদয়ও দুলেছিল। তিনি তাই ভক্তদের আকুল আহ্বানে সাড়া দিতে পেরেছিলেন। এর মধ্যে আশ্চর্যের কিছুই নেই। এটা অনুভূতির জিনিস, উপলব্ধির জিনিস।

॥ দুই ॥

শংকরীপ্রসাদ ও রমলার দ্বিতীয় সন্তান হল নীলু। সন্তান মানেই মায়ের নয়নের মণি। কিন্তু প্রথম কন্যাসন্তানকে অকালে হারাবার পর নীলুকে পেয়েছেন রমলা। তাই নীলু হয়ে উঠল রমলার দুনয়নের মণি। শংকরীপ্রসাদ তাড়া দেন স্ত্রীকে, ছেলেকে ইস্কুলে ভর্তি করার জন্য। কিন্তু রমলার এক জেদ—না, তুমি বাড়ীতে মাষ্টার রাখ। অতদূরে ঐটুকু ছেলে রোজ রোজ যাবে কি করে ? তারপর মাষ্টারগুলো যা মারে দুধের বাছাদের !

শংকরীপ্রসাদ বিরক্ত হন। বলেন—ইস্কুলে তো আর দুধের বাছা নেই ? আমরাও তো ঐ ইস্কুলে পড়েছি। সেই একই বড়-পণ্ডিত মশায় আর ছোট পণ্ডিত মশায় এখনও রয়েছেন। কই, আমাদের মা-রা তো তোমার মত কথা বলেনি ? আমরা তো খেয়া পেরিয়ে আসতাম। তোমার ছেলেকে তো সে কষ্টও করতে হবে না। নীলু ইস্কুলে যাক্। বাড়ীতে মাষ্টার রেখে পড়িয়ে ছেলেকে আমি আলালের ঘরের দুলাল করে তুলতে চাই না।

কিন্তু রমলা সহজে মত দেন না। এমনি করে নীলুর পড়া-শুনা সুরু করার কাল একটু গড়িয়ে যায়। গাজনের পর নীলু পাঁচ পার হয়ে গেল। এমনি করে আরো সময় চলে যায়। রমলা অবশ্য ছেলেকে বাড়ীতে একটু আধটু শেখান। কিন্তু বৃহৎ সংসারের চাকা সচল রাখতে গিয়ে তিনি এম্‌নিতে দম পান না। তার মধ্যে নীলুকে পড়াবার সময় তাঁর কোথায় ?

শংকরীপ্রসাদেরও সময় নেই। তাঁর এখন বৃহৎ ব্যবসা তিনি রক্তের বিনিময়ে গড়ে তুলেছেন। মুলধন বলতে প্রথমে কিছুই ছিল না তাঁর। আগে তিনি গ্রামের অবস্থাপন্ন মাইতিদের দোকানে কিছুকাল কর্মচারী ছিলেন। সেই সূত্রে কোলকাতার বড়বাজারে তাঁকে মালপত্র কিনতে যেতে আসতে হত। এভাবে বড় বাজারের আড়তদারদের সঙ্গে তাঁর জানাশোনা হয়। পরে যখন তিনি নিজেই ব্যবসায় নামলেন, তখন ধারে মাল পেতে তাঁর অসুবিধা হল না। অতএব কম মুলধনে তাঁর অসুবিধা হয় নি।

মাত্র দুশ' টাকা মুলধন নিয়ে তিনি ব্যবসায় নেমেছিলেন। দিয়েছেন তাঁর বাবার বন্ধু ভুবনবাবু ধার হিসাবে। শংকরীপ্রসাদ ঐ টাকায় সেবার পাট কিনেছিলেন। তাঁর কপালগুণে সে বছর পাটের দাম পাঁচ-সাত গুণ চড়ে যায়। তার ফলে ঋণদাতার টাকা শোধ করেও তাঁর বেশ কিছু মুলধন হয়ে যায়।

তখন তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। কালীগ্রাম আর তালপুকুরিয়ার বাজারে সাইকেলে চড়ে মাল কেনার জন্য তাঁকে যেতে আসতে হত। এই দুই গঞ্জকে যোগ করেছে তাঁর বাড়ীর সামনের টাইডেল ক্যানেলটি, যেটি একদিকে হলদি ও অন্যদিকে রসুলপুর, এই দুই নদীকে যুক্ত করেছে। ক্যানেলটির দৈর্ঘ্য প্রায় আঠারো মাইল।

ক্যানেল তখন সারাবছরই নাব্য ছিল। কালীগ্রাম আর তালপুকুরিয়াতে লক্ গেট ছিল, নদীর জল ক্যানেলে ঢোকাবার আর ক্যানেলের জল নদীতে বার করার জন্যে। ব্যবসার সুবিধার জন্যই তিনি শাপলা গ্রামের ক্যানেল পাড়ের এই জায়গাটি পছন্দ করেন। নৌকায় ব্যবসার মাল এসে তাঁর দোরগোড়ায় উঠত। আবার তেমনি তাঁর পাট বা খড় বোঝাই নৌকা একেবারে বাড়ীর দোরগোড়া থেকেই সোজা কলকাতার বাগ-বাজারে গিয়ে পৌঁছাত। শংকরীপ্রসাদ ছিলেন পাকা ব্যবসায়ী। ব্যবসার স্থান নির্বাচন তিনি অতি সুন্দরভাবেই করেছিলেন,

যাতে তাঁর পরিবহন সমস্যা না থাকে এবং ব্যয়ও নামেমাত্র হয়।

লক্ষ্মীদেবী এই উদ্যমী এবং পরিশ্রমী যুবকটিকে সত্যই দয়া করেছিলেন। মাত্র পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে তিনি যা উন্নতি করলেন, তা এক রূপকথারই মত। এখন তাঁর মুলধন অন্ততঃ পক্ষে কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা। আর তা দিনে দিনেই বাড়ছে। তাঁর রয়েছে মনিহারী, ভূষিমাল সামগ্রী বাদে কাপড়-চোপড়ের দোকান। আনুষঙ্গিক হিসাবে রয়েছে ধান, চাল, খড়, পাট, কয়লা ইত্যাদির ব্যবসা এবং সেই সঙ্গে বই, ওষুধ, সোনারূপা ইত্যাদির কারবার। এত সব জিনিসের জন্য আজকাল তাঁর পুরোনো দোকান ঘরে অসুবিধা হচ্ছে।

এত বড় ব্যবসা-যজ্ঞের মধ্যে যিনি সর্বক্ষণ শংকরীপ্রসাদকে ছায়ার মত অনুসরণ করে চলেছেন, তিনি হলেন শৈলেশ্বর—নীলুর শৈলমামা, শংকরীপ্রসাদের দূর সম্পর্কের শ্যালক। আজকাল শৈলেশ্বরই মালপত্র কেনা-কাটার জন্য কলকাতায় যান। আর রয়েছেন নগেন সামন্ত—নীলুর নগেন কাকা, শাপলা গাঁয়েই বাড়ী। নগেন কাকার কাজ খরিদ্দারের জিনিসপত্র দেওয়া। হিসাব পত্র লেখার জন্য রয়েছে বক্সী পতিত পাবন জানা—নীলুর পতিতপাবন জেঠা। পতিত পাবন জেঠার বাড়ী কোথায় নীলু জানে না, তবে এ গাঁয়েই তাঁর শ্বশুরবাড়ী। এঁরা নীলুদের বাড়ীতে থাকেন ও খান। এ ছাড়া আরো দু' একজন কর্মচারী আছে যারা তাঁদের বাড়ীতে থাকে না।

রমলার সংসারে স্বামী আর তার ছেলে। কিন্তু পরিজনদের সংখ্যা তাই বলে কম নয়। দোকানের তিন-চার জন লোক ছাড়া বাড়ীতে রয়েছে বারমেসে চাকর হরি আর চাকরানী মানদা বুড়ী। এ ছাড়া পতিত পাবন আবার নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব। তিনি রান্না করা তরকারীতে পেঁয়াজ পর্যন্ত খান না। মুশুর ডালও তাঁর খাদ্য তালিকায় নেই। তাঁর জন্য তাই রমলাকে আলাদাভাবে

রান্না করতে হয়। তবে সুবিধা এই, রাতের বেলায় তিনি দু'খানা আটার রুটি আর এক গেলাস দুধ ছাড়া আর কিছু খান না।

অতএব অতগুলো লোকজন নিয়ে রমলাও কম হিমশিম খান না। এ ছাড়া রমলার সংসারে গরু রয়েছে তিন-চারটি। যদিও হরি সেগুলোর জন্য রয়েছে, তবু তাঁকে বিস্তর ঝক্‌মারী পোহাতে হয়। ওদিকে শংকরীপ্রসাদও তাঁর ব্যবসার পরিধি বাড়াতে ব্যস্ত। সন্ধেবেলার দিকে তাঁর অনেক বন্ধুবান্ধব আসেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আড্ডা জমান তিনি। কোনদিন গান-বাজনা হয়, কোনদিন খবরের কাগজের সংবাদ নিয়ে খোশ গল্প আবার কোনদিন বা তাসের আসর জমে ওঠে। যখন শংকরী-প্রসাদের কাজকর্মের চাপ একটু কম থাকে তখন তাসের আসর বড় সাংঘাতিক জমে ওঠে। এমনও এক একদিন যায়, যেদিন চব্বিশ ঘণ্টাই তিনি তাস খেলেন, স্নান ও আহারের সময়টুকু বাদে।

অতএব রমলা বা শংকরীপ্রসাদের সময় কোথায় নীলুকে নিজেরা একটু-আধটু পড়াবেন? নীলুর অবশ্য তার জন্য কোন দুঃখ নেই। সে আপন মনে খেলে বেড়ায় সারাদিন। রানী তার চেয়ে বড়। সে ইস্কুলে যায়। ঐ সময় বাদে বাকী সময়ের বেশীর ভাগই রানী নীলুর সঙ্গে খেলে। প্রশস্ত গোয়ালঘর অথবা পাটের গুদামই তাদের খেলাঘর। অথবা বাড়ীর পেছনের বড় ঝাঁকড়া তেতুল গাছটার ছায়াঢাকা তলাটা তাদের খেলার আস্তানা। তাদের খেলাঘরে পাড়ার অন্য ছেলেমেয়েরাও আসে কখনও কখনও। সন্ধ্যের দিকে কোন দিন তারা পাশের 'গরু-চরার' মাঠে খেলতে যায়। সেখানে সারা গাঁয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলে।

নীলুর কাছে রানী তার ইস্কুলের অনেক গল্পই করে। একদিন নীলু রানীর সঙ্গে এক ছুটির দিনে লুকিয়ে নাপিতদের

বাঁশবাগান পেরিয়ে, ছোটপণ্ডিত-মশাইয়ের বাড়ীর সামনের কৃষ্ণচূড়ার গাছ ছাড়িয়ে, বোষ্টমদের বাড়ীর সামনের বিরাট তেতুল-গাছটার তলা দিয়ে গিয়ে তাদের ইস্কুলে দেখে এসেছে।

তেতুল গাছটার তলা দিয়ে যেতে যেতে রানী বলেছিল—জানিস্, এ গাছটার তেতুল, না, একেবারে গুড়ের মত মিষ্টি। আমরা ইস্‌কুল থেকে ফেরার সময় রোজ তেতুল পেড়ে খাই।

নীলু আপশোষ করে বলে—সব খাস্? আমার জন্য তো কই, কোন দিন নিয়ে যাস না।

রানী বলে···দূর, গাছ থেকে বেশী পাড়া যায় না। বোষ্টমদের যা একটা খেঁকি কুত্তা আছে না,—খ্যাক্ খ্যাক্ করে তেড়ে আসে। গাছে ঢিল মারলেই তেড়ে আসে। যা দু' একটা পাই, বাড়ী নিয়ে যেতে যেতেই শেষ হয়ে যায়। আচ্ছা, তোকে একদিন দেব।

নীলুর ভারী ইচ্ছে হয়, সেও রানীর সঙ্গে ইস্‌কুলে যায়। ইস্‌কুলের পেছনেই বিরাট এক দীঘি—জলে টলটল। দীঘি শাপলাতে ভর্তি। ওপারে কামারশাল। একপাশের পাড়ে বিরাট বৈঁচীকুলের ঝোপ।

নীলুকে রানী সেদিন পুকুর থেকে শাপলার ডাঁটা তুলে আর বৈঁচীকুলের ঝোপ থেকে পাকা টসটসে গাঢ় লাল রঙের কুল তুলে এনে খাইয়েছিল। খুব ভাল লেগেছিল নীলুর। ইস্‌কুলে পড়তে আসা যে এত মজার, তা কে জানত? ইস্কুলে না আসতে পারার জন্য তার মনে বড় কষ্ট হয়। মায়ের উপর এক অবুঝ অভিমানে তার গলার কাছে কি যেন এক ব্যথা দলা পাকিয়ে ওঠে। রানীর সৌভাগ্যকে নীলুর ঈর্ষা করতে ইচ্ছে হয়। সেদিন ফিরে এসে সে তাই মায়ের কাছে ইস্‌কুলে পড়তে যাওয়ার বায়না ধরে।

সরস্বতীর প্রতি পুত্রের এ হেন টান দেখে রমলা হাসবেন না কাঁদবেন ভেবে পান না। সস্নেহ হাসি মেলে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেন—পাগল!

কিন্তু নীলু নাছোড়বান্দা। সে মায়ের পিঠের উপর চড়ে গলা জড়িয়ে ধরে আবদার জানায়—না, আমি ইস্‌কুলে যাব। রানী যায়। আমি ওর সাথে যাব।

—আচ্ছা, আচ্ছা রে বাবা, যাবি! এখন যা তো। দেখছিস্ না, ভাতের ফ্যান গড়াচ্ছি। পিঠ থেকে নাম। নইলে গরম ফ্যানের উপর মুখ থুবড়িয়ে পুড়ে মরব যে।

নীলু পিঠ থেকে নামার পর রমলা হেসে বলেন—ইস্কুলে ভারী মজা, না? যা, বুঝবি। মাষ্টারদের ছড়ি যখন পিঠে পড়বে তখন বুঝবি মজাটা।

ফ্যান গড়িয়ে রমলা ভাতের হাঁড়িতে ঝাঁকানি দেন।

—ইস্, বললেই হল? মারবে! নীলু দৃঢ় বিশ্বাসে বলে—মিছে কথা, মারে না, রানী আমায় বলেছে।

রমলা হেসে বলেন—রানী যে মেয়েছেলে।

নীলু ভেবে পায় না, মাষ্টারমশাইয়েরা কেন দেখে দেখে শুধু ছেলেদেরই মারে। তার মনে হয়, সরস্বতী মেয়েছেলে, তাই বোধ হয়, মাষ্টারমশাইয়েরা মা সরস্বতীর জাত, মেয়েদের গায়ে হাত তোলেন না। ঠাকুরের জাত বলে কথা!

বিকালে ঘুম থেকে উঠে নীলু দুধ দিয়ে মুড়ি খেতে বসেছে। ঘরের দুটো গাই দুধ দেয়। প্রচুর দুধ। অত খাওয়ার লোক নেই। ছেলে বলতে সে একা। নীলু বাটিতে হাত ডুবিয়ে দেখে দুধ তার কব্জী পর্যন্ত উঠল না। রেগে গিয়ে মায়ের উদ্দেশ্যে সে বলল—দুধ অতটুকু কেন? আমি খাব না, যাও।

—খেয়ে নে বাবা। দুধ পোড়ারমুখো ভুলো বেড়ালই খেয়েছে। রমলা ছেলেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন।

ভুলো নীলুর অতি আদরের বেড়াল। প্রায়ই সে ভুলোকে নিয়ে শোয়। ভুলো খেয়েছে বলে, বোধ হয়, সে আর বেশী উচ্চবাচ্য করল না। ভাল মুখ করে খেয়ে নিল দুধ-মুড়ি।

শীতের বেলা। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। নীলু খেলতে যাবে, এমন সময় রানী এল।

রানীকে দেখে নীলু বলে—জানিস, মা বলেছে, আমি এবার থেকে ইস্‌কুলে যাব। কি মজা হবে, না রে? তুই আর আমি এক সঙ্গে যাব।

নীলু আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে। রানী কৌতুকে হেসে যায়। হাসি থামিয়ে বলে—মজা নয়, পড়া করতে না পারলে বেত খাবি।

অবাক হয়ে নীলু বলে—তবে যে তুই বল্‌লি মাষ্টার মারে না?

—একেবারে কি আর মারে না? মেয়েদের চুলের ঝুঁটি ধরে টানে। ছেলেদের বেত মারে। সে বেশ মজার। ইস্কুলে চল্, দেখতে পাবি। এখন চল্ তো খেলতে যাবি। সন্ধ্যে হয়ে এল।

নীলুর মনটা ভারী হয়ে আসে মারের কথা শুনে। সঙ্গে সঙ্গে সে ভেবেও পায় না, মার খেতে বা কি মজা লাগতে পারে। রানীটা কেমন যেন সব হেঁয়ালীর কথা বলে। কিন্তু তবু তার ভয় ছাপিয়ে তেতুল, শাপলা ও বৈঁচীকুলের স্বাদগ্রহণের আনন্দ বড় হয়ে ওঠে। এক অজানা আনন্দ ও আতঙ্কের মিশ্রিত সুরে তার মন দুলতে থাকে।

রানীর হাত ধরে সে বলে—আয়, আজ আমরা এখানেই খেলি।

তারা গোয়ালঘরের মধ্যে খেলতে আসে। তখনও হরি বাইরে থেকে গরু এনে গোয়ালে তোলে নি। রানী সামনের ঢ্যাড়স ক্ষেতের বেড়া থেকে একটা কঞ্চি তুলে নিয়ে বলে—দেখবি নীলু, মাষ্টারমশাই কি রকম মারে? এ্যাই দ্যাখ্। ধর, এই বাঁশের খুঁটিগুলো ছাত্র। আর আমি ধর বড় পণ্ডিতমশাই।

—আর আমি? নীলু শুধায়।

—তুই, তুই নীলু। রানী খিল খিল করে হেসে ওঠে।

নীলু রানীর এই খেলায় অংশ নিতে পারছে না বলে তার ভাল লাগে না। সেদিন যখন ও-পাড়ার বুলি, মন্টু, আর কালরা এসেছিল তখন তারা সকলে মিলে চোর-চোর খেলেছিল। নীলু হয়েছিল চোর আর রানী দারোগা। কিন্তু এই পণ্ডিত-পণ্ডিত খেলায় রানী তো সে রকম কিছু তাকে হতে বলল না।

রানী ততক্ষণে গোয়ালঘরের বাঁশের খুঁটিগুলোকে উদ্দেশ্য করে বলছে—পড়া হয় নি? চোরবাচ্চা, করঞ্জার গুঁড়ি। আয় কাছে সরে আয় বলছি! আজ তোর পিঠে ছড়ি ভাঙ্গব।

রানী ছড়ি নিয়ে আস্ফালন করে, আর সমানে বাঁশের খুঁটি-গুলোর কাছে আসার জন্য আদেশ করে যেতে থাকে। নীলু এতক্ষণে মজা পায়। কিন্তু খুঁটি তো কাছে আসতে পারে না। নীলু ভাবছে, খুঁটিগুলো সব অবাধ্য ছাত্র, কাছে আসতে চায় না, বেতের ভয়েও না।

অগত্যা রানীই এগিয়ে যায়। তারপর এলোপাথাড়ী মার শুরু করে। ছড়ি অল্পতেই ভেঙ্গে যায়। রানী সদর্পে নীলুর দিকে তাকিয়ে বলে—দেখলি তো, কিরকম ছেলেদের পিঠে ছড়ি ভাঙ্গলাম?

নীলু ভয়ে বলে—মাগো, এত জোরে মারে?

—দূর পাগল! তুই মজা জানিস না। ছড়ি সত্যি সত্যি পিঠে ভাঙ্গলে তো ছেলেরা মরেই যাবে রে। পণ্ডিতমশাই মুখে ওরকম বলে, কিন্তু কাউকে যখন মারে না, দেখতে ভারী মজা লাগে।

—আর তোকে যদি মারে?

—তাহলে তুই মজা পাবি। আবার তোকে মারলে আমি মজা পাব। রানী এবার হাত নেড়ে বুঝিয়ে বলে—আসলে কি জানিস, প্রথম প্রথম সবাই ভয় পায়। তারপর এমনিই মজা না,—মজা পেতে পেতে ভয় ভেঙ্গে যায়। তখন পিঠে ছড়ি ভাঙ্গলেও ভয় নেই।

দুজনে খিল খিল করে হেসে ওঠে। এমন সময় হরি ঢুকল গোয়ালে গরু নিয়ে। ওদের হাসতে দেখে সে বলে—তোরা সন্ধ্যেবেলা এখানে কি করছিস? যা', যা', বাইরে যা,—আমি গরু বাঁধব।

নীলু আর রানী তারপর পাটের গুদামে আসে। গুদামের এক কোণে থাকে তাদের খেলনাপাতি। ছোট মাটির হাঁড়ি, ভাঙ্গা পুরান কড়াই, খুন্তি, এইসব খেলার জিনিস তারা বার করে আনে।

রানী বলে—আজ, বর-বৌ খেলি, আয়।

নীলু আশ্চর্য হয়। এ খেলার নাম সে আগে শোনে নিলু। তাই বলে—সেটা কি রে? আমি তো জানি না খেলতে।

রানী তাকে আশ্চর্য করে বলে—আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। আমি তোর বৌ হব। আমি রান্নাবান্না করব, মা'রা যেমন করে আর কি। তুই হাট থেকে তরকারী, দোকান থেকে ডাল, নূন, তেল, এ সব নিয়ে আসবি। আমার বাবা তোদের দোকান থেকে বাজার করে নিয়ে যায়, দেখিস না? যা' তুই ওগুলো নিয়ে আয়। আমি ততক্ষণে উনুন বানাই।

নীলু এবার খেলাটা বুঝতে পারে। সে একটা ছোট শিশি আর একটা ভাঙ্গা বাটি নিয়ে ক্যানেলের পাড়ের দিকে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসে, তখন রাণীর উনুন তৈরী করা সারা। শিশিতে ছিল ক্যানেলের জল। রানীর হাতে শিশিটা দিয়ে নীলু বলে—এই হল তেল।

তারপর একে একে অন্যান্য জিনিস নামাতে নামাতে বলে—এই ডাল, এই নূন আর এই হল তরকারী।

রানী দেখে খুব খুশী। বাটিতে রয়েছে কিছু ধূলো আর নুড়ি-জাতীয় জিনিস। তরকারী বলতে, সামনের ক্ষেত থেকে সদ্যতোলা কয়েকটা ঢ্যাড়স আর ঝিঙ্গে।

রানী এক টুকরো কাঠের উপর ইটের টুকরো ঘষে ঘষে

বাটনা বাটতে বসে। রান্নায় মন দেয় রানী। একসময় নীলু বলে ওঠে—তুই রান্না কর্, আমি বাবার মত খাতা লিখি।

নীলু উঠে গিয়ে ঘর থেকে এক টুকরো কাগজ এনে কঞ্চি দিয়ে তার উপর অদৃশ্য হিসাবের হিজিবিজি কেটে যায় গভীর মনোযোগের সাথে।

বাটনা বাটতে বাটতে মুখ তুলে রানী বলে— তুই বেশ ভাল বর রে।

কথার শেষের দিকে রানী হেসে ফেলে। নীলু কিন্তু হাসে না। মুখ তুলে রানীর দিকে তাকায়। সে যেন এক মস্ত ফ্যাসাদে পড়েছে। সে ভাবেই সে বলে—কিন্তু তুই যে আমার চেয়ে বড় রে। মা তো বাবার চেয়ে ছোট।

—ও কিছু নয়, রানী নীলুর দুশ্চিন্তাকে উড়িয়ে দেয়। বলে—মা বলেছে, মেয়েরা যত বড়ই হোক, ছেলেদের চেয়ে ছোট-ই থাকে।

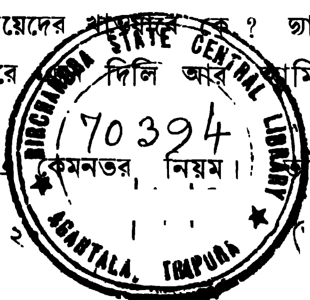
ঠিক বুঝতে পারে না নীলু রানীর কথাটা। তাই প্রশ্ন করে অন্য জিনিস। —আচ্ছা, মা কেন তার বাপের বাড়ীতে থাকে না রে? কারোর মা-ই তো থাকে না।

রানী এবার পরম অবজ্ঞার সুরে বলে—তুই কিচ্ছু জানিস না। বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েদের বরের বাড়ী যেতে হয় না? দেখিস নি, শান্তির দিদির বিয়ে হয়ে যেতে সে তার বরের সঙ্গে চলে গেল?

নীলু কারণটা বুঝল কিন্তু বিয়ে করার দরকারই বা কি, তা বুঝতে পারল না। তাই সে আবার প্রশ্ন করে—বিয়ে কেন করে রে?

—বারে, তা না হলে মেয়েদের খাওয়াবে কে? দ্যাখ্ না, তুই বর বলে তো বাজার করে এনে দিলি আর আমি রান্না করছি। এরকম আর কি!

নীলু বুঝতে পারে না, এ কেমনতর নিয়ম। তবে যদি



একটা বোন হতো, কি তার দিদিই বেঁচে থাকত, তাহলে তার বাবা কি তাকে খাওয়াত না? খাওয়াবার জন্য তার বিয়ে দিয়ে দিত?

কিন্তু বেশীক্ষণ এ চিন্তা সে করতে পারল না। রমলা তাকে ডাক দিয়ে বললেন—সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এবারে ঘরে আয়, নীলু।

একটু পরে রমলা কাছে এসে দেখেন, বেশ কয়েকটা ঢ্যাড়স ও ঝিঙ্গে তোলা হয়েছে। তিনি নীলু ও রানীকে তিরোস্কার করলেন ওগুলো তোলার জন্য। সেগুলো হাতে নিয়ে রমলা বলেন—চল্, ঘরে চল্।

খেলা তাদের সেদিন ভেঙ্গে গেল কিন্তু খেলা জমেও উঠল।

॥ তিন ॥

পৌষমাস। নীলু বাবার কাছেই শুয়েছিল। সকাল হয়েছে কিনা বুঝতে পারে না সে। চারদিকে ঘন কুয়াশা। ঘরের মধ্যেও কুয়াশা ঢুকে পড়েছে। নীলুর ইচ্ছে করছে আরও একটু শুয়ে থাকতে। কিন্তু আজ তার ইস্‌কুলে যাওয়ার কথা মনে পড়তেই তার সারা শরীরে একটা আনন্দের শিহরণ খেলে যায়। তার তখনই উঠে পড়তে ইচ্ছা করে। চেয়ে দেখে, পাশে বাবা স্তোত্র-পাঠ শুরু করছেন।

নীলু খাট থেকে নেমে বাইরে এল। মেঝেতে মার বিছানা পাতা রয়েছে কিন্তু মশারী চাঁদোয়ার উপর গুটিয়ে তোলা। মা অনেকক্ষণ আগেই উঠে গেছেন। নীলুকে দেখে রমলা বলেন—যা', তোর মামা পুকুরঘাটে রয়েছে। দাঁত মেজে আয়। এই নে, ছাই।

ছাই হাতে পুকুরঘাটে এসে নীলু দেখে শৈলমামা ঘাটের শান-বাঁধান সিঁড়ির উপর বসে দাঁত মাজছেন। আর ঐ প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও বুকসমান জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বক্‌সী পতিত-পাবন গলায় গামছা দিয়ে হাত জোড় করে স্তোত্রপাঠ করে যাচ্ছেন।

'ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥
ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাসপুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্তিহ॥
ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥'—

রোজ শুনে শুনে নীলুর প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। তখনও সূর্য উঠতে কিছু দেরী। কুয়াশার জন্য কাছের জিনিসও ভাল করে দেখা যায় না।

নীলু শৈলমামার পাশে এসে দাঁড়াল। পতিতপাবন জেঠা রোজ স্নান সেরে এমনই জলে দাঁড়িয়ে আধঘণ্টা ধরে স্তবস্তুতি করেন বিভিন্ন দেবদেবীর। এ দৃশ্য প্রতিদিনের। পতিত জেঠার এই নিত্যকর্মে মাস, ঋতুর বিচার নেই। সারা বছরে ৩৬৫ দিনই তিনি করেন। কদাচিৎ তিনি অসুস্থ হন। অন্ততঃ নীলু তো তাঁকে অসুস্থ হতে দেখে নি। পতিত জেঠার বয়স হয়েছে; বাবার চেয়ে তিনি অনেক বড়। অথচ এই বয়সে, এই হাড়-কাঁপানো শীতে জলে দাঁড়িয়ে কি করে যে তিনি স্তোত্রপাঠ করেন, তা নীলু ভেবে উঠতে পারে না। তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নীলুর সারা শরীর যেন জমে যেতে থাকে।

নীলু শৈলমামার দিকে তাকিয়ে বোঝে যে, তাঁর দাঁত মাজা অনেকক্ষণ আগেই হয়ে গেছে। বাধ্য হয়ে তিনি আঙ্গুল দিয়ে অনাবশ্যকভাবে দাঁত ঘষে যাচ্ছেন। নীলু জানে, পতিত জেঠা জল থেকে না উঠলে ঘাটে মুখ ধোওয়া চলবে না। এটুকু সৌজন্য এবং সম্মান সকলেই তাঁকে দেখান, বাবাও পর্যন্ত। নীলু দাঁত ঘষতে সুরু করল।

একটু পরে পতিত জেঠা তাঁর পেতলের পাতের ঘটি জলভর্তি করে মন্ত্র পড়তে পড়তে পুকুরঘাট ছেড়ে উঠলেন। নীলু জানে, এরপর তিনি কি কি করবেন। দেখে দেখে সব মুখস্থ হয়ে গেছে। এরপর তিনি পুকুর পাড়ের বট গাছের গোড়ায় ঘটি থেকে খানিকটা জল ঢালবেন। আর মন্ত্র পড়বেন :—

'ওঁ' বট ত্বং বৃক্ষরূপোঽসি মহাদেবেতি বিশ্রুতঃ।

বিষ্ণুরূপধরোঽসি ত্বং পুন্যবৃক্ষ নমোঽস্তুতে॥

তারপর তিনি ক্যানেলের পাড়ে দাঁড়িয়ে নবোদিত সূর্যকে প্রণাম করবেন—

'ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥'

তারপর তিনি ঘাট থেকে জলের ছড়া দিতে দিতে দোকান-ঘরের দিকে এগিয়ে যাবেন অতি শান্ত-সমাহিত চিত্তে। সামনে ফুলের বাগানের মধ্যে রয়েছে তুলসীমঞ্চ। সেখানেও তুলসীর গোড়ায় খানিকটা জল ঢালবেন আর মন্ত্র পড়বেন···

'ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িন্যৈ সত্যবত্যৈ নমোনমঃ॥'

তখনও পণ্ডিত জেঠার ঘটিতে কিছু জল থাকবে। সেই পবিত্র জল তিনি দোকানঘরের মধ্যে ছিটাবেন। তারপর ধূপ জ্বেলে ঘরের চারদিকে ঘোরাবেন। এবং আরো কি সব মন্ত্র পড়ার পর তিনি চোখে চশমা দেবেন। তারপর ক্যাশ বাক্সের সামনে এসে বসবেন। সমস্ত কিছুই নীলু রোজ দেখে এবং শোনে। অতএব কার পর কি করবেন, তা' নীলুর জানা।

পণ্ডিত জেঠা উঠে যাওয়ার পর শৈলমামা দ্রুতহস্তে নিজে মুখ ধুয়ে নীলুরও মুখ ধুইয়ে দিলেন। পরে বললেন—যা', তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নে। তোর জন্য দোকান থেকে নতুন ধুতি, গেঞ্জি বা'র করে দিয়েছি। খেয়ে দেয়ে ওগুলো পরে বেরিয়ে পড়্। আমি আজ তোকে ইস্কুলে নিয়ে যাব।

নীলু আপত্তি করে বলে—মামা আমি কাপড় পরব না, প্যাণ্ট পরে যাব।

শৈলমামা বলেন—আজকের দিনে পরতে হয়। পরে না হয় নাই পরিস্।

ঘরে আসতে মা নীলুকে হলুদ-তেল মাখিয়ে দিলেন। শীতে নীলুর সারা গা শিরশির করতে লাগল। আর সেই মুহূর্তে পণ্ডিত জেঠার কথা তার মনে পড়ল। গরমজল মা তৈরী করেই রেখেছিলেন। পুকুরে স্নান করার কথা ভেবে নীলু শীতে আকুল হ'চ্ছিল। গরম জল দেখে আশ্বস্ত হল। রমলা নীলুকে ভেতরের শান বাঁধানো চাতালে স্নান করিয়ে দিলেন।

নীলু কাপড় পরে খেয়ে দেয়ে যখন তৈরী, তখন বাবা ও মামার চা খাওয়া সারা। রমলা নীলুর কোঁচাটাকে জামার বাম পকেটে গুঁজে দিলেন। তারপর তার কপালে দৈ-এর টিপ পরিয়ে তার বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুল দাঁত দিয়ে কামড়ে দিয়ে বললেন—মা সরস্বতী, বিদ্যে দাও। পরে শৈলমামার দিকে তাকিয়ে বললেন—শৈল, মাষ্টারমশায়দের বলে দিস্, ছেলেকে যেন না মারে।

শৈলমামা সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললেন নীলুকে—ইস্, নীলু এখন একেবারে নীলুবাবু! তারপর মামা নীলুকে আদেশ করলেন মা বাবাকে প্রণাম করতে।

নীলু মা, বাবা ও শৈলমামাকে প্রণাম করে শেলেট হাতে মামার হাত ধরে বাড়ীর বাইরে এল। যাত্রার পূর্বে শংকরীপ্রসাদ বললেন—ওর শেলেটটা তুই হাতে নে। ছেলেমানুষ হোঁচট খেয়ে পড়লে শেলেট ভেঙ্গে যাবে। আজকের দিনে শেলেট ভাঙ্গাটা ভাল নয়।

নীলুর হাত থেকে শেলেট নিয়ে তার হাত ধরে শৈলমামা চলতে শুরু করলেন। নীলু পেছন ফিরে দেখে, মা, বাবা তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। পেছনের পুকুর পাড় দিয়েই রাস্তা। নিজেদের সীমানা পার হলেই পড়ে রানীদের সীমানা। রানী তার জন্য অপেক্ষা করে ছিল, রানীকে দেখতে পায় নি কুয়াশার জন্য।

কাছাকাছি আসতেই রানী বলল—আয় নীলু, তোর জন্যই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

রানী তাদের পিছু পিছু যেতে লাগল। বোষ্টমদের বাড়ীর সামনের সেই তেতুলগাছটার তলায় এসে নীলু একটু দাঁড়িয়ে পড়ল। গাছের দিকে চেয়ে পুষ্ট তেতুল ফলগুলো দেখে আনন্দে তার চোখ ছুটো চিকচিক করে উঠল। মামা দাঁড়িয়ে পড়ে পেছন ফিরে বললেন—কি হল, পা চালিয়ে আয়, দেরী হয়ে গেল যে।

নীলুর সঙ্গে রানীর চোখাচোখি হল। তুজনে হেসে উঠলো।

ইস্কুলের কাছাকাছি আসতেই একটা গুঞ্জন-ধ্বনি নীলুর কানে ভেসে এল। তখন কুয়াশা অনেকটা পাতলা হলেও চারদিক একেবারে পরিষ্কার হয় নি।

রানী আগে ইস্কুলের ভেতরে ঢুকে গেল, তারপর মামা ও তাঁর পেছনে নীলু। ঠিক ঢোকার মুহূর্তে তার বুকটা দুরুদুরু করতে লাগলো।

নতুন আগন্তুকদের দেখে ছেলেমেয়েরা পড়া ভুলে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। নীলু দেখল, দরজার সামনে যে পণ্ডিতমশাই রয়েছেন, তিনি চেয়ারে বসে। তাঁর সামনে একটা টেবিল। টেবিলের উপর মোটা ও সরু, নানা সাইজের ছড়ি। ছড়ি দেখে নীলুর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। দূর থেকে শোনা গুঞ্জন-ধ্বনি থেমে গেছে।

হঠাৎ চেয়ারে-বসা পণ্ডিতমশাই টেবিলের উপর একটা মোটা ছড়ি প্রচণ্ডশব্দে আঘাত বলে করে উঠলেন—এ্যাই থামলি কেন তোরা? পড়্। তোরা সার্কাস দেখছিস? শেষের দিকের কথাগুলি বলার সময় পণ্ডিতমশায়ের মুখভঙ্গি সার্কাসের জোকারের মতই হ'ল।

ছড়ির শব্দটা নীলুর কানে ঢাক গর্জনের মত বাজল। ছেলেরা আবার পড়তে শুরু করে দিল। ইস্কুল ঘর আবার গুঞ্জন-মুখরিত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নীলুর ভয়ভাবটা কেটে গেল। মনটা আনন্দে মুখরিত হল।

শৈলমামা এবার নীলুকে পণ্ডিতমশাই-এর সামনে গড় হয়ে প্রণাম করতে বললেন। নীলু প্রণাম করার পর মামা তার হাতে একটা রূপোর টাকা দিয়ে বললেন—এটা মাষ্টারমশাই-এর হাতে দে।

পণ্ডিতমশাই অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে নীলুর হাত থেকে রূপোর টাকাটা নিয়ে হেসে বললেন—বিদ্যে হোক তোর। দে শেলেটটা দে।

পণ্ডিতমশাই-এর হাসিতে নীলুর ভয়ভাবটা যেন একেবারে কেটে যায়। পণ্ডিতমশাই টেবিলের উপর শেলেট রেখে 'অ', 'আ'

লিখলেন। পরে খড়িটা নীলুর হাতে দিয়ে খড়িসুদ্ধ নীলুর হাতটা ধরে বললেন—লেখার উপর মক্শ দে, খড়ি বুলা'! এই রকম—এ্যাই হল 'অ'; আর এ্যাই, এ্যাই, এ্যাই হল গিয়ে 'আ'। পরে হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন—আমার লেখার উপর মক্শ দিয়ে যা'। তারপর নিজে লিখতে পারবি। রোজ যা' যা' লিখে দেব, তা' নিজে লিখে দেখাতে হবে। না'হলে ছুটি নেই। যা, ঐ কাঠের লম্বা পিঁড়িতে বসে লেখ্।

শৈলমামা নীলুর হাত ধরে পিঁড়িতে বসিয়ে দিলেন। তারপর মামা পণ্ডিতমশাই-এর সঙ্গে কি সব কথাবার্তা বলে বিদায় হলেন।

নীলু কোনদিকে না তাকিয়ে ঘাড় হেট করে কয়েকবার পণ্ডিতমশাই-এর লেখার উপর খড়ি বুলিয়ে যায়। কিছুক্ষণ বাদে পাশের ছেলের ঠ্যালা পেয়ে তার দিকে মুখ তুলে চায়। দেখে···কালা। কালার পুরোনাম কালাচাঁদ বারিক। জাতে নাপিত। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসে।

কালা কানে একটু কম শোনে। তাই সকলে তাকে কালা বলে ডাকে। আবার তার গায়ের রং কাকের মত কালো··· নীলুর মনে হয়, হুঁকোর মত বা ছাতার মত কালো। সেজন্যও তার নাম কালাচাঁদ হতে পারে। কালা বয়সে নীলুর চেয়ে বড়। বোধ হয়, রানীরই সমবয়সী। তার বিদ্যারম্ভ হয়েছে মাত্র কয়েক দিন আগে। কালা নীলুদের খেলার সাথীও বটে।

কালা ফিসফিস করে বলে—তুই আর আমি রোজ একসঙ্গে বসব।

নীলু ঘাড় নাড়ে। তারপর কালার শেলেটের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়। কালার শেলেটে লেখা রয়েছে···'ই', 'ঈ'। নীলু বলে···সে কি রে কালা, তুই আমার কত আগে এসেছিস, মাত্র 'ই', 'ঈ' শিখছিস?

কালা ভারিক্কি চালে বলে—তোর চেয়ে বেশী তো—'অ' আ।

নীলুও দমবার পাত্র নয়। সে বলে—জানিস, আমি 'ট', 'ঠ' পর্যন্ত লিখতে পারি? মার কাছে শিখেছি।

কালা হার স্বীকার করে হেসে ফেলে ; বলে—তবে তোর বেশ মজা রে। বলিস না এখন বড় পণ্ডিতকে। তাহলে তোকে নতুন পড়া দেবে। এখন ক'দিন বেশ এভাবে চালিয়ে যা'। রোজ দুটোর বেশী তো লিখতে হচ্ছে না। আর আমিও তোর কাছে জেনে নেব—কেমন ?

নীলু সম্মত হয়। পরে ফিসফিস করে বলে—বড় পণ্ডিত কে রে ?

কালা বিজ্ঞের মত বলে—ঐ তো রে, যে তোকে 'অ' 'আ' লিখে দিল। আর ঐ যে ছ্যাখ্, ও পাশের বেঞ্চিতে বসে রয়েছে—ঐ যে তোর বড়দার পড়া ধরেছে—ও হল ছোট পণ্ডিত। জানিস, এই ছোট পণ্ডিত বড় পণ্ডিতের কাছে পড়েছে। তাই তো গুরুর সামনে চেয়ারে বসে না। ছ্যাখ্ না, ছেলেদের সঙ্গে বেঞ্চির এক পাশেই বসেছে। আর পেছন দিকে, ঐ দিকে ছ্যাখ্—ঐ লেখাচ্ছে মেয়েটাকে, ও হল বড় পণ্ডিতের ছেলে···সুরেশ পণ্ডিত। মেয়েটা হল সুরেশ পণ্ডিতের মেয়ে—পান্না।

—এ্যাই, তোরা পেছন দিকে কি দেখছিস রে ? —বড় পণ্ডিতমশাই-এর গম্ভীর কণ্ঠস্বর। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উপর ছড়ির আছড়িয়ে পড়ার শব্দ। নীলু চমকিয়ে মুখ ঘোরায় ; কালাও। বড় পণ্ডিতমশাই বলেন—লেখ্, যা লিখে দিয়েছি। ফের পেছন দিকে তাকাবি তো বেত দিয়ে পিঠের চামড়া তুলে দেব। আবার ছড়ির শব্দ।

নীলু ও কালা লেখায় মনোযোগী হয়, কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। একটু বাদে আড়চোখে চেয়ে নীলু দেখে, বড় পণ্ডিতের সামনে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে। পণ্ডিতমশাই তাকে বলছেন—বল্, তিন ত্রিকে কত ?

ছেলেটি কি বলতে গিয়েও যেন বলতে পারে না। চুপ করে থাকে। বড় পণ্ডিতমশাই প্রচণ্ড এক ঘা বেত কষিয়ে বলেন—তোর হবে কি ? তোর বাপ তো একটা চোর। তুই তো চোরবাচ্চা করঞ্জার গোড়া। পড়াশোনা কি তোর কাজ ?

পণ্ডিতমশাই সপাং করে আর এক ঘা কষিয়ে বলেন—যা তিনের নামতা পড়্।

ছেলেটিকে নীলু চেনে। কালাদের বাড়ীর পাশেই বাড়ী। ওর নাম পুলিন। পুলিন কালার চেয়ে বড়। পুলিন ফিরে এসে বেঞ্চিতে বসল। নীলু চেয়ে চেয়ে দেখে, পুলিন বেঞ্চিতে বসল কিন্তু পড়ল না; তার পাশে বসে থাকা রানীকে চিম্‌টি কেটে দিল। এতক্ষণ নীলু রাণীকে দেখতে পেল। এতক্ষণ তো চারদিকে তাকাবার সুযোগ পায় নি সে। নীলু বুঝল, রাণী উঁচু ক্লাসে পড়ে।

মাষ্টারমশাই-এর অলক্ষ্যে নীলু ও কালা নিম্নস্বরে গল্প জমায়। কালা বলে—নীলু, শেলেটের দিকে চেয়ে কথা বল্। কথা বল্ আর শেলেটের উপর মক্‌শ' দিয়ে যা'। শালার পণ্ডিত তাহলে ধরতে পারবে না, বুঝলি ?

নীলু তাই-ই করে। কিন্তু কালা পণ্ডিতমশাইকে শালা বলল, এটা তার ভাল লাগলো না। অবশ্য বড় পণ্ডিতমশাই পুলিনকে শালা বলেছেন, এও তার ভাল লাগলো না। আস্তে আস্তে, নীলু কালার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারে।

নীলু জানল, বড় পণ্ডিত মশাই 'অ' 'আ' 'ক' 'খ' এবং ধারাপাত, এই সব পড়ান। সুরেশ পণ্ডিত অংক আর বই পড়ান দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত। আর ছোট পণ্ডিতমশাই তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছেলেদের ইংরাজী বাদে সব কিছু পড়ান। তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরাজী পড়ান হয়। ইংরাজী মাষ্টার পড়াতে আসেন বিকালে। তখন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছেলেরা পাশের ঘরে উঠে যায় তাঁর কাছে পড়ার জন্য। নীলু পেছন ফিরে দেখে পাশেই আর একটা ঘর। সেখানে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চি রয়েছে কিন্তু এখন সেখানে কেউ নেই। উভয় ঘরের মধ্যে দেওয়াল কেটে, যাওয়ার রাস্তা, কোন দরজা বসান নেই।

কালা বলে—ইংরাজী মাষ্টার কিন্তু খুব রাগী। জানিস, সব

মাষ্টারই তাকে ভয় করে। ছেলেরা তো করেই। তবে আমাদের কি ভয়? আমরা তো আর ওর কাছে পড়ছি না। আমাদের পড়তে অনেক দেরী।

—আমরা কোন ক্লাশে রে? নীলু প্রশ্ন করে।

—আমরা? আমরা হলাম শিশু শ্রেণী। একবছর থাকতে হবে। তারপর প্রথম শ্রেণী। তখন আমরা নামতা শিখব সুরেশ পণ্ডিতের কাছে।

নীলু আবার প্রশ্ন করে—রানী কোন শ্রেণী?

কালা বলে—রানী প্রথম শ্রেণী।

নীলু এবার বুঝল, পুলিনও তা'হলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। সে আরও বুঝতে পারে, কাঠের এই লম্বা পিঁড়িটা শুধু শিশু শ্রেণীর ছেলেদের জন্য। তারা ছোট, তাই বেঞ্চিতে বসতে পারবে না বলেই, বোধ হয় এই ব্যবস্থা।

কালা বলে যায়—আমার সান্নিপাতিক জ্বর হয়েছিল বলে পড়া শুরু করতে এক বছর দেরী হয়ে গেল। না হলে আমিও এখন রানী পুলিনদের সঙ্গে পড়তাম। না হোক, এই-ই বেশ ভাল—তুই আর আমি এক সঙ্গে? আমরা বন্ধু, না রে, নীলু?

নীলু হেসে বলে—বেশ, আমি তোর বন্ধু।

কথাটা বলে নীলু একটু ভাবে, রানী তো তার বন্ধু, তা'হলে কালা কি করে আবার বন্ধু হবে? একটু পরে সে নিজের মনে একটা উত্তর খুঁজে পায়—রানী হল মেয়ে বন্ধু আর কালা ছেলে বন্ধু।

একটু পরে সে আবার বলে—আমরা আসছে বছর ঐ রানীদের বেঞ্চিতে বসব, না রে কালা?

কালা বলে—হ্যাঁ। কিন্তু তার চেয়ে এই ভাল রে। নীচে বসলে পণ্ডিত গুলো ঠিক দেখতে পায় না, আমরা কি করছি। টেবিলের নীচ দিয়ে ঐ ওদিকে দেখ—ঐ যে ছোট পণ্ডিতের গোঁফজোড়া, দেখতে পাচ্ছিস?

নীলু লেখার উপর খড়ি বুলাতে বুলাতে টেবিলের তলা দিয়ে তাকিয়ে বলে—হ্যাঁ, পারছি, গোঁফে হাত বুলাচ্ছে।

কালা যেন কৌতুকে ফেটে পড়ে! বলে—কি বুলাচ্ছে বল দেখি? পারলি না তো? তেল রে, তেল। ঐ যে বেরাদের বাড়ীর অখিল—ঐ যে ছাখ্, ও তৃতীয় শ্রেণীতে দু'বছর আছে। মোটে পড়ে না। মাথায় খুব করে তেল মাখে। পড়া না পারলে ছোট পণ্ডিত ওর চুল ধরে টানে। চুলের তেল হাতে লেগে যায়। তখন তেলটা গোঁফে ঐ ভাবে তা দিয়ে দিয়ে মুছে ফেলে।

নীলুর কালায় কথার দারুণ মজা পায়। সে তাকিয়ে আরও দেখতে পায়, ছোট পণ্ডিতমশাই-এর মাথাটা মাটির দেওয়ালের গায়ে লেগে রয়েছে। যেখানে মাথাটা লেগে রয়েছে, দেওয়ালের সে অংশটা একেবারে তেল-পালিশ হয়ে আছে। একেবারে চক্‌চকে, যেন মুখ দেখা যাবে। কতকাল তিনি ঐখানে মাথা ঘষে গেছেন, তা' কে জানে!

নিজের পিঁড়িটার দিকে এবার দৃষ্টি ফেরায় নীলু। সেটাও চক্‌চকে, পালিশ হয়ে আছে। একটু চেষ্টা করলেই মুখ দেখা যাবে। কত ছেলেমেয়ে যে এখানটায় বসে গেছে, তা' সে জানে না। তাদের আনন্দ-বেদনার সাক্ষ্য এই পিঁড়িটা! নীলুর মনে পড়ল, তার বাবাও এই ইস্কুলে পড়েছেন তারই বয়সে। তখন নিশ্চয়ই এই পিঁড়িতেই বসতেন। কোন খানে? আজ নীলু যেখানে বসে রয়েছে, সেখানে? হতে পারে। কথাটা ভাবতেই সারা শরীরে তার এক রোমাঞ্চ খেলে যায়।

কালার দিকে তাকিয়ে দেখে, কালাচাঁদ পেছনের পুকুরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। না, পুকুরের দিকে না, পুকুরের ওপারের ঐ কামারশালটার দিকে। কালা কি দেখছে অত তাকিয়ে তাকিয়ে? নীলু কালার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখতে পায় কামারশালের লাল গনগনে আগুনটাকে—ক্ষণে ক্ষণে দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠছে। পুকুরের জলে তার ছায়া দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। নীলুর

ভারী ভাল লাগে, তার চোখে এক মুগ্ধ বিস্ময়ের ঘোর লাগে। কালার চোখে তাকিয়ে দেখে, সেখানেও যেন একই মুগ্ধতা।

নীলু লেখা ভুলে, কালা, রানী, ইস্কুল, পণ্ডিতমশাই,—বিশ্ব-সংসার সবকিছু ভুলে তার ডাগর চোখের অবাক চাহনী মেলে সেই আগুনের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকে। বড় পণ্ডিত-মশাই-এর ছড়ির কথা তার আর মনে থাকে না। ঐ পুকুরের জলের তলায় সে যেন তলিয়ে যেতে থাকে।

রাণীর চাপাস্বরের শাসন দূর থেকে ভেসে আসে—এ্যাই নীলু, ওদিকে না, শেলেটের দিকে তাকা'। মার খাবি।

নীলু চেতনা ফিরে পায় কিন্তু তবু যেন বাস্তবের মাটিতে ফিরে আসে না। রানীর দিকে শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে। রানী তাকে কিছু বলছে, সে বোধ তার হয় কিন্তু কি বলছে, তা' যেন সে বুঝতে পারছে না।

এই অবস্থায় বড় পণ্ডিতমশাই-এর হুঙ্কার তার কানে যায়, এ্যাই শালা, নাপ্তের বেটা, কি দেখছিস ওদিকে চেয়ে? কামার-শালে তোর জন্যে হালুয়া তৈরী হচ্ছে, খাবি ব্যাটা?

নীলু চম্‌কিয়ে দেখে কালার পিঠে সপাং করে এক ঘা ছড়ি পড়ল। এত দ্রুত পড়ে আবার উঠে গেল, পলকে নীলুর মনে হল, যেন সাপ একবার ছোবল দিয়ে দ্বিতীয়বার ছোবল মারতে উদ্যত। দ্বিতীয় ছোবলও যেন পড়ল। কালা ততক্ষণে তড়াক করে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে একটু পিছে হটে গেছে। কালার আর্ত চীৎকারে ইস্কুল ঘর যেন কেঁপে উঠল। কালা কেঁদে চলেছে---এ্যাঁ এ্যাঁ···।

বড় পণ্ডিত মশাই আরও কয়েক ঘা মেরে থেমে গেলেন। কালা বসে পড়ে চোখ মুছতে মুছতে নীলুর দিকে চেয়ে ফিক্ করে হেসে উঠল।

নীলু সহানুভূতির সুরে বলল---কি রে, তোর খুব লেগেছে, না রে?

কালা অবাক করে দিয়ে বলে—একটুও না।

—তবে যে অত কাঁদলি ?

—আরে, না কাঁদলে, শালার পণ্ডিত যে আরও মারত রে। তোকে যখন মারবে, না, তুই খুব জোরে জোরে কাঁদবি। তাহলে দেখবি, তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে।

কালার এই উপদেশ নীলুর এত ভাল লাগে যে সে মনে মনে কালাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারে না। সে স্পষ্ট বুঝতে পারে, আজ নতুন বলে পার পেলেও মার তাকেও খেতেই হবে। মার তো সকলেই খাচ্ছে, আবার হাসছেও। এই কান্না হাসির খেলা নীলুর মনে একটা কাঁপা কাঁপা ছায়া ফেলে যায়। সে তার অহেতুক ভয়ের ভাবনাটাকে কাটিয়ে সহজ হয়ে পরিস্থিতিটাকে মেনে নেবার চেষ্টা করে।

॥ চার ॥

নীলু ও কালা একমনে কিছুক্ষন অ, আ, ই, ঈ লিখল। একটু বেলা হতেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে রোদ উঠল। হঠাৎ বড় পণ্ডিতমশাই এর ঈষৎ কোমলস্বরের ডাক শোনা গেল —কালা!

কালা বোধ হয় এ ডাক চেনে। অমনই শেলেট রেখে দিয়ে তড়াক্ করে লাফিয়ে ওঠে সে।

বড় পণ্ডিত মশাই বল্‌লেন—যা তো, একটু তামাক সাজিয়ে আন তো।

পেছনের দরজার একপাশে রয়েছে হুঁকো, কল্‌কে, তামাক ইত্যাদি। নীলু এতক্ষণ ওগুলো লক্ষ্যই করে নি। নীলু দেখল, কালা কল্‌কের ছাই ফেলতে বাইরে গেল। একটু পরে ফিরে এসে কল্‌কেতে এক চিলিম তামাক পুরল। তারপর সেই কল্‌কেসুদ্ধ জোড়হাতে বড় পণ্ডিতমশাই-এর সামনে এসে প্রার্থনা করার মুদ্রায় নিবেদন করল যে, নীলুর দারুণ জলতেষ্টা পেয়েছে। সে একটু বাইরে যেতে চায়।

পণ্ডিতমশাই তখন ঘাড় নাড়লেন। কালা তখন নীলুর কাছে এসে বলল—কৈ রে, জল খেয়ে আস্‌বি তো চল্।

নীলু কালার চালাকিটা উপভোগ করল। সঙ্গে সঙ্গে কালার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মনটা ভরে উঠল। অনেকক্ষণ একটানা বসে থেকে থেকে তার হাত পা গুলো যেন ব্যথা ব্যথা করছিল। দু'জনে বাইরে বেরিয়ে এল—দুটি খাঁচার পাখী যেন খাঁচার বাইরে এসে উদার উন্মুক্ত আকাশের নীচে প্রাণভরে এক ঝল্‌ক মিষ্টি বাতাসের স্বাদ নিল। শ্বাস টেনে নীলু বলে—আঃ!

কালা বলে—দাঁড়া নীলু, একটু পরে যাব। এখন শাপলা তুলে খাই আয়।

বলেই কালা অম্লানবদনে প্যান্ট খুলে পুকুরের পাড়ে রেখে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে জলে নেমে গেল। সাঁতরিয়ে পুকুরের কিছুদূর গিয়ে অনেকগুলো শাপলার গাছ তুলে আনল। ডাঙ্গায় এসে আবার প্যান্ট পরে নিল সে। নীলুকে কয়েকটা শাপলার ডাঁটা দিল, নিজে কয়েকটা খেতে লাগল। খেতে খেতে তারা কামারশালের দিকে যেতে লাগল। বৈঁচীকুলের ঝোপের পাশ দিয়ে যাবার সময় নীলু লক্ষ্য করল, এখন আর কুল নেই।

যেতে যেতে নীলু কালাকে বলে—দেরী হলে পণ্ডিতমশাই বকবে না?

অম্লানবদনে কালা উত্তর দেয়—বলব, ব্যাটা কামার আগুন দিতে দেরী করেছে।

—মিথ্যে কথা বলবি?

—তো কি, সত্যি কথা বলব না কি রে? সত্যি কথা বললে কি পণ্ডিত আমাদের ফুল দিয়ে পূজো করবে ভেবেছিস?

নীলু তবু ভাবে, তাই বলে একেবারে মিথ্যে বলাটা কি রকম যেন! একটু ভেবে সে আবার বলে—আচ্ছা, তোকে তামাক সাজতে কেন বলল রে? আর কেউ পারে না বুঝি?

কালা সদর্পে বলে—কেউ পারে না, আমি ছাড়া। আমি কেন পারি, জানিস? কলকেতে আগুন ভরে অতটা পথ নিয়ে যাওয়ার পর আগুন কি আর থাকে কখনও? আমি যে টান্তে টান্তে যাই। তাই তো আগুন নেভে না। আমি যেদিন ইস্কুলে না আসি, সেদিন পণ্ডিত ব্যাটার ভারী মুশকিল হয়।

নীলু আশ্চর্য হয়ে বলে—সে কি রে, তুই তামাক খাস?

খুবই সহজ সুরে কালা বলে—খাই তো! আমি তো দিদিমার সামনে খাই। আরে, আমাদের খেলে কিছু হয় না। ওসব তোদের খেতে নেই।

কালার মা নেই, বাপও নেই—দুজনেই মারা গেছে। দিদিমাই ওকে মাতৃস্নেহে বড় করেছে। দিদিমার আদরে এবং প্রশ্রয়ে যে কালা এ জিনিস ধরেছে, তা আর নীলুর বুঝতে বাকী রইল না।

নীলুরা কামারশালে এসে দেখে ভেতরটা একেবারে জমজমাট। গাঁয়ের অনেক লোক সেখানে রয়েছে। ভূতনাথ ভূইঞ্যাকেও সে দেখতে পায় সেখানে। লোকটাকে সে চেনে। প্রায়ই সন্ধ্যায় তাদের বাড়ীতে যায় খবরকাগজ পড়ার জন্য। নীলুদের বাড়ীতে দৈনিক বসুমতী আসে। লোকটাকে খুব মন দিয়ে খবর কাগজ পড়তে সে দেখে। ভূতনাথ খবরের কাগজের খবর সারা শাপলা গ্রামে ছড়িয়ে বেড়ায়। লোকে এজন্য তাকে 'রয়টার' বলে। খুব সম্ভব শংকরীপ্রসাদই নামটা দিয়ে থাকবেন।

কামারশালে বেশীর ভাগ দা' ও কাটারী তৈরী হচ্ছে। কেউ কেউ কোদাল সারাতেও নিয়ে এসেছে। বুড়ো পঞ্চানন কর্মকার সাঁড়াশী দিয়ে লাল লৌহ খণ্ডকে চেপে ধরে আর জোয়ান ছেলে সর্বেশ্বর ভারী হাতুড়ী দিয়ে তার উপর আঘাত করে। আঘাতের সাথে সাথে আগুনের ফুলঝুরি ছড়িয়ে পড়ে। লৌহখণ্ড আঘাতে আঘাতে পাতলা হয়ে যায়। পঞ্চানন আবার লোহার টুকরোকে আগুনে ঢুকিয়ে দেয়। তার এক ছোট ছেলে বসে বসে হাপর টানে। পঞ্চানন বিশ্রাম নেয়।

নীলু শুনতে পায় পঞ্চানন বলছে—তারপর কি হলো ভূতুবাবু?

রয়টার ভূতনাথ সোৎসাহে বলে যায়—তারপর আর কিছু হয় নি। হলে এসে জানিয়ে যাব। ব্রিটিশ পলিসি বড় সাংঘাতিক জিনিস, বুঝলে গো। রোজ খবরের কাগজ না পড়লে বুঝা যায় না।

নীলুর ও-সব শোনার আর মন নেই। আগে কামারশাল কোনদিন দেখে নি। হাপরও সে এই প্রথম দেখল, যদিও তার নাম সে আগে শুনেছে। নীলু অপলকনয়নে তাকিয়ে দেখে,

হাপর টানার তালে তালে আগুন কেমন জ্বলে জ্বলে ওঠে। একটু আগে পুকুরের জলে যার ছায়া দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল, সেটা যে এত সত্য সত্য দেখতে পাবে এতটা সৌভাগ্য সে আশা করে নি। কালার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন আর একবার ভরে ওঠে।

জ্বলন্ত কাঠকয়লার টুকরোগুলো কল্‌কের মধ্যে খালি হাতে পুরে দেয় কালা। তারপর প্রাণপনে ফুঁ দিতে থাকে। ফুঁ দেবার চোটে তার চোখ দুটো লাল হয়ে ওঠে।

নীলু বলে—এ্যাই কালা, তোর হাতে আগুন লাগে না।

কালা শুধু হাসে। বাইরে বেরিয়ে এসে বলে—আমার অভ্যেস হয়ে গেছে।

নীলুর কেমন যেন অবাক লাগে। সে ভাবে, কালা নির্ঘাত ম্যাজিক্‌ জানে। কালার দিদিমা বুড়ী নানারকম তুকতাক্‌, ঝাড়-ফুঁক্‌ করে। জ্বর-টর হলে নানারকম কবরেজী বড়ী দেয়। বুড়ী হয়ত কিছু ম্যাজিকও জানে। নীলু ভাবে, কালা হয়ত দিদিমার কাছে ম্যাজিকটা শিখেছে। কালার হাতটা টেনে নিয়ে ভাল করে দেখে, ফোস্‌কা পড়ে নি কোথায়ও।

কামারশাল ছাড়িয়ে একটু এসেই কালা দু'হাতে কল্‌কে ধরে দেয় টান। গল্‌গল্‌ করে ধোঁয়া বার করে হাসতে হাসতে, কাশতে কাশতে কালা বলে—দ্যাখ আগুন কি আর নেভে? এম্‌নি ফুঁ দিয়ে নিয়ে গেলে আগুন থাকবে না।

নীলুকে দেখাবার জন্য কালা ঘন ঘন এবং জোর জোর টান লাগায়। যত ইস্‌কুল ঘরের কাছের দিকে তারা আসতে থাকে কালার টানের মাত্রা ততই বাড়তে থাকে। টানের চোটে কালার চোখ দুটো সাংঘাতিক রকমের লাল হয়ে ওঠে।

নীলু সভয়ে বলে—ছেড়ে দে কালা, আর না। তোর দম বন্ধ হয়ে যাবে।

কালা কথা বলে না, কিরকম এক অতিপ্রাকৃত হাসি হাসে।

নীলুর ভয় করে, যদি দেখে ফেলে কিন্তু কালার যেন সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

ইস্‌কুলের একেবারে কাছে এসে কালা বলে—এবারে ছুটে চল। আর টানা যাবে না। আগুন নিভে যাবে।

দুজনে দৌড়ে ইস্‌কুল ঘরের ভেতর এসে ঢোকে। দরজার পাশ থেকে হুঁকো নিয়ে তার মাথায় কল্‌কে চাপিয়ে পরম বিনীত ভাবে কালা তার প্রসাদ পণ্ডিতমশাইকে নিবেদন করে। তিনি নৈবেদ্যভ্রমে অতি আগ্রহ সহকারে তা গ্রহণ করেন।

পণ্ডিতমশাই টানতে থাকেন, প্রাণপনে টানতে থাকেন। কিন্তু ধোঁয়া বিশেষ বার হয় না। কালা বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নীলু এসে তার জায়গায় বসে। পণ্ডিতমশাই-এর মুখ বিরক্তিতে ভরে ওঠে। নীলু ক্রমে সেখানে স্পষ্ট ক্রোধের চিহ্ন দেখতে পায়। কালাকে দেখে মনে হয়, সে প্রমাদ গুনছে। পরে নীলু কালার মুখে স্পষ্ট আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে। পণ্ডিতমশাই ব্যর্থ প্রচেষ্টায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, আর কালাচাঁদ দাগুর ভয়ে রীতিমত শংকিত হয়ে ওঠে।

নীলু ঠিক কি ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে তা বোঝার আগেই ঘটে গেল ব্যাপারটা। পণ্ডিত মশাই ক্রুদ্ধ শার্দুলের মত রাগে গর গর করতে করতে কল্‌কেসুদ্ধ হুঁকো নীচে আছড়িয়ে ফেলে দেন। চারদিকে আধপোড়া তামাক আর জ্বলন্ত কাঠ কয়লা ছড়িয়ে পড়ে। পণ্ডিতমশাই হুঁকো ছুড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কালা লাফ দিয়ে পিছু হটে গেছে কখন চোখের পলকে।

বড় পণ্ডিতমশাই জ্বলন্ত হুতাশনের মত জ্বলে উঠে বেত দিয়ে প্রচণ্ড জোরে এক ঘা কসিয়ে দেন কালার কাঁধে, আর সগর্জনে বলেন—শালা চোর বাচ্চা, করঞ্জার গুড়ি, শালা সব টেনে শেষ করে এনেছে। আমার জন্যে যে কিছু রাখতে হবে, এ বোধ নেই শালার নাপতেব বাচ্চার।

পণ্ডিতমশাই বলে যাচ্ছেন আর সমানে বেত চালাচ্ছেন।

কালা লাফ দিয়ে পেছনে সরে গিয়ে কয়েক ঘা বাঁচিয়েছে কিন্তু যে কটা লেগেছে, তাই যথেষ্ট। ওতেই সে আহত পশুর মত কাতরাচ্ছে।

কিন্তু পণ্ডিতমশাই শান্ত হলেন না। তিনি যখন কালাকে বেতের নাগালে পেলেন না তখন চেয়ারে বসেই হুংকার ছাড়লেন—ব্যাটাকে কাছের দিকে ঠেলে দে তো রে। আজ সব কটা বেত আমি ওর পিঠে ভাঙ্গব। শালার তামাক খাওয়া আমি জন্মের মত ঘুচাচ্ছি। আজ যা খেয়েছিস, সেটাই হবে তোর শেষ খাওয়া। শালা—

মুহূর্তের মধ্যে নীলু এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। বড় পণ্ডিতমশাই-এর বলার সঙ্গে সঙ্গে পুলিন, রানী এবং আরও পাঁচ-সাতজন উঠে দাঁড়িয়ে পেছন থেকে কালাকে প্রবল ধাক্কা মেরে বড় পণ্ডিতমশাই-এর সমুদ্যত বেতের নাগালের মধ্যে পৌঁছিয়ে দিল। অমনি বেত সগর্জনে কালার পিঠে আছড়িয়ে পড়ল। কালা আকাশ ফাটানো, বাতাস কাঁপানো মরণ চীৎকারে ছটপট করতে লাগল। এক ফাঁকে নীলু সকলের দিকে তাকিয়ে দেখে কারোর মুখে ব্যথা বা সহানুভূতির চিহ্ন নেই। সকলে কালার মরণদশা দেখে বেশ যেন মজা পাচ্ছে। নীলুর কেমন যেন কাঁদতে ইচ্ছে করে।

সঙ্গে সঙ্গে কালার সকরুণ মিনতি মাখা কথাগুলো নীলুর কানে যায়—না মাষ্টার মশাই, আমি তামাক খাই নি। বলতে বলতে কালা একটু পিছু হটে। খুব বেশী পারে না, পেছনে চাপ রয়েছে সামনের দিকে ঠেলে দেবার।

বড় পণ্ডিতমশাই আবার গর্জন করে ওঠেন—খাস নি শালা! দ্যাখ্ তো চেয়ে তামাকের আর কিছু আছে কিনা। তোরা ওকে সামনের দিকে এগিয়ে দে।

আবার ছেলেমেয়েরা কালাকে ঠেলে পণ্ডিতমশাই-এর বেতের নাগালে পৌঁছে দেয়। আবার কালার পিঠে ঢাকের কাঠি আছড়িয়ে

পড়ার মত ছড়ি পড়ে। নীলু শংকামিশ্রিত ব্যথাভরা চোখে এক নিদারুন অসম যুদ্ধ দেখে যায়। একজন নিরস্ত্র। অন্যজন সশস্ত্র। নীলুর মনে হচ্ছে, পণ্ডিতমশাই-এর বেতটা কখন শেল, কখন শূল, কখন বা মুদ্গরের মত আকার ধারন করে যাচ্ছে। রানীও পুলিনের দল সমানে কালাকে সামনের দিকে ঠেলছে, আর কালা বারে বারেই অস্ত্রের নাগালের মধ্যে এসে আবার আহত পশুর মত পিছে সরে যাচ্ছে। নীলুর ভয় করে। তার মন খারাপ হয়ে যায়।

হঠাৎ পণ্ডিতমশাই মার থামিয়ে নীলুকে লক্ষ্য করে বলেন —এ্যাই, তুই তো ওর সঙ্গে গিয়েছিলি। ও তামাক খায় নি, কল্‌কে টানে নি ? বল্, বল সত্যি কথা। না হলে—। কথা শেষ না করে তিনি হাতের ছড়ি দিয়ে টেবিলের উপর প্রচণ্ড শব্দ করলেন।

সেই শব্দে নীলুর সংজ্ঞা লোপ পাওয়ার যোগাড়। সত্যি কথা বলে দিলে পণ্ডিতমশাই কালাকে যে ফুলচন্দনে পূজা করবেন না, কালার এ উক্তি তখন আর মনে পড়ল না। সে এক নেশাগ্রস্থের মত বলে উঠল—হ্যাঁ, ও খেয়েছে।

ব্যাস, আর যায় কোথায় ? এবারে পণ্ডিতমশাই ছড়ি ফেলে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাঁর কীল, চড়, ঘুসি ইত্যাদি কালার সর্বাঙ্গ লেহন করে চলল। সকলে মজা পেতে লাগল। নীলু ভয়ে চোখ বন্ধ করল।

একটু পরে যখন সকল তামাশার অবসান হল, তখন কালা গম্ভীর মুখে তার জায়গায় এসে শেলেট নিয়ে নীলুর পাশে বসে পড়ল।

নীলু কালার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। সে তখন সত্যি কথা বলে ফেলার অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে। নীলু মনে মনে স্বীকার করে—মিথ্যে যেমন বলতে নেই তেমনি সব জায়গায় সত্যি কথাও বলতে নেই। যতক্ষণ সকাল বেলার ইস্‌কুল

ছুটি না হল ততক্ষণ সে বন্ধুর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না বা তার সঙ্গে কথাও বলতে পারল না।

একটু পরে ছুটি হল। সকলে হৈ হৈ করে বেরিয়ে এল। রানী, পুলিন কালা একসঙ্গেই যাচ্ছে। নীলু একটু যেন কুণ্ঠিত ভাবে ওদের পিছু পিছু চলেছে। কিছু দূরে এসে নীলু অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে—কালা, কিছু মনে করিস না, ভাই। আমার উপর রাগ করিস না। আমি ভয়ে বলে ফেলেছি। অমন মারবে জানলে—

কালা নীলুর কথাটাকে যেন হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে বলে ওঠে—আরে দূর, আমি কিছু মনে করেছি ভাবছিস? শালার পণ্ডিত বুঝি জানে না, আমি তামাক খাই? তাহলে আমাকে তামাক সেজে আনতে বলে কেন? দেখিস, আবার কাল সেই তামাক সাজতে আমাকেই বলবে।

মাথা চুল্‌কাতে চুল্‌কাতে লাজুক হাসি হেসে কালাচাঁদ বলে—আজ তোর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম যে টানটা বেশী বেশী হয়ে যাচ্ছে। মার খাওয়া আমার খুব অভ্যেস আছে। আমার মত অমন মার খেতে কেউ পারবে না, তা জানিস?

সবাই কালার সগর্ব উক্তিতে হেসে ফেলে। হাসে নীলুও। তার মনের মেঘ-ভারটা কেটে যায়। সে ভাবে, তার চেয়ে অনেক বিষয়ে কালার অভ্যেস বেশী আছে। মার খাওয়ার অভ্যেস, খালি হাতে জ্বলন্ত কাঠের টুকরো তোলার অভ্যেস, এ সবই কালার আছে। কিন্তু রানীর প্রতি তার মনটা বিরূপ হয়ে ওঠে।

নীলু রানীকে বলে—তুই কেন ওকে ঠেলতে গেলি?

রানী বলে—বাঃ ওটাই তো মজার রে। তোকে যে মজার কথা বলেছিলাম, সে কি তবে? আবার দেখিস, যখন পুলিনকে মারবে তখন ঐ কালাই ওকে ঠেলবে। তখন কালাই মজা পাবে।

নীলুর মনে পড়ে, রানী আগে তাকে ঐ ধরণের মজার কথা শুনিয়েছে বটে। কথাগুলো ভেবে সে এতক্ষণে যেন কিছু মজা পায়। ইস্‌কুলে যে এত মজা, তা কে জানত? নাঃ, ইস্‌কুলে নীলুর আর একদম ভয় লাগছে না। বাড়ী গিয়ে মাকে সেও কালার মত বলতে পারবে, মার খেতে সে ভয় পায় না। মা যে কেন অত ভয় পায়, তা নীলু ভেবে পেল না।

বোষ্টমদের বাড়ীর কাছে আসতে নীলুরা দেখতে পেল সেখানে ছেলের দল হৈ হৈ করছে। কি ব্যাপার? কাছে আসতে দেখে, এক শ্রীরাম সহচর শ্রীহনুমান গাছের উপর বসে রয়েছে। ছেলের দল ক্রমাগত তার দিকে ঢিল ছুড়ে যাচ্ছে। হনুমানটা হুপ্‌ হুপ্‌ করে এ ডাল থেকে ও ডালে লাফাতে লাগল। নীলু এত কাছ থেকে হনুমান আগে কোনদিন দেখে নি। ভারী আনন্দ হল তার।

কালা চীৎকার করে বলে উঠে—ও হনু, চাল দেব, কলা দেব, দাঁত দেখি।

কালা হনুমানকে ভেংচিয়ে দাঁত দেখাতে লাগল। হনুমানও খিঁচিয়ে দাঁত দেখাল। ছেলের দল আনন্দে হৈ হৈ করে ওঠে। আবার ঢিলের বৃষ্টি।

বোষ্টমদের বাড়ীর লোকেরা এসে ছেলেদের দূর দূর করতে থাকে। অতগুলো ছেলেমেয়ে তারা শোনে না। ঢিলের আঘাতে তেঁতুলও পড়ে। ছেলে মেয়েরা হুড়োহুড়ি করে তেঁতুল কুড়িয়ে খায়।

শেষে ঢিলের মার সহ্য করতে না পেরে হনুমানচন্দ্র বিকট হুপ্‌ শব্দ করতে করতে তেঁতুলগাছ থেকে লাফিয়ে পাশের নারকেল গাছের মাথায় বসল। সেখান থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে ল্যাজ খাড়া করে লাফিয়ে লাফিয়ে পালাতে লাগল।

ছেলের দলও পিছে পিছে ধাওয়া করে গেল। তারা বাড়ী ফেরার কথা ভুলে গেল। হনুমান এগোচ্ছে। যে গাছে

আশ্রয় নেয়, ছেলের দল সেখান থেকে অবিলম্বে তাকে উৎঘাত করে। কিছুদূর এসে নীলু দেখে. তার সঙ্গে রানী, পুলিন, কালা ছাড়া আর চার পাঁচ জন মাত্র রয়েছে বাকীরা সব পালিয়েছে। নীলুরা হাল ছাড়ল না। অবশেষে তারা গাঁয়ের শেষ সীমানায় খালের ধারে এল।

খালের ওপারে অন্য গ্রাম—উরুভাঙ্গা। ওপারে বোম্বেটেদের তৈরী একটা গীর্জার ভগ্নাবশেষ পাশে রয়েছে একটা 'বাতিঘর'। তারও ভগ্নদশা।

হনুমানটা খালের পাড়ে এসে একটু থামল। খালে তখন জোয়ার। হনুমানটা পেছন ফিরে একবার তাদের দিকে চেয়ে দাঁতমুখ খিঁচাল! ছেলেদের দল ভয় না পেয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। অবশেষে শ্রীমান হনুমান উপায়ান্তর না দেখে, বোধ হয়, মা জানকীকে স্মরণ করে বিকট হুপ শব্দ করে লাফ দিল। নীলুর মনে হল, হনুমান বুঝি সাগর লাফ দিল তার মনে হল, ওপারে লঙ্কা—রাবনের দেশ

হনুমান হেলেদুলে গির্জাবাড়ীর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। সেখানটা জঙ্গলে ঢেকে আছে। নীলু অপলকনয়নে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনে হয়, ঐ তো অশোক কানন। ওখানে মা জানকী রয়েছেন। কিন্তু সামনে যে সমুদ্র, তার যাওয়ার উপায় নেই।

কালার কথায় নীলুর তন্ময়তার ভাবটা কেটে গেল কালা বলে—জানিস, বীর হনু, না—এক লাফে বাহার গাং পেরিয়ে যায়।

রানী বলে—বাহার গাং কত বড় রে, কালা?

কালা বলে—ষোল ক্রোশ।

নীলু একথা অবিশ্বাস করতে পারে না। সে কিছু কিছু রামায়নের কাহিনী জানে। হনুমান সাগর লাফ দিয়ে ছিল, এ তো আর মিছে কথা নয়। বীর হনু হয়ত সেই রামায়নের হনুর কেউ-টেউ হবে, নীলু ভাবে।

এবারে ফেরার পালা—ঘরের দিকে সকলে পা বাড়ায়। বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই হরির সঙ্গে দেখা। হরি তাদের বলে—কোথায় ছিলি তোরা এতক্ষণ? ইস্কুল তো কবে ছুটি হয়েছে। আমি তোকে খুঁজতে যাচ্ছিলাম।

নীলু সে কথার কোন জবাব না দিয়ে হুপ্ হুপ্ শব্দ করতে করতে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। উৎকণ্ঠিতা রমলা প্রশ্ন করেন—কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

নীলু কল্‌কলিয়ে তার অভিজ্ঞতার কথা সব বলে যায়। সবিস্তারে হনুমানের দৈর্ঘ্য প্রস্থের বর্ণনাও দেয়। রমলা বিরক্ত হয়ে বলেন—এই জন্যেই বাপু তোকে ইস্কুলে পাঠাতে চাই নি; একদিনে—একবেলাই এত! ছোট ছেলে, কোথায় পড়ে যাবি! কোনদিন হয়ত হনুমান কামড়ে দেবে,—তখন? তোর বাপও যেমন। পুরুষ মানুষ আর মেয়েদের কথা কবে শোনে!

নীলু ভাবতে থাকে—কয়েকঘণ্টা আগে সে ছেলে মানুষ ছিল ঠিকই, কিন্তু এখন সে তার বড়দার মত বড়, কি তার চেয়েও বেশী। সে মার খেতে ভয় পায় না। সে কামারশাল, হাপর দেখেছে, হনুমান দেখেছে, রামায়ণের দেশও দেখে এসেছে সে। বড় হবার জন্য আর কি চাই তার?

রমলা বলেন—কাপড় খোল্। তেল মাখিয়ে চান করিয়ে দিই।

মার সামনে ছোট ছেলের মত নগ্ন হতে নীলুর আত্মসম্মানে লাগে। সে বলে ওঠে—আমি নিজে চান করব, মা।

—তাই করো। করে খেয়ে নাও। খেয়ে নিয়ে আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করো একবেলা ইস্কুলে গিয়ে হনুমান তৈরী হয়ে এসেছে।

বল্‌তে বল্‌তে রমলা অপ্রসন্ন মুখে রান্নাঘরে ঢোকেন।

॥ পাঁচ ॥

শংকরীপ্রসাদ ছাত্রাবস্থায় যেমন দুষ্টু ছিলেন তেমনি মেধাবীও ছিলেন। তিনি ইসকুলের সব পরীক্ষাতেই প্রথম হতেন। বিশেষ করে, অংকে তার যথেষ্ঠ পারদর্শিতা ছিল। সব পরীক্ষাতেই অংকে ১০০ এর মধ্যে ১০০ বা তার কাছাকাছিই নম্বর পেতেন। এম্, ই, ইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন তিনি। তারপর তাঁর ভি, এম্, পড়ার ইচ্ছা হয়। ঐ কোর্সে পড়ার জন্য যে প্রতিযোগিতামুলক পরীক্ষা হয় তাতে তিনি সারা বাংলাদেশের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে দ্বিতীয় হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আর পড়া হয় নি।

তাঁর বড়ভাই ভবানীপ্রসাদ এবং মেজভাই হরপ্রসাদ তাঁর চেয়ে যথাক্রমে পঁচিশ এবং বার বছরের বড় ছিলেন। ছেলেবেলায় তিনি অসম্ভব রকমের চঞ্চল আর দুষ্টু ছিলেন বলে দাদারা তাঁকে খুব শাসন ও প্রহার করতেন। তাঁর বাবা কতকটা আত্মভোলা লোক ছিলেন। তিনি শংকরীপ্রসাদের ব্যাপারে ততটা মনোযোগী ছিলেন না। সকলের শাসনে ঐ বয়সে তিনি, বোধ হয়, কিছুটা অভিমানী হয়ে ওঠেন।

তিনি যখন ইস্কুলের ছাত্র তখন একদা গান্ধীজী ইস্কুল কলেজ বর্জন করার জন্য ছাত্রদের ডাক দিলেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে দলে দলে ছাত্র ছাত্রী ইস্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে কংগ্রেসের পতাকাতলে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিল। বিলেতী শিক্ষা যে ক্ষতিকর তা অনেকের মত শংকরীপ্রসাদেরও মনে হয়েছিল। তার সঙ্গে সংসারের প্রতি অভিমানবোধ যুক্ত

হল। তিনি ঐ বয়সে সবার অলক্ষ্যে একদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন অজানা পথে।

তারপর ঘুরতে ঘুরতে একদিন কাশী এসে পৌঁছালেন এবং কাশীতে গান্ধী আশ্রমে আশ্রয়ও পেলেন। গান্ধীজী তখন ঐ আশ্রমে বেশীর ভাগ সময় থাকতেন। শংকরীপ্রসাদ আশ্রমে তাঁত বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করলেন।

নীলু বাবার মুখে তাঁর কাশীবাসের নানা গল্প শুনেছে। তখনকার দিনে ধনী ব্যক্তিরা গান্ধীজীর আশ্রমে লিচু, আম ইত্যাদি নানা ভোজ্যদ্রব্য উপঢৌকন পাঠাতেন। ওগুলো গরুর গাড়ীতে বোঝাই হয়ে যেত। গান্ধীজীর প্রভাব তখন যে লোকের মনের কত গভীরে গিয়ে পৌঁছিয়েছিল তা বুঝাবার জন্যে বাবা নীলুকে বলতেন—লোকে ঐ গরুর গাড়ী দেখলে শুধু রাস্তাই ছেড়ে দিত না, দূর থেকে হাতজোড় করে ঐ গাড়ীকেই প্রণাম জানাত আর মুখে বলত, গান্ধীজীকা শকট যা রহা।

অনেকদিন পর্যন্ত বাড়ীর কেউ শংকরীপ্রসাদের অবস্থিতির কথা জানতেন না।

যখন তাঁরা জানলেন, তখন অন্তঃত এই ভেবে নিশ্চিন্ত হলেন যে, তিনি গান্ধীজীর আশ্রয়ে আছেন। অতএব চিন্তার কিছু নেই।

শেষে জীবন পরিক্রমার পথে ঘুরতে ঘুরতে তিনি জয়নগরে আসেন। সেখানে তাঁর কাজ ছিল জনসাধারণকে তাঁত এবং চরকার বিষয়ে শিক্ষাদান। তখন তিনি থাকতেন জয়নগরের বিখ্যাত দত্ত পরিবারে। দত্ত বাড়ীর বহু কথা বাবা নীলুর কাছে সশ্রদ্ধচিত্তে বলতেন। দত্তরা খুব অভিজাত ছিলেন। তখনকার দিনে তাঁদের বাড়ীর অনেকে কোলকাতায় বড় বড় চাকরী করতেন। সুন্দরবনে তাঁদের জমিদারী ছিল। অবশ্য তখন সুন্দর বন এলাকা জয়নগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই দত্ত বাড়ীতে তাঁর অবস্থানকালে ভবানীপ্রসাদ গিয়ে তাঁকে

জোর করে ধরে নিয়ে আসেন। কিছু পরে সাত বছরের রমলার সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন। শংকরীপ্রসাদের বয়স তখন তেইশ। কিন্তু কয়েক বছর পরে নানা কারণে-অকারণে ভাইদের সঙ্গে আবার তাঁর মনোমালিন্য হতে শুরু করে তখন থেকে একান্নবর্তী পরিবার ছেড়ে পৃথক সংসার রচনার চিন্তা তাঁর মনে আসে।

এই উদ্দেশ্যে তিনি গ্রামের অবস্থাপন্ন মাইতিদের দোকানে চাকরী নেন। এই চাকরী করতে করতে এক সময় স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করার ইচ্ছা তাঁর মনে জাগে সেই ইচ্ছা আজ লক্ষ্মীর কৃপায় বাস্তবায়িত। এখন দশ গ্রামের মধ্যে শংকরীপ্রসাদ গোস্বামী একডাকে একজন। তাঁর দান, ধ্যান, সাহায্যের পরিমান খুব কম নয়। তিনি নিয়মিত ভাবে দৈনিক খবরের কাগজ, নানা সাহিত্য পত্র-পত্রিকা পড়েন। বাইরের জগতের অনেক আলো তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেছিল। কাশীতে অবস্থানকালে সুযোগ মত তিনি প্রায় সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছেন। হিমালয়ে গিয়ে ঐ সময় একবার তাঁর সন্ন্যাসী হয়ে যাবার ইচ্ছাও হয়। কিন্তু গান্ধীজীর আদেশে তিনি সেই ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন

দেশভ্রমনের নানাবিধ জ্ঞান তাঁকে একপ্রকার সম্পূর্ণতা এনে দিয়েছিল। তিনি সুরসিক এবং মজলিশী পুরুষও ছিলেন। সু-গায়ক না হলেও সংগীত উৎসাহী ছিলেন। তাঁর সান্ধ্য আসরে গান বাজনা প্রায়ই হত। কখনও বড় বড় গাইয়ে বাজিয়েরা সে আসরে উপস্থিত থেকে আসরের গৌরববর্দ্ধন করতেন। এই সব নানা কারণে লোকে তাঁকে বিদগ্ধ ব্যক্তি বলে মানতেন।

তাঁর জীবনের এত সব প্রাপ্তির মধ্যেও কিন্তু একটা ক্ষোভ ছিল মনে—তিনি ইস্কুল কলেজের বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারেন নি। মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে সখেদে বলতেনও—আসলে কি জান, আমরা একটা হুজুগে ইস্কুল ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। তাতে ফল বিশেষ কিছু বেশী ভাল হয়েছে বলে মনে হয় না। বরং মাঝখান থেকে অনেকের পড়াশুনা বরবাদ হয়ে

জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল।

বন্ধু রাখাল মিশ্র প্রতিবাদ করে বলতেন—ফল কিছু হয় নি কেন বলছ, শংকরী? তুমি, আমি তখন বেরিয়ে না গেলে গান্ধীজীর আদর্শ এবং আন্দোলন অত তাড়াতাড়ি দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত কি?

রাখাল মিশ্রও ঐ ইস্‌কুল-ছাড় আন্দোলনের পর আর পড়াশুনা করেন নি। তিনি এখন পাশের গাঁয়ের এক প্রাথমিক ইস্‌কুলের শিক্ষক।

শংকরীপ্রসাদ উত্তেজিত হয়ে বলতেন—পড়াশুনাটা ছেড়ে দিয়ে আমাদের কি হল? লাভ তো, নেতাদেরই হল। বল না শুনি, কোন্ নেতাই বা তোমার পড়াশুনা কম করেছে? সবই তো উকিল, ব্যারিষ্টার, বিলাত ফেরৎ কেউ কেটা। আসলে কি জান, রাজনীতি কর আর যাই কর, তার আগে পড়াশুনা কর। পড়াশুনা শেষ করে এসব কর।. যারা দেশ চালাবে তারা অশিক্ষিত কি অল্পশিক্ষিত হলে চলে? দেখনা কেন, রাজনীতিতে যাঁরা এখন শীর্ষস্থানীয় তাঁরা উচ্চশিক্ষায়ও শীর্ষস্থানীয়। রাখাল, বিদ্যের কিছুটা দৌড় না থাকলে রাজনীতিতে ঘোড় দৌড় সম্ভব নয়। গান্ধীজীর বিদ্যে আমাদের মত হলে কি তিনি গান্ধীজী হতে পারতেন, ভাবো? কৈ, তিনি নিজে তো ব্যারিষ্টারী পড়া শেষ করার আগে রাজনীতিতে নামেন নি?

যথেষ্ট পড়তে না পারার ক্ষোভ এভাবে শংকরীপ্রসাদের কথার মধ্যে ধরা পড়ত। স্ত্রীর প্রশ্রয়ে তিনি ছেলেকে আগে ইস্‌কুলে পাঠাতে পারেন নি। তাঁর প্রথম কন্যাসন্তানের অকালমৃত্যু হওয়ায় তিনি মনে মনে কিছুটা দুর্বলও হয়ে পড়েছিলেন। তাই নীলুর প্রতি বিশেষ কঠোর হতে পারেন নি। কিন্তু নিজের জীবনের অপূর্ণতা তিনি ছেলের জীবনে হতে দেবেন না, এ কঠোর প্রতিজ্ঞা তিনি করেছিলেন। তাই ছেলেকে ইস্‌কুলে দেবার পর তিনি চাইলেন যাতে ছেলের পড়াশুনার গোড়াটা যেন বেশ পোক্ত হয়।

তাই বাড়ীতে ছেলেকে রাতের বেলায় পড়িয়ে যাওয়ার জন্য মাসিক তিন টাকা মাইনেতে সুরেশ পণ্ডিতকে ঠিক করলেন। নীলু ইস্কুলে সুরেশ পণ্ডিতের কাছে না পড়লেও বাড়ীতে তাঁর কাছে পড়তে লাগল।

সুরেশ পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর মেয়ে পান্নাও এসে পড়ত। পান্না নীলুর চেয়ে এক বছরের বড়। পান্না তার এক ক্লাস উপরেও পড়ত। পান্নার চেহারাটা ছিল রোগাটে ধরনের। শীত-কালে প্রায়ই সে হাঁপানীতে ভুগত। এটা তার ছোট বেলার রোগ। এই রোগের জন্য পান্নারও পড়াশুনা শুরু করতে কিছু দেরী হয়েছিল।

কিছুদিন পরে রানী তাদের পড়ার সান্ধ্য আসরে এসে যোগ দিল। সুরেশ পণ্ডিত খুব কড়া লোক ছিলেন। নীলু ইস্কুলে বিশেষ মার না খেলেও রাতের বেলায় সুরেশ পণ্ডিতের কাছে মার খাওয়া ছিল এক নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। বাড়ীতে সারাদিন সে যে সব দুষ্টুমি করত, সন্ধ্যেবেলায় সুরেশ পণ্ডিত এলে সকলে একে একে সে সব ফিরিস্তি আউড়িয়ে তার নামে অভিযোগ করে যেত। পণ্ডিতমশাই সেগুলির বিচার করতেন শাস্তি দিয়ে—চুল টেনে, কান মলে বা মাথায় গাঁট্টা বসিয়ে। এ সব শাস্তি তিনি দিলেও মন দিয়ে পড়াতেন। তাঁর পড়ানোর গুণে নীলু খুব তাড়াতাড়ি মা সরস্বতীর দোরগোড়ার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

ছেলেমেয়েদের ঘুম পেলে তিনি নানা রকম গল্প বলে তাদের ঘুম ছাড়াতেন। ভূতের গল্পই বেশী বলতেন। ভূতের গল্প যেন ঘুম তাড়ানো মন্ত্র। কখনও বা বলতেন—যা বাড়ী থেকে একটু নুন নিয়ে আয়।

নীলু দৌড়িয়ে বাড়ীর ভেতরে গিয়ে নুন নিয়ে আসত। সুরেশ পণ্ডিত তাঁর ফতুয়ার পকেট থেকে একটা ছোট ছুরি বার করতেন। অপর পকেট থেকে বার করতেন এক টুকরো আদা।

তারপর আদার ছাল ছাড়িয়ে কুচি কুচি করে কাটতেন। তারপর সকলের হাতে এক একটা কুচি দিয়ে বলতেন—নূন মাখিয়ে খা। বেশ ভাল লাগবে আর ঘুম পালাবে।

নীলু ছুরির ফলাটা চেয়ে চেয়ে দেখত। ফলাটা একটা মোটা রেখার মত হয়ে গেছে। নীলু ভাবত, ওটি কতকালের কে জানে।

সুরেশ পণ্ডিত নীলুর মনের কথা বোধ হয় ধরতে পেরে বলতেন—এ ছুরিটা কুড়ি বছর আগে কৃষ্ণনগরের কালীর মেলায় কিনেছিলাম। কি দেখছিস চেয়ে, আরো কুড়ি বছর যাবে।

তারপর হয়ত তিনি আদার গল্প করতেন। একটুকরো আদা দেখিয়ে হয়ত বলতেন—একবার আমি এই এতটুকু আদা লাগিয়ে ছিলাম। পাঁচ সের আদা পেয়েছিলাম।

এই সব গল্প শুনতে শুনতে তাদের ঘুম ছেড়ে যেত। তখন সুরেশ পণ্ডিত বলতেন—এবার পড়, ঘুম চলে গেছে।

সুরেশ পণ্ডিত যখন হাত দিয়ে নীলুর মাথার চুল ধরে শাস্তি দিতেন, তখন নীলুর খুব ব্যথা লাগত। তাই ঐ বিশেষ শাস্তির হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়ার জন্য নীলু মাথার চুল খুব ছোট করে কাটিয়ে নিল। কিন্তু তাতে কোন লাভ হল না। সুরেশ পণ্ডিত তখন আঙুল দিয়ে না পেরে নখ দিয়ে টানতে লাগলেন।

ঘণ্টা দুয়েক তাদের পড়তে হত। মাঝে প্রত্যেকদিন একবার করে হাফ্-টাইম মিলত। ঐ সময় পণ্ডিতমশাই হুঁকো খেতেন। আর নীলুরা হৈ হৈ করে বাইরে বেরিয়ে যেত। এটুকু সময় ছিল তাদের কাছে সকল বন্ধনের মাঝে এক চিলতে মুক্তি যেন। নীলুর কাছে এ মুক্তির তুলনা ছিল না। রবিবার দিন সুরেশ পণ্ডিত পড়াতে আসতেন না। সেদিন সারাদিন নীলুর অবসর মিলত। কিন্তু তা এই হাফ্-টাইমের মুক্তির মত অমন স্বাদু এবং উপভোগ্য ছিল না।

মিনিট দশেকের মত সময় নির্দিষ্ট ছিল এই হাফ টাইমের

অর্থাৎ যতক্ষণ সময় লাগে পণ্ডিতমশায়ের একবার তামাক খেতে। তারপরেই তিনি ছেলেমেয়েদের ডাক দিতেন। নীলু, রানী ও পান্না কিন্তু ঐটুকু অবসরের মধ্যে ক্যানেলের পাড়ে নানারকমের খেলা খেলত। কখনও তারা রাম-সীতা, দস্যু রত্নাকর বা চোর পুলিশ খেলত বা কখনও লুকোচুরি খেলত।

আবার যখন চাঁদের আলোয় সারা ক্যানেল পাড় এবং জলে ভরে যেত। তখন কোন কোনদিন তারা তাদের প্রিয় বর-বৌ খেলত। একজন বৌ হলে অন্যজন হত চাকরানী। নীলু কিন্তু সব সময় বর। মাঝে মাঝে এই বৌ হওয়া নিয়ে পান্না ও রানীর মধ্যে মান-অভিমান হত। ঐটুকু সময়ের মধ্যে তারা খেলা শেষ করে সুরেশ পণ্ডিতের ডাকে পড়ার আসরে ফিরে আসত। কিন্তু পড়ার আসর আর বেশী জমত না. তামাকের নেশার জন্য কিনা কে জানে, এই দ্বিতীয়ার্ধে সুরেশ পণ্ডিত প্রায়ই ঢুলতেন। ঐ সময় তাদের তিনি অংক কষতে দিতেন। কিছু পরে হরি এসে নীলুকে খেতে যাওয়ার জন্য ডাকত।

সুরেশ পণ্ডিত তখন হাই তুলে বলতেন—যা, বই পত্র গুছিয়ে নে।

এভাবে ঘরে ও ইস্কুলে নানা কান্নাহাসি, আনন্দবেদনার মধ্য দিয়ে নীলুর শৈশবের দিনগুলো কেটে যেতে থাকে। নীলাদ্রি যখন নিজের ছেলেদের পড়াতে বসে, তখন কোন কোন সময় তার নিজের সেই শৈশবের দিনগুলোর কথা ভাবার চেষ্টা করে। তার মনে হয়, সেদিনের আনন্দ ও বেদনার কোন আলাদা সত্বা ছিল না,—আজো নেই। আসলে সব কিছু মিলে একটাই গান—মহাজীবনের গান। গানের ভাষা ছাড়িয়ে সুর, সুর ছাড়িয়ে মুর্চ্ছনাটুকু তার হৃদয়ে ধরা পড়ে আছে।

নীলু মনে মনে স্বীকার করে—মহাজীবনের গানের কোন অংশ আলাদা করে উপভোগ করা যায় না। সব ত্রুটি-বিচ্যুতি, সাফল্য-অসাফল্য, সব পাপ-পুণ্য, সব ভাল মন্দের ভেতর দিয়েই সেই গানের উত্তরণ।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় সুরেশ পণ্ডিত তাদের ছুটি দিয়ে দিলেন। সেদিন রানীর বাবার নৌকা কোলকাতায় মাল খালাস করে ফিরে এসেছে। রানীর বাবা শ্রীপতি মান্না শংকরীপ্রসাদের 'পাট তার নৌকায় বোঝাই করে তালপুকুরিয়ার লকগেট পেরিয়ে গেঁয়োখালি হয়ে কোলকাতার বাগবাজারে গিয়েছিল। সেই নৌকা সেদিন ফিরেছে; সঙ্গে শৈলমামাও ফিরেছেন দোকানের মালপত্র কিনে। সঙ্গে এনেছেন কলের গান। সেই কলের গান আজ বাজবে। পাড়া পড়সীরা সকলে গান শোনার জন্য ভীড় করছে দোকান ঘরে গানের আড্ডায়। সেজন্যই নীলুদের ছুটি মিলেছে।

ছুটি পেয়ে নীলুরা দোকানঘরের দিকে দিল দৌড়। শৈলমামা কলের গানের সামনে বসে। সকলে তাঁকে ঘিরে আছে। মামা সকলকে বলতে লাগলেন—আরে সকলে সরে দাঁড়াও। গান তো দূর থেকে শোনা যাবে। এ কি সার্কাস যে কাছে এসে দেখতে হবে?

সকলে একটু সরে গেল। শৈলমামা কলের গানে দম দিতে লাগলেন। নীলুরা এসে মামার পাশে বসল।

নীলু ফিস ফিস করে রানীকে বলে—কে গাইবে রে?

রানী বলে—লোক

নীলু আবার বলে—কোথায় লোক।

রানী বলে—ঐ বাক্সের ভেতরে. বোধ হয়।

শৈলমামা ডিস্‌কের উপর রেকর্ড চাপাতে চাপাতে বলেন—এ্যাই, তোরা চুপ কর। গান শোন্ এবার।

গান সুরু হল। নীলু মনে মনে বলে উঠল—আহা, কি মিষ্টি!

নীলু তাকিয়ে দেখে সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে। কেউ কথা বলছে না। যাঁরা গাইয়ে—বাজিয়ে লোক তাঁরা চোখ বন্ধ করে আছেন। মাঝে মাঝে আহা-হা করে উঠছেন।

নীলুর কি যে ভাল লেগেছিল! —কি মিষ্টি গলা, কি

অপরূপ সুর! তার মনে হয়েছিল কোন দেবকন্যা বুঝি গাইছে। নীলু তারপর বহুবার সে গান শুনেছে, মুখস্থ করেছে, তার সুরও নিজের গলায় তুলেছে। যতবার রেকর্ডে ঐ গান শুনেছে ততবারই ভাল লেগেছে। কিন্তু প্রথম বারের শোনার সাথে অন্য কোনবারের তুলনা হয় না। গান এবং তার সুর নীলাদ্রি আজও ভোলে নি। সেটি ছিল—

'আমার কৃষ্ণ কানাই এল
রুনু-ঝুনু, রুনুঝুনু বোলে রে,
তাই যমুনারি অঞ্চল চঞ্চল ছলছল
কলকল রোল রোলে রে।
ঐ ডালে ডালে শিখি ডাকে,
ফুলমঞ্জরী, লো, নীপশাখে,
তাই কুঞ্জে কুঞ্জে অলি গুঞ্জরী', লো,
ফুলমঞ্জরী, লো, দোল দোলে রে।
যমুনাকিনারে চলে অভিসারে
ব্রজের গোপপিয়ারী
কণ্ঠে দুলায়ে মধুমালতীর মালা,
অঙ্গে সুনীল শাড়ী!
আলতারাঙ্গা পায় মঞ্জীর মুরছায়—
রিনিঝিনি ঝংকার তোলে রে।'

গান শেষ হবার পর সকলে আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে! মামা রেকর্ড উলটিয়ে আবার ডিস্‌কে চাপালেন। চাপাতে চাপাতে বললেন—আজ আর নয়। কাল হবে আবার।

সে গানটাও সেই দেবকন্যার গাওয়া। সেটিও নীলাদ্রির মনে আছে—

'কৃষ্ণারাতের তিথি ফিরে আসে কতবারই,
প্রিয়, তুমি তো এলে না ফিরে, গিরিধারী?
কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী, হায়

তোমার লাগিয়া বৃথা ঝরে যায়!
আজি বেনুরবে কেন নাচে না ময়ূর,
ডাকে না শুকসারি,
গিরিধারী!
কৃষ্ণকালি যে মেখেছে আঁখি,
সেই কথা কয় বনের পাখী।
কৃষ্ণ কোথায় কেহ নাহি পায়
এ ব্রজের নরনারী,
গিরিধারী।'

সেদিন ঐ দুটি গান নীলুর মনে যে দাগ কেটেছিল, সে দাগ আর ইহজীবনে মুছে যাওয়ার নয়। এর আগে সে কেষ্ট-যাত্রা ও নিমাই সন্ন্যাসের গানগুলো শুনেছে। ভাল লেগেছে। আবার লাগেও নি। কারন সুরগুলোর মধ্যে বৈচিত্র্য খুব কম—অনেকক্ষণ শুনলে একঘেয়ে লাগে। যেমন, কেষ্টযাত্রার—

'আজ কেন গো নিধুবনে
রাধাকৃষ্ণ একাসনে গো, গো—ও-ও।'

অথবা,

রাধা, রাধা, রাধা বলে
বাঁশি বাজ বাজ বাজ রে।
'যন্ত্র যদি পড়ে থাকে লক্ষ-জনার মাঝে,
যন্ত্রী না হইলে যন্ত্র কেমন করে বাজে গো।
কেমন করে বাজে গো।'

অথবা, নিমাই সন্ন্যাস পালাগানের সেই গান—

'মধু, মধু, মধু বলে, প্রভু-উ-উ—
আমায় ডাকলে কেন?'

আবার শিবের গাজনের সেই তরজা গান—

'এটা কেটা মাথায় জটা,
এই কি বরের বাপ?'

এ সবই নীলুর ভাল লাগে। কিন্তু ভাল লাগার অনুভূতিকে এরা তার হৃদয়ের গভীরে নিয়ে যায় না। তবে হ্যাঁ, মনে পড়ছে, নিমাই সন্ন্যাস পালা শেষের সন্ন্যাসী নিমাই-এর সেই প্রাণ মন আকুল করা গানটা, যা তার মনকে দোলা দেয়—

'ভিক্ষা দাও গো, নগরবাসী—
তোমরা আমার মাতাপিতা,
ভিক্ষা দাও গো, নগরবাসী।'

কিন্তু কলের গানে শোনা ঐ দু'খানি গান যেন নীলুকে প্রথম সুরের আঙ্গিনায় এনে ছেড়ে দেয়। কৃষ্ণ ও রাধার অনেক কাহিনীই সে জানে। রাধা যে অমন আকুল হয়ে সুরে সুরে কাঁদতে পারে, এ অনুভূতি তার আগে হয় নি। রাধার দুঃখে নীলুর হৃদয়টা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যায়। তার চোখে জল এসে যায়। সবার অলক্ষ্যে সে তার কচি কচি হাত দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে।

গানের মাঝে সে কান্নাবিহ্বল দৃষ্টিতে রানীর দিকে তাকায়। রানীকে তার রাধা বলে ভ্রম হয়। ভাবের আবেগে সে রানীর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলে—কি সুন্দর গান রে। এ গান তোকে গেয়ে দেখাব, দেখিস।

রানীও আবেগ জড়িত স্বরে বলে—তোর কাছ থেকে আমিও শিখে নেব।

নীলু পরে এ গান দুটির সুর নিজের গলায় তুলেছিল। রানীও গাইত নীলুর গলার সাথে সুর মিলিয়ে। আরো একটা গান সে শিখে নিয়েছিল—

'যাও পাখী বলো তারে
সে যেন ভুলে না মোরে
জনমেরি মত প্রাণ
সঁপেছি তাহারি পায়ে।'

এ গানটার সঙ্গে কেউ যেন নাচত, তার পায়ের ঘুঙুর

বাজত তালে তালে। নীলুর মনে হত, সে যদি একবার সেই দেবকন্যাকে দেখতে পেত!

নীলুর সেই স্বপ্নের কথা জগৎ থেকে তার সেই সুরের দেববালারা, শৈশবের নর্মসখী রানী, সেই প্রাণের বন্ধু কালা—অনেকেই হারিয়ে গেছে—চিরদিনের মতই হারিয়ে গেছে। কিন্তু সেই গানগুলো আজো হারায় নি—মনের মণিকোঠায় অতি সযত্নে সে সব সঞ্চিত আছে। সে সব গানের সুরে আজও সে কান্নায় উদ্বেলিত হয়।

নীলাদ্রি ভাবে, এরকম গান বাদ দিয়ে তার মহাজীবনের গান অর্থহীন। যে গানে ভুবন দোলে, সৃষ্টি দোলে—যে শোনায় সে যেমন দোলে, যে শোনে সেও দোলে-তা-ই তো মহাজীবনের গান। সে গানে ব্যথা, আনন্দ বলেও আলাদা কিছু নেই—আছে শুধু অনুভূতি, উপলব্ধি!

॥ ছয় ॥

যদিও শংকরীপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর অন্য দু ভাই—ভবানীপ্রসাদ ও হরপ্রসাদের বিশেষ সদ্‌ভাব ছিল না, তবু অসদ্‌ভাবও বিশেষ ছিল না। শংকরীপ্রসাদ তাঁর ভাইদের ব্যাপারে অনেকটা উদাসীনতার মনোভাব পোষণ করতেন। ভবানীপ্রসাদ বেশীর ভাগ সময় দেবত্তর সম্পত্তির দেখাশুনা ও নিত্যপূজার ব্যবস্থাদি করতেন। হরপ্রসাদ সংস্কৃত সাহিত্যে একজন দিক্‌পাল ছিলেন। তিনি পাশের গ্রামের এক হাই ইস্‌কুলে সংস্কৃত পড়াতেন। এ ছাড়া তাঁর অন্য এক জীবিকা ছিল—তিনি ছিলেন ভাল আমিন। অংকশাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। ভবানীপ্রসাদ ও হরপ্রসাদ এক পরিবারভুক্ত ছিলেন

ভবানীপ্রসাদ যেহেতু নিঃসন্তান ছিলেন তাই ছোট ছেলে-মেয়েদের খুবই ভালবাসতেন অপরপক্ষে হরপ্রসাদ, এমন কি নিজের ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত বিশেষ আদর যত্ন করতেন না। তিনি অত্যন্ত ক্রোধী স্বভাবের ছিলেন।

হরপ্রসাদের ছিল তিন ছেলে এবং তিন মেয়ে। ছেলেরা হল, যথাক্রমে চিত্তরঞ্জন, মনোরঞ্জন ও কালীরঞ্জন এবং মেয়েরা যথাক্রমে বড় পুঁটি, ছোট পুঁটি ও টুনি। মেজ জেঠার ছেলেরা সকলেই নীলুর চেয়ে বড় ছিল। নীলু তাদের ডাকত বড়দা, মেজদা ও ছোড়দা বলে। তারা একই ইস্‌কুলে যথাক্রমে চতুর্থ, তৃতীয় ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ত। বড় পুঁটি প্রথম শ্রেণীতে পড়ত কিন্তু সে মাকে প্রায়ই সংসারে সব কাজে সাহায্য করত। তাই ইস্কুলে যেত কম। ছোট পুঁটি নীলুরই প্রায় সমবয়সী ছিল। সে ইস্কুলে

পড়ত না।—ঘরে এক আধটু পড়ত। টুনি নীলুর চেয়ে ছোট ছিল। তার পড়ার বয়স তখনও হয় নি।

এই জেঠাদের বাড়ী ছিল নীলুর আর এক আনন্দ নিকেতন। কিন্তু নীলু জেঠাদের বাড়ী যাক, এটা তার মা-বাবা বিশেষ পছন্দ করতেন না। অনেক সময় তাঁরা প্রকাশ্যেও বারন করতেন। কিন্তু নীলুর কচি মন কিছুতেই তা মানতে চাইত না। নীলুর খেলার মত নিজের কোন ভাইবোন ছিল না বলে মনে দুঃখ ছিল। তাকে খেলতে হলে বাইরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতে হয়। সেই অভাববোধটা জেঠাদের বাড়ীতে এলে তার আর থাকত না।

এখানে এসে সে অবাধে ছোড়দা, দিদি ও ছোট পুঁটিদের সঙ্গে খেলতে পারত। এখানে এসে লুকোচুরি খেলাটাই জমত ভাল। শিব ও চণ্ডী মন্দিরের ভেতরে, আশেপাশের পেয়ারা ও করবী গাছের জঙ্গলে বেশ লুকোবার জায়গা ছিল। ধানকাটার মরশুমে মন্দিরের সামনের চাতালে বড় বড় ধানের গাদাগুলো যখন বসত তখন তো লুকোবার সুবর্ণ সুযোগ।

এ আকর্ষণ ছাড়া ছিল অফুরন্ত ডাব, নারকেল, পেয়ারা, আম, কুল ইত্যাদির আকর্ষণ। সামনের চড়কপোতার মাঠে অতি বৃহৎ বকুলগাছ ছিল। পাকা বকুল ফল খেতে বেশ মিষ্টি. সকালবেলা উঠে বকুলফল এনে খাওয়ার আলাদা আনন্দ ছিল। নীলুদের বাড়ীতে এতসব ফলের গাছ নেই। আমের গাছ তো একদম নেই। আমের সময় কত আম যে জেঠাদের বাগানে হত তার ঠিক নেই। কালী আম আর সুন্দরী আম ছিল নীলুর অতি প্রিয়। সে নারকেল বা আমগাছে উঠতে পারত না। কিন্তু দাদারা তাকে সব পেড়ে দিত সকলেই তাকে বিশেষ আদর স্নেহ করত, ভালোবাসত।

শীতকাল এলে জেঠাদের বাড়ীটা খেজুরগুড়ের মিষ্টি গন্ধে সব-সময় মৌ মৌ করত। মেজদা খেজুর গাছে কলসী বাঁধায় আর রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরী করায় ওস্তাদ। মেজদা ভাল বাঁশী বাজাতে

পারত। নীলুকে অনেক বাঁশের বাঁশী তৈরী করে দিত।

জেঠাদের বাস্তুতে ছোটবড় মিলে অনেক পুকুর ছিল। আর ছিল চারদিকে একটা ঝিল মত। সেই ঝিলের জল খুব গভীর ছিল না। মাঠের সঙ্গে তার যোগ ছিল। বর্ষাকালে ঝিলে মাঠের মাছ ঢুকত আর সারাবছর ধরে সে সব মাছ খাওয়া চলত। নীলু এই ঝিলে দাদাদের সঙ্গে মিলে পাঁকের মধ্যে হাত ড়িয়ে হাত ড়িয়ে কৈ মাছ ধরতে পারত। নিজে মাছ ধরে সেই মাছ খাওয়ার একটা টাটকা স্বাদ ছিল।

এখানে এলে তাই নীলুর মনে হত, এ এক চিরসুখের দেশ! সে এলে এ বাড়ীতে একটা আনন্দের সাড়া পড়ে যেত। সকলে তাকে এত ভালোবাসত যে, সে কি খেলে খুশী হবে, তাই তাকে যোগাবার জন্য সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। এমন কি মেজজেঠা পর্যন্ত। মেজজেঠা, শিবের মন্দিরে ভোগবাবদ যে সব ভাল ভাল ফল, ছানা ইত্যাদির আমদানি হত সেগুলো একাই প্রায় খেতেন— নিজের ছেলেমেয়েদের লুকিয়েই খেতেন। কিন্তু নীলুকে তাঁর ভোগের সিংহভোগ দিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য ছিল না তাঁর।

সন্ধ্যেবেলায় গল্পের আসর বসত। মেজজেঠাই হতেন বক্তা আর নীলুরা সব শ্রোতা। বেশীর ভাগ গল্প ছিল নীতি-কথার গল্প- ঈশপের গল্প বা সংস্কৃত শ্লোকও আউড়িয়ে শোনাতেন। নীলু সে সবের অর্থ না বুঝলেও তার ধ্বনি, তার ছন্দসৌষ্টব, তার মনে এক অপরূপ সুরের লহরী তুলত। অনুস্বার বিসর্গের শব্দ ছাপিয়ে তার কানে বীণার টুং টাং শব্দই যেন বাজত। কালিদাস, ভবভূতির নাম সে এই বয়সে এই মেজজেঠার কাছেই শুনেছিল। এখানে এলে তাই কখনও কখনও তার মনে হত, সে বুঝি শিপ্রানদীর তীরে কালিদাসের বাসস্থানে এসেছে।

এখানে ছিল শুধু গান, শুধু সুর, শুধু ছন্দ, খেলা আর আনন্দ। বড়দের মুখে নীলু শুনেছে, স্বর্গের দেবতারা চিরকাল আনন্দে থাকেন—দুঃখকষ্ট কোনদিন তাদের স্পর্শ করে না। স্বর্গের সঠিক

কোন ধারণা তার মনে না থাকলেও তার মনে হত স্বর্গটা অনেকটা যেন জেঠাদের এই বাড়ীটার মত।

এই বাস্তুতেই নীলু ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। সেই জন্মগত অধিকারেই, বোধ হয়, সে এখানকার সকলের মন অধিকার করে থাকত। আমের সময় বড় জেঠা নীলু, বড় পুঁটি, ছোট পুঁটিদের পাতে নিয়ে খেতে বসতেন। খাওয়ার শেষে বড় জেঠাইমা দুধ আর আম দিয়ে গেলে বড় জেঠা সেগুলো মেখে ফেলতেন, তারপর তাদের মধ্যে চলত হুড়োহুড়ি করে খাওয়ার পালা। নীলু যখন দেখত, দুধভাত প্রায় শেষ হয়ে আসছে তখন সে বড় জেঠার ডান হাতটা তার বাম হাত দিয়ে ধরে রেখে তাড়াতাড়ি ডানহাত দিয়ে বড় জেঠার অংশটা শেষ করে ফেলত। সবাই এ দৃশ্য উপভোগ করতেন এবং মেজজেঠা তার এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসা করতেন।

এখানে জেঠাদের বাড়ী ছাড়া পাশের রায় ও মাইতিদের বাড়ীতেও সে বেড়াতে যেত। যেখানেই যেত, সেখানে মাসী পিসীরা কিছু না কিছু খাওয়াত। খেতে খেতে একসময় তার মনে হত, ক্ষুধা কি জিনিস, তা তার জানা নেই।

ঐটুকু বয়স হলেও নীলু অনেক কিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে পারত। জেঠাদের বাড়াতে আহারের আয়োজন বা পরিমানের স্বল্পতা ছিল না কিন্তু অন্য-অনেক ব্যাপারে স্বল্পতা ছিল। নীলু দেখত জেঠতুতো ভাইবোনদের কাপড় চোপড় তার মত নয়। তাদের হয়ত কেবল একটা প্যাণ্ট বা খাটো ধুতি। গেঞ্জির বালাই ছিল না। শীতকালে সে যেখানে ফুলশার্ট আর শোয়েটার পরে দাদারা সেখানে কেবল চার আনা দামের এক একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে থাকে। তাদের পায়ে কোনদিন সে জুতো দেখে নি। নীলুর সব সময় জুতো থাকত, তবে পরত কম।

আরও নানা ব্যাপারেই স্বল্পতা লক্ষ্য করত নীলু। স্নানের আগে বড় জেঠাইমা হয়ত ছোট অতটুকু একবাটি নারকেল তেল

দিয়ে গেলেন। সেইটুকু তাদের চার ভাইকে মাখতে হবে। নীলু ভাবে, তার মা একা তাকেই রোজ এতটা করে তেল মাখায়। অবশ্য নীলুর কিন্তু তার জন্য এতটুকু ক্ষোভ ছিল না মনে। এখানে এসে সে দাদাদের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারলেই খুশী হত।

কিন্তু এ বাড়ীর কেউ তাকে তা হতে দিত না। তার জামা কাপড় ছিল সুন্দর উজ্জ্বল রঙের। চারিদিকের মলিন বস্ত্রধারীদের মধ্যে তাকে একটা ফুটফুটে রঙীন প্রজাপতির মত ঘুরে বেড়াত দেখত তার আসে পাশের সকলে। তখনকার দিনে নকল দুধ বা টিনের দুধ ছিল না। জন্মাবার পর থেকেই সে মায়ের বুকের অফুরন্ত সুধা পেয়েছে। বড় হয়ে গরুর দুধ এত খেয়েছে যে, বলতে গেলে, সে দুধেই ভেসে গেছে। পুষ্টির বিচারে তার বাড়ীর আহার্যের মান ছিল অনেক উঁচুতে। বাপমায়ের এক ছেলে সে। আদরে আদরে, যত্নে যত্নে মানুষ হয়েছে। তার গোলগাল চেহারা, ঝাঁকড়া কোঁকড়ান কালো চুল, সুন্দর মুখশ্রী সকলের মাঝে তাকে এক বিশিষ্টতা এনে দিত। সকলের তাকে ভাল লাগার, বোধ হয়, এ ও এক কারণ ছিল।

বেশভূষার প্রাচুর্য না থাকুক, কোন বাড়ীতে কেউ লজ্জা নিবারণ করতে পারছে না। এ কথা নীলু কোনদিন শোনে নি। গ্রামের বেশীর ভাগ পুরুষ একটা গামছা পরেই বছরে ন'মাস সময় কাটাত। মেয়েদের একটা মোটা ন'হাতি শাড়ীই যথেষ্ট ছিল। ঐটুকু যোগাড় করার মত সামর্থ সকলেরই ছিল।

তার বাড়ীর মত তাহার্যের মান এবং পরিমান সব বাড়ীতে না থাকুক, কোন বাড়ীতে আহার্যের অভাব সে কোনদিন বিশেষ দেখে নি। সকলেই মোটামুটি ভরা পেটেই থাকত – সে মোটা ভাত আর শাকে পেট ভরলেও।

কিন্তু নীলুর মন তার বাড়ীর এতটা প্রাচুর্যে যেন সায় দেয় না, সে সকলের মত কিছুটা মলিন বস্ত্র পরে সকলের মত হয়ে থাকতে

চায়। জেঠাদের বাড়ীতে এলে সে সকলের মত গামছা পরে ঘুরে বেড়াতে চায়। কিন্তু কেউ তাকে তা হতে দিত না। সে এখানে এসে মনের আনন্দে পান্তা আর ক্ষুদ খেতে চায়। কিন্তু মেজ-জেঠাইমা যখন বলেন—বড় লোকের ছেলের ক্ষুদকুঁড়ো খাওয়ার সখ হয়েছে, তখন সে লজ্জা পায়।

রানীদের বাড়ীতেও সে একই জিনিস দেখে। রানীদের ছিল বসতবাড়ী ও তৎসংলগ্ন কিছুটা জমি যেখানে তারা তরকারী ফলাত। ধানজমি বলতে খুব সামান্যই ছিল। রানীর বাবা ও দাদা নীলুদের এবং আরো অনেকের জমি ভাগে চাষ করত। তারা ছুতোর মিস্ত্রিও ছিল। আবার তাদের নৌকাও ছিল একটা। সে নৌকায় সওদা নিয়ে তারা দূর দূর স্থানে পাড়ি দিত। কখনও কখনও কালীগ্রাম বা তালপুকুরিয়ার হাটে নৌকা নিয়ে যায়। দু জায়গাতে সপ্তাহে দুবার করে হাট বসে।

নীলুদের দোকান ঘরের যা কিছু কাঠের কাজ তা রানীর বাবা ও দাদা করেছে। সারা বছর তারা শংকরীপ্রসাদের নানা ফাই-ফরমায়েস খাটত। মজুরী ছাড়াও বিপদে সম্পদে সাহায্য তারা তাঁর কাছে পেত। রানীর মাও রমলাকে নানা সাংসারিক কাজে সাহায্য করত, যথা ধান সেদ্ধ করা, ধানভানা, মুড়িভাজা ইত্যাদি। ধান ওঠার পর রানীর মার ডাক পড়তই। সারা বছরের চাল করে রাখার মরশুম ছিল এইটাই। সারা শীতকাল ধরে এ সব কাজ চলত। নীলুদের ঢেঁকি ছিল। সেখানে নিজেদের ছাড়াও পাড়ার অনেকের ধান ভানা হত। সকলের ঢেঁকি ছিল না। রমলা নিজেও এসব কাজে হাত লাগাতেন। তবে তাঁর তো ঝামেলা ছিল মেলাই। তাই এ সব কাজ বেশীর ভাগই করত রানীর মা ও মানদা বুড়ী।

ঢেঁকিঘরে ধানভানা এক জলসার মত ব্যাপার। পাড়ার অনেক মেয়েই সেখানে ভীড় করত। নানা মেয়েলী গল্পগুজবের আসর জমত সেখানে। কে কি দিয়ে খেল, কার কবে বাচ্চা হবে।

কার মরদ তার বৌকে ধরে মারে, কোন বৌ রান্না করার সময় লুকিয়ে খেয়ে যায়, এ সমস্ত হত তাদের আলোচ্য বিষয়। কখনও কখনও সে আসরে রূপকথার গল্প জমে উঠত। রানীর মা কখনও ঢেঁকিতে পা লাগাত আবার কখনও ঢেঁকির গর্তে ধান এগিয়ে দেবার কাজ করত তখন নীলুর আব্দারে সে কাজের ফাঁকে ফাঁকে রাক্ষস-খোক্কস, সোনার হরিণ, নিঝুমপুরের রাজকন্যা; এ সব রূপ-কথার গল্প বলত। নীলু রানী সঙ্গে বসে সে সব গল্প শুনে শুনে মনে মনে এক আজব রূপকথার দেশ গড়ে তুলত।--রাতের বেলা শুয়ে শুয়ে সে রাজকন্যাদের দেশে চলে যেত।

ধানভানার শেষে রানীর মা ক্ষুদ্‌গুলো নিত আর কিছু চাল। ছোট বেতের খুপরীতে মেপে মা তাকে চাল দিতেন। কুঁড়োগুলো গোলায় ভরে রাখা হত সারাবছর গরুবাছুর খাওয়ার জন্য।

নীলুর ক্ষুদ্‌ খেতে খুব ভাল লাগে। দুধ আলুভাতে দিয়ে গরম গরম ক্ষুদ তার কাছে পোলাও-এর চেয়েও সুস্বাদু লাগত। কিন্তু মা সব ক্ষুদ ধান ভানিয়েদের দিয়ে দিতেন। কোন কোনদিন নীলু সকালবেলায় রানীদের বাড়ীতে গিয়ে দেখত, ভাঙ্গা এ্যালু-মিনিয়ামের বাটিতে ক্ষুদভাজা গুড় দিয়ে খাচ্ছে। নীলু ভরপেট থাকলেও তার ঐ ক্ষুদভাজা খেতে ইচ্ছে করত। সে ক্ষুদভাজা খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রানীর মা তার মেজ জেঠাইমার মত হেসে একই রকমের কথা বলত—বড় লোকের ছেলে কি ক্ষুদ খায়?

রানীদের গাই ছিল না। চাষের জন্য দুলো বলদ ছিল। তারা কালেভদ্রে দুধ খেত। অনেক পীড়াপীড়িতে রানীর মা যখন যথেষ্ট সংকোচের সঙ্গে নীলুকে ক্ষুদভাজা দিত তখন তার মনে হত—এই-ই বেশ! দুধ দিয়ে ক্ষুদভাজা ভাল জমে না।

নীলুর মাঝে মাঝে ইচ্ছে হত বাড়ীতে সে শুকনো মুড়ি খাবে—দুধ ছাড়া। কোনদিন সে কথা মাকে বললে মা পুত্রের দুধের প্রতি অনীহা লক্ষ্য করে অবাক হয়েছেন। যে ছেলে কবজি না ডুবলে দুধের বাটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়, সে কোন সখে দুধ খাবে না বলে,

রমলা খুঁজে পান না। ঘরে নীলু খেয়ে দেখেছে শুকনো মুড়ি। ভালো লাগে নি। একদিন বাড়ীতে মাকে বলে কয়ে ক্ষুদভাজা করিয়ে শুকনো শুকনো গুড় দিয়ে খেয়ে দেখেছে। তা ও ভালো লাগে নি। অথচ রানীদের বাড়ীতে বসে তাদের ভাঙ্গা বাটিতে এ জিনিস খেতে তার বেশ ভাল লাগত।

কারণটা আর একটু বড় হয়ে বুঝেছে সে। তার চারপাশের পরিবেশের সহজ সরল জীবনযাত্রার মাধুর্য তাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করত? সেই মাধুর্য সে নিজের বাড়ীর ধনাঢ্য পরিবেশে খুঁজে পেত না। যদি বা কোনদিন সেই পরিবেশ সে নিজের বাড়ীতে তৈরী করার চেষ্টা করত তখন তার কাছে তা নকল মনে হত। তাই বিস্বাদও লাগত।

নীলুর শিশুবয়সে তার চারদিকে ছিল এই সহজ সরল জীবন যাত্রার মাধুর্য। অভাব অভিযোগ তখনও মানুষের ছিল। পয়সার অভাবে বেশীর ভাগ লোকই রোজ রোজ মাছ, মাংস, ছানা, ডিম খেতে পেত না, বা জামাজুতো পরতে পেত না কিন্তু তাই বলে কাউকে অনাহারে বা বিনাবস্ত্রে দিন কাটাতে হয় নি। যেমন করেই হোক্, মোটা কাপড়, মোটা ভাতে সকলের দিন চলে যেত। জীবনযাত্রার মাধুর্যটা ছিল এখানেই যে, স্বল্পতার জন্য কারো কোন অভিযোগ ছিল না।

আশ্বিন-কার্ত্তিকের দিকে গরীব স্বল্পবিত্তদের অনেকেরই ঘরে কিছুটা ভাতের টান পড়ত। কিন্তু তাই বলে ক্ষুধার জ্বালায় কারোর নাড়ীতে টান পড়ত না। অনেকেরই আবার ধান উদ্বৃত্ত থাকত। সেগুলো অভাবী লোকেরা অসময়ে চাইলেই ধার হিসাবে পেত। নতুন ধান উঠলে দেড়গুণ ধান দিয়ে বা গতরে খেটে দিব্যি ধার শোধ করা যেত।

ধান ওঠার আগে রানীদেরও খাওয়ায় কিছু টান পড়ত কোন কোন বছর। রানীর বাবা তখন নীলুদের দোকান থেকে চাল কিনে নিয়ে যেত বা ধারেও নিত। অনেকেই তাই করত।

নীলুর মনে পড়ে, তখন চালের সের ছিল চার পয়সা। কত সস্তা! কিন্তু না, যতটা সস্তা ভাবা যায়, ততটা সস্তার ব্যাপার নয়। কারণ রানীর বাবা ছুতোর মিস্ত্রির কাজ করে মজুরী পেত রোজ হিসাবে আট কি দশ পয়সা।

অতএব বহাল তবিয়তে তারা না থাকলেও দিব্যি হেসে খেলে বেঁচে ছিল। নীলাদ্রি আজ ভাবে, অভাব তখনও ছিল, তার আগেও ছিল কিন্তু আজকের মত এই সর্বগ্রাসী অভাববোধ মানুষকে এমনভাবে পূর্ণগ্রাস করে বসে নি।

॥ সাত ॥

শীতকালে ধান ওঠার আগেই বাৎসরিক পরীক্ষাটা হয়ে গেল। পরীক্ষার পর কয়েকদিন ইস্‌কুল ছুটি। বাড়ীতে সুরেশ পণ্ডিতও পড়াতে আসেন না। নীলুর এখন অফুরন্ত অবসর। সারাদিন সে সঙ্গীসাথীদের নিয়ে, কখনও বা একা-একা বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। দুপুরবেলায় বাড়ীর সামনে ক্যানেলের ঘাটে রানীদের যে নৌকাটা বাঁধা থাকে তার উপর রানী, পুলিন, কালাদের সঙ্গে হাতছিপ নিয়ে বসে। সে বিশেষ মাছ ধরতে পারে না। কিন্তু ওরা দিব্যি মাছ ধরে—ট্যাংরা, পার্শে, কখনও কখনও বা সুন্দরী কাঁকড়া। নীলু মাছ ধরতে না পারলেও উৎসাহটা তারই সবচেয়ে বেশী। অন্যান্য সকলে অবশ্য তাকে মাছের কিছু কিছু ভাগ দেয়। একদিন সে বুঝি একটা ট্যাংরা মাছ ধরেছিল। সেদিন তার মনে কি আনন্দ! মনে হয়েছিল, বুঝি সে রাজ্যজয় করেছে।

পরীক্ষার ঠিক আগে রানীর হয়েছিল জ্বর। তাই সে পরীক্ষা দিতে পারে নি। নতুন ক্লাশে সে উঠতে পারবে না, সে কথা জানে। কিন্তু তার জন্যে তার কোনও দুঃখ ছিল না! বরং আনন্দ ছিল এই যে, নীলুর সঙ্গে সে একই বেঞ্চিতে বসতে পারবে। সে কথা সে নীলুকে বলেছেও। নীলু শুনে খুশী হয়েছে।

একদিন বাড়ীর কাছে ক্যানেলের ঘাটে কয়েকটা বিরাট বিরাট খড়ের নৌকা এল। আট দশদিন সেগুলো ঘাটেই বাঁধা রইল। প্রত্যেকদিন নৌকাগুলোতে কিছু কিছু করে খড় বোঝাই হতে লাগল। একদিন সেগুলো নারকেল গাছের সমান উঁচু হয়ে গেল।

খড়ের নৌকার তলাটা যেন একটা জগৎ। নীলুদের কাছে মনে হত যেন বিরাট এক খেলার মাঠ। কি মজা! উপরে খড়ের পাহাড় আর নীচে খেলছে তারা। বাইরে থেকে কেউ তাদের দেখতে পাচ্ছে না। নীলুরা হাতছিপ দিয়ে মাছ ধরা বাদ দিয়ে রোজই এ নৌকা সে নৌকায় খেলতে লাগল। নৌকার লোকেরা কেউ তাদের কিছু বলত না। বরং তারা জলখাওয়ার সময় নীলুদের মুড়ি, নারকেল, খেজুর গুড়ের পাটালি, এসব খেতে দিত।

নৌকার উপর এলেই নীলুর মনে হত, সে বুঝি রানীর মা'র বলা সেই নিঝুমপুরে এল। সে, রানী, কালা ও পুলিন—চারজন এখানে এসে রাজা রানী মন্ত্রী কোতোয়াল হত। কখনও কখনও পান্নাও এসে তাদের খেলায় যোগ দিত। কোনদিন রানী, কোনদিন পান্না হত নিঝুমপুরের রাজকন্যা। নীলু হত রাজপুত্র—ঘোড়া ছুটিয়ে টগ্‌বগিয়ে যাবে সেই রূপবতী রাজকন্যাকে নিঝুমপুর থেকে উদ্ধার করে আনতে, রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র কোতোয়ালপুত্র, তিনজনে তিনদিক চলে যেত। রাজকন্যা কোন্ নৌকায় আছে কেউ জানে না। যে যেদিন রাজকন্যার দেখা পাবে, রাজকন্যা সেদিন তার; রাজকন্যাকে পাশে নিয়ে সে সেদিন সিংহাসনে বস্‌বে। সিংহাসনটা ছিল নৌকার অতি বৃহৎ হালের অংশবিশেষ।

কিন্তু একদিনের এক দুর্ঘটনায় অভিভাবকদের শাসনে নিঝুমপুরের গড় তাদের কাছে চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেল। একটা খড়ের নৌকার মাঝিমোল্লাদের ভেতরে কি কারণে যেন ঝগড়া হল! তাদের একজন শত্রুতাবশে খড়ের মাঝে জলন্ত অঙ্গার পুরে তার উপর খড় সাজিয়ে রেখে গেল গভীর রাতে। খড় দাউদাউ করে জ্বলতে পারে নি কিন্তু রাতভোর ধিকিধিকি করে জ্বলল। পরের দিন সকালে শত্রুলোকটা যখন খড়ের গাদার উপর চড়ে নতুন খড় সাজাতে যাবে বলে উপরে উঠেছে, সেই মুহূর্তে সে খড়ের তলায় তলিয়ে গেল। খড়ের ভেতর তখন গন্‌গনে আগুন। লোকটার জীবন্তে অগ্নিসমাধি হয়ে গেল।

সে নিয়ে দারুণ হৈ চৈ পড়ে গেল। থানা থেকে দলবল নিয়ে বড়বাবু এলেন। মাঝিমোল্লাদের কয়েকজনকে বেঁধে নিয়ে গেলেন। তারপর কি সব যেন হল, নীলু জানে না। কিন্তু নিঝুমপুরের গড় তাদের কাছে রুদ্ধ হয়ে গেল।

ওদিকে শৈলমামা কলকাতা থেকে নীলুর নতুন ক্লাসের নতুন বই সব এনেছেন। নীলু বইগুলো হাতে নিয়ে দমভরে ঘ্রাণ নিল তাদের। আঃ, কি মিষ্টি গন্ধ—যেন নলেন গুড়ের মৌ মৌ গন্ধ-টার মত! ইস্কুল খুলে গেল। নীলু তার নির্দিষ্ট বেঞ্চিতে বসতে গিয়ে দেখে শুধু রানী নয়, পুলিন ও কালা একই বেঞ্চিতে তার সঙ্গে বসেছে। কালা পাশ করেছে, পুলিন ফেল করেছে। চার বন্ধু এবার এক হয়ে একাকার হয়ে গেল!

নীলু আর কালা ভাবে, পাশ করে নতুন ক্লাশে উঠতে কি মজা! কিন্তু রানী ও পুলীন ভাবে, ফেল করে বা পরীক্ষা না দিয়ে পুরাতন ক্লাশেই বা রয়ে যেতে মজাটা কম কিসে? যেখানে আনন্দ পাওয়াই একমাত্র লক্ষ্য সেখানে লাভ-লোকসান খতিয়ে, দেখে কে?

কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই এ কি সর্বনাশের কথা শুনল তারা! ইংরাজীমাষ্টার ভূপতি মিশ্র নাকি তাদের মানসাংক করাবেন সপ্তাহে দুদিন করে। ঐ দুদিন ইংরাজী-মাষ্টার সকালে আসবেন, বিকেলে নয়। বিকালে নাকি কোন্ এক ডাক্তারখানায় রোগী দেখবেন।

ইংরাজী-মাষ্টার যে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার তা নীলু জানে। তিনি তিন মাইল দূরের পাশের গ্রাম থেকে রোজ সাইকেলে চড়ে আসেন। কখনও কখনও তাঁর গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলে থাকতেও তারা দেখে। সেদিন হয়ত আসার আগে কোথাও রোগী দেখে আসেন।

ইস্কুলে আরও তিনজন মাষ্টারমশাই আছেন। কিন্তু বেশভূষায়

ইংরাজী-মাষ্টার তাঁদের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র—অনন্যও। বড় পণ্ডিতমশাই কোন কালেই জামা বা গেঞ্জি ব্যবহার করেন না। শীতকালে বড় জোর তিনি কাপড়ের কোঁচাটা খুলে গায়ে জড়ান। তাঁর রং গৌরবর্ণ, গায়ে চর্বির লেশমাত্র নেই। কোমরের কাপড় তিনি কোনদিনই এঁটে পরেন না। তাই কাপড় নাভির অনেক নীচে পরা থাকে। কেউ কোনদিন তাঁর কাপড়কে ঐ অবস্থা থেকে একচুল উপরে উঠে যেতে বা একচুল নীচে নেমে আসতে দেখে নি। কি ভাবে আর কি কায়দায় তিনি যে অমনভাবে কাপড় পরতে পারতেন তা কেউ ভাবতে পারত না। বড়দা ঠাট্টা করে বলতেন—বড় পণ্ডিতের কাপড় পরা পৃথিবীর নবম আশ্চর্য।

ছোট পণ্ডিতমশাই-এর ধুতি হাঁটুর একটু নীচে নামানো। শীতকালে তিনি গায়ে কোনদিন একটা ফতুয়া চাপাতেন। তাও যত শীতই পড়ুক বড় পণ্ডিতমশাই গায়ে কোঁচা না জড়ালে ছোট পণ্ডিতমশাই-এর ফতুয়া তাঁর কাঁধে পড়ে থাকবে; তিনি সেটিকে গায়ে চাপাবেন না। অন্য সব সময় তাঁর খালি গা। জামা নাকি তাঁর একটা আছে কিন্তু তাঁকে সেটি পরতে কেউ দেখে নি। কোনদিন কোথাও যেতে হলে তিনি নাকি জামাকে কাঁধের উপর ফেলে যান। পায়ে জুতো থাকে না। অন্য কোথাও যেতে হলে নাকি তিনি চটিজোড়াও সঙ্গে নিয়ে যান—তবে পায়ে দিয়ে নয়, বগলে চেপেই নিয়ে যান। এ সব অবশ্য নীলুর শোনা কথা। সে কোন দিন তাঁর জামা জুতো দেখে নি। মাঝে মাঝে বৃষ্টি-বর্ষার দিনে তিনি একটা ছাতা অবশ্য নিয়ে আসেন। সে ছাতা এককালে হয়ত কালো রঙের ছিল কিন্তু তার তালির সংখ্যা এত হয়ে গেছে যে, এখন তা কোন্ রঙের তা'বলা শক্ত। বড় দা'বলেন—ছোট পণ্ডিতমশাই-এর রং-বাহার ছাতা,—ঠিক যেন মাথায় একটা পাতাবাহার গাছ দিয়ে চলেছেন।

ওরই মধ্যে সুরেশ পণ্ডিত একটু যা ধোপদুরস্ত। বয়সে তিনি নবীন এঁদের তুলনায়। তাঁর কাপড় হাঁটুর বেশ কিছুটা নীচেই

নামান থাকে, যদিও তা পায়ের পাতা স্পর্শ করে না। কাপড়ও মোটা, কোরা কিন্তু মোটামুটি পরিষ্কারই থাকে। তবে গরম বোধ হলে খুলে রেখে খালি গায়েই পড়াতে বসেন।

কিন্তু ইংরাজী মাষ্টার ভূপতি মিশ্র একেবারেই আলাদা। ময়লা কাপড়চোপড় তিনি কখনই পরতেন না। তাঁর ধুতি ছিল মিলের তৈরী অতি মিহি, ধোলাই করা। গরমকালে হাফশার্ট এবং শীতকালে ফুলশার্ট। ধুতি মালকোচা মেরে শার্টের উপরই পরা থাকত। শীতকালে হাতকাটা সোয়েটার ও গলায় কম্ফটর জড়িয়ে আসতেন। জামার বোতাম কোনদিনই লাগানো থাকত না। ভেতর থেকে দামী জালের মত ফুটো ফুটো গেঞ্জি উঁকি মারত। ঐ রকম গেঞ্জি ইংরাজী-মাষ্টার ছাড়া আর কাউকে পরতে নীলু দেখে নি। গরমকালে কোনদিন পাঞ্জাবী পরেও আসতেন। তার বোতাম ছিল সোনার—সোনার চেন দিয়ে বাঁধা। হাতে ছিল একটা সোনার তাবিজ, কালো সুতো দিয়ে বাঁধা ও কব্জীতে ঘড়ি। পায়ে থাকতো দামী নাগ্রা জুতো। দু'হাতে দুটো আংটি তিনি পরতেন। একটাতে ছিল সাদা পাথর ও অপরটাতে লাল। লাল পাথরটাকে মনে হত ঠিক যেন বেদানার দানা।

অত্যন্ত রূপবান যুবাপুরুষ ছিলেন তিনি। গায়ের রং দুধে আল্তা। মাথায় ঘন কালো কোঁকড়ানো চুলের মাঝামাঝি সিঁথি-কাটা—সুবিন্যস্ত। গোলগাল চেহারা এবং পেশীবহুল সুগঠিত স্বাস্থ্য। শরীর থেকে সব সময় একটা হাল্কা মৃদু সুগন্ধ ভেসে আসত। রোজই বোধ হয় গোঁফদাড়ি কামাতেন। বড়দা ঠাট্টা করে বলতেন—কার্ত্তিক।

ইস্কুলে ছেলেদের গোলমাল এবং চেঁচামেচি, এমনকি মাষ্টার মশাইদের জোরে জোরে পড়ানো তিনি একদম পছন্দ করতেন না। এসে তিনি সাইকেল নিয়ে ইস্কুলের বারান্দায় উঠে পড়তেন। তারপর খুব জোরে কয়েকবার বেল বাজাতেন। সেই শব্দ ছেলেদের কানে তখন মৃত্যুর ঘণ্টা হয়ে বাজত। ছেলেরা চেঁচামেচি তো দূরের কথা, পড়তেও পর্যন্ত ভুলে যেত।

তাঁর ছাত্ররা ঐ বেল বাজানোর শব্দে উঠে দাঁড়াত এবং পাশের ঘরে চলে যেত তাঁর কাছে পড়ার জন্য। তারপর তিনি বারান্দায় সাইকেল রেখে দু-ঘরের মাঝখানটিতে এসে দু'হাত কোমরে দিয়ে বীরবিক্রমে দাঁড়াতেন এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে চারদিক পর্যবেক্ষণ করতেন। কেউ সাহস করে মুখ তুলে তাকাতে পারত না। তখন বড় পণ্ডিতমশাই পর্যন্ত খুব নীচু স্বরে কথা বলতেন—এতই সম্মান প্রতিপত্তি এবং দাপট ছিল তাঁর!

তারপর জুতোর শব্দ তুলে তিনি যখন ইস্‌কুল ঘর কাঁপিয়ে নিজের ঘরে যেতেন তখন তাঁর পদশব্দ সকলের কাছে সাইরেনের 'অল-ক্লিয়ার' বলে মনে হত। সকলে আবার সহজ হবার চেষ্টা করত কিন্তু যতক্ষণ ইংরাজী মাষ্টার ইস্কুলে থাকতেন ততক্ষণ কেউ পুরোপুরি সহজ হতে পারতেন না—না ছাত্র-ছাত্রী, না অন্যান্য পণ্ডিত-মশায়েরা।

অন্যের চেঁচামেচি পছন্দ না করলেও তিনি নিজে কিন্তু অত্যন্ত চীৎকার করে পড়াতেন। প্রবল আসুরিক শক্তিতে তিনি ছেলেদের উপর বেত চালাতেন। এ ব্যাপারে অনেক সময় তাঁর কাণ্ডজ্ঞান থাকত না। মেয়েদের পিঠে বিশেষ বেত না মারলেও চুল ধরে যে জোরে নাড়া দিতেন, তার চেয়ে বেত বোধ হয় ভাল ছিল। রাগের সময় তিনি শুধু ইংরাজীই বলতেন। কদাচিৎ হয়ত দু' চারটে বাংলা শব্দ বেরিয়ে আসত—তাও ইংরাজী বলার কায়দায়।

ইংরাজী জানতেন বলে এটুকু সম্মান তাঁকে সকলেই দিত। অন্য পণ্ডিতমশাইয়েরা দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না—তাঁরা নিজেদের তাঁর কাছে করুণার পাত্র বলে মনে করতেন। ইংরাজী পড়াবার মাষ্টার চট্ করে পাওয়া যায় না। অতএব তিনি না পড়ালে ইস্‌কুলেরই ক্ষতি। তাই পণ্ডিতমশায়েরা সকলে নীরবে তাঁর দাপট সহ্য করতেন। ইস্‌কুল পরিদর্শনে যখন ইন্‌স্‌পেক্টার আসতেন তখন তিনি কেবল মাত্র-ইংরাজী মাষ্টারের সঙ্গেই কথা বলতেন।

এ হেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরাজী-মাষ্টার নীলুদের মানসাংক করাবে, এটা অত্যন্ত ভয়ের কথা বৈ কি!

বেরাদের বাড়ীর সলিল ইস্কুলে একটা জিনিস প্রায়ই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে। এত বেশীবার পড়ে যে, শুনে শুনে নীলুর তা মুখস্থ হয়ে গেছে। জিনিসটি হল—'অকার কিংবা আকারের পর অকার কিংবা আকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়। ঐ আকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা, রত্ন ও আকার সন্ধি করিলে হয় রত্নাকর।'

এই সলিল ইংরাজী পড়ার সময় ইংরাজী-মাষ্টারের হাতে প্রায়ই মার খেত। তখনও ইংরাজী-মাষ্টার নীলুদের মানসাংক পড়ানো শুরু করেন নি। সেই সময় একদিন পাশের ঘর থেকে ইংরাজী-মাষ্টারের প্রচণ্ড হুংকার শোনা গেল—তুই শুধু সন্ধি পড়িস্, না? আজ তোর সন্ধিবিচ্ছেদ করাব, তোর কাঁধ আর হাতের সন্ধিহাড় আমি আলাদা করে দেব।

নীলু সভয়ে তাকিয়ে দেখে ইংরাজী-মাষ্টারের হাতের কাঠের রুলটা ভীষণ মুদ্গরের মত উপরে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে মুদ্গরের পতনমাত্রেই সলিল কাটা গাছের মত মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু সলিল যে কোন সাড়াশব্দ করছে না।

সবাই বুঝল, সলিল জ্ঞান হারিয়েছে। কিন্তু ইংরাজী-মাষ্টারের বিনা অনুমতিতে সজ্ঞানে সলিলের সেবা করার জন্য কে যাবে? অমন বুকের পাটা কার? ইংরাজী-মাষ্টার কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে সলিলের দিকে চেয়ে চট্ করে টেবিলের উপরে রাখা তাঁর স্টেথোস্কোপ তুলে নিয়ে সলিলের বুকে চেপে ধরে পরীক্ষা করলেন। তারপর স্টেথোস্কোপ রেখে দিয়ে তার নাড়ী পরীক্ষা করেন। তারপর কাঁধ টিপে পরীক্ষা করলেন। কাঁধে চাপ দিলেন কিন্তু সলিল কোন শব্দ করল না।

তখন ইংরাজী-মাষ্টার গম্ভীরমুখে বললেন—নাঃ, বোন্-ফ্যাকচার হয় নি, শুধু সেন্স লষ্ট করেছে। এ্যাই, কে আছিস্ জল নিয়ে আয়, এর চোখে মুখে দে।

ইংরাজী-মাষ্টারের আহ্বানে অনেকে দৌড়িয়ে গিয়ে জল নিয়ে এল। দেখতে দেখতে সলিল ও ইংরাজী-মাষ্টারকে ঘিরে ছেলেদের ভীড় জমে গেল। পণ্ডিতমশায়েরাও ছুটে এলেন ইংরাজী মাষ্টারের অনুমতি পেয়ে।

কিন্তু ইংরাজী-মাষ্টার সকলকে মাছি তাড়াবার মত তাড়াতে লাগলেন। বল্‌তে লাগলেন—এয়ার, এয়ার।

একজন ছুটে গিয়ে একটা চেয়ার এনে ফেলল। তা' দেখে ইংরাজী-মাষ্টার দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ছেলেটিকে বলে উঠলেন—ষ্টুপিড্, এয়ার মানেও জানিস্ না? বাতাস রে বাতাস। সর্ সর্। রোগীর দমবন্ধ হয়ে যাবে। সর্।

ভীড় পাতলা হয়ে গেল। একটু পরে সলিলও সুস্থ হয়ে উঠে বসল।

সলিলকে কেন ইংরাজী-মাষ্টার রোগী বললেন, তা নিয়ে ইস্কুল থেকে ফেরার পথে নীলুদের মধ্যে কথাবার্তা হল। পুলিন বলল—ডাক্তার যাকে দেখে, সে তো রোগী।

নীলু এবারে ইংরাজী-মাষ্টারের সলিলকে রোগী বলার অর্থ ধরতে পারে। ইংরাজী-মাষ্টার যাকে মেরেছিলেন সে হল ছাত্র কিন্তু ডাক্তার ভূপতি মিশ্র তো রোগীকেই দেখবেন।

কয়েকদিন পরে সকালবেলায় প্রথম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের যমঘরে ডাক পড়ল। সলিল সেদিন ওঘরে জ্ঞান হারাবার পর ছেলেরা ওঘরের নাম দিয়েছে যমঘর। নীলুরা সকলে বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে যমঘরে হাজির হল।

ইংরাজী-মাষ্টার প্রথমে একজনকে কিছু প্রশ্ন করতেন। সে বলতে না পারলে দাঁড়িয়ে থাকবে। তার পরের জনকে তখন তিনি ঐ প্রশ্নের উত্তরটা দিতে বলবেন। সে যদি না বলতে পারে তবে সেও দাঁড়িয়ে থাকবে। যে বলতে পারবে, সে আগে দাঁড়িয়ে থাকা সকলের কান মলে দেবে। তারপর সকলে বসবে। মেয়েরা এভাবে যখন ছেলেদের কান মলার অধিকার পেত তখন ভারী

মজা হত। একদিন বুঝি কালা রানীর হাতে কানমলা খেতে চায় নি, তাই দেখে ইংরাজী মাষ্টার এসে কালার ছু'কান এমন আদর করে মলে দিয়েছিলেন, যে আর কেউ বিদ্রোহী হতে সাহসী হয় নি। ছেলেরা বুঝেছিল, ইংরাজী-মাষ্টারের পরুষ হস্তের তাড়নার চেয়ে সঙ্গিনীর কোমল হস্তের লাঞ্ছনা ঢের ভাল। আবার একদিন বুঝি কোন্ মেয়ে কোন্ ছেলের কান না মলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন ইংরাজী-মাষ্টার সেই মেয়েটির মাথায় এমন এক গাট্টা বসিয়ে দিয়েছিলেন যে, মেয়েরা বুঝে গিয়েছিল—ইংরাজী-মাষ্টারের রাজত্বে নিয়মভঙ্গ করা চল্‌বে না!

ক্রমে এটাই দাঁড়িয়ে গেল নিয়ম। পরে এই নিয়মটা হয়ে দাঁড়াল সকলের কাছে এক খেলা। যমঘরের থেকেও এ খেলাটা তাদের কাছে বেশ উপভোগ্য ছিল। কিন্তু একদিন খেলাটা বড় মারাত্মক হয়ে দাঁড়াল। ইংরাজী-মাষ্টার একদিন এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসলেন। তিনি ছু'হাতের পাতা উল্‌টিয়ে অর্দ্ধবৃত্তাকারে ঘুরাতে ঘুরাতে প্রশ্ন করলেন—আমি এতগুলো টাকা নিয়ে বাজারে গিয়েছিলাম। তারপর একটু থেমে শুধু একহাত পূর্ব্ববৎ দেখিয়ে বললেন—এতগুলো টাকা খরচ করলাম। পরে ছুহাত নামিয়ে বললেন—বল্‌ তো কত রইল?

ছেলেরা ধরল, ছুকাঁড়ি টাকা নিয়ে তিনি বাজারে গিয়েছিলেন। এক কাঁড়ি খরচ করলেন। অতএব আর এক কাঁড়ি রইল। এখন সে কাঁড়ির মধ্যে কত থাকতে পারে তা কে জানে?

আসলে তিনি ছু'হাতের দশ আঙ্গুল দেখিয়ে বলতে চেয়েছিলেন, তিনি দশ টাকা নিয়ে বাজারে গিয়েছিলেন। পাঁচ টাকা খরচ হল। অতএব উত্তর হবে, পাঁচ টাকা রইল। কিন্তু প্রশ্ন করার ধরণে কেউ সেদিন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নি। অতএব সকলেই দাঁড়িয়ে রইল।

এবারে কানমলা দেবার পালা ইংরাজী-মাষ্টারের নিজেরই। তিনি এগিয়ে এলেন। নীলু এর আগে কোনদিন ইংরাজী-মাষ্টারের

হাতে মার খায় নি। ইংরাজী-মাষ্টারের এত ভয়াল সান্নিধ্যেও তাকে দাঁড়াতে হয় নি। তিনি কাছে আসতেই নীলু ভয়ে আধমরা হয়ে গেল। তারপর যখন তিনি তার কানে হাত দিলেন তখন ভয়ে সে প্যান্ট নোংরা করে ফেলল।

এ দৃশ্যে সবাই চাপা হাসি হেসে উঠল। ইংরাজী-মাষ্টারও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য ভুলে হেসে উঠলেন। নীলুর সব চেয়ে খারাপ লেগেছিল রানী হেসেছিল বলে। লজ্জায় তার মনে হয়েছিল, এর চেয়ে যদি সলিলের মত জ্ঞান হারাতে পারত, তা' হলে ভাল হত।

ইংরাজী-মাষ্টার অবশ্য উত্তরটা তারপর বলে দিয়েছিলেন।

নীলুর মনে আছে, সেদিন ইস্‌কুল থেকে ফেরার পথে ভালো করে কারোর সঙ্গে সে কথা বলতে পারে নি। এক নিদারুণ অপমানজনিত নিরুদ্ধ বেদনা নিয়ে সে বাড়ী ফিরেছিল। মাকে বলার সময় তার কথাগুলো আটকিয়ে যাচ্ছিল। সে লজ্জায় বলতে পারে নি যে, রানীরা তার দুরবস্থা দেখে হেসেছিল। কিন্তু কথা বলার সময় খুব কেঁদেছিল। ছেলের কান্না দেখে রমলা বুঝেছিলেন, ইংরাজী-মাষ্টার অমানুষিক শক্তিতে ছেলের কান মলেছে। রমলা তাই নীলুকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—আচ্ছা, তোর মাষ্টারকে দেখ্‌ছি দাঁড়া। আসুক সে একবার।

ইস্‌কুলের বদ্ধ পরিবেশের একঘেয়েমির মধ্যে রয়টার ভূতনাথ ভূইঞা ছিল মুর্ত্তিমান মুক্তির দেবতা। তার কাজই ছিল খবরের কাগজ পড়ে এবং গ্রামের এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে খবর জোগাড় করা এবং সেগুলিকে আবার নিজস্ব কায়দায় রং চড়িয়ে বা ধোপদুরস্ত করিয়ে সরসে পরিবেশন করা।

তাকে ইস্‌কুলের সামনে দিয়ে যেতে দেখলেই বড় পণ্ডিত-মশাই হাঁক দেবেন—ও ভূতুবাবু, আসুন, তামাক খেয়ে যান।

রয়টার ইস্‌কুল ঘরে ঢুকত আর ছেলেরা পড়া ভুলে গিয়ে মুর্তিমান খবর কাগজের দিকে তাকিয়ে থাকত। পণ্ডিতমশায়েরাও

পর্যন্ত পড়ানো ভুলে আগ্রহ সহকারে রয়টারের বাণীর প্রতীক্ষা করতেন। তার কাছে নানা দেশ-বিদেশের মজার মজার কথা ও খবর শোনা যেত। দেশের কথা বলার সময়ও তার সাথে বিদেশের কথা জুড়ে দিতই।

ঐ সময় কালার ডাক পড়ত তামাক সাজিয়ে আনার জন্য। কালা খবর শোনার চেয়ে তামাক সেবনকে অধিকতর প্রিয় জ্ঞান করত। তবে রয়টারের গল্প শোনার কিছুটা আগ্রহ তারও ছিল। তাই সে সেদিন কামারশাল থেকে বেশ তাড়াতাড়ি ফিরত।

বড় পণ্ডিতমশাই বলেন—বলুন ভূতুবাবু, কি লিখেছে আজ কাগজে ?

অমনই খবর শুরু হয়ে যেত। হাওড়ায় মস্ত পুল হবে। সেটা নাকি বাতাসে ভেসে থাকবে। সেটা তৈরী করার জন্য বিলেত থেকে মিস্ত্রি আসবে। বিলেতের রাজা নাকি গান্ধীকে বলেছেন যে, গান্ধী যদি দেশের মধ্যে আন্দোলন তুলে নেন তবে তাঁকে চার্চিলের জায়গায় প্রধান মন্ত্রী করে দেবেন। এই রকম সত্যি-মিথ্যে মেশান নানা খবর ও খোশগল্প চলত কিছুক্ষণ।

রয়টার কংগ্রেসের আন্দোলন সম্বন্ধে নানা খবরই পরিবেশন করত। একবার শোনাল, গান্ধীজী নাকি বিলেতের গোল-টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে গিয়ে ছিলেন।

বড় পণ্ডিতমশাই প্রশ্ন করলেন—গোল কেন ? টেবিল তো চারকোনাই হয় জানি।

রয়টার সবজান্তার হাসি হেসে বলে—ব্রিটিশ পলিসি, বুঝলেন কিনা পণ্ডিতমশাই, এ ব্রিটিশ পলিসি—বড় সাংঘাতিক জিনিস ! গান্ধীজীর বসা নিয়েই গোল দেখা দিয়েছিল। মুশকিল হয়েছিল গান্ধীজী ও রাজার বসা নিয়ে, কে বসবেন মাঝে ? শেষে গোল টেবিল বানিয়ে কৌশলে সমস্যার সমাধান করে ফেলল ব্রিটিশের বাচ্চারা। হুঁঃ, ব্রিটিশ পলিসি বলে কথা !

তারপর রয়টার বলে যায়—সেই গোল টেবিলে রাজা, রানী,

লাটবাহাদুরেরা সব রয়েছেন। গান্ধীজী এসে চেয়ারে বসলেন না। চেয়ার নাকি তাঁর উপযুক্ত নয়। তাই তিনি বৈঠক বর্জন করে চলে এলেন।

এরকম নানা কাহিনী নিজস্ব কায়দায় পরিবেশন করত রয়টার।

সেবার শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছিল। সকলের মুখে ছিল শীতের কথা। শীতের জন্য বিকেলের দিকে তাড়াতাড়ি ইস্কুল ছুটি হয়ে যেত। কেন যে এত শীত পড়ল হঠাৎ, তা লোকে ভেবে পেল না।

সেই সময় একদিন রয়টার নিজেই ইস্কুলে এসে জানিয়ে গেল প্রচণ্ড শীত পড়ার কারণটা। হিমালয় পর্বত আমাদের দেশের উত্তরে রয়েছে বলে এ দেশে শীত কম। না হলে চীন দেশ থেকে ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে আসত। তখন এদেশেও বরফ পড়ত। তাহলে সাহেব মেমদের এ দেশে থাকতে এত কষ্ট হত না। সেই বাতাস এবারে হু হু করে চীন দেশ থেকে ভেসে আসছে।

ছোট পণ্ডিতমশাই প্রশ্ন করলেন—এর কারণ কি ভূতুবাবু?

রয়টার বলে—কারণটা আজকের খবরের কাগজে দিয়েছে। এই মাত্র গোস্বামীদের বাড়ীর দৈনিক বসুমতীতে পড়ে এলাম। হিমালয় পর্বত দু'ইঞ্চি মাটির নীচে বসে গেছে। তাই ঠাণ্ডা হাওয়া হু হু করে চলে আসছে চীন দেশ থেকে।

সকলে শীতের ভয়ে শংকিত হয়ে উঠল। রয়টার আরও ভয় ধরিয়ে দিয়ে বলে যায়—বিজ্ঞানীরা বলেছেন, প্রত্যেক বছরই এরকম করে হিমালয় পর্বত বসছে, বসবে। পৃথিবীটা নাকি সব সময় কাঁপছে। তাই নাকি ওরকম হচ্ছে।

ইস্কুল ঘরে একটা শীতের শীতল ছায়া নামে। সকলের মুখ-চোখ আতংকে শুকিয়ে যায়। তাহলে এ দেশেও শীঘ্র বরফ পড়বে। সকলকে সব সময় গরম জামাকাপড় পরে থাকতে

হবে। ও সব করার পয়সা কোথায়? পণ্ডিতমশায়েরা বেশী বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

গল্প শেষ করে, তামাক খেয়ে রয়টার লম্বা লম্বা পা ফেলে সাদা চাদর মাথায় মুড়ি দিয়ে ইস্কুল ছেড়ে বেরিয়ে যায়। আর পেছনে ইস্‌কুল ঘরের মধ্যে রেখে যায় আসন্ন মৃত্যুর শীতল ছায়া। নীলু দেখছে, রয়টার চলে যাচ্ছে। তার মাথায় সাদা-পাকা চুল, তার সারা শরীর সাদা চাদরে ঢাকা। নীলুর মনে হয়, হিমালয়ের তুষার মানব বুঝি শীতের তুহীন ছায়া ফেলে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে।

নীলু একটা জামা পরে এসেছিল। তার গায়ে চাদর ছিল না। রয়টারের গল্পের জন্য সেদিন একটু দেরীতেই ইস্‌কুল ছুটি হয়েছিল। বাইরে বেরিয়ে আসতে নীলুর খুব শীত করতে লাগল। চারদিকে একটা ধোঁয়াশা। রানীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বোষ্টমদের বাড়ী পার হয়ে এল। ছোট পণ্ডিতমশায়ের বাড়ীর সামনের কৃষ্ণচূড়ার গাছটার কাছে আসতেই পিছনের মিশ্রদের বাঁশবনে সূর্য হারিয়ে গেল। সন্ধ্যা হয়ে এল। শীতও চেপে এল।

নীলু শীতে কাঁপতে লাগল। শীতে তার দাঁতে দাঁত লেগে ঠক্‌ঠক্ শব্দ হচ্ছিল। রানীর গায়ে ছিল একটা চাদর। চাদরে শীত যেমন জব্দ, অমন আর কিছুতে নয়। রানী নীলুকে তার চাদরের একপাশটা গায়ে জড়িয়ে নিতে বলে। নীলু ও রানী একই চাদর গায়ে জড়িয়ে জড়াজড়ি করে পথ চলতে থাকে।

নীলু বেশ আরাম বোধ করে। চাদরের ভেতরেই সে রানীর গায়ে হাত রেখে বলে—তোর গাটা বেশ গরম।

রানীও বলে—তোর গাটাও বেশ গরম রে।

উভয়ের উষ্ণ সান্নিধ্যে উভয়ের শীত ভাবটা কেটে যায়। নীলুর মনে হতে থাকে, আসুক না সে কত বড় শীত, পড়ুক না সে কত বরফ—সে ভয় করে না। যেখানে রানী তার সাথে আছে সেখানে তার শীতের ভয় কি? রানী পাশে থাকলে সে

স্বচ্ছন্দে হিমালয়ের বরফগলা চূড়ায় উঠতে পারে। সেই মুহূর্তে তার মনে হয়, রানীকে ছেড়ে সে কোনদিন থাকতে পারবে না। এমনই শরীরে শরীর লাগিয়ে, হাতে হাত দিয়ে, বড় হয়ে তারা একদিন চীনের বরফের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে।

ঘরে ফিরে দেখে, সেদিন পুলিপিঠে হচ্ছে। সেদিন আর খেলতে যাবার সময় ছিল না। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে রান্না-ঘরে উনানের পাশে গিয়ে বসল। উনানের তাপটা রানীর দেহের তাপের মত মিষ্টি লাগল তার। মায়ের দেওয়া গরম গরম পুলি-পিঠে অনেকগুলো সে বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল।

তার খাওয়া শেষ হয়ে আসছে, এমন সময় ইংরাজী-মাষ্টার 'বৌদি' বলে রান্নাঘরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে নীলু যেন ভূত দেখল। বাকীটুকু ফেলে রেখেই দৌড়িয়ে পালিয়ে গেল। রান্নাঘরের পাশে চালের মরাইটার আড়ালে অন্ধকারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থেকে ভয়ে সে অত শীতের মধ্যেও যেন ঘামতে লাগল। ওখান থেকে মা ও ইংরাজী মাষ্টারের কথাগুলো স্পষ্ট সে শুনতে পেল।

ইংরাজী-মাষ্টার বলছেন—বৌদি একটু চা। নীলু খাওয়া ফেলে অমন করে পালিয়ে গেল যে?

রমলা বললেন—তোমাকে দেখে। তুমি ছেলেকে মেরেছ সেদিন। আজ তুমি কত বড় মাষ্টার দেখব আমি। তোমার কান মলব আজ।

ইংরাজী-মাষ্টার সকাতরে বললেন—বৌদি, আর কোনদিন হবে না, বৌদি! এই আমি কান ধরছি। আমার ঘাট হয়েছে। আর কোনদিন হলে তুমি আমার কান ছিঁড়ে দিও।

রমলা হেসে বলেন—ঠিক?

ইংরাজী-মাষ্টার বলেন—ঠিক, ঠিক, ঠিক। এখন একটু চা দাও। ওঃ, যা শীত পড়েছে! হাড়ের ভেতরেও যেন কাঁপুনি লেগেছে। রোগী দেখতে এদিকে এসেছিলাম। বড্ড শীত করল। ভাবলাম, বৌদির হাতে এক গেলাস চা খেয়ে যাই।

রমলা পিঁড়ি এগিয়ে দিয়ে বললেন—বস। চা করি।

ইংরাজী-মাষ্টার শাল মুড়ি দিয়ে বসলেন। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে কুণ্ঠিতভাবে বললেন—কই, নীলু তো এল না, বৌদি ?

রমলা জবাব দেন—ও এখন আসবে না। তোমাকে ও যমের মত ভয় করে।

কিন্তু নীলু তখন মরাই-এর আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে। ভয়টা কে কাকে বেশী করে—সে ইংরাজী-মাষ্টারকে, না, ইংরাজী-মাষ্টার তার মাকে ? নীলু ভেবে পেল না, যাঁর দাপটে সারা ইস্কুল ঘর কাঁপে, পণ্ডিতমশায়েরাও কাঁপেন, সেই লোক তার মায়ের সামনে অমন শিশুর মত হয়ে গেল কি করে। মা কি বেশী ইংরাজী জানে ? ইংরাজী যে জানে তার দাপট বেশী, এ ধারণা তো তার হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবে, মা তো ইংরাজী জানেই না।

হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় মেজজেঠার কথা। তিনি বলে-ছিলেন, চণ্ডী হলেন শক্তি আর প্রত্যেক নারী হল সেই শক্তির অংশ।

নীলু ভাবে, মা তো চণ্ডীই। ইংরাজী-মাষ্টার যতই ইংরাজী জানুক, চণ্ডীর সঙ্গে পারবে কেন ?

॥ আট ॥

নীলুদের ছোটবেলায় গ্রামে রেলগাড়ী ছিল না। বাস, ট্যাক্সিও রাস্তায় দেখা যেত না। ওদিকে গরুর গাড়ীর চলও তেমন ছিল না প্রায়। মাঠ থেকে কৃষকেরা ফসল খামারে বয়ে আনত মাথায় করে। এক একজন এক পণ, দেড় পণ পর্যন্ত বিচালী মাথায় বয়ে নিয়ে আসতে পারত। তাদের দেখে নীলুর মনে হত, এক একটা ছোট্ট খড়ের নৌকা বুঝি ডাঙ্গায় চলে বেড়াচ্ছে।

মাঠ থেকে ফসল তোলার মরশুমে তারা ছেলের দল গরুচরার মাঠে ধানের শীষ্ কুড়াত। ফসল কেটে নেবার পরও মাঠে প্রচুর ধানের শীষ্ পড়ে থাকত। এক একজন একদিন পাঁচ-সাত সের ধানের শীষ্ কুড়িয়ে আনত। নীলুও কুড়াতে যেত কতকটা খেলার ছলে। সে চিড়ে ভাজা নারকেল দিয়ে খেতে খুব ভালবাসত। মা তাই ছুতোর বৌকে ডেকে নীলুর কুড়িয়ে আনা ধানের শীষ্গুলো দিয়ে দিত। ছুতোর বৌ কিছুদিন পরে মাকে কিছু চিড়া এনে দিয়ে যেত। নিজের উপার্জিত এই চিড়া নীলুর খেতে কি যে ভাল লাগত।

নীলু রেলগাড়ী তো দূরে কথা, বাস পর্যন্ত দেখে নি কোনদিন। তার বাবা, শৈলমামা ও গ্রামের দু চারজন কাঁথি, খড়্গপুর, বেলদা, এগরা, মেদিনীপুর, তমলুক, কোলকাতা, এসব জায়গায় যায়। গ্রাম থেকে সবাই পায়ে হেঁটে বার হয়। কালিগ্রামে রসুলপুর নদী পেরিয়ে তারা কাঁথির বাস ধরে। ঐ পথে এগরা, বেলদা, খড়্গপুর ও মেদিনীপুর যাওয়া যায়। আবার

নরঘাটে হল্‌দী-নদী পেরিয়ে বাসে তমলুক যাওয়া যায়। তমলুক থেকে পাঁশকুড়া। পাঁশকুড়াতে ট্রেন লাইন পড়ে। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে গেলে কোলকাতায় যাওয়া যায়। শৈলমামার কাছে নীলু শুনেছে, পাঁশকুড়া তাদের শাপলা থেকে ৪৫ মাইল।

সে কত দূর?—নীলু মনে মনে হিসাব কষে। হরিপুর তাদের বাড়ী থেকে দু মাইল। এখানে এসে লোকে পায়ে হেঁটে দক্ষিণদিকে পাঁচ মাইল দূরের কালিগ্রামে যায়, আবার উত্তর দিকে বার-তের মাইল গেলে পড়ে নরঘাট। হরিপুর বেশ বড় এবং বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে হাই ইস্‌কুল আর পোষ্ট অফিস আছে। নীলু জানে, বড় হয়ে হাই ইস্‌কুলে পড়তে তাকে এই হরিপুরেই আসতে হবে। হরিপুর দু মাইল দূর হলে, পাঁশকুড়া তবে অনেক, অনেক দূর। ৪৫ মাইল পথ অনেকটা। না, নীলু ঠিক কল্পনা করতে পারে না।

অবশ্য শৈলমামা এবং বাবা সাধারণতঃ তালপুকুরিয়া হয়ে কোলকাতায় যান। তালপুকুরিয়া শাপ্‌লা থেকে তের মাইল। ক্যানেলের উপর দিয়ে নৌকায় চড়ে তালপুকুরিয়া যাওয়া যায়, আবার হেঁটেও যাওয়া চলে। সেখান থেকে মাইল দশেক হেঁটে বা নৌকায় মহিষাদল এবং একইভাবে আরও পাঁচ মাইল গেলে পড়ে গেঁয়োখালি। গেঁয়োখালি থেকে নৌকায় চেপে বাহার গাং পেরিয়ে ডায়মণ্ড হারবার। সেখান থেকে বাসে বা রেলগাড়ীতে চেপে কোলকাতা। শৈলমামা ও বাবা এ পথে যখন যান তখন তালপুকুরিয়া ও গেঁয়োখালিতে ব্যবসার কাজ সারতে সারতে যান।

অতএব কোথায়ও যাওয়া মানে বহুদিনের ব্যাপার। পাকা রাস্তা বলে কথাটা নীলু শুনেছে। কিন্তু কোনদিন দেখে নি সে। সে কোনদিন কালিগ্রাম বা তালপুকুরিয়া যায় নি। সমুদ্র তাদের বাড়ী থেকে মাত্র আট দশ মাইল দূর। খেজুরী গেলে নাকি সেই বঙ্গোপসাগরের দেখা মেলে। নীলু তাও কোন দিন দেখে নি। কি করে দেখবে সে? কি করে বা সে যাবে?

অত পথ তো সে তার কচি কচি পায়ে হেঁটে যেতে পারবে না। এ তো আর ঠাকুরনগরের অক্ষয় তৃতীয়ার মেলা কিংবা কৃষ্ণনগরের কালী রথের মেলা নয় যে হেঁটে যাবে। ঐ জায়গাগুলো তাদের বাড়ী থেকে মাত্র তিন-চার মাইল দূর। তাও নীলু সবটা হেঁটে যেতে পারে না। এসব মেলাতে নগেন কাকাই তাকে নিয়ে যায়। সঙ্গে রানীও যায়। কখনও বা রানীর দাদাও তাদের সঙ্গে যায়। রানী সবটা পথ হেঁটে যেতে পারে কিন্তু নিলু পারে না। মাঝে মাঝে সে নগেন কাকা-বা রানীর দাদার কাঁধে চাপে।

কোন কোনদিন তাদের বাড়ীতে তাদের এক আত্মীয় আসেন। নীলু তাঁকে রমেন জেঠা বলে ডাকে। রমেন জেঠা তার বাবার দূর সম্পর্কের মাসতুতো না পিসতুতো ভাই হন। সেই সুবাদে তিনি নীলুর জেঠা। তিনি নাকি ডাক্তার। নীলু এবং তার বাবা মাদের রমেন জেঠা প্রত্যেক বছর কলেরা ও বসন্তের টিকা দেন! তিনি থাকেন তেতুলবাড়িয়া গ্রামে। তেতুলবাড়িয়া শাপলা থেকে ছ মাইল পথ। হরিপুর ছাড়িয়ে আরও পশ্চিমে যেতে হয়! তাঁর বাড়ী রায়পুর গ্রামে। ক্যানেলের পাড় বরাবর তালপুকুরিয়ার দিকে আট ন মাইল গেলে পড়ে রায়পুর গ্রাম।. সেখানে শিবের মন্দির এবং তাদের অনেক আত্মীয় কুটুম্ব আছে। রায়পুরের শিবচতুর্দশী মেলা বেশ বড় আর বিখ্যাত।

যতবার রমেন জেঠা বাড়ী যান, নীলুদের বাড়ী হয়েই যান। নীলুদের বাড়ীতে চা খেয়ে, কোন কোনদিন ভাত খেয়ে তিনি বাড়ী যান। তিনি মোটর সাইকেল চেপে আসেন। তাঁর মোটর সাইকেলের ভট্ ভট্ আওয়াজ শুনলে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা কেন, মেয়ে পুরুষেরাও ভীড় করে আসে দেখতে। তাঁর পরনে থাকে খাঁকি হাফ প্যাণ্ট ও মাথায় খাঁকি হ্যাট্। বর্ষাকালে কাঁচা রাস্তায় যখন মোটর সাইকেল চলে না তখন তিনি সাইকেলে যাওয়া আসা করেন। বেশী বৃষ্টি হলে তিনি পায়ে হেঁটে তেতুল-

বাড়িয়া থেকে শাপলা আসেন এবং শাপলা থেকে নৌকায় চেপে স্বগ্রাম রায়পুর যান।

নীলু শুধু মোটর সাইকেলই দেখেছে, বাস না, ট্যাক্সি না, রেলগাড়ী না—কিছুই না। তবে হ্যাঁ আজকাল ইউরোপ না কোথায় যেন মস্ত যুদ্ধ বেধেছে। সেখান থেকে কলের পাখীরা আকাশ দিয়ে উড়ে আসে। বিকট আওয়াজ তাদের। কখনও একটা, কখনও বা দল বেঁধে উড়ে যায়। শৈলমামা বলেন, ওগুলো নাকি উড়োজাহাজ। অতএব নীলু উড়োজাহাজ দেখেছে—তবে সে দূর থেকে। শৈলমামা বলেন সেগুলো নাকি অনেক বড়, মোটেই পাখীর মত নয়। তার ভেতরে নাকি অনেক লোক বসে যেতে পারে।

শৈলমামা নীলুকে বলেছেন, জলের জাহাজ নাকি আরো বড়। সেগুলোর ভেতরে নাকি শ'য়ে শ'য়ে লোক যেতে পারে। গেঁয়োখালিতে ও কোলকাতায় গেলে নাকি সেগুলোর দেখা মিলতে পারে। নীলু সে জাহাজ কোনদিনও দেখে নি। সে ভাবে, কত বড় ওগুলো? খড়ের নৌকার চেয়ে বেশ বড় নিশ্চয়ই। চার পাঁচটা খড়ের নৌকা মিলে একটা নৌকা হলে যতবড় হয়, ততবড় বোধ হয়। নীলুর কল্পনার দৌড় তার বাইরে আর যেতে পারে না।

নীলু এসব কিছুই দেখে নি। তালপুকুরিয়া বা কালীগ্রাম যায় নি। বড় জোর সে হরিপুর গেছে। কিন্তু সে নিয়ে তার মনে কোন ক্ষোভ নেই। কারণ সে জানে, তার বাবা, শৈলমামা, রাণীর বাবা, ইংরাজী মাষ্টার, এই রকম দু চারজন ছাড়া গ্রামের বা পাশাপাশি গ্রামের কেউই এ সব দেখে নি।

শৈলমামা নীলুকে বলেছে, সে যখন হরিপুর হাইস্কুলের পড়া শেষ করে ফেলবে তখন তাকে কোলকাতাতেই পড়তে যেতে হবে। তখন সে তো এ সব কিছুই দেখতে পাবে। সে হতে না হয় একটু দেরী আছে। তা হোক্, যবে হোক্ তো হবেই। এখন না হয় নাই বা পেল সে দেখতে।

তাদের বাড়ীতে সব সময় নানা ধরনের লোক আসে। তারা নানা দেশ-বিদেশের কথা আলোচনা করে। তাদের কথা শুনে শুনে নীলু ঐ বয়সে বাইরের জগতের অনেক খবরই জেনে ফেলেছে। সে জগৎকে সে কোনদিন চোখে দেখে নি কিন্তু একদিন দেখবে, এই আশা।

কিন্তু সে তার মনে মনে সেই জগতের একটা স্পষ্ট ছবিও দেখতে পায়। সে তার জগতে দেখে, জলে ভাসা জাহাজ গুলো সব খড়ের নৌকা, বাসগুলো মোটর সাইকেলের চেয়ে একটু বড়। তাদের ছুটো বেশী চাকা আছে, এই যা। রেলগাড়ী-গুলো আরো একটু বড়। লোহার পাতের উপরে চলে। আর খড়গপুর কোলকাতা? এগুলো হরিপুরের হাট-গঞ্জের চেয়ে বড় বই কি! নীলু আপন মনে মাথা নেড়ে নেড়ে নিজেকে বোঝায়—হ্যাঁ, বেশ বড় বই কি! লোকজন গাড়ীঘোড়া সেখানে অনেক তো।

আর বঙ্গোপসাগর? এটার কল্পনা নীলু নিজের মনে সহজেই করে নিতে পেরেছে। তা বাড়ীর সামনের এই ক্যানেলটা তো ছোট বঙ্গোপসাগর। ছুটোরই জল লোনা। শৈলমামা বলেছেন—বঙ্গোপসাগরের নাকি ওপার দেখা যায় না! তাহলে কত আর বড় হবে? আচ্ছা, ক্যানেলটা যদি ওপারের ওই পূর্বচক গ্রামের মাইতিদের তালবনী পুকুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, কি তার চেয়ে আর একটু বেশী হয়, তাহলে কি সাগর হয়ে যায় না? হ্যাঁ, তা-ই। রানীও তাই বলে। কিন্তু কালাটা তো মানতে চায় না। সে বলে, সাগর নাকি আরো বড়। নীলু ভাবে, তাই হয় কখনও? অতবড় হলে সবটাই তো জলে জলময় হয়ে যাবে। মানুষ থাকবে কোথায়?

গ্রামের মানুষ গ্রামেই থাকে। তাদের অনেকে বাইরে যায়, কেউ না গিয়েও বাইরের খবর রাখে। বাইরে যাওয়ার সুযোগ সুবিধা নেই বিশেষ! প্রয়োজনও বিশেষ নেই। গ্রামের জল

মাটিতে যা হয় তাতেই তাদের দিন্ বেশ চলে যায়। জল, মাটি, হাওয়া তাদের কাছে মায়ের স্তন্যের মত।

নীলু দেখেছে, তখনকার দিনে মায়ের স্তন্যে অফুরন্ত সুধা-ধারা ঝরত। মাটি মায়ের স্তন্যও শুষ্ক ছিল না। আজ মায়েদের বুকের দুধ ফুরিয়েছে। টিনের দুধের প্রচলন হয়েছে। মাটি-মায়ের দুধও ফুরিয়েছে। তাই লোকে শহরের খাঁচার দিকে এগিয়ে চলেছে। আর তাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য বাস, ট্যাক্সি রেলগাড়ী রাতদিন জোরে জোরে ছুটছে।

বর্ষাকাল আর ধান কাটার মরশুমটা গ্রামের লোকের কাছে ছিল কাজের সময়। চাষ তখন একটাই হত। চাষের চার পাঁচ মাস ছাড়া বছরের বাকী সময়টাতে কাজের চাপ ছিল না। তখন ডাঙ্গা জমিতে লোকে পাট ও অন্যান্য শাক সব্জী লাগাত। অনেক দিন-মজুর খাটত। অন্যান্যেরা যে যার বৃত্তির কাজ করত। তারাই সকলের সবসময়ের সবরকমের চাহিদা মেটাত।

লোকে বাইরে যেতে না পারলেও সবাই মিলে কি আর আনন্দ করত না? নিশ্চয়ই করত। এই আনন্দের প্রধান উৎস ছিল মেলাগুলো। নীলুদের বাড়ীর কাছাকাছি ও দূরে অনেক বিখ্যাত মেলা বসত বৎসরের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন উপলক্ষ্যে, যেমন কালী গ্রামের কালীর মেলা ও রথের মেলা, ঠাকুরনগরের অক্ষয়তৃতীয়ার মেলা, রায়পুরের শিবচতুর্দশীর মেলা, মহিষাদলের রথের মেলা, ইত্যাদি। এ বাদে ছিল যাত্রাগান ও পালাগান।

হরিপুর হাই ইস্কুলে সরস্বতী পূজার সময় প্রত্যেক বছর তিন চার আসর যাত্রাগান হত। নীলু একবার শৈলমামার সঙ্গে সেখানে গিয়ে 'চন্দ্রহাস' পালা শুনে এসেছে। এ ছাড়া গ্রামে সর্ব্বজনীন শীতলা পুজা ও হোলীপুজা উপলক্ষ্যে, প্রত্যেক বছর কেষ্টযাত্রা ও নিমাই সন্ন্যাস জাতীয় যাত্রাগান হত। তখনও পর্যন্ত তাদের গাঁয়ে স্বদেশী যাত্রার চল হয় নি। ধনীরা বিভিন্ন পালাপার্বনে, অন্নপ্রাশন ও বিয়ের উৎসবে কয়েক আসর পালাগান করাতেন।

তখনকার যাত্রাগান এখনকার থিয়েটারের মত মাত্র আড়াই ঘণ্টায় হত না—সারারাত ধরে হত। নীলুর মনে আছে, তারা রাতে ভাত খেয়ে দেয়ে যাত্রার প্রথম ঘন্টি পড়লে যাত্রার আসরে যেত। সে যাত্রাগান ভোর রাতে শেষ হত, কখনও বা ভোর হয়ে সূর্য উঠলে শেষ হত। লোকে সারারাত ধরে আনন্দ করত। যাত্রার আসরের আশেপাশে ছোলাভাজা, পানবিড়ি ইত্যাদির দোকান বসত। দোকানপাট, আলো আর লোকজনের আনাগোনায় যাত্রার আসরকে মেলা বলেই মনে হত।

নীলু, রানী, কালা ও পুলিন এখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠেছে। পান্না তৃতীয় শ্রেণীতে উঠেছে। নীলুর এক ছোট বোন হয়েছে। মাস ছয়েক বয়স তার। নাম রাখা হয়েছে বুলি। দুর্গাপূজার পর বুলির অন্নপ্রাশন হল। সে উপলক্ষ্যে তাদের বাড়ীতে সতী বেহুলার পালাগান হল,—নাম বেহুলা ভাসান। এ জিনিস নীলু আগে শোনে নি কোনদিন।

তাদের গোয়াল ঘর পরিষ্কার করে যাত্রার লোকজনদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নীলু সেদিন প্রাণভরে সাজ-ঘরে অভিনেতাদের সাজসজ্জা দেখেছিল। দলে কোন মেয়ে ছিল না। যে চাঁদ সওদাগর সেজেছিল, সে নগেন কাকার মত একটা বড় লোক। আর যে বেহুলা সেজেছিল, সে ছিল বড়দার মত এক ছেলে। তার গায়ের রং অবশ্য বড়দার চেয়ে অনেক বেশী ফর্সা। দেখতেও সে অনেক বেশী সুন্দর ছিল।

নীলু অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, সেই বেহুলা ছেলেটি যাত্রার আসরের পাশেই অনবরত বিড়ি ফুঁকে যাচ্ছিল। ঘন্টি পড়লে আসরে যখনই যাচ্ছিল তার আগেই জ্বলন্ত বিড়ির টুকরাকে পা দিয়ে চেপে নিভিয়ে দিয়ে দৌড়িয়ে আসরে যাচ্ছিল। আসরে গিয়েই একেবারে সাবলীল অভিনয়। তখন তাকে দেখে কে বলবে, এই ছেলেটিই একটু আগে বিড়ি ফুঁকছিল আর

আসর থেকে গিয়েই আবার বিড়ি ধরাবে। এমন অপূর্ব অভিনয় নীলু তার আগে কোনদিন দেখে নি!

বেহুলা কলার ভেলায় যখন লখিন্দরকে নিয়ে ভেসে যাচ্ছে, তখন সেই ছেলেটির অভিনয় দেখে চোখের জল ফেলে নি এমন লোক একটাও সেদিন দর্শকদের আসরে ছিল না। নীলুর চোখেও জল এসে গিয়েছিল। পাশে বসে থাকা রানীর চোখেও সে জল দেখেছিল। নীলুর তখন মনে হয়েছিল, সে এমন করে কোনদিন মরে গেলে রানী তাকে নিয়ে জলে কলার ভেলায় ভাসবে। কিন্তু রানী পারবে তো, তাকে আবার বাঁচিয়ে আন্‌তে?

ফিস্‌ফিস্‌ করে রানীকে নীলু বলেছিল— রানী, আমি যদি অমন করে মরে যাই, তুই পারবি আমাকে বাঁচাতে।

নীলুর কথা শুনে রানীর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে সে বলেছিল—পারব। কিন্তু যদি সে ধোপানীর দেখা না পাই? সে না হলে আমি কেমন করে স্বর্গে দেবসভায় যাব বল্‌? আর স্বর্গে না গেলে তোকে বাঁচাব কি করে?

নীলু ভয়ে ভয়ে বলেছিল—তবে?

রানী হেসে বলেছিল—তুই আগে কেন মরবি? মা বলেছে, সতী মেয়ে যে হয়, সে সতী বেহুলার বরে তার বরের আগেই মরে। আমি সতী মেয়ে হব, দেখিস্‌।

সতীমেয়ে কাকে বলে, সে ধারণা নীলুর নেই। সে তাই মনে মনে ভাবে—রানীর সতী হয়ে কাজ নেই, বাপু। সতী হলে তো তার আগেই মরে যাবে। আর রানী মরে গেলে তার বেঁচে থাকার কোন অর্থই হয় না।

তার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে ভেবেছিল, সে পরে বরং রানীকে বলবে যে, তার সতী হয়ে কাজ নেই। কিন্তু এ ভাবনাও সে বেশীক্ষণ ভাবতে পারেনি। চাঁদ সওদাগরের হুংকারে

তার ভাবনায় ছেদ পড়েছিল। তাকিয়ে দেখেছিল, চাঁদ মা মনসাকে 'চ্যাংমুড়ী কানী' বলে উপহাস করছে। চাঁদের অভিনয়ের মাঝে নীলু ডুবে গিয়েছিল।

এরপর তাদের মধ্যে এক নতুন খেলা শুরু হল—ক্যানেলের জলে কলার ভেলা ভাসানোর খেলা। পুলিন ভেলা বানানোতে ওস্তাদ। স্নানের আগে তারা ভেলা নিয়ে ক্যানেলের জলে নামত। ভেলায় চড়ে দিব্যি ওপারে চলে যেত। আর ওপার থেকে চলে আসত। খেলার শেষে ভেলাগুলো খুঁটিতে বেঁধে জলের উপর ভাসিয়ে রেখে আসত তারা।

একদিন নীলু আর রানী নেমেছে ক্যানেলের জলে। পুলিন সেদিন নেই। সে মামার বাড়ী গেছে। কালা তখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছায় নি।

নীলু বলল রানীকে—আয় রানী, আমরা সতী বেহুলা খেলি। এ্যাই গ্যাখ, আমি ভেলার উপর মরে পড়ে থাকলাম। তুই ভেলা ভাসিয়ে নিয়ে চল্।

নীলু ভেলার উপর শুয়ে থাকল। রানী উঠে খুঁটি দিয়ে ঠেলে ঠেলে ভেলা ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। রানী কোন্‌দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বুঝতে না পেরে নীলু শুয়ে শুয়েই বলে—কোনদিকে যাবি রে, রানী? ধানগোলার হাটের দিকে চল্। ওখানে মালতী ধোপানী থাকে না?

রানী ঠোঁটে আঙ্গুল চাপা দিয়ে বলে ওঠে—চুপ! মরা মানুষ কি কথা বলে কখনও? তুই চুপ করে শুয়ে থাক। আমি সেদিকেই ভেলা নিয়ে যাচ্ছি।

সেই সময় কালা এসে হাজির। সে লাফ দিয়ে জলে নেমে বলে—এ্যাই, তোরা সতী বেহুলা খেল্‌ছিস। নীলু, তুই নাম্ এবার। আমি লখিন্দর হই।

রানী সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে বলে ওঠে—আমার ভারী বয়ে গেছে তোকে নিয়ে ভেলা ভাসাতে। লখিন্দর বুঝি তোর মত

কালো? আর, নীলু যখন একবার লখিন্দর হয়েছে তখন আর কেউ লখিন্দর হতে পারবে না। আমি সতী বেহুলা, না? সতী-মেয়ের কি দুটো বর হয় কখনও? তুই সতী বেহুলা খেলতে চাস তো. পান্নাকে ডেকে নিয়ে আয়। সে তোর সতী বেহুলা হবে। তবে তোর মত কাকের সাথে সে সতী বেহুলা খেলতে রাজী হলে তো!

রানী তীব্র ঘৃনায় মুখ বিকৃত করে। কালা রাগে, লজ্জায়, ক্ষোভে পাথরের মুর্ত্তির মত জলে দাঁড়িয়ে থাকে।

নীলুর এতক্ষণে সতী সম্বন্ধে একটা ধারনা হয়। রানীর কথায় সে লজ্জা পায়। তা ছাড়া, কালার ব্যথায় তার বুকটা সহানুভূতিতে টন্‌টন্ করে ওঠে। সে তাড়াতাড়ি ভেলা থেকে জলে নেমে বলে—রানী, এ খেলা আজ থাক। আর একদিন খেলব বরং। আজ, আয় আমরা তিনজনে ক্যানেলের এপার ওপারে হই।

সতী বেহুলা খেলাটা সেদিন তাদের আর খেলা হয় নি। পরে তারা বেশ কিছুদিন খেলেছে এ খেলা। পান্না কালার সঙ্গে এ খেলা খেলতে কোনদিনই রাজী হয় নি। রানী তো না-ই। পান্না, পুলিনের সঙ্গে এ খেলা খেলত। কালা মনের দুঃখে ভেলায় চড়া সেই থেকে ছেড়ে দিয়েছিল। ওরা যখন এ খেলা খেলত তখন কালা ক্যানেলের পাড়ের বট গাছের তলায় বসে তার বাঁশের বাঁশী বাজাত বা জলে নেমে ক্যানেলের এপার ওপার হত।

এই খেলা থেকে নীলুর একটা প্রত্যক্ষ লাভও হয়েছিল—সে সাঁতার দেওয়াটা শিখে গেল। রানী, কালা ও পুলিন সকলে সাঁতার জানত। জানত না শুধু নীলু, নীলু এখন একাই এপার ওপার হতে পারে।

শীতের শেষের দিকে সে বছর গ্রামে একটা সাড়া পড়ে যায়। গ্রামে নাকি থিয়েটার হবে। অনেকেই ভেবে পায় না, থিয়েটার

আবার কি বস্তু। শৈলমামা ও বাবা কোলকাতায় থিয়েটার দেখেছেন।

শৈলমামা বললেন—যাত্রার মতই। তবে তার ষ্টেজ আছে। ঘরের মতই প্রায়। সামনে পর্দা থাকে। পর্দা সরে গেলে যে যার পার্ট করবে। আবার দৃশ্য শেষ হয়ে গেলে ষ্টেজকে পর্দা দিয়ে ঘিরে ফেল্‌বে।

অনেক চেষ্টা করেও নীলু জিনিষটা কি রকম হবে, বুঝতে পারে না। রিহার্সেল কথাটা এ সময় নীলু প্রথম শোনে। শংকরী-প্রসাদই এব্যাপারে উৎসাহী বেশী। অর্থের ব্যাপারে সিংহভাগটা তিনিই দিচ্ছেন। কিন্তু পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁর সহপাঠী ও অকৃত্রিম বন্ধু নির্মাল্য দাস। তিনি হরিপুর হাই ইস্‌কুলে বাংলা পড়ান।

নীলুদের বাড়ীতেই রিহার্সেলের আসর জমতে লাগল। একদিন রিহার্সেলের আসরে একজনকে দেখে নীলু চম্‌কে উঠল। একে সে চেনে। একবার নীল উৎসবের তরজা গানের দিন এই ছেলেটা তাকে মেরেছিল। এ সেই রাসু—বড়দার বন্ধু। রাসু রিহার্সেলের আসরে কেন?

॥ নয় ॥

রিহার্সেল বসত কোন কোনদিন দুপুরবেলা। দুপুর গড়িয়ে বিকাল হত আবার বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যে হত। আবার কোন-দিন সন্ধ্যের মুখে সুরু হত, রাত দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত চলত। সবদিন যে সকলে আসত, তা নয়। কেউ অনুপস্থিত থাকলে পরিচালক নির্মাল্য দাস বিরক্ত হতেন। তিনি নিজে কিন্তু কোনদিন অনুপস্থিত থাকতেন না।

নীলুদের দোকান ঘরটা ছিল টালির চালের। মেঝেটা পাকা। পূব আর দক্ষিণে চওড়া লাল রঙের বারান্দা। সামনেটা হল পুব-দিক আর দক্ষিণে ছিল ক্যানেল। ক্যানেল উত্তর-দক্ষিণে লম্বা আর পূব-পশ্চিমে চওড়া। দোকানঘরের পাশেই ছিল গুদাম ঘর। সেটা ছিল বেশ অন্ধকার। দোকানঘরের পাশ দিয়ে সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠা যেত। দোকান ঘর আর গুদাম ঘর, উভয়ের দেওয়াল ছিল মাটির।

দোকানঘর আর গুদামঘরের গায়ে লাগিয়েই ছিল বসতবাটি। বসতবাটির দেয়াল মাটির, চাল খড়ের। তার পূবদিকে গোয়াল ঘর, পাটের গুদাম, ধানের গোলা, ব্যবসার চালের গুদাম ঘর ইত্যাদি। দোকানঘর আর গোয়ালের পেছনেই ছিল দুটো পুকুর।

দোকানের সামনের পূবদিকে ছিলো ফুলের বাগান, দক্ষিণ-দিকেও। ফুলের বাগানের সামনে কিছুটা ফাঁকা জায়গা। তারপরে তরকারী বাগান। তারপরেই পড়ে গোয়াল আর পাট-গুদাম। এ ছাড়া বসতবাটির পেছনে ছিল এক বিঘার মত ডাঙ্গা জায়গা। সেখানে পাট, আলু, কফি, এসব চাষ হত। এ বাদে

ঐ জমিতে কিছু, নারকেল, পিয়ারা, আম, সবেদা ইত্যাদি গাছ লাগান হয়েছিল। তবে সেগুলো সব ছোট ছোট। শংকরীপ্রসাদ কয়েক বছর মাত্র এখানে এসেছেন।

অতএব নীলুদের বসতবাটির চৌহদ্দি যেমন বড় ছিল তেমনই দোকানঘর আর বসতবাটি মিলিয়েও বেশ বড় ছিল। কিন্তু সমস্ত বাড়ীই সবসময় পরিবার পরিজনে, বাইরের খরিদ্দার, অতিথি ও অভ্যাগতে এমনই পূর্ণ থাকত যে রিহার্সেলের জন্য বাড়তি জায়গা পাওয়া মুস্‌কিল। ফাঁকা বলতে ছিল দোকানঘরের উপরের দোতলাটা কিন্তু সেটা বাড়ীর ভেতরই। অতএব সেখানে তো আর রিহার্সেল চলতে পারে না। তাই শৈলমামা বুদ্ধি করে জায়গাটা বার করলেন। দক্ষিণের বারান্দাটা ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা করলেন তিনি।

দোকানে তুলা আর কাপড় আসত গাঁটবন্দী হয়ে। গাঁট-গুলো সব লোহার পাত দিয়ে মোড়া থাকত। সেই পাত অনেক পড়েছিল মরাই ঘরে। রানীর দাদাকে ডেকে লাগিয়ে দিলেন শৈলমামা ঐ পাত দিয়ে দক্ষিণের বারান্দা ঘেরার কাজে। কয়েক-দিনের মধ্যে সুন্দর জাক্‌রীওয়ালা ঘেরা বারান্দা হয়ে গেল। তাতে আলোও যেমন রইল, বাতাসও তেমনি রইল। পেছনেই তো ক্যানেল। আর তার ওপারে দিগন্তবিস্তৃত ধানের মাঠ। আর সেই মাঠের শেষে—নীলুর মনে হত, বুঝি বা, পৃথিবীর শেষ প্রান্তে দেখা যেত মাইতিদের তালবনী পুকুর, যার চার পাশে অসংখ্য তালগাছ রাতদিন দাঁড়িয়ে পুকুর পাহারা দিচ্ছে।

দক্ষিণের বারান্দার পেছনের বাগানে ছিল একটি করবী গাছ আর মস্তবড় এক জামরুল গাছ। মাঝে ছিল হাস্নুহানা, মল্লিকা ও বেলীর ঝোপগুলো। নীলু এই ঝোপের মধ্যে এসে বসলে তার মনে হত রবিঠাকুরের সেই কবিতাটা, যা তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য :—

'ছোট্ট আমার কুটির খানি
লতাপাতায় ঘেরা,
দালান কোঠা পাকাবাড়ী
সবার চেয়ে সেরা।'

শৈলমামা গল্প করতেন, রবিঠাকুরের নাকি মস্ত বড় সাদা দাড়ি। মামা রবি ঠাকুরকে নাকি অনেকবার দেখেছেও।

রিহার্সেল মাত্র কিছুদিন চলার পর কিছুদিনের মত বন্ধ রইল। ছুটো বই হবে—'সিরাজদ্দৌলা' ও 'সীতার পাতাল প্রবেশ।' কোলকাতার ষ্টার থিয়েটারে ঐ সময় সিরাজদ্দৌলা বই হচ্ছিল। শৈলমামাই একদিন কোলকাতা থেকে ফিরে এসে দিলেন সংবাদটা।

নির্মাল্য দাস অমনি বললেন—তবে তো একবার কোলকাতা গিয়ে অভিনয় দেখে আসতে হয়। আমরা সেই মত করতে পারব।

বলা বাহুল্য, নবাব সিরাজদ্দৌলার ভূমিকায় ছিলেন নির্মাল্য দাস স্বয়ং। অতএব পরিচালকের অনুপস্থিতিতে রিহার্সেল কিছুদিন বন্ধ রইল।

ঐ সময় একদিন, রবিবার। নীলু ভাত খাওয়ার পর পুকুরে মুখ ধুয়ে এল রোদ পোহাতে জামরুল গাছের নীচে। সেদিন ঠাণ্ডাটা একটু বেশী ছিল। স্নান করার পর থেকেই শীত করছিল বেশ। খাওয়ার পর শীতটা আরো যেন বেশী করতে লাগল। তাই সে এখানে এল রোদ পোহাতে। জামরুল গাছটার নীচে সারাদিনই রোদ লাগে। প্রায়ই সে এখানে আসে। রোদে গা গরম হয়ে গেলে দিব্যি বেলী মল্লিকার ঝোপের নীচে বসে আরাম পাওয়া যায়। আবার ওখানে ঠাণ্ডা লাগলে বেরিয়ে এলে কি নরম মিষ্টি রোদ।

তাছাড়া এমনই তার এখানে বসতে ভাল লাগে। এটা ছিল তার নিজস্ব এক জগৎ, যে জগতের কথা সে ছাড়া আর কেউ

জানত না, একদা আমেরিকা যেমন ছিল। নীলু দাদাদের কাছে ভাস্কো-ডা-গামা, কলম্বাসের নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের কাহিনী কিছু কিছু শুনেছে। সে নাম শুনেছে, সুন্দরবন, আফ্রিকার অরণ্য আর আমাজন নদীর।

ঝোপের নীচে বসে তার নিজেকে মনে হত সেও বুঝি কলম্বাসদের মত একজন আবিস্কারক। কিন্তু সে তার এই আবিষ্কৃত জগতের সন্ধান অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে চায় না! তার নিজস্ব জগতে সে একাই থাকতে চায়। ঝোপের আলো-আঁধারির দিকে চেয়ে তার কখনও কখনও মনে হয়েছে, সে বুঝি আমাজন নদী পেরিয়ে আফ্রিকার গহন অরণ্যের মধ্যে এসে পড়েছে। ক্যানেলটা তখন তার কাছে আমাজন ছাড়া আর কিছু নয়।

কখন বা এই ক্যানেলটাকে তার মনে হয়েছে পেট্রয়া কি কাকদ্বীপের কাছের সেই বাহার গাং। ওপারের বাঁধা নৌকা-গুলোকে তখন তার মনে হত বাহার গাং-এর নৌকাগুলো। সে তো এখনই ঐ নৌকাগুলোর একটায় চড়ে এপারের সুন্দর-বনের গহন জঙ্গলে ঢুকেছে। এখন আর তার এই হাস্নুহানা মল্লিকা ও বেলী গাছগুলোকে হেঁতাল, গরান ও সুন্দরী গাছ বলে ভাবতে এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না।

আর কি আশ্চর্য! সে তো ঐ আফ্রিকার জঙ্গলের হায়না কিংবা সুন্দরবনের বাঘও দেখতে পাচ্ছে। রোদ পোহাচ্ছে যে বাঘা কুকুরটা সে তো এখন নীলুর চোখে একটা হায়নাই। আর পাশে শুয়ে আছে ঐ যে ভুলো বেড়ালটা, ওটা তো আসল বাঘই। বাঘ তো দিনের বেলায় ঝোপের মধ্যে শুয়ে থাকে। রাতে ওটা শিকারে বেরোবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে, আফ্রিকার জঙ্গলে সিংহও থাকে। নীলু ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগল ধারে কাছে-সিংহ কোথায়ও আছে কিনা। হঠাৎ সে জামরুল গাছের ওপাশে পুকুরের পাড় ঘেঁষে, করঞ্জা গাছের কাছ থেকে

সিংহের গর্জন শুনতে পেল। ঝোপের নীচে জড়সড় হয়ে ঘাপটি মেরে, নিঃশ্বাস বন্ধ-করে সে সিংহের ডাক শুনে থরথর করে কাঁপতে লাগল। ঝোপের ফাঁক দিয়ে সে দেখতে পাচ্ছে সিংহের কেশর। ঐ তো, ঐ তো—ঐ যে সিংহটা কেশর ফুলিয়ে গর্জন করছে।

নীলুর তখন ভয়ে বাহ্যজ্ঞান লোপ পাওয়ার অবস্থা। তার মনেই রইল না, মা ঐ ভেড়াকে তেলীদের বাড়ী থেকে কিনে এনেছিল। গোয়ালে ভেড়া থাকলে নাকি গরুর গায়ে উকুন হয় না। ভেড়াটা যে করঞ্জা গাছের গোড়ায় বাঁধা থাকে। এ কথা ভয়ের চোটে সে বেমালুম ভুলে গেল। আর জ্ঞান থাকলে সে মনে করতে পারত, সিংহের ডাক মেঘগর্জনের মত, এ কথা শৈলমামা কতবার তাকে বলেছেন। সিংহ কোনদিন ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে ডাকে না।

নীলুর এত ভয় করতে লাগল যে, তার মনে হল, এ সময় রানী তার কাছে থাকলে সে অনেকটা বুকে বল পেত। কিন্তু না, রানীকে সে এখানে আনতে চায় না। এই অপার রহস্য ঘেরা চিরনূতন জগতের সন্ধান সে বাবা, মা, নগেন কাকা, শৈল মামা, এমন কি রানীকেও পর্যন্ত দিতে চায় না। এ তার একেবারে নিজস্ব জগৎ। অবশ্য রানীকেও নিজস্ব বলেই মনে হয়। রানীকে সে সব দিতে পারে। তাকে নিয়ে হিমালয়ের চূড়ায় কিংবা চীনের বরফ ঢাকা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে পারে কিন্তু তাই বলে এ জগতের সন্ধান সে কিছুতেই দিতে পারে না রানীকে। সে রানীকে তার সব কথাই বলেছে কিন্তু এ জগতের কথা কোনদিনই বলে নি।

কিন্তু একা একা গভীর, হিংস্র, ভয়াল, শ্বাপদসংকুল অরণ্যে বসে থাকতেও তার ভীষণ ভয় করছে। কতক্ষন এভাবে একা একা বসে থাকতে পারবে তাও জানে না সে। হয়ত ভয়ে সে জ্ঞান হারিয়ে ভেলবে আর হিংস্র জন্তুগুলো তাকে খেয়ে ফেলবে।

রানী জানতেও পারবে না, নীলু মরেছে। সে মরে গেলে রানী তাকে নিয়ে কলার ভেলায় ভাসবে বলেছিল। কিন্তু তা বোধ হয় আর হবে না। রানী যখন জানবে নীলু মরেছে তখন ছুটে এসে দেখবে নীলু নেই, তার কয়েকটা হাড় আর গলার হারটা পড়ে আছে।

এই নিদারুণ আতংকের মধ্যে হঠাৎ সে যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা কোন দেবদূতের শব্দ শুনতে পেল—ওখানে বসে আছিস কেন? রাগ হয়েছে?

নীলু পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে অবিকল একটা দেবদূত তার দিকে চেয়ে হাসছে। তার টক্‌টকে ফর্সা রং, ঘন কালো, কোঁকড়ানো অবিন্যস্ত চুল, ঝক্‌ঝকে সুন্দর দাঁত আর নীল-নীল চোখ। দেবদূতের হাসিতে তার ভয় কেটে যেতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সে তার জগৎ থেকে ছিট্‌কে সরে আসে আর দেখতে পায়, সে মল্লিকা ঝোপে বসে আছে। আর সামনের ঐ ছেলেটা দেবদূতের মতই সুন্দর, তবে দেবদূত নয়। ও হল সেই রাসু—যে কদিন ধরে রিহার্সেলে আসছে। রিহার্সেল এখন বন্ধ বলে কদিন আসেনি।

নীলু বিহ্বল চোখে কিছুক্ষণ রাসুর দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছু যে একটা বলতে হবে এ বোধও তার জাগে না। আসলে সে তার নিজস্ব জগৎ থেকে সকলের জগতে এত তাড়াতাড়ি চলে এসেছিল যে আসার সময় তার চেতনা বোধটাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারে নি। সেই বোধটা যখন একটু পরে এসে তাকে ধরে ফেলল তখন সে পেল লজ্জা, দারুণ লজ্জা। লজ্জাটা তার মুখে কুণ্ঠিত হাসি হয়ে ফুটে উঠল। হেসে সে চোখ নামাল।

রাসু কিন্তু ততক্ষণে বলে চলেছে—কি রে, কথা বলবি না আমার সাথে? কবে সেই গাজনের সময় মেরেছিলাম, সে কথা এখনও মনে রেখেছিস্? তাই-রাগ করে আছিস্। আয়, তোর সঙ্গে ভাব করি।

এই বলে রাস্থ ক্যানেলের পাড় থেকে নেমে এল। নীলুর হাত ধরে তাকে জামরুল গাছের ছায়ার নীচে নিয়ে এল। ডুজনে সেখানে বসে পড়ল।

নীলু রাস্থর চোখে চোখ রেখে এতক্ষণে কথা বলল—তুই রিহার্সেলে আছিস কেন রে?

কথাটা বলে ফেলেই নীলু অবাক হয় ভেবে যে, সে তার চেয়ে অত বড়, বড়দার 'বয়সী রাস্থকে কি করে প্রথমেই তুই বলে বসল। লজ্জা পেল খুব। কিন্তু আর তো উপায় নেই। বলা কথা তো আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। রাস্থ কি এ কথায় রাগ করল? ভয়ে ভয়ে আড়চোখে সে চেয়ে দেখল, নাঃ, রাস্থর মুখে রাগের কোন চিহ্ন নেই। রাস্থ যে তার তুই সম্বোধনে কোন রাগ করে নি, এ দেখে নীলু আশ্বাস্ত হল।

—বাঃ, তুই জানিস না? —উজ্জ্বল চোখের নির্মল হাসিতে রাস্থ বলে—আমার যে ছুটো বইতেই গান আছে রে।

অবাক চাহনী মেলে নীলু রাস্থর দিকে তাকায়—তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। ভাবে—কি আশ্চার্য! রাস্থ গানও জানে? তবে যে সে একটু আগে তাকে দেবদূত বলে ভেবেছিল, সে তো ঠিকই। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল—সে ও তো গান জানে। সে তো বেশ ভালই গাইতে পারে। রাস্থ হয়ত ঐ রকমই গায়।

নীলু শুধু তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, কথা বলছে না দেখে রাস্থ আবার বলে—কি, তোর বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

নীলু লজ্জিত হয়ে বলে—না, না, তা কেন? আমিও গাইতে পারি, জানিস? কলের গানে যেসব গানগুলো হয়, আমি সেগুলো গাইতে পারি। আর পূর্ণেন্দু কাকারা এখানে যেগুলো গায়, সে গুলোও।

নীলু সগর্বে বুক ফুলিয়ে বলে যায় কথাগুলো। রাস্থ মজা পায়। কিছুটা উপেক্ষার হাসি হেসে বলে—তাই নাকি? বেশ হলো, তুই জানিস, আমিও জানি। আমরা ছুজনে এবার থেকে গাইব। আর সেদিনের মত মারামারি করব না, কেমন তো?

নীলু মাথা নাড়ে। একটু পরে বলে—তোদের কি কল্‌্রে গান আছে? তুই কোথায় গান শিখলি? তোর বাড়ী কোথায় রে? তুই বুঝি ওপারের ঐ রায়দের কুটুম?

রাসু বলে—তোদের শিবের মন্দিরের পাশের যে শচী রায়, ও হলো আমার আপন পিসে। আমার বাড়ী বাসুদেবপুর।

—সেটা কোথায় রে?

—ভগবানপুর।

—ভগবানপুর?

হ্যাঁ তোদের যেমন খেজুরী, আমাদের তেমনি ভগবানপুর থানা। আমি পাঁচ বছর যাত্রাদলে গান গেয়েছি রে। আমাদের গাঁয়েরই যাত্রাদল।

নীলু খুব অবাক হয়। বলে—তুই তবে যখন আমাদের মত ছিলি, তখনই যাত্রাদলে গিয়েছিলি? মাকে ছেড়ে থাকতে তোর কষ্ট হতো না?

করুণ ছলছল চোখে রাসু বলে—আমার নিজের মা নেই রে। তবে আমার নিজের এক ভাই আছে, ঠিক তোরই মত। তার নাম বাসু—বাসুদেব। আমার নাম রাসু—রাসবিহারী। বাসু থাকে বাসুদেবপুরে। তোকে দেখে আমার সে ভাই-এর কথা মনে পড়েছে। আজ থেকে তুই আমার ভাই। হবি তো?

নীলু মাথা নাড়ে। চোখের জল মোছে। তার চোখে জল দেখে রাসু অবাক না হয়ে পারে না। অবাক চোখে তাকিয়ে বলে—এ কিরে তুই কাঁদছিস কেন?

নীলু কান্নাভেজা স্বরে বলে—তোর মা নেই যে বললি। মা না থাকলে বড় কষ্ট হয়, না রে?

রাসু কিছুক্ষণ কথা বলে না। উদাস দৃষ্টি মেলে দিগন্তের নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। পরে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদ্‌গত অশ্রু চাপ্‌তে চাপ্‌তে বলে—প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হতো। এখন আর হয় না। তবে—

রাস্থর চোখে জল ছলছল করে ওঠে, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। একটু সময় নেয় সে নিজেকে স্বাভাবিক করতে। গলা পরিষ্কার করে বলে—মাঝে মাঝে তোদের মায়েদের দেখলে আমার বুকটা কি রকম যেন করে ওঠে। ইচ্ছে হয়, কাউকে মা বলে ডাকি। পিসী আমাকে মার মতই স্নেহ করে। দেশে এলে তাই পিসীর কাছেই পালিয়ে আসি। এখানে এলে বাবা বিরক্ত হয়। বেশীদিন থাকলে বকাবকি করে, মার-ধোরও করে।

নীলু আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না—ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। রাস্থও-কাঁদে। দুজনে কাঁদে। একজন মা হারিয়ে কাঁদে! আর একজন মা হারিয়ে গেলে যে ব্যথা, সেই ব্যথার আবেগে কাঁদে।

কিছুক্ষণ কেঁদে তারা ভাবাবেগকে চোখের জলে ঝরিয়ে দেয়। সহজ হয়। ভাবাবেগের জন্য উভয়ে লজ্জা পায়। দুজনে লাজুক লাজুক হাসি হাসে। মন ভারী করে দুজনে কাঁদল। কেঁদে আবার হাসল। এ যেন, গুমোট হয়ে মেঘ করে এল! সে মেঘে বৃষ্টি ঝরল। আবার বৃষ্টি থেমে যেতেই, মেঘ সরে যেতেই, নরম রোদের হাসি বেরিয়ে এল।

নীলু বলে—বাড়ীতে তোর কে কে আছে?

—বাবা, সৎমা, নিজের ভাই বাস্থ, সৎভাই লালু আর সৎবোন কালী।

সৎমার নাম নীলু শোনে নি। তাই সে বলে—সৎমা? সেটা আবার কি?

—ওঃ হো, রাস্থ হেসে ফেলে—তুই সৎমা জানিস না? আমার নিজের মা মরে যাবার পর আমার বাবা আমার সৎমাকে আবার বিয়ে করে। যতদিন বাবা আমার মা মারা যাবার পর সৎমাকে বিয়ে করে নি, ততদিন আমাদের দু'ভাইকে খুব ভালোবাসত। কিন্তু সৎমা আসার পরই বাবা যেন কি রকম পর হয়ে গেল।

রাসু দীর্ঘশ্বাস ফেলে। নীলুর সৎমা সম্বন্ধে এবার পরিষ্কার ধারনা হয়। তার ভয় হয়, তার মা যদি কোনদিন মরে যায় আর তার বাবা যদি আবার বিয়ে করে, তবে ? এ চিন্তাটা এতই ভয়ের যে নীলু ভাবনাটাকে স্রেফ উড়িয়ে দেবার জন্যই তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—তোর বাবা তোকে মার-ধোর করত ?

রাসু বয়স্ক ব্যক্তির মতই বলে—আরে সব বাবাই তো ছেলেদের মারে। ছেলেরা দুষ্টুমি করে না ? কিন্তু আমার বাবার মার তোরা কোনদিন কল্পনাও করতে পারবি না। রাসু বলে চলে··· মা নেই। সৎমা মোটেই আদর করে না। নিজের পেটের ছেলেদের দুধের সর দেবে। আর আমার দু'ভাইকে দেবে জল মেশানো দুধ। বড় মাছের টুকরো সব নিজের ছেলেদের, আর আমার দু'ভায়ের জন্য কাঁটা আর তার গায়ে লাগান একটু মাছের মত কিছু। তাই ঘরে থাকতে ভাল লাগত না। আমরা পাশের নাপিতদের বাড়ীতেই বেশীর ভাগ সময় থাকতাম। তারা ছিল আমাদের প্রজা। প্রজার বাড়ীতে আমাদের খেলা বাবা মোটেই পছন্দ করত না! নাপিত বৌকে আমরা মাসী বলে ডাকি। সে ছিল আমার মায়ের প্রাণের বন্ধু। মা মরার সময় নাপিত মাসীর হাতে আমাদের তুলে দিয়ে যায়।

—মাসী আমাদের পেটের ছেলের মতই ভালোবাসত। তাই ওখানে পড়ে থাকতাম। বাবা একদিন অগ্নিশর্মা হয়ে কোমরে মোটা দড়ি বেঁধে আমাদের পুকুরের জলে ছুঁড়ে দিত। আমরা ডুবে যেতাম। তারপর বাবা ডাঙ্গা থেকেই, যেমন জালের দড়ি টানে, অমনিভাবে আমাদের টেনে ডাঙ্গায় তুলত। বুঝে ছাখ্, চোখে মুখে জল ঢুকে গিয়ে আমাদের কিরকম দম বন্ধ হবার মত অবস্থা হত। এ রকম আরো কত ধরনের মার। আমার নিজের মা থাকলে কি আর বাবা এ ধরনের শাস্তি দিতে পারত ?

নীলুর মনটা ভীষণ ভারী হয়ে ওঠে। সে আর এই বিষয়টা নিয়ে

আলোচনা করতে চায় না। অন্য কিছু কথা হোক, এটাই সে চায়। রাসু তার দিকে তাকিয়ে তার মনের কথাটা যেন বুঝতে পারে।

রাসু তাই প্রসঙ্গ পাল্‌টিয়ে বলে—যাত্রাদলের সাথে সাথে কত জায়গা যে ঘুরেছি। মন্দ লাগত না। তবে গানের মাষ্টার খুব মারত।

নীলু বলে—তুই সুন্দর বনে গেছিস্‌?

—হ্যাঁ, আমাদের দল তো বেশীর ভাগ সুন্দরবনেই গান করত। বকখালি, হাস্‌নাবাদ, কুলতলি, গদামথুরা প্রথম খণ্ড, গদামথুরা দ্বিতীয় খণ্ড, নামখানা সি-প্লট—আরো কত, কত। রাসু গড়্গড়িয়ে বলে যায়।

—তুই বাঘ দেখেছিস্‌?

—না বাঘ দেখি নি, তবে তার পায়ের ছাপ দেখেছি। আর তার গর্জন শুনেছি কত। যে ডাক শুনলে পেটের পিলে চম্‌কায়। একেবারে যেন মেঘের ডাক, বা তার চেয়ে আরো সাংঘাতিক।

নীলু নীল চোখে ডাগর চাহনী মেলে এই অপরূপ ছেলেটিকে দেখে যায়। নীলু তার নিজস্ব জগতে বসে অনেক দেশ দেখেছে কিন্তু সে কি ঐ রকম চোখের দেখা? ঠিক এই রাসুর মত? রাসুকে তার ঈর্ষা করতে ইচ্ছে হয়, সে এত দেশ, এত নদী দেখেছে বলে। নিজেকে রাসুর কাছে তার কেমন যেন অসহায় মনে হয়। সে কি কোনদিন ওসব দেখতে পাবে না?

আবার রাসুর অসহায় মুখটার দিকে চেয়ে তার মায়া হয়। সে ঈর্ষা ভুলে যায়। বুকের মধ্যে রাসুর জন্য এক ভালোবাসার ঢেউ এসে আছ্‌ড়িয়ে পড়ে। রাসু যতই কিছু দেখুক, নীলুর মনে হয়, সে কিছুই দেখে নি। যে মাকে দেখেও দেখতে পেল না। সে আর কি দেখল? নীলু ঠিক বড়দের মত করে ভাবতে পারে না। কিন্তু এটুকু সে ভাবতে পারছে যে, সে মাকে ছেড়ে কোন স্বর্গে যেতে চায় না। মায়ের আঁচল ধরে জনমভোর ঘুরে মরবে সেও ভালো, তবু মাকে কষ্ট দিয়ে সে তার সাধের আমাজনে ডিঙ্গা বাইতে যাবে না।

রাসুকে তার মনে হয়, এ যেন তার কতকালের, কত যুগের কত জন্মের চেনা। তাকে এত ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে কেন? রানীকেও তো তার ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এ যেন অন্য এক রকমের ভালোবাসা। নীলু ভালোবাসার জাত বিচার করতে শেখে নি। তবে সে মনে মনে স্বীকার করে—রানীর মা না থাকলে সে হয়ত রানীকে ঠিক এম্‌নিই ভালোবাসত।

রাসু কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। ঐ অবসরে নীলু এতসব ভাবল, এখন রাসুর কথায় তার ভাবনায় ছেদ পড়ে। রাসু বলে—বাসুটার আজ পিসী বাড়ীতে আসার কথা ছিল। তাই এপারে এসেছি। এতক্ষণ কেন এল না বল্ তো? বেলা যে গড়িয়ে এল।

নীলু ভারিক্কিচালে রাসুকে সান্ত্বনা দেয়। বলে—ভগবানপুর তো অনেক দূর—তাই না? এতটা পথ আসতে সময় লাগবে না? ঠিক এসে পড়বে, দেখিস্।

পরে রাসুর মনটাকে হাল্‌কা করার জন্য প্রসঙ্গ পাল্‌টিয়ে নীলু বলে—তুই তো তবে যাত্রাদলে অনেক গান শিখেছিস্। একটা গান গাইবি?

—বল, কোনটা শুন্‌বি?

নীলুর রাসুকে নিয়ে এবার কৌতুক করার ইচ্ছা হয়। সে ভাবে, রাসু নিশ্চয়ই কলেরগানের সেই দেবকন্যাদের গানগুলো জানে না। ওদের বাড়ীতে তো আর কলেরগান নেই। রাসু যদি ওগুলো না গাইতে পারে তবে নীলু সেগুলো গেয়ে রাসুকে অবাক করে দেবে। রাসু দেখুক, নীলু যাত্রাদলের গান না শিখেও কেমন গাইতে পারে।

তাই নীলু কতকটা উপেক্ষার ভঙ্গিতে বলে—তুই কলের-গানে যে গানগুলো হয় সেগুলো জানিস।

মুচকী হেসে রাসু বলে—বল্ না, কোন্ গান তুই শুনতে চাস্?

—কি আশ্চার্য এ যে সেগুলো জানে দেখি, নীলু মনে মনে

বলে। আবার কেমন যেন সন্দেহ হয় তার। রাস্থ মিছে বড়াই করছে না তো? আবার ভয়ও হয়, যদি ও সত্যিই জেনে থাকে!

তাই সে ভয়ে ভয়ে বলে—আমার কৃষ্ণকানাই এলো, গানটা জানিস্?

রাস্থ বলে—হ্যাঁ জানি। শোন্ তবে। চুপ করে বস্। গান গাইতে হলে ধ্যান করার মতই বসতে হয়, আবার শুনতে হলেও তাই। গানের মাষ্টার আমাদের তাই শিখিয়েছেন।

নীলু চুপ করে বসে। রাস্থ চোখ বন্ধ করে গলা পরিষ্কার করে তারপর শুধু সুরটা একটু গলায় ভাঁজল। সেই সুর শুনে নীলু চম্‌কে উঠল। মনে মনে বলে—আঃ, কি মিষ্টি!

তারপর রাস্থ অতিউচ্চ কণ্ঠে আস্তে আস্তে যথাযথ আবেগ দিয়ে পুরো গানটা গেয়ে গেল। গানের সঙ্গে সঙ্গে তার নানা অভিব্যক্তি তার চোখে মুখে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঝরে ঝরে পড়তে লাগল। নীলু স্পষ্ট দেখতে পেল, তার মুখে সেই দেবদূতের এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ খেলে বেড়াচ্ছে।

গান কখন শেষ হয়েছে, খেয়াল নেই নীলুর। রাস্থর কথায় চমক ভাঙ্গে। রাস্থ বলছে—গলা ছেড়ে গাইতে পারলাম না তো। গলা ছেড়ে গাইলে আরও ভালো লাগত তোর।

নীলু ভেবে পায় না, এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে? এযে রেকর্ডের গানের চেয়েও মিষ্টি। সুরের দেবকন্যাদের কাউকে সে দেখে নি কিন্তু এই রূপবান ছেলেটিকে শাড়ী পরিয়ে মেয়ের সাজ দিলে কি সেই দেবকন্যা হয়ে যাবে না? তারা এর চেয়ে বেশী সুন্দর হতেই পারে না।

রাস্থ একটু পরে বলে—এবারে তুই একটা গা, নীলু।

এক ঝলক লজ্জা এসে নীলুকে ঘিরে ধরল। এই গানের কাছে তার গান যে কোকিলের কাছে কাকের গানের মত মনে হবে, তা সে বিলক্ষণ জানে। সে কিছুতেই গাইতে চাইল না। কিন্তু রাস্থ বলে চলে—তুই গা' না। ভুল হলে আমি শিখিয়ে দেব।

তবু নীলু কিছুতেই গাইতে পারে না। গাইবে কি? তার গলা কে যেন চেপে ধরেছে। সে পড়েছে দ্বিধায়। রাস্থকে সে ভালোবেসে ফেলেছে। তার অনুরোধ না রাখলে সে মনে কষ্ট করতে পারে। এ কথা ভেবেও নীলু গাইতে পারল না। বসে বসে নতমুখে শুধু লজ্জায় ঘামতে লাগল। এই অস্বস্তিকর পরি-বেশ থেকে মা এসে তাকে শেষে উদ্ধার করল।

—ওমা তুই এখানে এতক্ষণ রাস্থর সঙ্গে গল্প করছিস্— রমলা বলেন,—আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম উঠে দেখি, তুই নেই। এবারে আয়, দুধ মুড়ি খেয়ে নিবি। রাস্থ তুইও আয় নীলুর সঙ্গে খাবি।

রাস্থ উঠতে পারে না। সে লজ্জা পেয়েছে।

নীলু রাস্থর হাত ধরে টানতে টানতে বলে—চল্ না।

রমলা ছেলেকে তিরস্কার করে বলেন—ও কি, রাস্থ তোর চেয়ে কত বড়। ওকে দাদা বলবি।

নীলু লজ্জা পায় খুব! রাস্থও!

রমলা সস্নেহে রাস্থর দিকে চেয়ে বলেন—লজ্জা কি বাবা? আমি তোমার মায়ের মত। মার কাছে কি ছেলে লজ্জা করে?

রাস্থ অবাক চোখে রমলার দিকে চেয়ে বলে—মা।

নীলু রাস্থর হাত ধরে প্রবল ঝাঁকি দিয়ে বলে—হ্যাঁ তো। মা তো বলল, তোর মা হবে বলে। তোর তো নিজের মা নেই। আমার মা তোর মা হবে।

রমলা নীলুর দিকে একবার সস্নেহে দৃক্‌পাত করে রাস্থর হাত ধরে টানেন। বলেন—এসো, আমার সঙ্গে।

রাস্থ আর ধরে রাখতে পারে না নিজেকে। সে সব কিছু ভুলে রমলার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে—মা, মাগো···

রমলা রাস্থর মাথায় চুম্বনের স্নেহচিহ্ন এঁকে দিয়ে বলেন— হ্যাঁ বাবা, আমি মা। তুমি আমার নীলুর মতন—নীলুর দাদা।

আর নীলু হাততালি দিয়ে বলে ওঠে—কি মজা, কি মজা! আমার ভাই ছিল না, ভাই হল! কি মজা!···

॥ দশ ॥

রাসু সেদিন সন্ধ্যেবেলায় বিদায় নিয়ে চলে গেলে নীলুর খুব মন খারাপ হয়ে গেল। নীলু ভেবে নিয়েছিল, রাসু এরপর তাদের বাড়ীতেই থেকে যাবে। মায়ের কাছে তারপর বায়না ধরল নীলু—রাসু কেন থাকল না ?

এই সুন্দর ছেলেটিকে ছেড়ে দিতে রমলারও বুঝি প্রাণ চায় না। কিন্তু পরের ছেলেকে নিজের কাছে রাখব বললে তো রাখা যায় না। তার বাপ রয়েছে। বাপ মতামত না দিলে কি চলে ?

রমলা ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—তোর বাপ কে বলি, ওর বাপের সঙ্গে কথা বলুক।

নীলু কিন্তু তবু খুব মনমরা হয়ে রইল। কিন্তু বেশীক্ষণ সে ভাবতে পারল না। এক সময় ঘুমে তার চোখ দুটো জুড়িয়ে এল। সেদিন রবিবার বলে সুরেশ পণ্ডিত পড়াতে আসেন নি। নীলু শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে গেল। রান্না শেষ করে রমলা ছেলেকে কয়েকবার খেতে ডাকলেন কিন্তু নীলু কিছুতেই উঠল না। ছেলের মন যে বেজায় খারাপ হয়েছে, সে কথা রমলাও বুঝেছিলেন। তিনি সে রাতে তাই নীলুকে খাবার জন্য বেশী আর পীড়াপীড়ি করলেন না। নীলুর সে রাতে আর খাওয়া হল না।

কিছুদিন পরে নির্মাল্য দাস কোলকাতা থেকে ফিরে এলেন এবং রিহার্সেল আবার যথারীতি পুরোদমে সুরু হয়ে গেল। রোজ সন্ধ্যে-বেলায় নীলুদের দোকানঘরের দক্ষিনের বারান্দায় রিহার্সেল চলতে লাগল। রাসু রোজই রিহার্সেলে আসছে। রাসু তার বাড়ীতে না থাকুক, সে রোজ আসছে, এতেই নীলুর আনন্দ। রাসু ক্যানেলের

ওপারের তার পিসে—শচী রায়ের বাড়ী থেকেই রোজ যাওয়া আসা করছে।

অবশ্য রোজ যে ফিরে যেত তা নয়। যে দিন বেশী রাত হয়ে যেত সেদিন রমলা তাকে যেতে দিতেন না। নীলু ও রাস্থ সেদিন এক সঙ্গে খেত, এক বিছানায় শুত।

শংকরীপ্রসাদের বাড়ী তখন জমজমাট। সন্ধ্যেবেলা অন্ততঃ তিরিশ চল্লিশ জন লোক তাঁর বাড়ীতে জমায়েত হতেন। সকলেই থিয়েটারের প্লেয়ার ছিল না। অনেক পাড়া প্রতিবেশী দর্শক হিসাবেও উপস্থিত হত। এ বাদে দোকানের খরিদ্দাররা তো ছিলই। আরো ছ দশ জন আসতেন গান বাজনার আসর জমাবার জন্য।

এত সমস্ত লোকের মধ্যে যাঁরা বিশিষ্ট, রমলা তাঁদের জন্য চা পাঠাতেন। তা ছাড়া মুড়ি, নারকেল কোরা, লুচি, হালুয়া, কোন সময় বা তেলমুড়ি পিয়াজ এসবও অন্যান্যদের জন্য তিনি পাঠাতেন। মানদা বুড়ী এ ব্যাপারে তাকে যথেষ্ট সাহায্য করত। হরির কাজ ছিল খাবার-দাবার বয়ে নিয়ে যাওয়া আর তামাক সাজান।

এ সবের জন্য খরচ বড় কম হত না। তবে তখন সত্যই লক্ষ্মী শংকরীপ্রসাদের উপর কৃপাদৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাই তাঁর কৃপায় তিনি সকলের অভ্যর্থনায় কুণ্ঠিত হতেন না। সেই বছরই তিনি শুধু মাত্র পাটের ব্যবসাতে প্রায় আট হাজার টাকা লাভ করেছিলেন।

এত সমস্ত লোকের পরিচর্যার মধ্যে রাস্থর ব্যাপারটা কিন্তু ছিল অন্যরকম। রমলা তাকে রান্নাঘরেই ডেকে পাঠাতেন। ভালোমন্দ ঐ রান্নাঘরে রমলার পাশে বসেই সে খেত—কখনও নীলুর সঙ্গে, কখনও বা একা।

পড়ানোর ব্যাপারে সুরেশ পণ্ডিত চিরকালই কড়া ছিলেন। তাঁর পড়া শেষ না করে নীলুকে রিহার্সালের ওদিকে যাওয়ার উপায় ছিল না। তবে তিনি একটু সুবিধাও তাদের জন্য করে দিয়েছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি আসতেন আর তাই তাদের ছুটিও মিলত বেশ

আগেভাগে। রিহার্সেল যতদিন চলেছিল ততদিন এই ব্যবস্থাই তিনি করেছিলেন।

শেষের দিকে ঐ দক্ষিণের বারান্দায় রিহার্সেল হত শুধু রাতের দিকে। আর দুপুর বেলায় সেখানে চলত নাচের মহড়া। থিয়েটারে যারা সখি-সেজে নাচবে তাদের নাচ শেখানো হত এখানে। নাচের জন্য এক মাষ্টার এসেছিলেন। তাঁর বাড়ী নন্দীগ্রাম না কোথায় যেন।

একদিন দুপুর বেলায় রানী আর নীলু জাফ্‌রীর ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে নাচের মাষ্টার ছড়ি হাতে বসে রয়েছেন আর একদল ছেলে নাচছে। ছেলেগুলো সকলেই নীলুর চেয়ে বড়। তাদের অনেককেই নীলু চেনে। কেউ কেউ তাদের জমি চাষ করে। তাদের ময়লা কাপড় চোপড়, ফাটা-ফাটা হাত পা দেখে নীলু হতাশ হয়। সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না, এরা ষ্টেজে নাচলে কিরকম লাগবে দেখতে।

সঙ্গে সঙ্গে তার রাম্বুর কথা মনে হয়। সে মনে মনে বলে—হ্যাঁ, অমন চেহারা নিয়ে ষ্টেজে নাচলে, সেটা একটা দেখবার জিনিষই হবে বটে।

আঙ্গুল দেখিয়ে রাণীকে নীলু বলে—দ্যাখ্ দ্যাখ্ ঐ ছেলেটাকে দ্যাখ্-ওর গোঁফে চুল বেরিয়েছে দ্যাখ্। ও সখি সেজে নাচলে কি রকম লাগবে রে ? দূর্, হিঃ হিঃ হিঃ—

রানী ফিস্ ফিস্ করে বলে—আরে, গান করার আগে ওর গোঁফ দাড়ি সব ছেঁটে দেবে। তখন রং মাখিয়ে, শাড়ী পরিয়ে, এমন সাজিয়ে দেবে, না,—তুই চিন্‌তেই পারবি না। তোদের বাড়ীতে সেবার যখন বেহুলা ভাসান পালা হল, সেবার দেখলি, না ?—যে বেহুলা হয়েছিল সে অত সুন্দর নয়—আমি পালা গানের পরদিন দেখেছি, ছেলেটা তোদের গোয়ালঘরে শুয়েছিল। তার মুখে কিছু কিছু বসন্তের দাগ ছিল।

নীলুর এখন ঠিক মনে পড়ছে না সেই সতী বেহুলা সত্যিকারের

দেখতে কিরকম ছিল। সহসা গানের মাষ্টারের গলায় নীলু চমকিয়ে ওঠে।

—এ্যাই, ফের তোর গোড়ালী মাটিতে ঠেকছে, গানের মাষ্টার প্রচণ্ড শব্দে একটা ছেলের পায়ের গোড়ালীতে মোটা ছড়িটা দিয়ে আঘাত করে বলেন—ফের যদি হয় তো, তোর গোড়ালীটা একেবারে মারতে মারতে ভেঙ্গে দেব, হারামজাদা।

ছেলেটা মারের চোটে 'মাগো' বলে কঁকিয়ে উঠে দেয় লাফ। তার সার্কাস দেখে অন্য ছেলেরা নাচ থামিয়ে দেয়। কেউ কেউ হাসে।

দূরে যে মাষ্টার হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিলেন তিনি অমনি হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন—এ্যাই, তোরা থামলি কেন? ধর, গান ধর।

হারমোনিয়ামে সুর বেজে চলে। ছেলের দল গান ধরে আবার। সঙ্গে সঙ্গে নাচেও। নেচে নেচে তারা গান করে। তাদের পায়ে বাঁধা ঘুঙ্গুরের বোল যেখানে শমে এসে ঠেকে, সেখানে তবলায় জোর চাঁটি পড়ে। হারমোনিয়াম যিনি বাজাচ্ছেন, তার পাশে অল্পবয়সী এক ছেলে তবলা বাজাচ্ছিল। গানের সুরটা নীলুর ভালো লাগল। গান হচ্ছে :—

'ওরে ও, বনের হরিন লুকিয়ে কেন
থাকিস বনের মাঝে।
আয় ছুটে আয়, করবি খেলা,
আয়, আমাদের মাঝে।'

কেউ বোধ হয় বেসুরো নেচেছে। তাই তাল কেটে গেল। অমনি নাচ গান দুই বন্ধ হয়ে গেল। নীলুও তালে তালে আপনমনে মৃদুস্বরে বেশ গাইছিল। তাল কেটে যাওয়ায় তারও বিরক্তি লাগে।

নাচের মাষ্টার আবার একজনের কোমরে মেরেছে ছড়ির এক গোত্তা। আর বলছেন—বেটা, চাষার বাচ্ছা আবার নাচবে? চামচিকের সখ হয়েছে, হাতির পিঠে হাওদায় চড়ে হাওয়া খেতে যাবে? যা মাঠে যা—

সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছেলেটির কোমরে আর এক ঘা কষিয়ে বলেন—কোমরটা আরও ডাইনে বাঁকবে। ব্যাটা চাষা, মাথায় যখন বিচালির বোঝা চাপিয়ে মাঠ থেকে খামারে যাস তখন কোমরটা কিরকম দোলে রে? দেব, মাথায় একমনি বাট চাপিয়ে, তাহলে কোমর ঠিক দুলবে। ধর, ব্যাটা ধর।

আবার নাচ-গান সুরু হয়ে যায়, বেশ চলছে এবার। নীলুরও বেশ মজা লাগছে। একটা কথা সে ভেবেই যাচ্ছিল যে, ইস্কুলে পড়াবার সময় পণ্ডিত মশায়েরা তাদের যে ভাবে বকেন, মারেন, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে আপ্যায়িত করেন, নাচের মাষ্টারও নাচ শেখাবার সময় অবিকল সেই রকম করে চলেছেন। সে ভেবে পায় না, নাচ-গান শেখাটা কি করে পড়াশুনার মত একই পর্য্যায়ে পড়তে পারে। সে ভাবে, গানটা হলেও হতে পারে কিন্তু নাচটাকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। এবং এটা শেখার জন্য মার খাওয়াটা তার কাছে কিরকম যেন একটা ছেলেমানুষীর ব্যাপার বলে মনে হতে লাগল।

একসময় নাচ-গান সব থেমে গেল। ছেলের দল সকলে চলে গেল, একজন ছাড়া। সে হল রাধানাথ। নীলু চেনে তাকে। সকলে তাকে 'রাধা' বলেই ডাকে, আবার যে সব মেয়েদের স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনদের কারোর নাম রাধা, তারা রাধাকে রাধা না বলে 'আধা' বলে ডাকে। রাধা খাট মাঝি পদ্মলোচনের ছেলে। সে প্রায় নীলুর বড়দার বয়সী; কি তার চেয়ে কিছু বড়ই হবে।

থিয়েটারে রাধার নাকি একটা কৌতুক নাচ আছে। সেখানে রাধা হবে এক জেলেনী। সে তার স্বামীর উপর অভিমান করে একটা হাসির গান গাইবে। এটা নীলু রাসুর কাছে জেনেছিল। নাচের মাষ্টার এবার সেটির মহড়া দেবার জন্য রাধকে একক নৃত্য করতে আদেশ করলেন। রাধা নেচে নেচে গান ধরল—

'কথা বলব না, ও, কথা বলব না রে।
ফিরিয়ে নে তোর রূপোর বাজু

পরব না রে, পরব না।

কথা বলব না—'

রাধা গালে ডান হাতের তর্জনী ছুঁইয়ে অঙ্গভঙ্গি করে হেলে-দুলে বেশ গাইছিল। বেশ লাগছিল নীলুর। কিন্তু নাচের মাষ্টারের রাধার নাচ বুঝি মোটেই পছন্দ হল না। তিনি দাঁত মুখ ভেংচিয়ে বলে উঠলেন—আহা, মরে যাই আমার রে! মুখে আগুন তোর, মুখপোড়া।

রাধা নাচ-গান থামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। নীলু ভাব্‌ছিল নাচের মাষ্টার বড় নীরস লোক। কিন্তু না, তা নয়—তিনি যে রসিক নীলু তখনই তার প্রমাণ পেল। নাচের মাষ্টার রহস্য করে হেসে হেসে বলতে লাগলেন—মাগী, অমন করে বললে তো তোর ভাতার বলবে, না পরলি তো আমার বড় বয়ে গেল।

নীলু ও রানী এখানে খুব জোরে হেসে ওঠে। নাচের মাষ্টার চোখ পাকিয়ে তাদের দিকে ঘুরে তাকান। তারা চুপ করে যায়। একটু পরে নাচের মাষ্টার নেচে নেচে গানটা গেয়ে রাধাকে দেখাতে লাগলেন। ঐ রকম একটা বড় লোকের নাচ দেখে নীলু ও রানী আর হাসি চেপে রাখতে পারে না। তারা এবার খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে।

নাচের মাষ্টার নাচ থামিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে বলেন—কিরে, খুব যে হাসি তোদের। এ্যাই রাধা, যা তো ওদের দুটোকে ধরে আন্‌ তো দেখি। যা, যা—তোকে আর নাচতে হবে না। ঐ দুটোকে জেলে আর জেলেনী সাজালে, বেশ মানাবে দুটিতে।

সবাই হেসে ওঠে। নীলু ও রানী আর দাঁড়ায় না, দৌড়িয়ে পালায়।

রিহার্সেল কাল ক্রমে শেষ হয়ে আসছে। আর অল্পদিন পরেই নাকি হবে ষ্টেজ রিহার্সেল। ষ্টেজ রিহার্সেল যে আসল থিয়েটারের পুরো মহড়া, তা নীলু রাসুর কাছেই জেনেছিল।

নীলু এখন থিয়েটারের অনেক খুঁটিনাটি রাসুর কাছ থেকে জেনেছে!

ইতিমধ্যে একদিন তার বাবার সান্ধ্য মজলিশে এক বিখ্যাত অন্ধ গায়ক এলেন। নীলু বিখ্যাত অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে বা কানাকেষ্ট-র নাম শুনেছে। তাঁর রেকর্ডও তাদের বাড়ীতে আছে—

'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু ঐখানে থাক।'

নীলু রাসুর কাছে শুনেছে, অন্ধ হলে নাকি ভাল গাইতে পারে। এই অন্ধ গায়কও যে কম বিখ্যাত নয় তা বোঝা গেল যখন তাদের গ্রাম ও পাশের গ্রামগুলো থেকে প্রচুর লোক তাঁর গান শোনার জন্য সন্ধ্যেবেলায় দোকানঘরে এসে হাজির হল। তাঁর সম্মানে সেদিন রিহার্সেল বন্ধ রইল। বলা বাহুল্য, সুরেশ পণ্ডিতও সেদিন নীলুদের ছুটি দিলেন। অনেকগুলো পেট্রোম্যাক্স, ঢাকাই লণ্ঠন সেদিন জ্বালা হল। নীলুদের শাপ্‌লা গাঁয়ের দু একজন ছোট বড় গাইয়ে বাজিয়ে লোকও সেদিন গানের আসরে উপস্থিত ছিলেন।

তখনকার দিনে যে সব জিনিসের সাহায্যে নির্মল আনন্দ বিতরণ হত। এ ধরনের মজলিশী গানের আসরও তাদের মধ্যে ছিল অন্যতম' লোকে পরনিন্দা পরচর্চা যেমন করত, তেমনি বড় বড় ওস্তাদদের গানও শুনত। তবে সে সব গান ছিল রাগাশ্রয়ী বা ভক্তিমুলক গান। আধুনিক যুগ তখনও আসে নি। তাই আধুনিক গানের নামও তখন শোনে নি লোকে।

সবাই মন্ত্র মুগ্ধের মত অন্ধগায়কের গান শুনছিল। বেশীর ভাগ ভক্তিমুলক গানই সেদিন গেয়েছিলেন তিনি। দু একটি গান হল:—

'বলরে জবা বল
কোন সাধনায় পেলি শ্যামা
মায়ের চরণতল।'...

এই বিখ্যাত গানটি নীলু তারপর অনেকবার শুনেছে। আজও শোনা যায়।

অপর গান দুটি ছিল :—

'মা হবি না মেয়ে হবি
দে মা আমায় বলে।···

এবং

খেলিছ এ বিশ্বালয়ে
নিরজনে প্রভু নিরজনে খেলিছ।'···

এগুলো সে সময়ে অনেকের মুখে মুখে ফিরত। আজকাল শোনা যায় না, কিন্তু সেদিন অন্ধগায়কের কণ্ঠে নীলু যে এক আশ্চর্য মন-উদাস করা গান শুনেছিল, তা, আর কোনদিন নীলু শোনে নি কোথাও। সুরটার নাম ভাটিয়ালী—মাঝিদের গান, গানের ভাষা আর সুরের মধ্যে ছিল কি এক বেদনার নির্ঝরিণী যা আজো কানে বাজে। তবে ভাষা হয়ত সবটা মনে নেই।

আরো পরে নীলু বুঝেছিল, এ ছিল সেই মহাজীবনের গান। গানের সুরটা তাই নীলু আজো মনে রেখেছে—

'অকুল গাঙে ভাষায়ে তরী
কোন্ দেশেতে যাওরে মাঝি—কোন্ দেশেতে যাও ?
ডাক্‌ছে তোমায় পারের পথিক,
(তুমি) তারে সাথে নাওরে মাঝি—তারে সাথে নাও।

* * * *

আকাশ পথে যায় পাখীরা বিদায় গীতি গেয়ে।
পান্থরবি বিদায় মাগে সাঁঝের পানে চেয়ে।
জ্বল্‌বে যখন পারের আলো,
ঘুচবে তখন আঁধার-কালো।
(তুমি) তারই সাথে সুর মিলায়ে পারের গীতি গাও।
কোন্ দেশেতে যাও।'

সবাই ধন্য ধন্য করে উঠেছিল তাঁর এই প্রাণ-মন মাতানো গানে। শংকরীপ্রসাদ অন্ধ গায়ককে একটি ধুতি, একটি শাল ও পাঁচ টাকা দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।

সেই বিখ্যাত আসরে অপর দুজন বিশিষ্ট গায়ক ছিলেন শাপলা গ্রামেরই। একজন ছিলেন মনো দা। নীলু জানত, মনো দার সংগীতে নাকি প্রগাঢ় বুৎপত্তি। তিনি গেয়েছিলেন—

'পাগ্‌লা মনটারে তুই বাঁধ্‌।
কেনই রে তুই হেথায় সেথায়
পাতিস প্রেমের ফাঁদ।'

গানটা ভালোই গেয়েছিলেন মনো দা। কিন্তু তাঁর অনাবশ্যক হাত-পা নাড়া, গাইতে গাইতে শমে এলে আধা শরীর উঠিয়ে আবার ধপ্‌ করে বসে পড়া, মাঝে মাঝে হারমোনিয়াম ছেড়ে দিয়ে তবলার উপর চাঁটি মারতে যাওয়া ইত্যাদি নানা অঙ্গভঙ্গি ও কসরতগুলো অনেকের কাছে হাসির খোরাক হয়েছিল। গানের গাম্ভীর্য, ভাবমাধুর্য ও সুরের আবেশ অনেকখানি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

এ গানও তখনকার দিনে খুব চালু ছিল। পরে বহুকাল শোনা যায় নি। আজকাল অনেকে আধুনিক সংগীতের উপর তিক্তবিরক্ত হয়ে পুরানোকালের সঙ্গীতস্রষ্টা ও সুরকারদের কবর থেকে টেনে তুল্‌ছেন। তাই এ সব গান আবার শোনা যাচ্ছে।

মনো দার গান শেষ হবার পর শংকরীপ্রসাদ রহস্য করে বললেন— কালোয়াতের পো, কালোয়াতিটা একটু কম করো। তবে গান জম্‌বে ভাল।

সকলে হেসে উঠলেন শংকরীপ্রসাদের রসিকতায়। অন্ধ গায়ক মনো দার গানের প্রশংসা করেছিলেন। তবে তিনি তো আর মনো-দার অঙ্গভঙ্গি এবং বিকট মুদ্রাগুলো দেখতে পান্‌ নি। তাই হাসির কথাগুলো শুনে শংকরীপ্রসাদকে বললেন—উনি বুঝি হাত-পা একটু বেশী নাড়েন ?

শংকরীপ্রসাদ হেসে বলেছিলেন—হ্যাঁ, বাবাজীর আমার গলা আর তালজ্ঞান যতটা বশে, হাত-পা গুলো ততটা বশে নয়।

তাঁর কথায় আবার হাসির ঢেউ খেলে যায় আসরের মাঝে। মনো দা লজ্জিত হয়ে পড়েন। শংকরীপ্রসাদ তখন মনো দার গানের

গল্প সকলকে শোনালেন,—মনো দা নাকি বিয়ের পিঁড়িতে বসে সানাইয়ের সুরে সুরে তালে তালে এমনভাবে মাথা দুলিয়েছিলেন যে বার বার মন্ত্র পড়তে ভুলে যাচ্ছিলেন। তখন পুরোহিত নাকি শেষে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—গান বাজনার বিদ্যেটা শেষ করে বিয়ে করতে এলে তো পারতে, বাপু। শোনা যায় পুরোহিতের ঐ তিরস্কারেও নাকি বিশেষ ফল হয় নি। শেষে নাকি পুরোহিত সানাই বাজান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিতে বাধ্য হন, তবে বিয়ের অনুষ্ঠানটা শেষ পর্যন্ত হতে পারল!

প্রবল হাস্যরোলের মধ্যে শংকরীপ্রসাদ হাসতে হাসতে কাহিনী শেষ করেন।

সেদিনের আসরের দ্বিতীয় বিশিষ্ট শিল্পী হলেন পূর্ণেন্দু কাকা, তিনি তখন বয়সে একেবারেই তরুণ। তিনি গেয়েছিলেন দুটি অপূর্ব রবীন্দ্র সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথ তখনও জীবিত। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছুই নীলু জানত। তিনি যে বিখ্যাত গায়কও তাও জানত সে। তবে তখন শাপলার মত অজগ্রামে রবীন্দ্রনাথ যতটা তাঁর কবিতা গল্প এবং অন্যান্য সাহিত্য কর্মের মধ্য দিয়ে বিদগ্ধজনের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন ততটা তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের গানকে তখন রবীন্দ্রসংগীত না বলে রবিবাবুর গান বলে বলা হত।

এ কথা নীলুর পরিষ্কার মনে আছে, রবীন্দ্রনাথকে তখন বেশীরভাগ লোকে জানত মহাকবি বা বিশ্বকবি বলে। তিনি যে মহাদেবের মত সংগীতস্রষ্টা এবং সুগায়কও, তা খুব কম লোকেই জানত। সেটি ছিল ইং ১৯৪০ সাল।

নীলুর মহাজীবন পরিক্রমায় পূর্ণেন্দু কাকার সে দিনের গাওয়া দুটি রবীন্দ্র সঙ্গীত এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। তার মহা-জীবনের গান, সে ও দুটি গানকে বাদ দিয়ে কল্পনাও করতে পারে না। গানগুলি এখন অনেকেই গায়। নীলু নিজেও গায়। মরার আগে পর্যন্ত গাইবে। এই গান দুটির সঙ্গে যে এক বিয়োগ ব্যথা জড়িয়ে

আছে তার নিবৃত্তি বুঝি ইহজীবনে আর হবে না। যদি কোন-দিন বিস্মৃতি এসে তার মনের সমস্ত রবীন্দ্রভাবনাকে মুছে দিয়ে যায় তবুও সে ঐ গান দুটিকে মুছে ফেলতে পারবে না, কিছুতেই না। সে কাহিনী যথাস্থানে।

যে বয়সে ও দুটি গান শোনা, সে বয়স আর কোনদিন ফিরে আসবে না। তখন গান দুটো যে দাগ তার মনের গভীরে কেটেছিল সে দাগ আর ইহজীবনে মুছে যাওয়ার নয়। তারপরে কত কত বার তো এ গান দুটো সে শুনেছে কিন্তু সেই প্রথম পূর্ণেন্দু কাকার গলায় শুনে যে তৃপ্তি সে পেয়েছিল তা পাওয়া আর শত চেষ্টাতেও বুঝি সম্ভব নয়—এক যদি স্বয়ং বিশ্বকবি আর্যলোক থেকে এসে তাকে শুনিয়ে যান্ তো, অন্য কথা।

গান দুটি ছিল :—

'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান।'··

এবং

'দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে—'··

পূর্ণেন্দু কাকা প্রায়ই তাদের বাড়ীর গানের আসরে আসতেন। শংকরীপ্রসাদের নির্দেশে পূর্ণেন্দু কাকা পরে রাসুকে ঐ দুটি গান শিখিয়েছিলেন। শুনে শুনে নীলুরও শেখা হয়ে গিয়েছিল। আজো সে অবিকল নিখুঁত সুরে গাইতে পারে।

গান দুটো নীলু কেন, নীলুদের প্রিয় হয়ে গেল রানীও মোটামুটি গাইতে পারত। কালা গাইতে পারত না কিন্তু সে তার বাঁশের বাঁশীতে গানের সুর চমৎকার তুলতে পারত। কালা নিজেই বাঁশী বাজাতে পারত। নীলুকেও দিয়েছিল একটা, কিন্তু নীলু বাজাতে পারত না। সে সব আরো পরের কথা।

সেই বিখ্যাত গানের আসরের চার-পাঁচ দিন পরে এক রবিবার দুপুরে হল সেই ষ্টেজ রিহার্সেল। নীলুদের ইস্কুল ঘরে নকল ষ্টেজ তৈরী করে রিহার্সেল হল, অনেকের সঙ্গে নীলু, রানী, পুলিন ও কালা গিয়েছিল। প্লেয়ারদের কারোরই কোন মেক্‌আপ ছিল না। তাই

নীলুর দেখতে বেশ মজা লাগছিল, বিশেষ করে সীতাকে দেখে। সীতা সেজেছিল নগেন দা। নগেন দা বোধ হয় তার আগে চার পাঁচদিন দাড়ি গোঁফ কামায় নি। গোটা মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভর্ত্তি। নগেন দা যখন ঐ মুখ নিয়ে মাথায় ধুতির একটা অংশ ঘোমটার মত তুলে দিয়ে পার্ট করছিল তখন সকলেই হাসাহাসি করছিল।

. গোপাল কাকা সেজেছিল রাম। তাঁকে মানিয়েছিল চমৎকার। তাঁর লম্বা চেহারা, ফর্সা রং, আয়ত চোখ, সুন্দর মুখশ্রী আর মেদবিহীন দেহ—সমস্ত মিলিয়ে তাঁকে বাল্মীকির রামের মতই মনে হয়েছিল।

দর্শকদের হাসাহাসিতে গোপাল কাকা বিরক্ত হয়ে নগেন দাকে বলেছিলেন—তুমি ধুতিটা শাড়ীর মত করে না পরে দাড়িটা কামিয়ে এলে পারতে। তোমাকে সীতা বলে মনে করে রামের পার্ট তো করতে পারছি না। মনে হচ্ছে, বই-এর শুরুতেই তোমাকে পাতালে পাঠিয়ে দিই।

সকলের অট্টহাসিতে ইস্কুল ঘরের ভিতও বুঝি কেঁপে যায়।

একদিন পরে হল বহু প্রতিক্ষীত আসল থিয়েটার দু'রাত হল। প্রথম রাতে 'সিরাজদ্দৌলা' ও দ্বিতীয় রাতে 'সীতার পাতাল প্রবেশ'। থিয়েটার হয়েছিল ইস্কুলের পুকুরের উত্তর পাড়ের বিরাট ফাঁকা জায়গায় ষ্টেজ তৈরী করে এবং ত্রিপল টাঙ্গিয়ে। কত যে লোক হয়েছিল তার ঠিক নেই।

ঐ থিয়েটার দেখা নীলুর জীবনের অবিস্মরণীয় ঘটনা। নির্মাল্য দাস অভিনীত সিরাজদ্দৌলা এক কথায় অপূর্ব। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল রাজকীয়। মঞ্চের উপর একটা বেদী ছিল। তার উপরে ছিল সিংহাসন। তিনি অপরূপ দৃপ্ত ভঙ্গিমায় ছুটে এসে সিংহাসনে বসতেন। এই বিশেষ কায়দাটি তিনি ষ্টার থিয়েটারে দেখে রপ্ত করেছিলেন। মহম্মদী বেগ যে দৃশ্যে নবাবকে হত্যা করে, সে দৃশ্যে নির্মাল্য দাসের অভিনয় ভোলার নয়।

দুটি বই-ই অসম্ভব রকমের সফল হয়েছিল। প্রতিটি অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয় সার্থক ও সুষ্ঠু হয়েছিল। অবশ্য অভিনেত্রীরা

পুরুষই, তখনকার দিনে মেয়েদের যাত্রা থিয়েটার করা কল্পনার বাইরে। লোকে তখন বরং চাঁদে যাবার কথা কল্পনা করতে পারত কিন্তু এ জিনিস কখনই নয়। এই সাফল্য পুরোপুরি নির্মাল্য দাসের পরিচালনাগুণে সম্ভব হয়েছিল।

'সীতার পাতাল প্রবেশ' বইতে রাস্থু সেজেছিল ধরিত্রী। মঞ্চের নীচ থেকে সিংহাসন হাতে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে এসেছিল মাতা ধরিত্রী কন্যা সীতাকে গ্রহণ করার জন্য। ধরিত্রীর পরনে ছিল শ্বেতশুভ্র পোষাক। অপূর্ব মানিয়েছিল রাস্থুকে। গানটা আর নীলুর মনে নেই দৃশ্যটির পরিকল্পনা ছিল নির্মাল্য দাসের। রাস্থু বাজীমাত করেছিল।

থিয়েটারে কেবল একটাই অঘটন ঘটেছিল। যে মোহম্মদী বেগ সেজেছিল তার নাম শ্রীপতি। চেহারাখানা মোহম্মদী বেগের মতই। তার রং ছিল আবলুষ-কালো, বেশ লম্বা, চোখ দুটো লাল আর কোঠরগত। এক কথায় তার মঞ্চে অভিনয়ের জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন মেক-আপের প্রয়োজন ছিল না। তবু তাকে মেক-আপ দিয়ে একেবারে ঘাতক সাজান হয়েছিল।

নির্মাল্য দাস, জানতেন শ্রীপতি অতি উৎকট ধরনের লোক। তাকে ঐ ভূমিকায় নামানোর একমাত্র কারন ছিল তার চেহারাখানা। তবু তিনি সাবধানতা অবলম্বনের জন্য তার হাতে প্রচলিত টিনের তলোয়ার দেওয়ার অনুমতি দেন নি। পিচ বোর্ডের উপর রাংতা কাগজ চড়িয়ে তার জন্য আলাদা তলোয়ার তৈরী হয়েছিল।

নির্মাল্য দাসের অনুমান ঠিক। শ্রীপতি সার্থক অভিনয় করেছিল। সে ঐ পিচ বোর্ডের তলোয়ার দিয়ে নবাবের কণ্ঠদেশের চামড়া তুলে দিয়েছিল অভিনয়ের আবেগে। নির্মাল্য দাস নাকি অভিনয়ের শেষে মন্তব্য করেছিলেন যে, যদি তিনি শ্রীপতির হাতে টিনের তলোয়ার তুলে দিতেন তবে নবাব সত্যসত্যই খুন হতেন, সন্দেহ নেই। সেই থেকে শ্রীপতির নামই হয়ে গেল মোহম্মদী বেগ। নামটা বোধ হয় আজও চালু।

থিয়েটার ভালোয় ভালোয় শেষ হল। নীলু অধীর হয়, রাস্থ কখন সত্যসত্যই তাদের বাড়ীতে থাকতে আসবে। অবশেষে এলো সেই পরম লগ্নটি। একদিন রাস্থকে নিয়ে রাস্থর বাবা এলেন তাদের বাড়ীতে। শংকরীপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর কি সব কথা বার্ত্তা হল। সেদিন থেকেই রাস্থ পাকাপোক্তভাবে তাদের বাড়ীতে রয়ে গেল।

নীলুর আনন্দ ধরে না। রাস্থর জন্য নতুন জামা কাপড় এল। একেবারে নীলুর মতই সেগুলো। রমলা ও শংকরীপ্রসাদ নিজের ছেলের সঙ্গে কোন ব্যাপারে রাস্থর কোনরূপ পার্থক্য রাখলেন না। বাইরের কেউ তাদের তুজনকে দেখলে বুঝতেই পারতনা যে তারা সহোদর ভাই নয়।

॥ এগার ॥

কয়েকদিন পর থেকেই রাসু নীলুর সঙ্গে ইস্‌কুলে যেতে লাগল। রাসু নীলুর চেয়ে বছর ছ'য়েকের বড়। যাত্রাদলে যাওয়ার আগে রাসু ইস্‌কুলে কিছুদিন পড়েছিল। তারপর অনেক বছর চর্চার অভাবে অনেক কিছুই ভুলে গিয়েছিল সে। পণ্ডিত মশায়েরা পরীক্ষা করে তাকে প্রথম শ্রেণীতে পড়ার অনুমতি দিলেন। তাই রাসু নীলুর চেয়ে অনেক বড় হয়েও তার এক ক্লাস নীচে পড়তে লাগল। রাতে বাড়ীতে সুরেশ পণ্ডিতের কাছেও পড়তে লাগল সে।

রাসুর প্রভাব নীলুর উপর পড়তে বেশী দেরী হল না। সে নীলুর ঠিক খেলার সঙ্গী ছিল না, তবু ঘরে বাইরে সে ছিল নীলুরই চব্বিশ ঘণ্টার সাথী। রাসু বেশীরভাগ খেলত তার বয়সের সঙ্গী সাথীদের নিয়ে আর নীলু তার বয়সী পুরানো সাথীদের সঙ্গে। এই একটা ব্যাপারে যা ছিল এক অদৃশ্য আড়াল। আড়ালটা দুজনের মধ্যে আপনা থেকেই কখন তৈরী হয়েছিল। ঐ এক জায়গা ছাড়া আর কোন ভাগ তাদের মধ্যে ছিল না।

এর কারণও ছিল। অন্য কিছু নয়—বয়সের যথেষ্ট তফাৎটাই। ফলটা দাঁড়াল এই, রাসু ক্রমে ক্রমে হয়ে গেল নীলুর বন্ধু ও অভিভাবক আর নীলু হয়ে গেল রাসুর বন্ধু, গুণগ্রাহী ও অনুগামী।

তখনকার দিনে গ্রামের লোকেরা সাধারনতঃ নানা পাড়ায় ভাগ হয়ে বাস করত। এক এক পাড়ায় থাকত এক এক উপাধিধারী বা বৃত্তির লোক। তারা ছিল, হয় এক পরিবারভুক্ত আর নয়তো ছোট ছোট শরীকে বিভক্ত। সম্পত্তির ভাগ, তস্য ভাগ করতে করতে তারা পাশাপাশি গায়ে গা লাগিয়ে বছরের পর বছর বাস

করে যেত। যখন আর পাশাপাশি বাস সম্ভব হত না তখন তাদের দু এক শরীক অন্য জায়গায় উঠে যেত। শাপলা গ্রামেও ছিল অনেক পাড়া—আচার্গপাড়া, মাইতি পাড়া, বেরা পাড়া, জানাপাড়া, রায়পাড়া ইত্যাদি।

আচার্গপাড়াটা ছিল নীলুদের চৌহদ্দি সংলগ্ন একেবারে। আট দশ বিঘা ভদ্রাসনের উপর দশ-বার শরীক দেওয়ালে দেওয়াল লাগিয়ে বা চালে চাল লাগিয়ে বাস করত। এই পাড়াতে ছিল সব বয়সেরই অনেক ছেলেমেয়ে। ওদের মধ্যে যারা ছিল রাস্বর সমবয়সী তারা রাস্বর সঙ্গে খেলত, যেমন নিমাই, প্রাণেশ, গুণরঞ্জন, প্রভৃতি। ওদের মধ্যে প্রাণেশ ছিল নীলুর বেশী অন্তরঙ্গ। সে নীলুর চেয়ে অল্প বড় ছিল। কিন্তু ঐ পাড়ার রাখাল আচার্গ ছিল নীলুর একেবারে প্রাণের বন্ধুদের অন্যতম।

এ বাদে আর একজন ছিল এই পাড়ায় যে ছিল নীলুর পাতানো বন্ধু। তারও নাম নীলু—নীলু আচার্য। নীলু তার বন্ধুর বাবাকে মেসোমশাই এবং তার মাকে মাসীমা বলে ডাকত। দুজনের নাম একই। তাই তাদের বন্ধুত্ব পাতানো হয়েছিল বটগাছকে সাক্ষী রেখে রীতিমত এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সে উপলক্ষে শংকরী প্রসাদ প্রচুর মিষ্টি বিতরন করেছিলেন।

এরা ছিল সব ক্যানেলের এপারের নীলুর সঙ্গী-সাথী, বন্ধু-বান্ধব। ওপারেও নীলু ও রাস্বর খেলার সঙ্গী-সাথীর অভাব ছিল না। নীলুর দুই জেঠা ভবানীপ্রসাদ ও হরপ্রসাদের কথা আগেই বলা হয়েছে। সেখানে গেলে নীলুর খেলার সাথী ছিল ছোড়দা কালীরঞ্জন, ও মেজদা মনোরঞ্জন।

ঐ খানেই ছিল রায়পাড়া—রাস্বর পিসেদের বাড়ী। রাস্বর পিসেরা চার ভাই। তাদের ঘরেও অনেক ছেলেমেয়ে। তাদের মধ্যে কিছু কিছু ছিল নীলুর খেলার সাথী আর কিছু ছিল রাস্বর খেলার সাথী।

এ বাদে নীলুদের ওপারের পুরানো বাস্তুতে আর এক শরীক ছিল।

তাঁর নাম রমা প্রসাদ। তিনি ছিলেন সেজতরফ। নীলুর ঠাকুর্দা হরিশংকরের এক ভাই ছিল মণিশংকর। হরিশংকরের তিন ছেলে— ভবানীপ্রসাদ, হরপ্রসাদ এবং শংকরীপ্রসাদ। আর মণিশংকরের মাত্র এক ছেলে—রমাপ্রসাদ। রমাপ্রসাদ বয়সে ছিলেন হরপ্রসাদের চেয়ে ছোট কিন্তু শংকরীপ্রসাদের চেয়ে বড়। তাই তিনি ছিলেন সেজতরফ। গ্রামের লোকেরা এঁদের যথাক্রমে বড়কর্তা, মেজকর্তা, সেজকর্তা এবং ছোটকর্তা বলে ডাকতেন।

রমাপ্রসাদের ছিল তিন ছেলে—শ্রীকান্ত, রমাকান্ত ও শ্যামাকান্ত। ওদের মধ্যে শ্যামাকান্তই ছিল নীলুর বয়সী, এবং খেলার সাথী বাকী বড় দুজন রাসুর সঙ্গেই খেলত, নীলু এপারে এলে তার সেজজেঠার বাড়ীতে যেত কম। প্রথম কারণ, ওখানে তার খেলার সাথী ছিল কম। আর দ্বিতীয় কারণ হল সে তার আপন জেঠাদের বাস্তুতে জন্মেছে বলে এই ঘরটাই ছিল তার অন্যতম আপনার ঘর।

এইভাবে রাসু ও নীলু উভয়ে উভয়ের খেলার দুটো আলাদা জগৎ করে ফেলল। ধরা যেতে পারে, ও দুটি বড় জগৎ আর ছোট জগৎ। বড় জগতের লোকেরা ছোট জগতের লোকদের কিছুটা করুণার চোখে দেখত আর ছোট জগতের লোকেরা বড়জগতের লোকদের কিছুটা শ্রদ্ধামিশ্রিত কৌতূহল আর বিস্ময়ের চোখে দেখত। মানুষের একটা নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা পর্যন্ত ছোট জগতের লোকেরা সব সময় বড় জগতে যেতে চায় কিন্তু বড় জগতের লোকেরা ছোট জগতে আসতে চায় না। সেই বয়স সীমাটি হল ততদিন, যতদিন পর্যন্ত না উভয় জগতের লোকেরা বাস্তবের রূঢ়জগতে প্রবেশ করছে। মজা হচ্ছে এই, এই উভয় জগতের লোকেরা একবার রূঢ়জগতে এলে সকলেই একমাত্র ছোট জগতটিতে ফিরে যেতে চায় বা তাকে ফিরে পেতে চায়। মানুষের এই প্রবৃত্তিই সৃষ্টি করেছে সাহিত্যের আঙ্গিনায় বর্ষীয়ানদের স্মৃতিচারণা।

যাই হোক বাইরের এই খেলাধূলা ছাড়া ঘরে নীলু আর রাসু এখন একপ্রাণ, একমন হয়ে থাকত। তখন তারা মরমী বন্ধু। অবশ্য তাই

বলে যে তাদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি হত না. এটা ভাবা ভুল, বরং তাদের দেখে মনে হত, তারা বুঝি দিনরাত শুধু মারামারিই করে। কিন্তু ওটা ছিল বাইরের ব্যাপার। ভিতরে বয়ে যেত একই প্রাণের স্রোত। তাদের এ যেন জীবনধারা ছিল যেন ফল্গুনদী—উপরে নীরস বালুকারাশি আর নীচে সরস স্রোতস্বিনী।

রাস্থ অনেকটা বয়স্ক অভিভাবকের মত নীলুকে নানা গল্প, উপকথা শোনাত, যে জিনিসগুলো নীলু তার ঠাকুরদাও ঠাকুরমার কাছে শুনতে পারত সেগুলি সে রাস্থর কাছেই শুনতে লাগল। তার মনে পড়ে না, কবে তার ঠাকুরদা, ঠাকুরমা মারা গেছে। রাস্থর কাছে বিচিত্র সব কাহিনী শুনে শুনে নীলু তার নিজস্ব জগতটার পরিধি বাড়িয়ে ফেলল।

রাস্থ অনেককাল সুন্দরবনে যাত্রাদলের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। সেখানকার জঙ্গলের বাঘের গল্প নীলু প্রথম শুনল রাস্থর কাছে। বাঘ কিভাবে পায়ের নখ দিয়ে বড় বড় মাছ ধরে ফেলে, কি ভাবে লেজ ভাসিয়ে দিয়ে জলের স্রোতের দিক ঠিক করে এবং তারপর সাঁতার দেয় এসব নীলু শুনতে লাগল। বাঘ যে দিনের বেলায় ঘুমায়, রাতের বেলায় শিকার করে, নীলু প্রথম জানল। বাঘের গায়ের ছাপ দেখে তার দৈর্ঘ্য, তার লেজের দৈর্ঘ্য, এমন কি তার গোঁফেরও দৈর্ঘ্য যে বুঝা যায়, আর সে বাঘ কতক্ষন আগে হেঁটে গেছে, এ সমস্ত গূঢ় তথ্য নীলু একের পর এক রাস্থর কাছে জেনে নিতে লাগল।

এ ছাড়া জানল, বাঘের পিছনে ফেউ করে। ফেউ নাকি দেখতে খ্যাঁকশেয়ালের মতই। সুন্দরবনের খাঁড়ি নদীগুলিতে কুমীরের ছড়াছড়ি আর কুমীরেরা যে শীতের দুপুরে বালিতে পড়ে পড়ে রোদ পোহায়, এসব কথা নীলুর কাছে নতুন জিনিস বটে। কুমীর নাকি রোদ পোহাবার জন্য একই পথে রোজ যাওয়াআসা করে। অতএব ঐ পথে বালির নীচে ধারাল ছুরি বসিয়ে রাখলে কুমীর জানতেই পারে না তার পেট চিরে গেল বলে। রাস্থ

নীলুকে জানাল, কুমীরের পিঠের চামড়া খুব শক্ত—বন্দুকের গুলিও ভেদ করতে পারে না অথচ পেটের চামড়া কত নরম।

রাসু বলেছে—আর শুধু কি কুমীর? গাছে গাছে কত রং বেরং-এর ছোট-বড় সাপ সব ঝুলে থাকে। মানুষকে দেখলেই গাছ থেকেই ছোবল মারে। সুন্দরবনে জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ আর গাছে সাপ।

রাসু গল্প করত, কত রকমের এবং কত মাছ যে তারা খেয়েছে তার ঠিক নেই। বেশী মাছ খাওয়ার ফলে তাদের দলের অনেকের কলেরা পর্যন্ত হয়ে যেত। সেখানে ডাক্তার পাওয়া যেতনা বলে কলেরা হলে মৃত্যু ছিল অবধারিত।

সুন্দরবনের গ… বাদে রাসু নানা রূপ-কথার গল্প বলত নীলুকে। এ সব গল্প অবশ্য নীলু অনেক আগেই শুনেছে। নতুন গল্প যা শুনল তা হলো, রাজপুত্রের উট পাখীর পিঠে চড়ে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে যাওয়া।

রাসু অনেক রকমের ভূতের গল্প বলত নীলুকে। ভূতেরা যে মানুষদের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, তা নীলু জানত না। রাসু তার সত্যমিথ্যা মেশান নানা ভূতের অভিজ্ঞতার কাহিনী বলে যেত নীলুকে। নীলু ভূতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার মন্ত্র জানল রাসুর কাছ থেকে। রাসু তাকে বলেছে, ভূত ভর করলেই বলতে হবে—রাম রাম রাম…। তাহলেই ভূত ছেড়ে পালাবে। ভূতেরা নাকি নাকি, সুরে কথা বলে। তারা রাম বলতে পারে না। উলটে বলে 'মরা'। বনের মধ্যে অন্ধকারে দেশলাই জ্বালতে নেই। তাহলে ভূত নিশানা পেয়ে মানুষকে ভর করবে। এ রকম নানা কথাই রাসুর কাছ থেকে জেনে নিল।

আরও বলেছিল রাসু। ভূত নাকি বাঁশগাছ বাঁকিয়ে তার ডগা মাটিতে নামিয়ে রাখে। কেউ যদি ওটিকে ডিঙ্গিয়ে যেতে চায় তো তার মরণ। ভূত তখন বাঁশগাছটা ছেড়ে দেয় আর মানুষটা বাঁশের সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠে গিয়ে আবার ছিট্‌কিয়ে মাটিতে পড়ে যাবে। এ ভাবে মানুষ মারাও যেতে পারে।

রাসু নীলুকে উপদেশ দেয়—অতএব কোন বাঁশগাছ মাটিতে শুয়ে আছে দেখলেই পার হওয়া চলবে না। সেখানে তিনবার হাততালি বাজাতে হবে। তাতে যদি বাঁশ একইভাবে পড়ে থাকে তো, তিনবার রাম রাম বলতে হবে। যদি ভূত থাকে তো সে বাঁশ ছেড়ে দেবে। বাঁশটা উপরে উঠে যাবে। আর না থাকলে গাছ একই রকম পড়ে থাকবে। তখন তুমি পার হতে পার।

ভূতের ভয়, বাঘের ভয়, সাপের ভয় পেতে সকলেরই ভালো লাগে, ছোটদের ত কথাই নেই। তাই নীলুরও ভাল লাগত। সে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে রাসুর কথাগুলো যেন গিলত। শুনতে শুনতে আস্তে আস্তে সে তার চারিদিকে গড়ে তুলল ভয়ের এক অজানা রহস্যময় জগৎ।

তার জগতে এতদিন যে রাজপুত্রেরা ছিল তারা ঘোড়ায় চড়েই শুধু রাজকন্যাদের উদ্ধারে যেত। এখন তারা উটপাখীর পিঠেও চড়ে সাত সমুদ্র, তের নদী পার হয়ে যেতে লাগল। আগে তাদের যাওয়ার পথে কোনরূপ বাধা-বিপদ আসত না, কিন্তু বিপদ থাকত শুধু শেষের দিকে, যখন রাক্ষসের কাছ থেকে রাজপুত্রকে কায়দা করে চাবিকাঠিটা নিতে হত। এখন নীলুর আপন জগতের রাজপুত্রেরা আর অত সহজে রাজকন্যাদের উদ্ধার করতে পারল না। তাদের যাত্রাপথেই নরখাদক বাঘ, কুমীর আর সাপেরা বারবারই হানা দিতে লাগল।

তবে রাসু যেমন বলেছিল যে ফেউ-এর ডাক শুনে বাঘ কাছে আছে বোঝা যায় বা বালির উপর মসৃন দাগ থেকে কুমীরের আনাগোনার কথা জানা যায় কিংবা গাছের পাতা দেখে সাপের অবস্থান ধরে ফেলা যায়, তেমনি রাজপুত্রেরাও বিপদ-গুলো আগে থেকেই বুঝতে লাগল। আর তার ফলে তারা সমস্ত বিপদ এড়িয়ে, বাধা জয় করে ঠিক আগের মতই রাজ-কন্যাকে উদ্ধার করে দেশে ফিরতে লাগল। কখনও যদি বা তাদের সামনে ভূত এসে হঠাৎ হাজির হত তবে রাজপুত্রেরা

হেসে রাম রাম বলে উঠলে ভূতেরা বাপ্, বাপ্ বলে তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে বাঁচত।

আপন জগতে নীলু কখনও কখনও নিজেকে কল্পনা করত রাজপুত্র বলে। তখন রানীকেই তার মনে হত রাজকন্যা। সে আগে মনের রথে চড়ে অবলীলায় তার রাজকন্যার কাছে যেতে পারত। কিন্তু তখন নানা রকমের ঐসব উপদ্রব দেখা যেতে লাগল। তবু ওদের নীলুর ভালো লাগে, বেশ ভালোই লাগে। ঐটুকু বয়সে নীলু বুঝতে পারে, ভূতদের গল্প শুনতে যতই ভালো লাগুক, সত্যিকারের ভূতেরা যদি সামনে এসে হাজির হয় তখন ব্যাপারটা খুব সুখের হবে না। তাদের কথা ভাবতেই ভালো লাগে।

আস্তে আস্তে নীলু আপন জগতের পরিধি পৃথিবীর মাটি ছাড়িয়ে শূন্যলোকে বিস্তার করে ফেলল রাসুর সহায়তায়। আর তাই সে আজকাল কেরোসিন ল্যাম্পের কাঁপা-কাঁপা আলোতে দেওয়ালে নিজের প্রলম্বিত ছায়া দেখলেও চমকে ওঠে।

মাঝে মাঝে নীলু নিজের ছায়া দেখে ভয় পেয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে। রমলা ছেলের কাণ্ড দেখে অবাক হন। কিন্তু ছেলে ততক্ষণে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়েছে। তিনি হয়ত বুঝতে পারেন ব্যাপারটা। তাই হেসে বলেন—পাগল! রাসুটা বুঝি সব সময় তোকে ভূতের গল্প শোনায়।

নীলু লজ্জা পেয়ে মাকে ছেড়ে দেয়। আগে রাতের বেলায়ও নীলু একা দিব্যি পুকুর-ঘাটে মুখ ধুয়ে আসতে পারত কিন্তু এখন ভূতের ভয়ে পারে না। তারজন্য কিন্তু রাসুর উপর তার এতটুকু রাগ হয় না। ভয় পেতে এমনই মজা!

রাসু মাঝে মাঝে এমন কতকগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করত যে নীলু তার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারত না। একবার বুঝি ঘরে পাড়ার বেড়ালের উপদ্রব হল খুব। বেড়ালটা ছিল অসম্ভব রকমের চালাক। দিনের বেলায় তার টিকিটিও দেখা

যেত না কিন্তু রাতে তার দৌরাত্ম্য এমন বাড়ল যে সকলে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে সুরু করে দিল। রান্নাঘরে খাবার জিনিস কিছু রাখা যেত না। সেদ্ধ-করা ধান শুকোবার জন্য মেঝেতে বিছিয়ে রাখা হত। বেড়াল মহারাজ রোজ রাতে তার উপর অপকর্মটি সেরে যেত আর মানদা বুড়ী রোজ সকালে সে-গুলিকে পরিষ্কার করার সময় বেড়ালের গুষ্টি উদ্ধার করত।

মা যখন বিড়ালের মরণ কামনায় ঠাকুর দেবতাদের মানত করে করে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, রাসু তখন বিড়ালকে এমন শিক্ষা দিল যে, সে ভুলেও আর এ-বাড়ীর সীমানায় আসারও সাহস পর্যন্ত করল না।

বিছিয়ে রাখা ধানের এক জায়গায় রাসু কিছু ধান জড়ো করে উঁচু করে রাখল। তার ভেতরে রাখল ভেট্‌কী মাছ ধরার এক বড়শী। বড়শীর সঙ্গে বাঁধা রইল মস্ত লম্বা মোটা সুতো। সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করে রাসু নীলুকে বলল—দেখিস্, বেড়ালকে ঠিক গেঁথে তুলব।

নীলু অবিশ্বাসের সুরে বলে—বেড়াল যে ঠিক তোর এই জায়গাতেই আসবে তার কি কথা আছে?

উপেক্ষার হাসি হেসে নীলু বলে—তুই বেড়ালের চরিত্র বুঝিস না। ওর অভ্যাস নখ দিয়ে মাটি আঁচড়ে পায়খানা করা। তাই প্রথমে ওর চোখে জড়ো-করা উঁচু জায়গাটা নজরে পড়বে। আর তখনই নখ দিয়ে জায়গাট আঁচড়াতো থাকবে। তখন আমি দূর থেকে সূতোর টান মারলে বাছাধন বড়শীতে ঠিক গাঁথা হয়ে যাবে।

সেদিন রাতে রাসু ও নীলু এক বিছানায় শুয়েছে। রাসুর হাতে সূতোর এক প্রান্ত ধরা রয়েছে। ঘর অন্ধকার। সকলে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। নীলু ও রাসু, বলাই বাহুল্য ঘুমায় নি। কিছুক্ষণ পরে রাসু উত্তেজিত হয়ে বিছানায় উঠে বসল। নীলু চাপা স্বরে বলে—কি রে, হাতে টান পাচ্ছিস্ বুঝি?

রাস্থ শুধু বলে—চুপ।

হঠাৎ রাস্থ এমন জোরে টান মারে যে, সে নীলুর উপরে পড়ে যায়। আর সেই মুহূর্তে দূর থেকে বেড়ালের আর্ত চীৎকার—ম্যাও ম্যাও ভেসে এল। তার চীৎকারে সকলে জেগে উঠল। মা হারিকেন হাতে উঠে আসেন।

নীলু ও রাস্থ তাড়াতাড়ি মার সঙ্গে অকুস্থলের দিকে এগিয়ে যায়। রাস্থর হাতে দড়ির প্রান্ত ধরা রয়েছে। বড়শী গেঁথেছে বেড়ালের ঠ্যাং-এ। মা তো রাগের চোটে বেড়ালের মাথায় বঁটির বাঁট দিয়ে আচ্ছা কয়েক ঘা দিলেন। শংকরীপ্রসাদও মোটা লাঠির কয়েক ঘা বসালেন। শেষে তিনি বেড়ালকে ছেড়ে দিতে বললেন।

কিন্তু রাস্থর প্রখর বুদ্ধি। সে বলে উঠল—এখন বড়শী ছাড়াতে গেলে ও প্রতিশোধ নেবেই।

রাস্থ তাই তার হাতে ধরা দড়ির কিছুটা বঁটি দিয়ে কেটে ফেলল। বেড়ালটা বড়শীসুদ্ধ ম্যাও ম্যাও করতে করতে পালাল। তার পরেও নীলু অন্য জায়গায় সে বেড়ালটাকে দেখেছে। তখন তার ঠ্যাং-এ বড়শী ছিল না। বোধ হয়, ঘা হয়ে পচে গিয়ে ওটা খুলে গিয়ে থাকবে। কিন্তু তারপর কেউ কোনদিন তাকে আর নীলুদের বাড়ীর ত্রিসীমানায় দেখে নি।

নীলুর মনে পড়ে, একবার শেয়ালের উপদ্রবে রানীদের কয়েকটা ছাগল মারা পড়ল। সেবারেও রাস্থ বুদ্ধি খাটিয়ে শেয়ালটাকে মেরে ফেলতে পেরেছিল। প্রক্রিয়াটি অভিনব, নাম বাঁশগাছি। একটা আস্ত বাঁশকে মাটিতে বেশ কিছুটা গোড়ার দিকে পুঁতে তার লক্‌লকে ডগাটাকে বাঁকিয়ে এনে মাটিতে পোঁতা একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলল রাস্থ। বাঁশের ডগাতে থাকল একটা মরণ ফাঁস। খুঁটির কাছে রাস্থ রাখল নিহত ছাগলের কিছু নাড়িভুঁড়ি।

সব ঠিকঠাক করে রাসু নীলুকে বলল— শেয়াল এগুলো খেতে এলে ভুলে এই ফাঁসের মধ্যে মাথা গলাবেই। আর তখন আপনা থেকেই অল্পটানে বাঁশের ডগাটা খুঁটি ছেড়ে উপরের দিকে লাফিয়ে উঠে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসটাও শেয়ালের গলাকে নিবিড় বন্ধনে আলিঙ্গন করবে। বাছাধন শূন্যে বাঁশ থেকে ঝুলতে থাকবে আর ফাঁসের চাপে দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে।

সেদিন রাতে রাসু সব ব্যবস্থা করে এসেছিল আর পরদিন সকালে সকলে দেখেছিল ঘাতক শেয়ালটা মরে বাঁশের ডগায় ঝুলছে।

এ রকম আরো কত! কত পক্রিয়ায় যে রাসু মাছ ধরত! কোন কিছু হাতিয়ার না নিয়েও যে মাছ ধরা যায়, তা নীলু রাসুর কাছেই প্রথম জানল। ধানের মাঠ থেকে যখন পুকুরের জল ঢোকে তখন বিপরীত দিকে অর্থাৎ মাঠের দিকেই পুকুরের মাছ বেরিয়ে যেতে চায়। ওরই পাশে রাসু মস্ত লম্বা এক গর্ত খুঁড়ে রাখত। মাছ পুকুর থেকে মাঠের দিকে লাফিয়ে যাওয়ার সময় ঐ গর্তে এসে পড়ত। একবার পড়লে আর তাদের লাফ দিয়ে ওখান থেকে ওঠার ক্ষমতা থাকত না। অতি সহজেই এভাবে ল্যাঠা, শোল, বোয়াল, এসব মাছ ধরা যেত। ছোট মাছও ধরা হত।

রাসুর এই সব বুদ্ধির কাজগুলো আস্তে আস্তে নীলুর কচি-মনে অপরূপ প্রতিক্রিয়া করে চলল। অল্পদিনের মধ্যেই নীলু রাসুর একান্ত গুণগ্রাহী হয়ে উঠল।

ওদিকে রাসুও তার ছন্নছাড়া জীবন থেকে উঠে এল গৃহের স্বাভাবিক স্নেহবন্ধনের মাঝে। শৈশবে যে মা-বাপের স্নেহ ভালোবাসা পায় নি, সে বুঝি কোনদিন নিজেকেও ভালোবাসতে শেখে না। নিজেকে ভালো না বাসলে নিজের জীবন সুস্থ, সবল, সুন্দর করে গড়ে তোলা যায় না। আর তাই সে অপরকেও

ভালোবাসতে শেখে না। শৈশবে ভালোবাসার অভাব মানুষকে কালক্রমে অসামাজিক জীব করে তোলে।

রাসু ধীরে ধীরে সামাজিক হয়ে উঠল। রমলা ও শংকরী-প্রসাদকে সে তার নিজের মা-বাবার মতই ভাবে। নীলুর তো সে ভাই-ই। তবে ভাই বলে যে সবসময় ভাব থাকবে, এমন কথা নেই। ভাবও যেমন থকবে তেমনি খিটিমিটি ও অল্পবিস্তর মারামারিও হবে। আবার ভাব হতেও দেরী হবে না।

দু'ভাইকে দুবেলা ইস্কুলে যেতে হত আবার রাতে আড়াই ঘণ্টার মত সুরেশ পণ্ডিতের কাছে পড়তে হত। কচি-প্রাণে পড়ার চাপটা মাঝে মাঝে যেন দুঃসহ হয়ে উঠত। ইস্কুলে একঘেয়েমির হাত থেকে তাদের বাঁচাত রয়টার। সুরেশ পণ্ডিতের পড়ার আসরেও অনুরূপ মুক্তি দিত ঘাটমাঝি পদ্মলোচন।

পদ্মলোচন মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলায় আসত তাদের কাছে সহানুভূতির দূত হয়ে। কালো রঙের, নাদুস্-নুদুস্, কাঁচা-পাকা চুলের পদু দা এসে হাজির হলেই নীলু ও রাসুরা আনন্দে অধীর হয়ে উঠত গল্প শোনার জন্য। পদু দার আগমন মানে শুধু নীরস পড়ার হাত থেকে অব্যাহতি নয়, অনেক মুক্তির আস্বাদও বটে। খেলাধূলার মাঝে মুক্তি ছিল, কিন্তু সে ছিল অনেকটা যেন কর্তব্যের বেড়াজাল আর বড়দের শাসন থেকে অব্যাহতি। কিন্তু ঘাটমাঝি পদ্মলোচনের নানা রসের, নানা স্বাদের গল্প ও ছড়ার মধ্যে ছিল শিশুমনের চির আকাঙ্খিত মনের মুক্তি। এ মুক্তি তাই ছিল মহামুক্তি।

তাদের বাড়ীর পাশেই ছিল ক্যানেল পারাপারের খেয়ানৌকা। পাড়েই ছিল ছোট একটা খড়ের ঘর। এটি সরকারী খেয়া ছিল না। পদ্মলোচনই খেয়ানৌকার যাবতীয় খরচ বহন করত। আর সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ঐ ঘরে বসে সে যাত্রীদের কাছ থেকে পারাপারের মাশুল আদায় করত। মাথা পিছু রেট ছিল আধ পয়সা। সেকালে আধ পয়সারও দাম ছিল। ঐ পয়সায়

এক পোয়া দুধ মিলত আর তা ছিল একেবারে খাঁটি দুধ।

সকলে পয়সা দিত না। যারা দিত না, তাদের সঙ্গে পদ্মলোচনের অন্য বন্দোবস্ত ছিল। কারোর কাছে বাঁশ, কারোর কাছে খড়, কারোর কাছে বা ধান পেত সে ফি বছরে। পদ্মলোচন ছিল জাত কবি। মুখে মুখে সুন্দর সুন্দর ছড়া বানাতে পারত। মাঝে মাঝে আসলে কবিগানও গাইত। রমলাকে সে মেয়ে বলে ডাকত। তাই সম্পর্কে সে ছিল নীলুর দাদামশাই বা পদু দা।

ছেলেমেয়েরা তাকে দেখলেই ঘিরে দাঁড়িয়ে ছড়া বলতে অনুরোধ জানাত। পদ্মলোচনের মেজাজ ভালো থাকলে তখনই সে তাদের ইচ্ছাপূর্ণ করত। একদিন দুপুরবেলা নালু, রাসু, কালা ও পুলিনের দল স্নানের আগে তেল মেখে ক্যানেলের পাড়ে খেলছে। তখন পরীক্ষা শেষ! তাই অভিভাবকদের শাসন ছিল না। এ সময় পদ্মলোচন তাদের পাশ দিয়েই ঘাট ফেরত খেতে বাড়ী যাচ্ছিল। তাকে দেখা মাত্রই ছেলের দল ঘিরে ধরল।

কালা অঙ্গভঙ্গি করে পদ্মলোচনের হাত ধরে ঝুলে বলল—দাদু, একটা ছড়া না শোনালে তোমায় ছাড়ছি না।

পদ্মলোচন অমনই বলে—আরে ছাড় ছাড়, বল্‌ছি রে বল্‌ছি।

কালা হাত ছেড়ে দিল। তখন পদ্মলোচন কালার খুতনি ধরে ছড়া কাটল আর সুর করে গেয়ে উঠল।

'একে তো কালা,
তায় মেখেছে ধূলা,
তায় মেখেছে তেল,
দেখ্‌রে কালার খেল্।

ছেলের দল হৈ হৈ করে ওঠে। তারা আরও বলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। পদ্মলোচন তাদের নিমন্ত্রণ করে বলে এখন আর না। খেয়ে দেয়ে এসে বিকেলে বলে যাব।

এ হেন পদ্মলোচন মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলায় চায়ের লোভে নীলুদের বাড়ীতে এসে হাজির হত। তখনকার দিনে কদাচিৎ কারোর বাড়ীতে চায়ের পাট ছিল। শাপলা গ্রামে নীলুদের বাড়ীতেই যা ছিল। তাই পদ্মলোচন ঘাটের কাজ শেষ করে কোন কোন দিন সন্ধ্যেবেলায় নীলুদের বাড়ী চলে আসত।

এসেই সুরেশ পণ্ডিতের পড়ার আসরের সামনে দাঁড়িয়ে পদ্মলোচন সশব্দে হাঁচি তুলত। সে হাঁচির শব্দ রান্নাঘরে রমলার কানে যেত। ওখান থেকেই পদ্মলোচন তারপর রমলার উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে বলত—গোঁসাইর ঝি, বড় ঠাণ্ডা লেগেছে। একটু গরম জল দি-ও মা বুড়োটাকে।

রমলা রান্নাঘর থেকেই বলতেন—বস, একটু দেরী হবে।

বলা বাহুল্য পদ্মলোচনের তাতে কোন আপত্তি নেই। সে এখন ছেলেদের বসার মাদুরের একপাশে বসে পড়ত।

সুরেশ পণ্ডিত সাগ্রহে বলতেন—বস পদুবাবু।

অর্থাৎ পদু বাবুর গল্প শোনার আগ্রহ ছেলেদের চেয়ে সুরেশ পণ্ডিতের কম ছিল না। ছেলেমেয়েরা পদ্মলোচনের একেবারে কাছাকাছি জড় হয়ে ঘন হয়ে বসত। পড়ার আসর তখন আপনা থেকেই ভেঙ্গে যেত কিন্তু গল্পের আসর জমজমাট হয়ে উঠত। অমনই সুরু হয়ে যেত গল্প। পদ্মলোচন বলে যায়, সকলে মন দিয়ে শোনে।

—এই তো পরশুদিন—হরিপুরের হাট থেকে ফিরছি। একটু সন্ধ্যে হয়ে গেছে। খাসমহাল পেরিয়ে বেরাদের সেই বিরাট বাঁশ বাগান পড়ল। ওর মধ্যে সেই বিরাট শিরীষ গাছটা। সেদিন দেখি কি, শিরীষ গাছের মাথায় বসে রয়েছে বিরাট এক হনুমান ভূত!

এই সময় অযথা তেলের অপচয় বন্ধ করার জন্য সুরেশ পণ্ডিত হারিকেনের বাতিটা একটু কমিয়ে দেন। অমনই দেওয়ালে পড়ে শ্রোতাদের লম্বা লম্বা ছায়া। নীলুরা ভয় পেয়ে আরো জড়াজড়ি

করে সরে আসে। পদ্মলোচন একটু হাসে তাদের দিকে চেয়ে। পরে আবার বলতে সুরু করে।

—তা সেই হনুমান ভূতের ল্যাজটা মাটিতে পিঁড়ি বেঁধে পড়ে রয়েছে। সেই পিঁড়িটাই হবে বিশ হাত কি তার চেয়েও বেশী।

হারিকেনের নরম আলোতে নীলু দেখে পদ্মলোচনের ছায়াটা পড়েছে পিছনের দেওয়ালে। ওটাকে তখন তার আস্ত এক হনুমান ভূত বলেই মনে হয়। সে তাড়াতাড়ি রানীর গায়ে গা লাগিয়ে দেয়। আর একটা হাত দিয়ে রাম্মুকে ধরে থাকে।

গল্প শেষ করে পদ্মলোচন আবার রমলার উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে বলেন— তুমি গল্প কর না,—হয়ে গেলে নিয়ে যাচ্ছি।

অগত্যা পদ্মলোচনকে আবার সুরু করতে হয়। সে বলে—অনেকদিন আগে—তোরা তখন জন্মাস নি—আমি একটা মস্ত বলদ পুষেছিলাম। সেটা চাষের কাজ করত। জোয়াল টেনে টেনে তার কাঁধে একটা ঘা মত হল। সেই ঘায়ে চুন-হলুদ দিলাম। কিন্তু ঘা-টা কিছুতেই ভাল হল না। চাষ শেষ হয়ে গেল কিন্তু তার ঘা-টা রয়েই গেল।

একদিন বুঝি এক পাখী তার কাঁধে বসে ঐ ঘায়ের ওপর পায়খানা করে দেয়। তার পায়খানার সঙ্গে বোধ হয় বটের বীজ ছিল। পাখী বট ফল খায় তো। যাই হোক্ সেই বীজ থেকে ঘা-এর ওপর বটের চারা হল। বটগাছ দেবতা। তাই ওটাকে মারা গেল না। বরং তার গোড়ায় জল দিয়ে যেতে হল। আস্তে আস্তে সে গাছটা বড় হল। কয়েক বছর পরে সেটা একটা বিরাট বটগাছ হয়ে দাঁড়াল। তার অসংখ্য ঝুরিও নামল।

এইখানে সুরেশ পণ্ডিত বাধা দিয়ে বললেন—অতবড় গাছ কাঁধে বয়ে বেড়াতে বলদটার অসুবিধা হতো না?

পদ্মলোচন বলে—কিছু না। ছোট থেকে তো বড় হয়েছিল গাছটা। তাই গাছের ভার বলদের সহ্য হয়ে গিয়েছিল। তবে আমাদের একটা মস্ত অসুবিধা হত বটে। ঐ গাছে প্রচুর কাক,

শকুন এসে বাসা বাঁধল। ঐ সব পাখীরা চারিদিক নোংরা করতে লাগল। বলদটা দিনের বেলায় বাইরে বাঁধা থাকত আর রাতের বেলায় ওটাকে গোয়ালে রাখা হত। কিন্তু—

সুরেশ পণ্ডিত আবার ফ্যাকড়া তুলে বলেন—কিন্তু অতবড় গাছ পিঠে নিয়ে গরুটা গোয়ালে ঢুকত কি করে পদুবাবু? গোয়ালটা কত উঁচু ছিল তবে?

অমনিই পদ্মলোচন বলে ওঠে—এ্যাই তো অবিশ্বাস করে বসলে পণ্ডিতের পো। অবিশ্বাস করলে কি আর গল্প হয়? 'বিশ্বাসে' মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।

ছেলের দল কিন্তু পদুদার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করে। তারা গল্পটা শেষ করার জন্য পদ্মলোচনকে তাগাদা মারতে থাকে।

এমন সময়ে রমলা কাঁচের গেলাসে চা করে পদ্মলোচনের সামনে রেখে গেল। সুরেশ পণ্ডিত চা খান না। ওতে লিভার নষ্ট হয়। তিনি ওটাকে বিষের মত জিনিস বলে মনে করেন। চায়ের সঙ্গে রমলা একবাটি শুকনো মুড়িও দিয়ে গেছেন।

চায়ের গেলাসে ফুঁ দিতে থাকে পদ্মলোচন! তারপর চুমুক দেয়। গরমে তার জীভ পুড়ে যায়। 'ওরে বাবারে' বলে চীৎকার করে ওঠে পদ্মলোচন। পরে চায়ের গেলাসে শুকনো মুড়ি ফেলে দেয়। তাতে তার চা পানে একটু সুবিধা হয়। চা-টা পদ্মলোচন জুড়িয়ে জুড়িয়ে খায়।

ওদিকে ছেলেরা বায়না ধরে—পদু দা আর একটা গল্প, বল না। পদ্মলোচন আড়চোখে সকৌতুকে নীলুর দিকে চেয়ে বলে—কি দিবি? নীলু বলে—দু' আনা দেব।

পদ্মলোচন চা খেতে খেতে বলে—বেশ, তাহলে শোন্। এক রাজা ছিল। তার ছিল দু' রাণী। বড়োর নাম দুয়োরাণী আর ছোটর নাম সুয়োরাণী।

নীলু বাধা দিয়ে বলে ওঠে ও গল্প আমি জানি, পদু দা। তুমি অন্য একটা বল।

পদ্মলোচন গেলাসে আরো শুকনো মুড়ি ফেলতে ফেলতে বলে—না, এ সে গল্প নয়। শোন্ না। রাজা বড় রাণীকে চোখে দেখে না। ছোট রাণীকে খুব ভালবাসে। একদিন রাজা বড় রাণীকে তার অট্টালিকা থেকে বার করে দিল। বড়রাণী কি করে—গোয়ালঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল। বড়রাণী সেইখানে থাকে, আর—

নীলু আবার বাধা দিয়ে বলে ওঠে—না, না, এ গল্প আমি জানি। তুমি আমাদের ঠকাচ্ছ। তুমি অন্য একটা গল্প বল।

পদ্মলোচন এবারে বিরক্ত হয়ে বলে—আরে, শোন্ নারে। অবিশ্বাস করলে যেমন গল্প বলা যায় না, তেমনি বার বার বাধা দিলেও গল্প বলা যায় না। তুই বড্ড বাগ্ড়া দিচ্ছিস। গল্প আর বলা হবে না।

নীলু আপশোষ করে বলে—না, না পদ্দা, আমি আর কিছু বলব না, তুমি বল।

চায়ের গরমও জুড়াচ্ছে না, পদ্মলোচনের খেতে দেরী হচ্ছে। ওদিকে ছেলের দল বড্ড গল্পের জন্য জেদ ধরেছে। কিন্তু গরম চা, শেষ করব বললেই তো চট্ করে শেষ করা যায় না। যতক্ষন না শেষ হচ্ছে, ততক্ষন গল্প বলতেই হবে। অতএব নিরুপায় পদ্মলোচন শেষ পর্যন্ত চা-টা মুড়ির বাটিতে ঢেলেই খেতে লাগল।

চায়ে ভেজান মুড়ি খেতে পদ্মলোচন আবার সুরু করে।—অনেক দিন রাজা বড় রানীর সঙ্গে আর দেখা পর্যন্ত করেন নি। একদিন ভাবলেন, হাজার হোক বড়রানী তাঁর বিয়ে করা বৌ। একবার গিয়ে দেখে আসা যাক। রাজা বড় রানীর গোয়ালের কাছে গিয়ে দেখেন কি, বড়রানী গোয়ালের বাঁশের 'আগড়' লাগিয়ে সুঁটকী মাছের পোড়া দিয়ে পান্তা ভাত খাচ্ছে। তখন রাজা—

হঠাৎ সুরেশ পণ্ডিত বাধা দিয়ে বলে ওঠেন—সে কি গো, মাঝির পো, রাজা বড়রানীকে হয়ত খেতে দেয় না। তাই পেটের জ্বালায় বড়রানী হয়ত বাধ্য হয়ে পান্তা-সুঁটকী খাচ্ছিল। কিন্তু রাজবাড়ীর গোয়াল, তাতে একটা কপাট থাকবে না, এ কথা বিশ্বাস করি কি করে?

ততক্ষনে পদ্মলোচনের চা মুড়ি খাওয়া শেষ। গামছার কোনায় মুখ মুছতে মুছতে বলে—কি করব বল, পণ্ডিতের পো, দু আনা পয়সায় কি আর কাঠের কবাট হয়? বাঁশের একটা 'আগড়' হতে পাবে কোনমতে।

সবাই তার কথায় হেসে ওঠে। সেই অবসরে পদ্মলোচন যাবার জন্য পা বাড়ায়। নীলু তার হাত ধরে ঝুলে পড়ে বলে, – কৈ, গল্পটা শেষ হল না যে।

পদ্মলোচন গোঁফের আগায় হাসির রেখা ফুটিয়ে বলে—তুই কমপক্ষে দুটো টাকা জোগাড় কর। আমি ঐ টাকায় আগে রাজার গোয়ালে একটা কবাটের ব্যবস্থা করি। তারপর বাকিটা বলা যাবে।

নীলু হতাশ হয়ে হাত ছেড়ে দেয়। দু'টাকা হাতে পাওয়ার কথা সে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না। পদ্মলোচন চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শুধু গল্পের আসর নয়, পড়ার আসরও ভেঙ্গে যায়।

আর একদিনের কথা। সেদিন হয়েছে নীলুর অল্প-জ্বর। সন্ধ্যেবেলায় তাই নীলু সেদিন পড়তে বসে নি। বাইরে সুরেশ পণ্ডিত অন্যদের পড়াচ্ছেন। নীলু ঘরে বিছানায় শুয়ে আছে। শু'তে তার একটও ভালো লাগছে না। শুয়ে শুয়ে ভাবছে, পড়াশুনা যতই কষ্টের হোক, শুয়ে থাকাটা আরো বেশী কষ্টের। এমন সময় এলো পদ্মলোচন। নীলুর জ্বর শুনে ঘরের ভেতরে নীলুকে দেখতে এসেছে।

পদ্মলোচন রমলাকে বলেন—জ্বর কত গো মেয়ে?

রমলা বলেন—বেশী নয়। ঠাণ্ডা লেগেছে মনে হয়। যা জলে দাপাদাপি করে।

ওদের কথাবার্ত্তায় নীলুর জ্বরের ঘোরের তন্দ্রাভাবটা কেটে যায়। চোখ মেলে উৎসুক চোখে সে তাকায়।

পদ্মলোচন তখন রহস্য করে রমলাকে বলেন—আমি একটা সুন্দর ওষুধের ব্যবস্থা করছি আর সেই সঙ্গে যথারীতি পথ্য।

রমলা হেসে বলেন—কি সেটা ?

পদ্মলোচন গম্ভীর মুখে বলে—ওষুধ অন্য কিছু নয়—কতকগুলো জিনিস একসঙ্গে বেটে দিনে তিনবার করে খাওয়ানো। সেগুলো হল :—

'ছাইভস্ম, পিপুল-মুল
এঁড়ে বাছুরের লেজের চুল,
অশত্থ গাছের পূবের ডাল,
দাঁড়কাকের ঠ্যাং-এর ছাল,
গুঁড়ি পিঁপ্ড়ের দুধের ঘোল,
ঢেঁকির ঘাম আর কলার খোল।'

রমলা হাসছেন। হাস্‌ছে নীলুও। তাঁদের হাসির মধ্যে পদ্মলোচন পূর্ববৎ গাম্ভীর্য সহকারে বলে যায়—আর পথ্য হল :—

'মোরুল্লা মাছের চচ্চড়ি,
ভাত-কাঞ্জি, তায় দই, বড়ি।'

রমলা হেসে বলেন—ও সব তোমার জামাইকে খাইয়ো বরং।

পদ্মলোচন সে কথার জবাব না দিয়ে বলে—তোমার ছেলেকে এ সব খাওয়াও। একবছরের মধ্যে যদি জ্বর না ছাড়ে, তো ডাক্তারী করাই ছেড়ে দেব। নামের পদ্ম কেটে শুধু লোচন হব। এবারে, মা ভিজিটটা দিয়ে দাও। তাড়াতাড়ি চলে যাই।

রমলা হেসে বলেন—বস, চা করে দিচ্ছি।

নীলুর মনে পড়ে, সেদিন পদ্ম দার সরস কথায় এক বছর নয়, এক মিনিটেই যেন জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল। মানুষ যত দুঃখেই পড়ুক, পদ্মলোচন তার সামনে গেলে সে দুঃখভার তার লঘু হবেই।

এই পদ্মলোচন কিন্তু অত্যন্ত নির্ভীক এবং স্বাধীনচেতা লোক ছিল। নীলু ঐ বয়সে পদ্মলোচনের চরিত্রের এ পরিচয়ও পেয়েছিল। তখন ব্রিটিশ আমল। ব্রিটিশ আমলের থানার দারোগা মানে প্রায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। সেই দারোগাকে একবার উচিৎ শিক্ষা দিয়েছিল পদ্মলোচন।

একদিন সবেমাত্র সন্ধ্যে হয়েছে। ক্যানেলের ওপারে থানার দারোগা কয়েক জন পুলিশ সহ ঘাটে পার হওয়ার জন্য এলেন। প্রত্যেকের কাছে সাইকেল। সেগুলো নৌকায় তুলে দিয়ে তাদের পার করে দেবার জন্য দারোগাবাবু ওপার থেকেই এপারের মাঝির উদ্দেশ্যে হাঁক দিলেন—ঘাটমাঝি আছিস্ রে, ঘাটমাঝি আছিস্?

পদ্মলোচন বিলক্ষণ দারোগার কণ্ঠস্বর চেনে। তবু সে তাচ্ছিল্য-ভরে এপার থেকে জবাব দেয়—কে অত চেঁচায় রে? ওঃ, ব্যাটা যেন আমার থানার দারোগা এলো রে!

থানার দারোগা পদ্মলোচনের কথায় লজ্জা পায়। ওপার থেকেই বলে—কে, পদ্ম বাবু নাকি? অত রাত পর্যন্ত আছ? আমি ভাবলাম, বুঝি তোমার ছেলে রয়েছে।

পদ্মলোচন অমনি এপার থেকে অতি বিনীত কণ্ঠে জবাব দেয়—হ্যাঁ, বাবু, আমিই আছি।

এই সদাহাস্যময় লোকটিকে নীলু কোনদিন ভুলতে পারে নি। তাকে পরে চরম দুঃখ পেতে হয়েছিল। তার এক ছেলে ঘরে সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে ফেলে এক বেদের মেয়ের হাত ধরে ঘর ছেড়ে চলে যায়। সে আর কোনদিন ফিরে আসে নি। ঘরে যুবতী পুত্র বধূর মুখের দিকে চেয়ে পদ্মলোচনের সুখ, শান্তি আর স্বস্তি চিরদিনের মত অদৃশ্য হয়েছিল। কিন্তু তবু কেউ কোনদিন তাকে বিমর্ষ দেখে নি। আগের মতই সে আবালবৃদ্ধবনিতা—গ্রামের সকলকে নির্মল হাস্যরস পরিবেশন করে যেত।

নীলু ভাবে, সদানন্দ পুরুষ বোধ হয় একেই বলে। দুঃখ বুকের মাঝে নিশিদিন তুঁষের আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বললেও, ঠোঁটের ফাঁকে হাসির ঝিকিমিকি আর চোখের তারায় কৌতুক খেলিয়ে যে চিরকাল সমান ভাবে সকলকে আনন্দ দিয়ে যেতে পারে, সেই-ই সদানন্দ পুরুষ। নীলু তার জীবনে এমন পুরুষ ঘাটমাঝি পদ্মলোচন ছাড়া দ্বিতীয় আর কাউকে দেখে নি। এমন পুরুষ 'কোটিকে গুটিক!'

॥ বার ॥

ছোট্ট নীলু তখন তার আপন জগতের সীমানা নিত্যদিন নানা দৃশ্য, গল্প ও গানের মধ্য দিয়ে বাড়িয়ে চলেছে। সীমানা বাড়ান মানে অপরের সীমানা অধিকার করা বুঝায়। কিন্তু নীলুর ক্ষেত্রে তো অধিকার নয়, যেন জয় করা। আর সে জয় করার মধ্যে নেই কোন অনর্থক বাদ-বিসম্বাদ, নেই কোন অহেতুক মারামারি, রক্তপাত। এ যেন সেই 'Veni, Vidi, Vici'- I came, I saw, I conquered —আমি আসিলাম, আমি দেখিলাম, জয় করলাম। নীলু যাকে নিজের মত করে পেতে চায়, সে-ই তার কাছে পরাজয় স্বীকার করে।

কিন্তু সে তখনও জানত না, সে যখন আপন কল্পনার রাজ্যের সীমানা বাড়াতে ব্যস্ত তখন দুনিয়াতে তাবৎ মহাশক্তিধর বুড়ো শিশুরা আপন আপন স্বার্থের রাজত্ব বাড়াতে নিজেদের মধ্যে রাতদিন প্রবল যুদ্ধ, হানাহানি, কাটাকাটি আর রক্তপাত করে চলেছে। যুদ্ধের কথা অবশ্য সে বড়দের মুখে কিছু কিছু শুনেছে। সেই যুদ্ধের উড়ো-জাহাজগুলো মাঝে মাঝে আজকাল তাদের শাপলা গ্রামের উপর দিয়ে উড়েও যায়—নীলু দেখেছে। উড়োজাহাজগুলো কখনও কখনও দল বেঁধে নানা আকারে বিন্যস্ত হয়ে নীল আকাশের বুক চিরে উড়ে যায়। ওগুলো তখন তার পাখী বলে মনে হয়। দেখে বেশ মজা লাগে তার। কখনও কখনও সেই আকাশের জাহাজগুলো নানা কসরত করে—ডিগবাজী খায়, চট্ করে উপরে উঠে যায় আবার যেন

ধপ করে নীচে নামে তারপর আবার ডানা মেলে উড়তে থাকে। ওগুলোকে দেখে নীলুর রাবনের পুষ্পক রথের কথা মনে পড়ে। রামায়ণে সেই রথের কথা আছে, নীলু জানে।

রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী সে ইস্কুলের বইতে, মা, বাবা, জেঠা, দাদা, ও পণ্ডিত মশাইদের মুখে অনেক শুনেছে। বেশী করে শুনেছে ঈশ্বর আচার্যের কাছে। ঈশ্বর আচার্যের বাড়ী-তাদের বাড়ীর পাশেই। ঐ পাড়াকে লোকে আচার্যপাড়া বলে। নীলু ঈশ্বর আচার্যকে ভটচায জেঠা বলে। শংকরীপ্রসাদ তাঁকে ডাকেন ভট্চায দা বলে। নীলু জানে, ভট্চায জেঠা, মস্তবড় জ্যোতিষী। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে এক বিরাট দিক্‌পাল। প্রথম জীবনে তিনি কাশীতে বহুকাল সংস্কৃত পাঠ নিয়েছিলেন।

নীলুকে তিনি নিজের ছেলের মতই স্নেহ করতেন। আবার শংকরীপ্রসাদকেও তিনি নিজের ছেলে বলেই ভাবতেন। শংকরী-প্রসাদ ঈশ্বর আচার্যের চেয়ে পঁচিশ বছরের ছোট ছিলেন। তাঁর বড় মেয়ে আর শংকরীপ্রসাদ আটদিনের আগে-পিছে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। ঈশ্বর আচার্যের সেই বড় মেয়ে অবশ্য ছোট বেলাতেই মারা যায়।

ভট্চায জেঠা নীলুকে দেখতে পেলেই কোলে তুলে চুমো খেতেন তার। আর ইচ্ছে করেই তাঁর কাঁচা-পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ী নীলুর নরম গালে ঘষে ঘষে মজা করতেন। রামায়ন মহাভারতের বহু কাহিনী ভট্চায জেঠা যেমন সুন্দর শব্দবিন্যাস, উপমা আর অলংকার দিয়ে বলতেন, অমনটি আর কেউ পারত না।

অতএব যুদ্ধ কি ভাবে হয় তার অনেক কিছুই নীলুর জানা। সে যুদ্ধের পুরো ছবিগুলো যেন নীলু নিজের চোখে স্পষ্ট দেখতে পায়, যদিও সেগুলো কয়েক সহস্র বছর আগে ঘটেছিল। সঞ্জয় যে ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে সশরীরে উপস্থিত না থেকেও ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বসেই সমস্ত কিছু দেখতে পেরেছিলেন, নীলু তেমনি যুদ্ধের বহু সহস্র বছর পরে জন্মিয়েও সঞ্জয়ের মত অবিকল যুদ্ধের দৃশ্যগুলো ইচ্ছে করলেই নিজের চোখে দেখতে পায়।

সে-যুদ্ধে আছে উন্মাদনা, উদ্দীপনা। বুকের মধ্যে সে যুদ্ধ অপরূপ শিহরণ জাগায়, ধমনীতে ধমনীতে শৌর্যবীর্যের প্রবাহ ছুটিয়ে দেয়। নীলু জানে, যুদ্ধে যেমন ভয়ের কিছু নেই তেমনি জয়-পরাজয়েরও কোন প্রশ্ন নেই। যুদ্ধ মানেই তো ধর্মযুদ্ধ। এ-যুদ্ধে যে আপন শক্তি প্রকাশ করে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত মৃত্যুকে বরণ করে, তার হয় অক্ষয় স্বর্গলাভ—এ সব কথা নীলু বহুবার ভট্‌চায জেঠার মুখে শুনেছে। বরং যে কাপুরুষের মত মৃত্যুর ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসে সে বেঁচে থেকে নিন্দিত হয় আর মৃত্যুর পর অনন্ত-নরক ভোগ করে।

নীলু যে-যুদ্ধ দেখেছে, সে যুদ্ধ সমানে সমানে, সশস্ত্রে সশস্ত্রে। সশস্ত্র, নিরস্ত্রকে কখনই আঘাত করে না। যোদ্ধা প্রতিপক্ষকে বীর্য-সহকারে আহ্বান করেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। যুদ্ধে প্রচুর হত্যার দৃশ্য সে দেখেছে কিন্তু গুপ্তহত্যার কথা সে শোনে নি। প্রতিপক্ষকে বেকায়দায় পেয়ে রাতের অন্ধকারে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে ঘায়েল করার কথা কোন ক্ষত্রিয়-যোদ্ধা কল্পনাও করতে পারে না।

কিন্তু নীলু জানে না, আজ থেকে বহু-সহস্র বছর পরে সে যখন আবার ছোট্ট নীলু হয়ে পৃথিবীর মাটিতে জন্মাবে তখন তাকে 'ভট্‌চায জেঠাদের কাছ থেকে জানতে হবে, যুদ্ধ মানেই ঘায়েল বা হত্যা—সে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যেই হোক। নিরঙ্কুশ হত্যাই হল যুদ্ধ। আর সেই হত্যা বেশী চলে রাতের অন্ধকারে, প্রতিপক্ষের অসতর্ক মুহূর্তে আর দুর্বল, অসহায় অবস্থায়। অবশ্য আগামী দিনের সেই যুদ্ধে আজকের দিনের পৌরাণিক যুদ্ধের মত জল, স্থল, অন্তরীক্ষ—তিন মার্গের কথাই থাকবে। সে যুদ্ধ হচ্ছে, হয়ে যাচ্ছে—নীলু সঠিক জানত না।

আধুনিক যুগের যুদ্ধের এই চেহারার কথা নীলু প্রথম জানল কান্তি জেঠার কাছে। এই কান্তি জেঠার পুরো নাম হল কান্তি ভূষণ আচার্য। তিনি নামের শেষে আচার্য না লিখে, লিখতেন 'কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ'। জানত তার মেজ জেঠাও একজন কাব্যতীর্থ।

তবে মেজজেঠা ইংরাজী জানতেন না। কিন্তু কান্তি জেঠা হরিপুর হাই ইস্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ করেছিলেন। তিনি কোলকাতায় এক সওদাগরী অফিসে চাকরী করতেন। তাঁর বাড়ী ছিল নীলুদের বাড়ীর পাশের ঐ আচার্য পাড়ায়। তিনি ছিলেন ঈশ্বর আচার্যের জ্ঞাতি-ভাই। কান্তি জেঠার ছেলে নিমাই ও প্রাণেশ নীলুদের সঙ্গে খেলত।

কান্তি জেঠা বলতে গেলে, আসলে কোলকাতারই লোক। ছুটি ছাটায় বাড়ী আসতেন তিনি। বাড়ী এলে তিনি একমাত্র নীলুদের বাড়ীতেই আসতেন। সকাল সন্ধ্যা, দুবেলাই আসতেন। এখানে খবরের কাগজ পড়তেন। আর শংকরীপ্রসাদের সঙ্গে বসে চা মুড়ি খেতেন। কোলকাতার মানুষ কান্তি জেঠার সকাল সন্ধ্যা চা না হলে চলত না। তাঁর নিজের বাড়ীতে চা হত না। চায়ের তৃষ্ণা তিনি নীলুদের বাড়ীতেই মেটাতেন। কোলকাতার লোকের নাকি সকালের চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ না হলে চা বিস্বাদ লাগে। সেটির অভাবও এখানে ছিল না।

নীলু প্রাণেশের কাছে শুনেছিল, তার বাবার লেখা কয়েকটা বাংলা ও সংস্কৃত ব্যাকরণ বই রয়েছে। সেগুলো কোলকাতার অনেক ইস্কুলে পড়ান হয়। কান্তি জেঠা তাঁর চাকরী ছাড়াও অবসর সময়ে কোষ্ঠি-বিচার ও ভাগ্য গননা করতেন নিজের বাসায় বসে। যজ-মানদের বাড়ী থেকে ডাক এলে তাঁদের বাড়ীতেও যেতেন।

কান্তি জেঠা আচার্যপাড়ায় সকলের চেয়ে স্বচ্ছল ছিলেন যদিও তাঁর জমি-জায়গা ভট্চায জেঠাদের মত অত ছিল না। এই কান্তি জেঠার সঙ্গে শংকরীপ্রসাদের সবসময় চিঠিপত্রের আদান প্রদান হত। কোলকাতা থেকে আসার সময় তিনি শংকরীপ্রসাদের জন্য চা নিয়ে আসতেন। এ ছাড়া বাবার চিঠিতে লেখা ফরমায়েশী অনেক জিনিস আনতে কান্তি জেঠাকে দেখেছে নীলু। কোলকাতা থেকে পাশকুঁড়া পর্যন্ত রেলগাড়ীতে এসে পাশকুঁড়ায় নেমে বাস ধরে তিনি নরঘাট আসতেন তমলুক হয়ে। নরঘাটের খেয়া পেরিয়ে বার-তের মাইল পথ পায়ে হেঁটেই তিনি শাপলা পৌঁছাতেন।

নীলু তখনও কোলকাতা দেখে নি কিন্তু কোলকাতার মানুষ, কান্তি জেঠাকে সে দেখেছে। তাঁর কাছ থেকে কোলকাতার অনেক গল্প শুনে শুনে সে নিজের মনে কোলকাতার অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকেছে। সে ছবিগুলো বেশ স্পষ্টই তার কাছে। অবশ্য কান্তি জেঠা নীলুর সঙ্গে বিশেষ গল্প সল্প করতেন না। দেখা হলে পড়া শুনার কথা ছাড়া অন্য বিশেষ কিছু তিনি বরং বলতেন না। তবে তিনি বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। নীলু পাশে থেকে সেগুলো গোগ্রাসে গিলত যেন। বাবা কান্তি জেঠার সঙ্গে নানা দেশ বিদেশের গল্পও করতেন। তাঁদের মধ্যে সম্পর্কটা ছিল প্রীতি ও শ্রদ্ধার। তাঁরা যখন গল্প করতেন তখন তাদের দেখে মনে হত তারা যেন দুই ভাই। কখনও কখনও শৈলমামা এসেও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতেন।

দেখতে কান্তি জেঠা ছিলেন ছোটখাট, মেদবিহীন অতি সাদাসিধে মানুষ। পরনে ধুতি—ত্রিকচ্ছ করে পরা। পায়ে সাধারণ একজোড়া চটি, গায়ে একটা ফতুয়া। সেই ফতুয়ার পকেটে থাকত ছোট একটা পঞ্জিকা আর তাঁর চাঁদির চশমার খাপ। শীতকালে তাঁর গায়ে থাকত একটা শাল। তিনি কোনদিন পান, সুপারি, বিড়ি, তামাক এমন কি পণ্ডিতি নস্যও পর্যন্ত নিতেন না। নেশার মধ্যে ঐ এক হল চা। তেলমশলাহীন সামান্য আহারই তিনি করতেন। বেশী ঘি মশলা তার পেটে সহ্য হত না। বয়সে তিনি শংকরী-প্রসাদের চেয়ে দু-তিন বছরের বড় ছিলেন। শংকরীপ্রসাদ তাঁকে কান্তি দা বলেই ডাকতেন। ঐ বয়সে কিন্তু কান্তি জেঠার বেশীর ভাগ দাঁতই পড়ে গিয়েছিল আর মাথায় ছিল মস্ত এক টাক। শংকরীপ্রসাদ তখন প্রায় যুবকই। কোন কিছু পড়ার সময় তিনি পকেট থেকে চশমার খাপ বার করে চাঁদির চশমাটা পরতেন। পড়া হয়ে গেলে চশমাটা চোখ থেকে খুলে খাপে ভরে আবার খাপটা ফতুয়ার পকেটে রেখে দিতেন। সবসময় তিনি কোলকাতার ভাষাই ব্যবহার করতেন। দেশের ভাষা বা বিশেষ উচ্চারনের টান কখনই তাঁর কথার মধ্যে কেউ শুনতে পেত না।

এই আপাতঃ সাধারণ মানুষটি নীলুর মনে এক সশ্রদ্ধ আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। নীলু ঐ বয়সে তার বিচারবুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারত, এই লোকটি অন্য সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র। স্বাতন্ত্র্যের ছাপটা তাঁর চেহারার মধ্যেই নীলু দেখতে পেত। কান্তি জেঠা বেশ ফর্সাই ছিলেন। তাঁর চেয়েও ফর্সা লোক নীলু অনেক দেখেছে! কিন্তু নীলু তার গায়ের রঙের উপর এক শুভ্র পাণ্ডুর আভা দেখতে পেত। এটি অন্য কারোর ক্ষেত্রে তার চোখে পড়ত না। নীলু অনেক পরে বড় হয়ে বুঝেছিল, এটি সূর্যালোকের অভাব এবং প্রত্যহ ক্লোরিন মিশ্রিত কোলকাতার জলে স্নান করার জন্যেই হয়েছিল।

তার মুখের মধ্যে একটা অমায়িক হাসি এবং সারল্য ছিল কিন্তু যখন তিনি গান্ধীজী, সুভাষ বোস এবং অন্যান্য দেশ নেতাদের কথা আলোচনা করতেন তখন নীলু দেখত তাঁর মুখের রেখায় কখনও আনন্দ কখনও বা উত্তেজনা খেলে বেড়াত। আর ঐ সব সময়ে তাঁর মুখে একটা বুদ্ধিদীপ্ত ছাপও ফুটে উঠত।

বৈশিষ্ট তার আরও ছিল। তিনি যেমন ওয়াড্‌র্সওযার্থের সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারতেন তেমনি সমানে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ থেকেও উদ্ধৃতি দিতে পারতেন। আবার জ্যেতিষ শাস্ত্রের গণনায় তিনি যেমন সনাতন প্রাচ্যমতে ভট্‌চায জেঠাদের মত বিচার করতেন তেমনি পাশ্চাত্য মতেও বিচার করে ফলাফল মিলিয়ে দেখে তবে রায় দিতেন। নীলুর বিবেচনায় কান্তি জেঠা ইংরাজীতে যেমন তাদের গাঁয়ের একমাত্র বি, এ, পাশ রমেন্দু কাকার সমকক্ষ তেমনি সংস্কৃতেও জ্যোতিষ শাস্ত্রে তিনি ঈশ্বর জেঠারও সমকক্ষ। তিনি তাই ছিলেন নীলুর কাছে সব্যসাচী।

কান্তি জেঠা ছিলেন অজাতশত্রু। কেউ কোন দিন তাঁকে রাগতে বা অন্য কাউকে গালাগালি বা খারাপ কথা বলতে দেখে নি। কেউ তাঁকে অধিক আনন্দে অধীর হয়ে উঠতেও দেখে নি। তিনি সাধারণতঃ অতি উচ্চ স্বরে কথা বলতেন। কোন কিছু সমালোচনার সময় উত্তেজিত হয়ে তিনি কিছু বলতে গেলেও কণ্ঠস্বর একটা নির্দ্দিষ্ট

সীমা কখনই অতিক্রম করত না। এবং তা' বাবা, শৈলমামা, ভটচায জেঠা ও অন্যদের কণ্ঠস্বরের সীমারেখার অনেক নীচেই থাকত। তিনি যেমন সশব্দে উচ্চহাস্য করতেন না, তেমনি তাঁর মুখে স্মিত হাসির অভাবও কখনই দেখা যেত না।

গ্রামের লোকদের কথাবার্তা ও চলাফেরার মধ্যে তাঁর তফাৎ ছিল এইসব ক্ষেত্রে। পোশাকে তিনি ধোপ দুরস্ত ছিলেন না ইংরাজী মাষ্টারের মত। বরং গ্রামের অন্য পাঁচজন স্বচ্ছল লোকেদের বেশী কিছু তার গায়ে থাকত না! কিন্তু যা-ই তিনি পরুন না কেন, তা ছিল সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

গ্রামের অন্য কারোর বাড়ীতে যেতেন না বলে কারো কোন ব্যাপারে তাঁর মাথাব্যথা ছিল না। তাই গ্রামের কারোর কোন নিন্দা বা আলোচনা কখনই তিনি করতেন না। সে জন্য তাঁর শত্রুও কেউ ছিল না গ্রামে। তাই বলে সকলে তাঁর মিত্র ছিল না। তিনি কারোর সঙ্গে মিশলে তো তার মিত্র হবে। সবাই বরং তাঁকে এক সম্মানিত, শিক্ষিত এবং পদস্থ অতিথি বা আগন্তুকের মত দেখত।

সকলের চোখে তিনি এক বরফ-কঠিন সশ্রদ্ধ সুউচ্চ আসনে বসতে পেরেছিলেন তাঁর এই স্বভাবের জন্য। নীলু দেখেছে, তখনকার দিনে যাঁরা সংস্কৃত ভালো জানতেন লোকে তাঁদের সমীহ করত ঠিকই কিন্তু তার মধ্যে ছিল না কোন ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব। এ যেন কতকটা সেই 'মান দিয়ে দূরে রাখার মত।' কিন্তু ইংরেজী জানা লোক অবলীলাক্রমে সকলের ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারত। আধুনিক যুগে যে ইংরাজী না হলে চলবে না এটা সকলের কথাবার্তা থেকে নীলু বেশ বুঝতে পারত। ইংরেজরা হল রাজার জাত, তারা গোটা পৃথিবীর অর্দ্ধেকেরও বেশী জায়গা নিজেদের দখলে রেখেছে—এ সব কথা নীলু শুনত। তাই ইংরেজী জানা লোকদের বেশী কদরই সে দেখেছে।

কান্তি জেঠা সবদিক থেকেই উঁচুতে রয়েছেন। তিনি তাই

সাবেক আর আধুনিক কালের এক আশ্চর্য সমন্বয়। নীলুর কাছে কান্তি জেঠা ছিলেন এক খাষির মত লোক, যিনি ইংরাজী বাংলা, সংস্কৃত—তিন ভাষাই জানেন। তিনি ভূত, ভবিষ্যত বলতে পারেন। জ্যোতিষীরা বর্তমানে বিশেষ খোঁজ রাখেন না। তাঁরা থাকেন অতীত আর ভবিষ্যতের সন্ধানে মশগুল। কিন্তু কান্তি জেঠা সেই বর্তমানেরও পুরো খোঁজ রাখতেন—সারা পৃথিবীর তাবৎ খবর ছিল তার নখদর্পনে।

এক কথায় তিনি সকলের কাছে ছিলেন অনন্য, নীলুর কাছে তো বটেই। আর তাই তাঁর কথাকে লোকে অনেকটা বেদবাক্যের মত অভ্রান্ত বলে মানত, নীলুর তো কথাই নেই।

এই কান্তি জেঠাই একদিন সকালের চায়ের আসরে শংকরী-প্রসাদকে পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের নানাকথা বলছিলেন। নীলু একটু দূরে দাঁড়িয়ে শুনছিল। এটা নাকি বিশ্বযুদ্ধ। তাই মহা-যুদ্ধ। দু বছর ধরে নাকি চলছে যুদ্ধটা। পৃথিবীর সব কটা দেশই নাকি এর মধ্যে প্রায় জড়িয়ে গেছে। প্রতিদিনই হাজার হাজার লোক মরছে। যে পক্ষ যখনই সুযোগ পাচ্ছে তখনই প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করছে। কোলকাতাতেও যুদ্ধের ছোঁয়া লেগেছে। জিনিষপত্রের দাম নাকি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

কান্তি জেঠা বললেন—তবে কোলকাতাকে বৃটিশ প্রাণ দিয়েও রক্ষা করবে। ভারত হল বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যমনি আর সেই মধ্যমনির মনি হল কোলকাতা।

নীলু কান্তি জেঠার কোন কথাই কোনদিন অবিশ্বাস করে না। তাই সসম্ভ্রমে মনে মনে বলে নীলু—আর সেই কোলকাতার মানুষ হল কান্তি জেঠা।

কিন্তু কি আশ্চর্য! এতবড় একটা যুদ্ধ হচ্ছে, প্রতিদিন এত লোক মরছে, তার খবর শাপলা গ্রামের বিশেষ কেউ রাখছে বলে তো মনে হয় না। রাখলেও সে নিয়ে কারোর মাথাব্যথা নেই

একেবারে সকলে চাষবাস, মামলা-মোকদ্দমা, পূজা-পার্বন, যাত্রা-ম্যাজিক, মেলামেশা, পারস্পরিক কোন্দল এস নিয়েই ব্যস্ত।

গ্রামের সব লোকদের মনে মনে শুনিয়ে নীলু বলে—একি আর সেই মহাভারতের যুগের ন্যায়যুদ্ধ? কবে যে ঐ উড়ো জাহাজগুলো শাপলা গাঁয়ে বোমা ফেলে যাবে, তার ঠিক আছে কিছু?

আর কান্তি জেঠা তো বলেছেনই যে, যুদ্ধের ছোঁয়া কোলকাতায় লাগছে। ব্রিটিশ না হয় চেষ্টা করবে প্রাণপণ কিন্তু না পারলে, তখন? তখন কি আর যুদ্ধটা শাপলা গাঁয়ে চলে আসবে না?

হাঁ, নীলুর ভাবনাই ঠিক। তা যে হতে পারে, সে কথা তো কান্তি জেঠার কথাতেই বোঝা যাচ্ছে। কান্তি জেঠা বাবাকে শুনিয়ে যাচ্ছেন ইউরোপের যুদ্ধের সেই সব লোমহর্ষক, মর্মান্তিক কাহিনীগুলো। যুদ্ধে গ্রাম নগর সব বোমায় বোমায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। লোকজন ঘরবাড়ী ছেড়ে পালাচ্ছে। কত নারী বিধবা হচ্ছে, কত শিশু নিরাশ্রয় হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। কোলকাতায় কোনদিন বোমা পড়লে সেখানেও বাস করা দুঃসাধ্য হবে, কোলকাতা ছেড়ে পালিয়ে আসতে হবে, সে কথা কান্তি জেঠা বললেনও।

শংকরীপ্রসাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তার শেষে সেদিন উঠতে উঠতে কান্তি জেঠা বলেছিলেন—বুঝলে ভাই শংকরী, শাস্ত্রে আছে কলিতে পৃথিবী ছিন্নভিন্ন হয়ে পাপের ভারে অতলে তলিয়ে যাবে। পৃথিবী একেবারে শেষ হয়ে যাবে, এ কথা মিছে নয়। শাস্ত্র বচন ফলবেই। শাস্ত্রে আছে।

'যদা তু বৈদিকী দীক্ষা দীক্ষা পৌরাণিকী তথা।
ন স্থাস্যতি শিবে শান্তে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥
কচিচ্ছিন্না কচিদ্ভিন্না যদা সুরতরঙ্গিণী।
ভবিষ্যতি মহা প্রাজ্ঞে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ।'

কান্তি জেঠা চলে গেলেন। রেখে গেলেন নীলুর মনে সেই অবশ্যম্ভাবী অমোঘ মৃত্যুর শীতল ছায়া। নীলুর মন খারাপ হয়ে যায়। হয়ত একদিন তাদের গ্রামেও বোমা পড়বে। তার বাবা,

মা, রানী, রাসু—এরা সব মারা যাবে, সে যদিও বেঁচে থাকেও তবে সে বাঁচারই বা কি দাম ? আর সে যদি মরে যায় ? মরতে যে শীগ্‌গীর হবে, এ তো কান্তি জেঠার কথাতেই সে বুঝতে পারছে। যদি মরতেই হয় তবে কি লাভ আর খেলাধূলা করে, খেয়ে দেয়ে বা এখন থেকে বেঁচে থেকে বা বাঁচার চেষ্টা করে ? মৃত্যু ভাবনায় নীলু বিমর্ষ হয়ে ওঠে। সে সেদিন সারাদিন প্রায় গুম মেরে বসে থাকে, কারোর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্ত্তাও বলে না।

অথচ সে দেখে অবাক হয়, তার চারপাশের সকলে কেমন নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন। নীলুর ইচ্ছা হয় ওদের করুণা করতে। ওরা জানে না বা জেনেও জানে না যে শীঘ্রই মৃত্যুর দূত তাদের কাছে হাজির হচ্ছে। সন্ধ্যাবেলা কোনরকমে সুরেশ পণ্ডিতের কাছে পড়া শেষ করে নীলু বিছানায় শুয়ে পড়ল। রমলা খেতে ডাকতে আসতেই নীলুর তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। সে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল— মা গো, আমরা সকলে মরে যাব !

—ষাট, ষাট! ভারি অসভ্য হয়েছিস, রমলা তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন.—কে বলেছে তোকে এ কথা ?

—আমি জানি, মা। তুমি জান না, মস্ত যুদ্ধ হচ্ছে। আমাদের গ্রামেও বোমা পড়বে একদিন, দেখো।

—পাগল! যেখানে যা শোনে, তাই-ই মনে করে রাখে আর যতসব আজগুবি ভাবনা ভাবে। ওঠ তো, খাবি চল। সারাদিন আজ বড়ি দিতে গিয়ে রাতের রান্না দেরী হয়ে গেল। খেয়ে নিবি চল্। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। তোরা খেয়ে নিলে একটু শুয়ে পড়ি।

নীলু অনিচ্ছাসত্ত্বেও খায়। ভালো করে খেতে পারে না। খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। সারারাত ধরে শুধু যুদ্ধের স্বপ্ন দেখে চলে।

সকালে উঠে সে প্রতিদিনের মত প্রসন্ন উজ্জ্বল সূর্যের মুখ দেখল। গত রাতের দুর্ভাবনাকে যেন একটা দুঃস্বপ্ন বলে তার মনে হতে লাগল। সূর্যের দিকে চেয়ে সে বিশ্বাস করতেই পারল না

যে, পৃথিবীটা শীঘ্র ধ্বংস হয়ে যাবে। রাতের সমস্ত অবিশ্বাস, সন্দেহ বুঝি এমনি করে ঘুচে যায় প্রত্যূষের সূর্যের অভ্রান্ত আগমনে। নীলু যেন একটু একটু বুঝতে পারে, সূর্যই হল আমাদের সকল বিশ্বাসের প্রতীক। সে তার মনের অহেতুক দুর্ভাবনাগুলোকে অবলীলায় মুছে দিয়ে নির্মেঘ আকাশের মত খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তার দৃঢ় বিশ্বাস জাগে, সূর্য এমনি করে অনেক দিন উঠবে আরো, আরো, আরো···! পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়ও বা তবে সে এখন হতেই পারে না। সে হবে অনেকাল পরে। নীলু মনে মনে আঁচ করে নেয়—মহাভারতের কাল থেকে মানুষ যতকাল চলে এসেছে তারও অনেক অনেক পরে।

নীলু আপনমনে বিড়বিড় করে বলে—এখন হতেই পারে না।

অতএব মা ভৈঃ। নীলু দাঁত মাজতে মাজতে দেখতে পায় সূর্য যেমন প্রতিদিনের মত আজ উঠেছে তেমনি সকলে প্রতিদিন যা যা করে তাই-ই করে যাচ্ছে। পণ্ডিতপাবন জেঠা মন্ত্র পড়তে পড়তে জল থেকে উঠে বটগাছে জল দিচ্ছেন আর মন্ত্র পড়ছেন। নীলু তখন ঘাটে মুখ ধুতে নেমে গেল। মুখ ধুতে ধুতে শুনতে পাচ্ছে, পণ্ডিত জেঠা সূর্য প্রণাম করছেন :—

'ওঁ এহি সূর্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।

অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহানার্ঘাং দিবাকর॥'

দাঁত মেজে খেয়ে দেয়ে ইস্কুলে যাবার সময় নীলু দেখে পণ্ডিত পাবন জেঠা স্নান স্তব সেরে দোকানঘরে ধূপ-ধুনা দিচ্ছেন বাবা চা খেতে খেতে খাতাপত্র লিখছেন। মা রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত, মানদা বুড়ী খুব ভোর থেকে ধান সেদ্ধ করায় খুব ব্যস্ত। এখনও সেই কাজ করছে উনানের পাশে বসে বসে। হরি গরু নিয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছে। নগেন কাকা দোকানঘরের বারান্দা ঝাঁট দিচ্ছে। শৈলমামা করবী গাছের নীচে নরম রোদে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ে যাচ্ছেন। আর দূরের দিকে তাকিয়ে নীলু দেখতে পায়, কান্তি জেঠা চটি পায় দিয়ে শব্দ তুলে তাদের বাড়ীর দিকেই আসছেন।

অবিকল প্রত্যহের চিত্র। নীলুর মন প্রসন্ন হাসিতে ভরে যায়। তার মনে আর সন্দেহের ভয়ের লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই। সেও মনে মনে বলে— '...গৃহানার্ঘ্যাং দিবাকর।' নীলু লাফাতে লাফাতে ইস্‌কুলের পথে এগিয়ে যায়।

ইস্‌কুলে গিয়ে নীলু তার বন্ধু রাখাল আচার্যের কাছে শুনল, আসন্ন শিব-চতুর্দ্দশীর মেলায় ক্ষুদি বারিকের ম্যাজিক বসবে শিবের চরকপোতায়। ম্যাজিক কি জিনিষ, নীলু দেখে নি। রাখাল তাকে বোঝায়। রানী ও নীলু বলে, তারা আগে দেখেছে। সেই ভোজের বাজি দেখার জন্য নীলুর মন আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে। গতকাল যে মন তার বেঁচে থাকার সার্থকতা খুঁজে পায় নি, সেই মন আজ বেঁচে থাকার সার্থকতায় আনন্দে উদ্বেল হয়ে যায়।

এলো সেই পরম লগ্ন যথাসময়ে। শিব-চতুর্দ্দশীর মেলায় আগেই নীলু এসে তার জেঠাদের বাড়ীতে থাকল। রাসু এসে থাকল তার পিশে বাড়ীতে। নীলু ম্যাজিক দেখতে এসে অবাক হয়। ক্ষুদি বারিক এক একটা ভোজের বাজি দেখায় আর দর্শকেরা সকলে আনন্দে ফেটে পড়ে।

এক একটা খেলা শেষ করে ক্ষুদিরাম বেতের ছড়ি দিয়ে জোকারের পিটে চটাস্ চটাস্ শব্দ করে মারে। আর জোকার চীৎকার করে সুর করে বলে—আরে, বাবা গো। টা রা রা, রা রা গো।...সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে বাজনা বেজে ওঠে ওর মধ্যে। জোকার অঙ্গভঙ্গি করে নাচে।

কত ভোজের বাজী দেখল নীলু—তাসের খেলা, মানুষ অদৃশ্য করার খেলা, খালি টিনের কৌটা দেখিয়ে পরে তার ভেতর থেকে রুমাল, জিলাপী, হাঁস পায়রা ইত্যাদি বার করে দেখান, এই রকম। আর কি আশ্চর্য, সেই জিলাপীগুলো লোকে খেয়ে দেখেছে—একেবারে আসল জিলাপিই। হাস পায়রাগুলো জ্যান্ত একেবারে। ছেড়ে দিতেই উড়ে গেল।

ম্যাজিকের সঙ্গে কিছু কিছু কসরতও ছিল। নামে ম্যাজিক

হলেও কিছুটা সার্কাসও বটে। ম্যাজিকের সঙ্গে নানারকমের ব্যাল্যান্সের খেলা, বিখ্যাত বর্শাখেলাও ছিল। আর ছিল নর-রাক্ষসের খেলা। সেটি সকলের শেষে দেখান হত। একটি লোককে ঘুমন্ত অবস্থায় এনে মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হল। তারপর তার উপর ক্ষুদিরাম একটা সাদা চাদর ঢেকে দিল এবং তার সহকারীরা তারপর তার কোমরটা ইয়া মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে দড়ির দু' প্রান্ত বাইরে বার করে রাখল। তারপর দর্শকদের মাঝ থেকে দশ বার জনকে উঠে এসে দড়ির দু' প্রান্ত ধরে রাখার জন্য ক্ষুদি বারিক আহ্বান জানাল।

তারপর ম্যাজিসিয়ান কি সব মন্ত্র পড়ে ঘুমন্ত লোকটার উপর জল ছিটিয়ে দিয়ে তার যাদুমন্ত্রটা লোকটার মাথায় ছুঁইয়ে দিল। অমনি লোকটা জেগে উঠে বিকট চীৎকার করতে করতে দাপাদাপি করতে লাগল। ঐ দশ বারজন লোক তাকে ধরে রাখতে পারছিল না। শেষে ক্ষুদিরাম একটা জ্যান্ত পায়রাকে লোকটার দিকে ছুঁড়ে দিল। লোকটা ধরে ফেলে জ্যান্ত পায়রাটাকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে তার মাথাটা ছিঁড়ে ফেলে তার রক্ত খেতে লাগল। দৃশ্যটা দেখে ছেলেরা তো দূরের কথা বড়রাও ভয়ে আধমরা হয়ে গেল।

খেলা শেষ হল কিন্তু তার রেশ রয়ে গেল পুরো নীলুর মনে। সে ভাবতে লাগল কি করে অমন ম্যাজিক দেখান যায়।

তাদের মধ্যে ম্যাজিক সুরুও হয়ে গেল। রাখাল বেশ তাসের খেলা দেখাতে পারে। হয়ত এক গোছা তাস নিয়ে কাউকে বলল তার মাঝ থেকে একটা টেনে নিতে। তারপরে রাখাল বলে দিত কোন রংয়ের কি তাস টানা হয়েছে। কালা খানিকটা ব্যালেন্সের খেলা দেখিয়ে সকলের প্রশংসা পেল।

এর মধ্যে রাসু তাকে একদিন বলল—আমিও একটা খেলা দেখাব তোকে। তুই আমাকে একটা গেঁড়ির চাক্তি এনে দে। আমি ওটাকে পয়সা করে দেব।

নীলু সঙ্গে সঙ্গেই এনে দিল একটা গেঁড়ির চাকতি। রাসু

বলল — এর থেকে পয়সা বানাতে সময় লাগবে তো। বিকালে দেব।

কি আশ্চর্য! বিকালে রাসু সত্যসত্যই একটা পয়সা দিল তাকে। নীলু তখন ভাবতেও পারে নি যে, রাসুর ওরকম একটা পয়সা থাকতে পারে। সে সত্যই ধরে নিল, রাসু ওটা ম্যাজিক দেখিয়েছে। রাসুকে তাই সে অনুরোধ করল খেলাটা তাকে শেখাবার জন্য কিন্তু রাসু কিছুতেই রাজী হল না। সে শুধু বলছিল—আরও একটু বড় না হলে এ জিনিষ তুই শিখতে পারবি না।

নীলুর মন খারাপ হয়ে যায়, সবাই ম্যাজিক পারে, সে পারে না। তার সব সময় চেষ্টা হতে লাগল, কি করে সে অন্ততঃ একটা খেলা দেখায়। একদিন দেখাল সে একটা সত্যিকারের ম্যাজিক। তবে সে রক্তের বিনিময়ে— একেবারে আসল ম্যাজিক।

এক সকালে গোয়ালে রমলা গাই দুইছেন। হরি বাছুরকে ধরে রয়েছে। সামনের পাঠের গুদামটার ধারে নীলু দাঁড়িয়েছিল। গুদামঘরের খুঁটির গায়ে কয়েকটা করোগেটেড টিনের 'শীট্' ঠেস দিয়ে দাঁড় করান ছিল। নীলু ঐ শীটের পাতলা প্রান্তগুলোর উপর দাঁড়িয়ে বাঁশের খুটি ধরে রাখল দুহাতে। হঠাৎ নীলুর খেয়াল হল ম্যাজিকের কথা। সে ভাবল, 'যদি সে হাত ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তাহলে চমৎকার একটা ব্যালেন্সের খেলা হয়ে যায়।

নীলুকে ঐভাবে দাঁড়াতে দেখে হরি চীৎকার করে বলে—এ্যাই নীলু নেমে যা, পড়ে যাবি।

কে শোনে তার কথা! নীলু তো ম্যাজিক প্রাকটিশ করছে, সে কথা তো আর হরি জানে না। ব্যস্, হলো ম্যাজিক। নীলু পড়ে গিয়ে চীৎকার করে উঠল। সকলে চারিদিক থেকে ছুটে এল। নীলুর ডান পাঁজরের কাছে তিন-চার ইঞ্চি মত লম্বা হয়ে কেটে গিয়ে রক্তারক্তি হয়ে গেছে। শৈলমামা তাড়াতাড়ি আয়োডিন আর তুলো ইত্যাদি এনে বেঁধে দিলেন। ফলে নীলুকে চার পাঁচদিন শুয়ে থাকতে হল।

পড়াশুনার হাত থেকে অব্যাহতি পেল সে কিন্তু ঘরে থাকতে সে হাঁপিয়ে ওঠে। পড়াশুনাটা বেশ ছুঃখকষ্টের ব্যাপার তা এতদিনে নীলু বুঝেছে কিন্তু তার চেয়ে বেশী কষ্ট বোধ হয় এ হেন নিঃসঙ্গ দিনযাপন। তারচেয়ে সঙ্গীসাথীর আনন্দের মধ্যে থেকে পড়াশুনার কষ্টটুকু সহ্য করা অনেক সহনীয়।

নীলুর সে ম্যাজিকের কথা আজও মনে পড়ে। সেই ম্যাজিকের কাটা ঘা জোড়া লাগালেও, দাগ আর ইহ জীবনে মুছে যাওয়ার নয়। আজও নীলু সে দাগে হাত বুলিয়ে তার সেই শৈশবের সুখস্বপ্নমাখা দিনগুলোর স্পর্শ পায়। আজ মনে হয়, শৈশবের বেদনাও মধুর, আনন্দ তো আরও মধুর।

কাটা ঘাটা শুকিয়ে যাওয়ার কয়েকদিন পরে সুরেশ পণ্ডিতের পা কেটে গেল গভীর হয়ে। তিনি ঘরামির কাজ করছিলেন নিজের ঘরে। ঐ সময় ধারাল 'ভাইসে' তার পা কেটে যায়। তিনি শয্যাশায়ী হয়ে থাকেন প্রায় ছ সপ্তাহের উপর। নীলু ও রাসুর আনন্দ ধরে না আর। সন্ধ্যেবেলা বইপত্র খুলে হারিকেন জ্বালিয়ে যথারীতি পড়তে বসতে অবশ্য তাদের হয় কিন্তু সে ছিল পড়ার ভান করা। পড়তে বসে মারামারিই হত তাদের মধ্যে বেশী।

ঐ সময় রাসু একদিন মারামারির সময় হারিকেনের এক পাশটা নীলুর পেটে ধরে। কাচের গরমে নীলুর পেটের ডানদিকে আধ ইঞ্চি অংশ গোল হয়ে পুড়ে যায়। শৈশবের আর এক স্মৃতি নীলু আপন সঙ্গে বহন করে চলেছে। ঐ গোল দাগটার উপর হাত বুলিয়ে সে রাসুকে খুঁজে পায়। মনে হয়, রাসু বুঝি সর্বক্ষন তার কাছেই রয়েছে।

একদিন তারা খবর পেল, সুরেশ পণ্ডিত পড়াতে আসবেন সেদিন সন্ধ্যাবেলায়। তাঁর ঘা শুকিয়েছে। শুনে ছ,ভাই খুব বিমর্ষ হয়ে পড়ল। রাসু তো বলেই ফেলল—হে ভগবান, পণ্ডিতের পাটা আবার জখম হয়ে যায়, না!

কিন্তু না, সেদিন তিনি এলেন। পড়ালেনও যথারীতি। ভগবান তাদের প্রার্থনা শুনেন নি বলে তাদের মন ভগবানের প্রতি অভিমানে পূর্ণ হয়ে উঠল।

কিন্তু না, ভগবান শুনেছিলেন তাদের কাতর প্রার্থনা। পর দিন আবার খবর এল যে, পণ্ডিত মশাইএর যে কাটা ঘা-টা সদ্য সদ্য জুড়েছিল তা গতকালের হাঁটাচলায় আবার ফেটে গেছে বাস্, আবার দিন সাতেকের মত তারা নিশ্চিন্ত হল ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাদের মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু তাই বলে তারা আর নতুন করে কোন প্রার্থনা জানাল না ভগবানের কাছে। বার বার যে একই জিনিস চাইতে নেই এ কথা বোধ হয় তারা বুঝেছিল।

এর কিছুদিন পরে রাসু-এক অভিনব খেলা আবিষ্কার করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিল। দোকানঘরের পিছনে ছিল একটা ছোট ঘর। সেখানে জালানী থাকত। তার একটা অংশ পরিষ্কার করে রাসু নীলুর সহায়তায় সেখানে কঞ্চির বেড়াদিয়ে তার উপর মাটি লেপে একটা দেওয়াল খাড়া করে ফেলল। ঐ দেয়ালের ছোট একটা অংশ কেটে রাসু সেখানে এক টকরা কাচ বসিয়ে দিল।

এবারে সে অনেকগুলো ছবি যোগাড় করল। প্রত্যেক নতুন কাপড়ের উপর নানা রং-বেরং এর ছবি থাকত। নগেন কাকা কে বলে কয়ে রাসু-অনেকগুলো ছবি সংগ্রহ করে ফেলল। সে-গুলোকে পর পর জোড়া দিয়ে সে ফিলি্মের মত তৈরী করে ফেলল। ওগুলো দেওয়ালের পেছন থেকে কাচের ভেতর দিয়ে দেখান হবে। ঘরের সাম্নের দিকে অংশে ছেলেমেয়েরা বসে দেখবে ছবিগুলো। রাসু নীলুকে বোঝায়—একেবারে সিনেমার মত হবে।

সিনেমা হলের ভিতর নানারকমের আসনের ব্যবস্থা করল তারা। কয়েকটা ভাঙ্গা চেয়ার ও বেঞ্চি এনে জড় করল। চেয়ার

গুলো ফার্ষ্ট ক্লাস. বেঞ্চিগুলো সেকেণ্ড ক্লাস আর সামনের দিকে খড় বিছিয়ে দিয়ে থার্ড ক্লাস তৈরী করা হল। আসন অনুযায়ী প্রবেশ মূল্যও নির্দ্ধারিত হল। পয়সা কোথায় পাবে ছেলেরা? অতএব গুগলির চাক্‌তিগুলো এক এক পয়সা। সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে রাসু সকলের মধ্যে প্রচার করে দিল তার অভিনব সিনেমার কথা। রাসু অবশ্য অপারেটার আর নীলু গেটম্যান।

আচার্যপাড়া, বেরাপাড়া ও আরো অন্যান্য পাড়া থেকে ছেলে মেয়েরা এসে রাসুর সিনেমা দেখে যেতে লাগল। ওপার থেকে নীলুর দাদারাও এসে দেখে গেল। রোজ তিনটে করে 'সো' হতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যে তাদের টিনের ছোটবড় কৌটায় হাজারখানেক চাক্‌তি জমা হল। চাক্‌তি তো নয়. ওগুলো তাদের পয়সাই। এ পয়সায় মনের বাসনা মেটে, বাস্তবের ইচ্ছাপূরণ হয়ত হয় না। তা না হোক, ওগুলো তাদের সম্পত্তি। তারা হাতছাড়া করতে পারে না।

সিনেমা অবশ্য খুব বেশীদিন চলে নি। প্রথম কারণ হল দিনের পর দিন একই ছবি দেখে দেখে দর্শকদের ভালো লাগছিল না। তাই পর পর ভীড় কম হতে লাগল তারা তখন প্রবেশ মূল্য অর্দ্ধেক করে দিল। তাতেও লোক বিশেষ হচ্ছিল না। ওদিকে রমলা আবার ঐ ঘরে ঘুঁটে রাখতে চাইলেন। তাই সিনেমা ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হল তারা।

আজ ভাবে নীলু, মানুষের ভাগ্যবিধাতা অনেক সময় তার সঙ্গে কি পরম কৌতুকই না করেন। সেই রাসু আজ ভাগ্যচক্রে সিনেমা অপারেটার। কোন স্থায়ী সিনেমা হলের নয়, বছরের কয়েক মাস একটা অস্থায়ী হলে অপারেটারের কাজ করে। তার মালিক কোন বছরই তার সম্পূর্ণ প্রাপ্য মাইনে দেয় না। সব সময় ক্ষতির কথা বলে। রাসুর সামান্য জমিজমা। সে সব থেকে বছরে তার তিনমাসেরও খাদ্যের যোগাড় হয় না। ওদিকে সিনেমার মালিক তার প্রাপ্য বাকী রাখে। তার দিন চলে না বলতে গেলে।

নীলু ভাবে, অথচ এই রাসু একদিন নিজেই সিনেমার অপা-রেটার সেজে হাজার হাজার পয়সা আয় করেছে। রাসুর কি সে সব কথা আজ অতি দুঃখের মধ্যেও একবার মনে পড়ে না? হয়ত পড়ে। তবে মনে পড়লেও সেদিনের সেই পয়সাগুলোকে নিতান্তই অবাস্তব মনে হয় নিশ্চয়ই। ঠিক তেমনি অবাস্তব মনে হয় তার মালিকের কাছ থেকে তার বকেয়া প্রাপ্য টাকাগুলো কোনদিন পাওয়া! ওগুলো রাসুর কাছে আজ শৈশবের সেই গুগ্লির চাকৃতির মতই মূল্যহীন, বা তার চেয়েও বেশী মূল্যহীন।

সে বছর কয়েকটি ঘটনা ঘটে নীলুর জীবনে। জাতির জীবনেও একটি ঘটেছিল—রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু। নীলুর স্পষ্ট মনে পড়ে, সে বিশ্বকবির মৃত্যু সংবাদ খবরের কাগজে নিজে পড়েছিল। মোটা অক্ষরে লেখা ছিল—'বিশ্বকবির মহাপ্রয়াণ।' পাশেই ছিল বিরাট শ্মশ্রুগুম্ফসমন্বিত সেই জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের স্বর্গীয় দিব্য ছবি। খবরের কাগজে মহাকবির শেষ কবিতাটিও ছাপা হয়েছিল। তা আর নীলুর মনে নেই।

নীলুর জীবনের বিখ্যাত প্রথম ঘটনাটি হল, সুভাষ বোসের গলায় মাল্যদান। নেতাজী এসেছিলেন হরিপুরের পাশের এক গ্রামে ভাষণ দিতে। নীলুর মনে আছে নেতাজীর পরনে ছিল ছাই রঙের মিলিটারী পোশাক। তাঁর সঙ্গে ছিল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যাদেরও পরনে ছিল একই রকমের মিলিটারী পোশাক। সকলের মাথায় বোধ হয় খদ্দরের টুপি ছিল।

নেতাজী নৌকায় এসে নীলুদের বাড়ীর কাছেই সদলবলে উঠে ছিলেন। তাঁর ব্যাণ্ড পার্টি বেজেই চলেছিল। প্রচুর কংগ্রেসীলোক নেতাজীর গলায় মালা পরিয়েছিল। ওরই মধ্যে নীলু শৈল মামার কোলে চড়ে নেতাজীর গলায় তাদের বাগানের ফুলের তৈরী মালা পরিয়ে দিয়েছিল। মালায় মালায় নেতাজীর শরীরটা যেন ঢেকে গিয়েছিল। নেতাজী নীলুর গাল টিপে আদর করেছিলেন, সে কথা ভাবতে আজও নীলু সর্বশরীরে অপূর্ব শিহরন বোধ করে।

জনসভায় অবশ্য নীলু সেদিন যায় নি। নেতাজীকে আর কোন দিন নীলু দেখেও নি কিন্তু নিজের গালে আজও সে সেই মহাবীর্যধর পুরুষের হাতের ছোঁয়া পায়—একটু চেষ্টা করলেই পায়।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল তার টাইফয়েড জ্বর। তখন এ জ্বরকে লোকে বলত সান্নিপাতিক জ্বর। এ জ্বরের কোন চিকিৎসা তখন ছিল না, বলতে গেলে, নীলু শুনেছে, ভটচায জেঠা নাকি বহুদিন আগেই গণনা করে শংকরীপ্রসাদকে নীলুর এক মস্ত অসুখের কথা বলেছিলেন। নীলুকে সাবধানে রাখার উপদেশও তিনি দিয়েছিলেন।

কিন্তু কথায় বলে 'গ্রহের ফের!' যতই সাবধানে থাক, যা ভবিতব্য তা হবেই। সামান্য ব্যাপার থেকেই হল বাড়াবাড়িটা। একদিন রাতের বেলায় কোন বিশিষ্ট অতিথির আগমনে শৈলমামা পুকুরে জাল ফেলতে গেলেন। হারিকেন নিয়ে নীলু গেল সাথে আলো দেখাতে। ঐ সময় নীলু অসাবধানে পা পিছলে পড়ে গিয়ে মাটিতে পোতা এক কাচের টুকরোয় হাঁটুর কাছে বেশ কিছুটা ক্ষত করে ফেলে। সেই ক্ষতের ব্যথা থেকে নীলুর একটি জ্বরমত হল। ঠাণ্ডা লেগে পরে সে জ্বরে বুকে সর্দি জমে গেল। ক্রমে ক্রমে তা সান্নিপাতিকের দিকে মোড় নিল।

শংকরীপ্রসাদ বাড়ীতে রোগীর জন্য দুজন ডাক্তার নিযুক্ত করলেন সর্বক্ষনের জন্য। তাঁদের একজন ছিলেন এল্, এম্, এফ। অপরজন ছিলেন পাশকরা কম্পাউণ্ডার। জ্বরের যখন খুব বাড়াবাড়ি তখন তাঁরা দুজন পালা করে রোগীর কাছে থাকতে লাগলেন। দীর্ঘদিন ধরে যমে মানুষে লড়াই চলল। এক একদিন রোগীর এমন অবস্থা হত যে বাড়ীতে কান্নার রোল পড়ে যেত। ঐ সময়ে তার অবস্থার কথা নীলুর নিজের জানার কথা নয়। সে সুস্থ হয়ে পরে সকলের কাছে শুনেছে।

একদিন তার দেহের তাপ ৯৫-তে এসে দাঁড়ায়। ডাক্তার নাড়ী পাচ্ছেন না, বুকের স্পন্দনও স্তিমিত, লুপ্তপ্রায় বা, শেষে রাশি রাশি গরম জলের বোতল এনে রোগীর চারপাশে জড় করা হল। দীর্ঘ

পাঁচ ঘণ্টার অনেক পক্রিয়ার পর নীলুর দেহের তাপ ফিরে এল।

ভটচায জেঠা রোজ সকাল সন্ধ্যা, যখন-তখন এসে রোগীর খোঁজখবর নিয়ে যেতেন। রোগীর দেহের তাপ ফিরিয়ে আনতে যখন ডাক্তাররা হিমশিম খাচ্ছেন তখন তিনি সকলকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন— ভয় নেই। তাপ ফিরে আসবে। তবে আর এক মারাত্মক বিপদ আসছে। সেটি আগামী কালই।

তিনি ডাক্তারদের সাবধান করে বলে দিয়েছিলেন যে, আগামী কাল তাঁদের ওষুধে মারাত্মক বিভ্রম হবে গ্রহের ফেরে। অতএব ডাক্তাররা যেন খুবই সাবধানে থাকেন।

কিন্তু আবার সেই কথা—'গ্রহের ফের।' দীর্ঘদিন ধরে নানারকমের ওষুধ প্রয়োগের কালে নীলুর বিছানার পাশে দেওয়ালের তাকে হরেক রকমের শিশি বোতল জড় হয়েছিল। পরদিন এক ডাক্তার পাথরের খলে মকরধ্বজ বেটে রোগীকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করছিলেন। পাশেই বসে রমলা। মকরধ্বজ মৌ-তে মিশিয়ে রোগীকে খাওয়ান হবে। মৌর-এর শিশির পাশে কি ভাবে যেন তারপিন তেলের শিশিও ছিল। ডাক্তার ভুলে মৌর বদলে তেলের শিশি থেকে তেল ঢেলে মকরধ্বজে মিশিয়েছেন। আশ্চর্য। গ্রহবৈগুন্যে ডাক্তার বা রমলা কেউই তারপিনের উগ্র ঝাঁক নাকে পান নি। অথচ ওর ঘ্রাণে বিষধর সাপও নিস্তেজ হয়ে ফনা গুটায়।

ঐ ওষুধ তারপর নীলুকে খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয় কিন্তু নীলু কিছুতেই খেতে চায় নি। শেষে রমলা জোর করে নীলুর মুখটা ফাঁক করে ধরে আর ডাক্তার প্রায় ওষুধটা মুখের মধ্যে ঢেলে দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ঈশ্বর আচার্য্য ঘরে ঢুকেই বলে ওঠেন—আরে, তারপিন তেলের গন্ধ যেন কোথায় পাচ্ছি।

সেই মুহূর্তে তারপিনের উগ্র ঝাঁঝ যুগপৎ ডাক্তার ও রমলার নাকে লাগে। তাঁরা নিজেদের বিষময় ভুলের কথা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন। জ্যোতিষীর ভবিষ্যত বাণী সফল হয়। কিন্তু ভগবানের অশেষ করুণায় নীলু বেঁচে যায়।

ডাক্তার লজ্জায় মুখ নীচু করে থাকেন। রমলাও লজ্জিত এবং আতংকিত হয়ে পড়েন। ঈশ্বর আচার্য তাঁদের তিরস্কার না করে বলেন—এ হয়, গ্রহের এমনি ফের। গ্রহের ফের এড়াবার সাধ্য ইহজগতে কারোর নেই, মা, একমাত্র ভগবানই পারেন গ্রহের ফলকে ঘুরিয়ে দিতে। তাঁরই কৃপায় নীলু আজ প্রাণ ফিরে পেল।

পরে তিনি রমলাকে বলেছিলেন মা, আমি গণনায় যা পেয়েছি, তা সাংঘাতিক। সেমত হলে তোমার ছেলে ফিরে পাওয়ার কথা নয়, একমাত্র পরম করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় তুমি আজ ছেলে ফিরে পেলে। এতদিন আমি রোগের পরিণতি সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলিনি। আজ সানন্দে বলছি, আর কোন চিন্তা নেই। অশুভ গ্রহ নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। তোমার ছেলে শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে।

এই বলে তিনি নীলুর হাতে একটা মাদুলী পরিয়ে দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন, মাদুলীটা নীলুর হাতে অন্ততঃ তার ষোল বছর বয়স পর্যন্ত যেন থাকে। নীলু তারপর খুব তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে। দীর্ঘ দেড় মাসের পর তাকে পথ্য দেওয়া হয়েছিল। ভগবানের কৃপায় সান্নিপাতিক জ্বরে তার কোন অঙ্গহানি হয় নি। সেই সোনা রুপার মাদুলী নীলুর ম্যাট্রিক পাশ করা পর্যন্ত হাতে বাঁধা ছিল।

এই ভটচায ছিল এক রহস্যঘেরা পুরুষ। লোকে বলত, তিনি নাকি কামাখ্যায় গিয়ে তন্ত্রসিদ্ধি শিখে এসেছিলেন। আগে নাকি তিনি শূন্যমার্গে উড়ে রাতের বেলায় কামাখ্যায় গিয়ে আবার রাতের বেলাতেই ফিরে আসতেন। যাই হোক তাঁর ভবিষ্যত বাণী চিরকাল এমনই অভ্রান্ত ছিল। তাঁর আরো বহু প্রমাণ উত্তর জীবনে নীলু পেয়েছে।

একটু বড় হয়ে নীলু বুঝেছিল, ভটচায জেঠা কোন তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন না। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন বলেই অত নির্ভুল গণনা করতে পারতেন। এটি যে অঙ্কশাস্ত্রের এক সুনির্দিষ্ট শাস্ত্র, তা নীলু ছোট বেলায় যেমন বিশ্বাস করেছে, আজও

তেমনি সমানভাবে কিংবা বেশী করে করে। অংকে পারদর্শী না হলে যেমন উত্তরে ভুল হতে পারে তেমনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী না হলে ভবিষ্যত বাণীও অভ্রান্ত হতে পারে না।

ভটচায জেঠার বহু অভ্রান্ত ভাবিষ্যত বাণী শুনে শুনে নীলুর উত্তর জীবনে একবার ধারনা হয় যে, মানুষ যা কিছু করে, নিজের প্রচেষ্টায় বোধ হয় নয়—সবই গ্রহ বা তার ভাগ্য করায়। কেউ যে ধনী বা নির্ধন, কেউ যে সাধু বা চোর, এ সবই বুঝি গ্রহনির্দিষ্ট।

নীলু তখন তার ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তির পথে। সেই সময় তার মনে ঘোর সংশয় জাগে—তাহলে মানুষের এ জগতে নিজস্ব করার কি কিছুই নেই? সবই যদি গ্রহ করায় তবে মানুষের কোনকিছু করার চেষ্টারই বা কি দরকার?

নীলুর শিক্ষিত যুক্তিবাদী মনে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি আজন্ম বিশ্বাসের উপর আস্থার অভাব ঘটে। কিন্তু সে অবিশ্বাসও করতে পারে না। কারন হাতে হাতে ফল পেয়েছে সে অনেকবার। মনের সংশয় দূর করতে ছুটে যায় সে তার ভটচায জেঠার কাছে। তিনি নীলুকে যে উপমা দিয়ে বুঝিয়েছিলেন সে উপমা বোধ হয় একটিই হয়। তার আর দ্বিতীয় নেই।

তিনি বলেছিলেন—তুমি রোদের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ। তুমি কি পার কোনক্রমে সূর্যের প্রভাবকে উড়িয়ে দিতে?

নীলু বলে, না, তা পারি না।

ঈশ্বর আচার্য মৃদু হেসে বলেন—উড়িয়ে দিতে না পার, অতি অল্প—প্রায় নগন্য হলেও—এড়িয়ে যেতে পার।

নীলু অবাক হয়। বলে—এড়িয়ে যাওয়া কেমন?

—যেমন ধর তুমি ছাতা মাথায় দিলে, ঈশ্বর আচার্য বলেন—তাতে কি হল? সূর্য তাঁর প্রভাব ঠিকই ছড়িয়ে গেলেন কিন্তু তুমি একটু এড়িয়ে বাঁচলে। সেইরকম গ্রহের প্রভাবও তুমি উড়িয়ে দিতে পার না। তোমার সারা জীবনের ঘণ্টা, মিনিট, দিন নির্দিষ্ট। নির্দিষ্ট তোমার কর্মযজ্ঞ এবং কর্মফলভোগ। তুমি আপন সাধু প্রচেষ্টায় তাদের

অন্নই এড়াতে পার বা তাদের মোড় ঘুরাতে পার। তবে যতটুকু পার বলে বললাম তার জন্য কঠিন প্রচেষ্টা দরকার, যা সাধারনের পক্ষে সহজ নয়। তাই আমরা সব কিছু গণনা করে বলে দিতে পারি।

নীলু প্রশ্ন করে—গণনাটা কি রকম ?

—এ অংকের মত জিনিস। তুমি যে বিশেষ মুহূর্ত্তটিতে ভূমিষ্ঠ হলে, সেই সময়ের মহাকাশে বিভিন্ন রাশি নক্ষত্রের অবস্থান নির্দিষ্ট। ঐ নির্দিষ্ট সূত্র ধরে তোমার সব কিছু আমরা স্রেফ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ কষে স্থূলভাবে বলে দিতে পারি। আর সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে আরো নানা রকমের চুলচেরা বিচার বিবেচনার প্রয়োজন হয়। তার জন্য অবশ্যই চাই শাস্ত্রে সম্যক দক্ষতা ও ব্যুৎপত্তি আর অধীত বিদ্যা প্রয়োগের ক্ষমতা। শেষেরটি সকলের থাকে না। ওটি আবার বিধি প্রদত্ত।

নীলু ক্ষুণ্ন হয়ে বলে—তাহলে ঐ সামান্য পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য এ হেন অসামান্য প্রচেষ্টা জনমভোর করে লাভ বা কি ?

ভটচায জেঠা নীলুর থুত্‌নি চুম্বন করে বলেছিলেন—মহাকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো, তুমি সামান্য, নগন্য। তোমার সব কিছুই সামান্য। তুমি মহাকাশে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যতটুকু দেখতে পাচ্ছ তা কিন্তু সামান্যই। তার বাইরে আরো অনেক আছে, যা তুমি দেখতে পাচ্ছ না। অতএব তোমার অবস্থিতি এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় কোন গণনায়ই আসে না। তুমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র, তুমি জানো—

নীলু স্বীকার করে বলে—হ্যাঁ, আপনার এ কথা অবশ্যই মানি।

সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর আচার্য বলেন—আবার দেখো, তোমার নিজের কাছে তোমার জীবন দীর্ঘ মনে হলেও মহাকালের কাছে তা এক পলকের শতকোটি ভাগেরও এক ভাগ নয়। আর তুমি নিজে, তোমার অবয়ব ? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কথা বাদ দিলেও মহাবিশ্বের অত বড় বড় সব নক্ষত্রের তুলনায় কি হাস্যকর বল ? অত কথা কি ?

তোমার এই পৃথিবী, যার উপর তুমি রয়েছ, সেটাই বা সূর্যের তুলনায় কতটুকু। তোমার এই সমগ্র সৌরজগৎ মহাবিশ্বের কতটুকু স্থান অধিকার করে আছে। তাও কি হাস্যকর অবস্থান নয়?

নীলু হেসে বলে—ঠিক।

ঈশ্বর জেঠা আবার বলেন—অতএব এত সবের মাঝে তুমি কতটুকু? আর তোমার প্রচেষ্টা কত বেশী হবে বল। অতএব যে নক্ষত্র তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করবে, তার প্রভাবকে আপন শক্তি দিয়ে তুমি কতটুকু বা এড়াতে পার? গ্রহের প্রভাব সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তোমার ধারণা আছে? সূর্যের প্রভাবে পৃথিবীতে জীবজগৎ সৃষ্ট হয়েছে এবং পরিবর্দ্ধিত হচ্ছে। চন্দ্রের প্রভাবে পৃথিবীতে জোয়ার ভাটা খেলে, মানুষের শরীরে রক্তের চাপের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। তেমনি প্রতিটি গ্রহেরই প্রভাব রয়েছে মানুষের উপর। গণনা করে যেমন জোয়ার ভাটার সময় ধরা যায়, সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের সময় বার করা যায় তেমনি মানুষের উপর গ্রহগুলোর প্রভাব কি কি হতে পারে বা হয়ে গেছে তা বলা যায়। এ সবের জন্য শাস্ত্রে দক্ষতার প্রয়োজন অবশ্যই আছে,—এ কথা আগেই বলেছি।

নীলু তবু প্রশ্ন করে—তাহলে গ্রহের প্রভাব থাকবেই? এড়ান যাবে না?

ঈশ্বর আচার্য বলেন—এড়াবে কি করে? তুমি নিজে যদি মহাসমুদ্রের একটা বালুকাকণার সমান না হও, তুমি কি পার মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গকে রোধ করতে? অতএব সৎ প্রচেষ্টা সব সময়েই করে যেতে হবে, ফল যাই হোক না কেন। কোন সৎ প্রচেষ্টা বিফলে যায় না। জন্ম জন্মান্তরেও মানুষ তার ফল পায়।

সমস্ত সংশয়ই সেদিন কেটে গিয়েছিল নীলুর। কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

কিন্তু ছোটবেলায় একই কথাপ্রসঙ্গে তিনি একবার নীলুকে বলেছিলেন—গণনা করে গ্রহের প্রভাব বলা যায় কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা বলা যায় না। তিনি ইচ্ছা করলে যেমন গ্রহদের লয় করতে

পারেন তেমনি পারেন তাদের প্রভাবকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে। কিন্তু তা' সকল গণনার বাইরে। অতএব ফলাফল জানারও দরকার নেই তোমার। তুমি তোমার ধর্মে নিষ্ঠাবান হয়ে কাজ করে যাও। বৃথা সময় নষ্ট করো না। তুমি ছাত্র। অতএব অধ্যয়নই তোমার একমাত্র ধর্ম এখন। তোমার প্রচেষ্টা থাকলে তুমি বিধাতার করুণা একদিন পাবেই। তোমার আকুল নিষ্ঠার কাছে তিনি ব্যাকুল হয়ে ধরা দেবেন। তিনি গীতায় বলেছেনই।—

'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি ॥

ছোট বেলায় ভটচায জেঠার কথায় নীলুর ঈশ্বরের অনুভূতি তীক্ষ্ণ হয়। যে বোধটা ছিল ভাসা ভাসা, তা যেন আস্তে আস্তে সুনির্দিষ্টভাবে রূপ পেতে লাগল। সে যেন উপলব্ধি করে—সে মহাশক্তি ধরের তুলনায় কোন গাণিতিক ভগ্নাংশে আসতে পারবে না তবু ইহজীবনে আপন প্রচেষ্টায় সেই মহাশক্তিধরের উপলব্ধি তার ভাগ্যে থাকলে, হলেও হতে পারে। একবার উপলব্ধি হলে তো সে সেই মহাশক্তিধরের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাবে। তখন সেও তো মহাশক্তিধর। কিন্তু কোন্ পথে? কিভাবে তাঁর বিপুল সত্ত্বার উপলব্ধি ক্ষুদ্র হৃদয়ে সম্ভব?

নীলাদ্রি আজ যেন অনুভব করে, সে হল সেই মহাজীবনের গান —যে গানে বিশ্বভুবন দোলে, সুরের তালে তালে। আর সেই গান রচনা করতে হয় সারা জীবন ধরে। আপন সাধু প্রচেষ্টায় সে রকম একখানা মহাজীবনের গান রচনা করা সম্ভব। যে পারে, সে মহা-ভাগ্যবান—সে মহাশক্তিধরের করুণাধন্য সন্দেহ নেই। অতএব চেষ্টা করতে দোষ কি?

নীলুর এই ভটচায জেঠা বোধ হয় পেয়েছিলেন সেই মহাশক্তি-ধরের কণামাত্র করুণা। তিনি সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেছিলেন। মৃত্যু যখন দেহের দ্বারপ্রান্তে তখন তিনি বুঝেছিলেন মৃত্যুর উপস্থিতি। তাই প্রিয় সেজ ছেলেকে বলেছিলেন তাঁকে শেষবারের মত তাঁর

প্রিয় তারকব্রহ্মনাম শোনাতে। প্রিয় পরিজনেরা মৃত্যুলোকের যাত্রীর সামনে সেই তারকব্রহ্ম নাম সংকীর্ত্তন করেছিলেন :—

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥'

নাম সংকীর্তনের মধ্যেই তিনি তাঁর শেষ আকাঙ্খিত নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করেছিলেন।

এ মৃত্যু তো কোন বিদায় নয়—এ যেন মহামিলন সেই মহাশক্তিধরের সঙ্গে। নীলাদ্রি ভাবে, সে ও কি পারবে, এমন করে সব কিছু ফেলে দিয়ে মিলিয়ে যেতে?

নীলুর ঈশ্বরচেতনার উন্মেষ হয়েছিল তার শিশুকালেই। মাঝে মাঝে তার মৃত্যুচেতনা আসে নি, এমন নয়। ঐ সান্নিপাতিক জ্বরে সেদিন তার দেহে প্রায় প্রাণস্পন্দন ছিল না, সেদিন সে এক অপরূপ চির আনন্দলোকের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছিয়েছিল। নীলু জানে না সেটা মৃত্যুলোক ছিল কিনা, তবে তাই যদি হয়, মরণে কোন ভয় নেই।

ঐ অবস্থায় সে যেন স্বপ্ন দেখ্‌ছিল, সে বুঝি এমন এক দেশে গেছে যেখানে নেই কোন বিষাদ, কোন দুঃখ—আছে শুধু আনন্দ, আনন্দ। ঘন গাছপালা ঢাকা সুন্দর সে জগৎ। পাখীর কূজনে মুখরিত ছায়াঢাকা সেই চিরশ্যামল বনভূমি। পাশে রয়েছে ছোট্ট একটা জলধারা—খালই হবে বোধ হয়। খালের এপারে ধনীদের প্রাসাদ। খালে বাঁধা রয়েছে ছোট একটা ডিঙ্গি নৌকা। সে প্রাসাদের কাছে এসে দাঁড়াল। প্রাসাদের মধ্যে যেতে তার ইচ্ছে করল না। বরং সে ওপারের একটা মাটির ঘরের দিকে যেতে চাইল।

নীলু নৌকা বেয়ে ওপারে চলে গেল। আর কি আশ্চর্য! তখনই তার সামনে তার চেয়ে কিছু ছোট এক সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে এক দিব্য রথে চড়ে হাজির হল। মেয়েটার চোখ দুটো ডাগর ডাগর, মাথায় গহন কালো চুলের রাশ যেন পায়ের পাতা ছুঁয়ে আছে।

মেয়েটি হেসে নীলুকে বলে—ও, তুমি এসে গেছ। আমি যে

তোমার পথ চেয়ে বসেছিলাম। এসো আমার রথে, উঠে এসো।

মেয়েটি নীলুর হাত ধরে। নীলু বলে—আমি তো রথ চালাতে জানি না।

মেয়েটি জবাব দেয়—তাতে কি? এসো, উঠে এসো। আমি তোমায় শেখাব।

নীলু তবু উঠ্‌তে ভয় পায়। মেয়েটি নীলুর হাত ধরে জোরে টানে। নীলু টাল সামলাতে চেষ্টা করেও পারে না। রথের চাকায় তার পা একটু কেটে যায়। রক্ত পড়ে। মেয়েটি হেসে বলে—তুমি বড্ড ভীরু।

তারপর সে তার ফ্রকের একপ্রান্ত দিয়ে নীলুর পায়ের কাটা জায়গাটা চেপে ধরে। রক্ত বন্ধ হয়।

—তুমি আমার পাশে এসে বসো, মেয়েটি বলে—আমিই রথ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার ভয় কি? এই তো, এই তো তোমার পাশে রয়েছি আমি।

রথ জোরে জোরে চলতে থাকে। নীলু ভয় পেয়ে মেয়েটিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলে—তুমি নেমে যেও না, আমায় ছেড়ে যেও না। আমি পড়ে যাব। আমার বড় ভয় ভয় কর্‌ছে।

মেয়েটি রথ চালাতে চালাতে মুখ ঘুরিয়ে বলে—কোন ভয় নেই; তোমার। আমি তো তোমার পাশেই রয়েছি।

নীলু তাকে ভালো করে জড়িয়ে ধরে ভয়ে ভয়ে বলে যদি না থাক?

মেয়েটি ফিক্‌ করে হাসে। বলে—তুমি কিচ্ছু জানো না। আমি সব সময় তোমার পাশেই থাকব। কোনদিনও তোমায় ছেড়ে যাব না।

নীলু পরম নিশ্চিন্ত হয়। রথ হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে মহাশূন্যের পথে উড়ে চলে। আরো পরে নীলুর মনে হয়, সে যেন হারিয়ে যাচ্ছে, মহাশূন্যে সে ভাস্‌ছে শুধু। রথ নেই, মেয়েটিও তারই মত ভাস্‌ছে।

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে দেয়। নীলু চট্‌ করে তার হাত ধরে ফেলে।

আর কোন ভয় নেই তার। রথ না থাকুক; সে মেয়েটির হাত তো ধরে রয়েছে।

মেয়েটি অপরূপ হাসি হেসে বলে—দেখলে তো, রথ নেই; ঘর নেই, গাছ নেই, কিছু নেই, কিন্তু আমি আছি। এই তো তোমার পাশে পাশে, তোমার হাতে হাত দিয়ে আছি। তোমার কোন ভয় নেই।

হঠাৎ যেন তার চমক ভাঙ্গে। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে তার বিছানার পাশে কতকগুলো উৎকণ্ঠিত বিষাদ-মলিন মুখ।

অসুখের পরেও অনেক অনেক বার নীলুর মনে পড়েছে সেই সুন্দর প্রজাপতির মত ছোট্ট মেয়েটার কথা। সে রাণীর চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর। সে তো রাণী নয়—মহারাণী। রাণীর মধ্যে সে তার অবচেতন মনের স্বপ্নে দেখা সেই মহারাণীকে খুঁজেছে। পায়নি তাকে।

আরো অনেক বছর পরে নীলু সেই মেয়েটির দেখা পেয়েছিল। অবিকল সেই মুখ, সেই চোখ, সেই চুল আর সেই রকম রথের মতই তিন চাকার সাইকেল একটা। আরো আশ্চর্য, যেখানে সে সেই মেয়েটির দেখা পেয়েছিল সেখানে ছিল অপরূপ পাখীর কাকলীভরা গাছপালার সারি, সেই ছোট খাল, সেই ডিঙ্গি নৌকা, সেই ধনীর প্রাসাদ আর মাটির ঘর খালের দু-পারে।

সেই মেয়েটি তাকে তিন চাকার সাইকেলে চড়া শিখিয়েছিল। শিখতে গিয়ে নীলুর পাও কেটে গিয়েছিল, রক্ত ঝরেছিল। মেয়েটিও সেইরকম তার ফ্রক দিয়ে তার রক্ত মুছিয়ে দিয়েছিল।

সেই মেয়ে হল তুলি। তার দেখা নীলু পেয়েছিল আরো বেশ কয়েক বছর পরে। তুলি প্রথম দর্শনে নীলুকে বলেনি যে, সে তার পাশে পাশে থাকবে। তবে সে আজও নীলুর পাশেই রয়েছে, চিরদিন থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

নীলাদ্রি আজো তার সেই মৃত্যুপুরীর কথা ভেবে অবাক না হয়ে পারে না। স্বপ্ন যদি ছিল ওটা, তবে এমন অসম্ভব রকমের সত্য হল কি করে? এর কোন ব্যাখ্যাই সে খুঁজে পায়নি, একমাত্র জন্মান্তর-

বাদের ব্যাখ্যা ছাড়া। সে বুঝি মৃত্যুপুরীতে গিয়ে তার গতজন্মের প্রিয়াকে দেখতে পেয়েছিল। এর বেশী তার বুদ্ধিতে আসে না কিছু।

কেউ কি দিতে পারে এর সঠিক ব্যাখ্যা ?

॥ ১৩ ॥

শংকরীপ্রসাদ ছোট বেলায় অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হয়েও অবস্থার বৈগুণ্যে বেশীদূর পড়াশুনা করতে পারেন নি, তা আগেই বলা হয়েছে। এর জন্য তিনি প্রধানতঃ তাঁর দুই দাদাকেই দায়ী করেন। তাঁর দুই দাদা বয়সে তাঁর চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। বয়সের বিচারে বলতে গেলে তাঁর বড়দা ছিলেন প্রায় তাঁর পিতৃতুল্য এবং মেজদা পিতৃব্যতুল্য। রমলাকে শংকরীপ্রসাদ বহুবার নীলুর পড়াশোনার প্রসঙ্গে এসব কথা বলেছেন।

নীলু শুনেছে, শংকরীপ্রসাদের পিতা হরিশংকর ছিলেন আপন-ভোলা লোক। ছোট ছেলের পড়াশুনার ব্যাপারে কোন মনোযোগই তিনি দেননি। তাছাড়া তাঁর বয়সও হয়েছিল যথেষ্ট। ওদিকে নীলুর ঠাকুরমা ছিলেন অত্যন্ত মুখরা এবং ডাকসাইটে মহিলা। হরিশংকর নাকি জীবনভোর স্ত্রীর কাছে যথেষ্ট বিড়ম্বনা ভোগ করেছিলেন। শেষ জীবনে তিনি তাই কতকটা নিরাসক্ত ও সংসার-বিরাগী হয়ে পড়েন। এও ছিল এক কারণ, যাতে শংকরীপ্রসাদ ছোটবেলায় বাপের লক্ষ্য-নজর পাননি।

তাই তাঁর দুই দাদাই হয়ে উঠে ছিলেন তাঁর অভিভাবক। শংকরী-প্রসাদ বলতেন দাদাদের হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত অভিমানী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁকে দাদারা বহুদিন ঘর থেকে মেরে তাড়িয়ে দিতেন। শাস্তিস্বরূপ কখনও কখনও খেতেও দিতেন না।

ওদিকে নীলু তার জেঠোদের কাছে গল্প শুনেছে, তার বাবা ছোট বেলায় নাকি অসম্ভব রকমের দুষ্টু ছিলেন। তাঁর নিত্যনূতন দুষ্টামির জ্বালায় ঘরের লোক, কি প্রতিবেশীরা উত্ত্যক্ত হয়ে পড়ত। তাঁর দুষ্টামির নানা নমুনার কথা নীলু শুনেছে।

শংকরীপ্রসাদ গাছে চড়তে ছিলেন ওস্তাদ। তাই প্রতিবেশীর গাছের ডাব, নারকেল, আম, সুপারি তার জ্বালায় গাছে থাকত না। শীতকালে খেজুর গাছে খেজুর রস ধরার কলসীতে তিনি ইচ্ছে করেই কাদা ও নোংরা জিনিস ফেলে রেখে আসতেন। এ নিয়ে কেউ যদি তাকে গালমন্দ করত তো তার আর রক্ষা থাকত না। তার গোয়ালের গরু থেকে মরাই-এর ধান, কোন কিছুই নিরাপদ থাকত না। কিছু না পারলে তিনি রাতের বেলায় তার গোয়ালের গরু ছেড়ে দিতেন। সে গরু সকালে খুঁজে পাওয়া বড় সহজ ব্যাপার হত না। ধানের মাচার তলা কেটে দিয়ে ধান ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে যেতেন।

এ নিয়ে প্রতিবেশীরা দাদাদের কাছে নালিশ করলে দাদারা প্রচণ্ড প্রহার করতেন। এ সব দুষ্টামি ছাড়াও তাঁর অনেকরকমের বালকসুলভ খেয়ালীপনা ছিল। যেমন ছোটবেলায় একবার তিনি মস্ত বড় এক মানুষ সমান ঘুড়ি তৈরী করেন। লেজের দিকে নানারকমের ভারী জিনিস বেঁধেও ঘুড়িটাকে ঠিকমত আকাশে উড়ান যাচ্ছিল না। শেষে নেহাৎ কৌতূহলের বশে রায়দের এক ছাগলকে ঘুড়ির লেজে বেঁধে আকাশে পাঠিয়ে দিলেন। ঘুড়ি উড়ল চমৎকার কিন্তু ছাগল তো মরলই, মরলো তার পেটের বাচ্চাগুলোও। বলা বাহুল্য, সেদিন দুই দাদা তাঁকে মারার জন্য লাঠি, চটিজুতা, এমন কি অর্দ্ধদগ্ধ চ্যালাকাঠও ব্যবহার করতে ছাড়েন নি।

এ সমস্ত গল্প নীলু গাঁয়ের আরো অনেকের মুখে শুনেছে। শুনে তার ভারী মজা লাগত। তবে বয়স্ক লোকেরা এ-ও স্বীকার করত যে, শংকরী ছোটবেলা থেকেই প্রখর বুদ্ধিমান, পড়াশুনায় মেধাবী, তেমননি দৃঢ়চেতা, স্পষ্ট বাক্ ও অকুতোভয় ছিলেন। যত বড় শ্মশানই হোক, যেখানে দুপুর বেলায়ও লোকে যায় না। সেখানে শংকরী গভীর

রাতেও একাই যেতে পারত। এসব কথা শুনে শুনে নীলুর মনে বাবার জন্য খুব গর্ব হত।

বাবা কিন্তু সব সময়ই বলতেন—দুষ্টু আমি ছিলাম ঠিকই কিন্তু দাদারা সব ক্ষেত্রেই আমাকে লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিত। ছোটবেলায় আমি ওদের কাছে স্নেহ, ভালোবাসা, দয়ামায়ার লেশমাত্রও পাই নি।

এই ছিল তার মত, বয়স্ক প্রতিবেশীদের বক্তব্যও কতকটা তাই। তবে যাঁরা শংকরীপ্রসাদকে এখনও স্নেহ করেন তাঁরা বলেন—ও হলো একটা বাঘ। বাঘের মতই ওর স্বভাব চিরদিন; শেয়ালের স্বভাব ওর কোনদিনই ছিল না।

এর কারণ স্বরূপ রসিকতা করে তাঁরা বলতেন, শংকরীপ্রসাদ জন্মে ছিলেন তার মেজদা হরপ্রসাদের জন্মের বার বছর পরে। এবং ঐ বার বছরের মধ্যে নীলুর ঠাকুরমার আর কোন সন্তানাদি হয় নি। আর বাঘিনী যে বার বছর অন্তর অন্তর সন্তান প্রসব করে, এ তো একটা চালু প্রবাদ বাক্য। বাঘিনী তো ব্যাঘ্রশাবকই প্রসব করে। নীলু শুনেছিল, তার ঠাকুরমা জীবনের শেষভাগে বাঘিনীই হয়ে গিয়েছিল প্রায়। তাই তার ঠাকুর্দা আর ঠাকুরমার মধ্যে সম্পর্কটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল খাদ্য-খাদক পর্যায়ে।

ব্যাঘ্রশাবক বড় হলে তো বাঘ হয়, আর সেই বাঘের বাচ্চাকেও তো ব্যাঘ্রশাবকই বলে। নীলুর ঐসব শুনে শুনে তার বাবার মত দুষ্টামি করার ইচ্ছাও হত। মাঝে মাঝে করতও। যেমন একবার করেছিল তার পাতানো বন্ধু—নীলু আচার্যের সঙ্গে যুক্তি করে। নীলু আচার্যের জ্ঞাতিদের একজনের ফলের দোকান ছিল। দুই বন্ধু মিলে একবার ঐ ফলের দোকানঘরের দরজার পাল্লার ডোম্‌নী খুলে ভেতর থেকে ফল, মনাক্কা চুরি করে খেয়েছিল। বুদ্ধিটা ছিল অবশ্য নীলুরই। কিন্তু তারা ধরা পড়ে গিয়েছিল। সে নিয়ে শংকরীপ্রসাদ নীলুকে যথেষ্ট শাস্তিও দিয়েছিলেন। বেশ কয়েক ঘা ছড়ি মেরে রোদে এক ঠ্যাং-এ দাঁড়াবার আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি ভবিষ্যতে চুরি করলে আর আস্ত বাঁচিয়ে রাখবেন

না, তাও বলেছিলেন। শেষে যাঁর ফল খোয়া গিয়েছিল, তিনি এসে অনুরোধ করায় শংকরীপ্রসাদ নীলুকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এর ফলও হয়েছিল ভাল। সম্ভবতঃ নীলুর জীবনে দুঃসাহসিক চুরি ছিল ঐ একটাই। ছোটবেলায় অপরের বাগানের দু' একটা ফল লুকিয়ে পেড়ে খাওয়াকে চুরির পর্য্যায়ে ফেললে নীলু অবশ্য আরও অনেকবার চুরি করেছে বলতে হবে। তবে সেভাবে ধরতে গেলে স্বয়ং যুধিষ্টিরও চোর না হয়ে যায় না।

বাপের মত দুঃসাহসিক হওয়ারও বাসনা তার হয়েছে মাঝে মাঝে। তাদের এক কুকুর ছিল। নাম তার বাঘা। রমলা কুকুর-ছানাটিকে পেয়েছিলেন তার মাতৃহীন অবস্থায়। রমলার কোলের মেয়ে বুলি ওরফে পার্বতী তখন একটু বড় হয়েছে। তা হলেও তাঁর বুকে যথেষ্ট দুধ ছিল। রমলা স্নেহবশে কুকুরছানাটিকে আপন বুকের দুধ খাইয়ে বড় করিয়েছিলেন।

একটু বড় হতে শংকরীপ্রসাদ কুকুরছানাটিকে চা খাওরা ধরালেন। বাঘা রোজ সকালে তাঁর চা খাওয়ার সময় এসে পাশে শু'ত। তিনি মাটিতে একটু চা ঢেলে দিলে বাঘা পরমানন্দে চেটে চেটে খেত। পরে তার চায়ে নেশা ধরে যায়। কোনদিন চা পেতে দেরী হলে বাঘা হাই তুলে অস্থির হত আর সকলে হাসত খুব তার কাণ্ড দেখে। নীলুর ভুলো বেড়াল যেমন প্রিয় ছিল, তেমনি ছিল এই বাঘা।

বাঘা রাতে বাঘের মত ঘরদোর পাহারা দিলেও বাড়ীর কাউকে কিছু বলত না। নীলুর ইচ্ছা হল বাঘাকে নিয়ে তার বাবার মত দুঃসাহসিক কিছু করার। সে বাঘার লেজে ক্রমাগত আঘাত করে করে তাকে উত্তেজিত করতে লাগল। শৈলমামা নীলুকে বার বার বারণ করেও কোন ফল হয়নি। শেষে বাঘা ক্ষিপ্ত হয়ে তার হাতে কামড়িয়ে দিয়েছিল। শৈলমামা তখন কামড়ানোর জায়গাটা কার্বলিক এ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেন। শংকরীপ্রসাদ সেদিনও নীলুকে যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছিলেন।

এরকম অনেক সময় নীলু বাবার কাছে মার খেত। কখনও কখনও মারের মাত্রা বেশী হত। সন্ধ্যেবেলায় সুরেশ পণ্ডিত মানসাংক করাতেন। রাসু বেশ ভাল উত্তর দিতে পারত. নীলু বিশেষ পারত না। একদিন বাবা বসেছিলেন তাদের পড়ার সময়। নীলু উত্তর দিতে পারছে না দেখে বাবা ক্ষিপ্ত হয়ে বেত দিয়ে এমন মার মেরেছিলেন যে সুরেশ পণ্ডিতই তাঁকে নিরস্ত করতে এগিয়ে আসেন।

নীলু ঐ বয়সেই বুঝেছিল, দুষ্টামি করলে অভিভাবকেরা শাসন করবেন, এ আর নতুন কথা কিছু নয়। বোধ হয় অন্যায়ও নয়। অতএব তার জেঠারা যে তার বাবার দুষ্টামির জন্য তাঁকে মারতেন। এ ছিল তো স্বাভাবিক ব্যাপার। তার বাবা মারেন বলে তো বাবার উপর নীলুর রাগ হয় না। অভিমান হয়ত মাঝে মাঝে হয়। কিন্তু সে সাময়িক। অতএব তার বাবার কেন এতে রাগ হবে দাদাদের প্রতি? আর হলেও তা এতকাল পরে আজও তাঁর কথার মাঝে ফুটে উঠবে এত? এতদিন পরেও তাঁর অভিমান কেন গেল না?

নীলু ছিল অত্যন্ত সচেতন ও কল্পনাপ্রবণ। ঐ বয়সে সে তার প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়েছিল: সেটা হল, বাপের বাপগিরির মধ্যে অভিভাবকত্ব ফুটে উঠলেও শিশুর পক্ষে তা মেনে নেওয়া সহজ এবং স্বাভাবিক কিন্তু অভিভাবকের বাপগিরি তার পক্ষে সহ্য করা কঠিন। বাপের বাপগিরির মধ্যেও যে স্নেহ-ভালবাসা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে ওঠে অভিভাবকের বাপগিরির মধ্যে তা ফুটিয়ে তোলা অত্যন্ত দুরূহ কাজ।

তবু নীলু তখন বুঝে উঠতে পারেনি, অভিভাবকের শাসন কি করে চিরকাল অমন অভিমানভরে মনে করে রাখা সম্ভব। এর উত্তর কিছু পরে পেয়েছিল। সেটি হলো, তা হতে পারে. যদি অভিভাবকত্বটা কেবলমাত্র শাসনসর্বস্ব হয় আর তার মধ্যে স্নেহ-ভালোবাসা মায়া দয়ার লেশমাত্র না থাকে। কিন্তু তাই বা কেন হবে? হাজার হলেও তারা একই মায়ের পেটের ভাই। এর উত্তর সে পেয়েছিল আরো পরে, আরো বড়ো হয়ে।

ভায়ে-ভায়ে মিল হতে পারে কিন্তু শরীকে শরীকে মিল হয় না। ভ্রাতৃত্ব এবং শরিকানা পরস্পরবিরুদ্ধ। যতদিন ভাই শরীক হয়ে ওঠে না, ততদিন সে ভাই, কিন্তু যখন সে শরীক হয়ে দাঁড়ায় তখন সে শরীকই —বড় জোর শরীক-ভাই। এটাই নিয়ম। ব্যতিক্রম থাকতে পারে কিন্তু সেটা নিয়মকেই প্রতিষ্ঠিত করে মাত্র। বিত্তর বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী যারা হয় এবং যাদের ঐ ভিন্ন আর অন্য কোন জীবিকা নেই, তাদের ক্ষেত্রে এ নিয়ম অবশ্যম্ভাবী। এ নিয়ম সেকালেও ছিল, একালেও আছে, আগামীকালেও থাকবে। ভায়েরা নানা রকমের বৃত্তিধারী হলেও পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারার সময় তারা শরীক হয়ে যায়; তবে সেক্ষেত্রে হয়ত শরীকী বিবাদটা অত উগ্র নাও হতে পারে, এই যা।

ছোটবেলা থেকেই ভায়েদের মধ্যে শরীকানা বোধ জাগে না। তাই তারা একসঙ্গে মিলেমিশে ঝগড়া-বিবাদ করেও একের প্রতি অন্যে সহানুভূতিশীল হয়ে আস্তে আস্তে বড় হয়ে ওঠে। এবং এ জিনিসগুলো হয় যখন তাদের মধ্যে বয়সের পার্থক্যটা খুব বেশী থাকে না। এই-ভাবে ছোট থেকে একসঙ্গে মানুষ হবার ফলে একটা ভাল জিনিস এই হয় যে, তারা যখন পরস্পর শরীক হয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায় তখন আবাল্যের প্রণয়টা তাদের ঘনায়মান বিরোধকে অনেক লঘু করে দেয়।

কিন্তু শংকরীপ্রসাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাঁর জন্মের আগেই এক ভাই সংসারে প্রবেশ করেছেন এবং আর একজন কয়েক বছর পরে করতে যাচ্ছেন। অতএব তাঁর জন্মের আগেই তাঁর দুই দাদার পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে ধারণা হয়েছিল। কে কতটা ভাগ পাবেন এ ধারণা বদ্ধমুল হওয়ার পর তাঁদের মনে নানা রঙীন কল্পনাও দানা বেঁধে ওঠে। ধারণাটা তাঁদের মনে বদ্ধমুল হয়েছিল এই কারনে যে, তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন, তাঁদের আর কোন শরীক জন্মাবে না।

কিন্তু শংকরীপ্রসাদ দেরী করে জন্মিয়ে দাদাদের সমস্ত সুখস্বপ্ন-

গুলোকে গুঁড়িয়ে দিলেন। এইজন্য জন্মলগ্ন থেকেই বুঝি তিনি দাদাদের বিষনজরে পড়লেন। খুব সম্ভব দাদারা তাঁদের মাকে তাঁর এই বিলম্বিত সন্তান প্রসবের জন্য ক্ষমাও করতে পারেন নি। তাই শংকরীর পক্ষে সম্ভব ছিল না দাদাদের ভালোবাসা পাওয়া। নীলু শুনেছিল তার জেঠারা তাঁর ঠাকুরমাকেও তার বাবার জন্মের পর কারণে অকারণে গালমন্দ করতেন। মেজজেঠা একবার বুঝি তাঁর মায়ের গায়ে হাতও পর্যন্ত তুলেছিলেন। মায়ের অপরাধ তিনি মুখরা, যেমন শংকরীর অপরাধ, তিনি দুষ্টু।

শংকরীপ্রসাদ নিশ্চয়ই এ সমস্ত কিছু তাঁর পরিণত বয়সে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি রমলাকে বিয়ের পর বেশ কয়েক বছর দাদাদের সঙ্গে এক পরিবারে ছিলেন। কিন্তু নীলুর জন্মের পরই তাঁর মনে ইচ্ছে জাগে তিনি নীলুকে এই বিষয়-সম্পত্তির নীচতার মধ্যে রেখে বড় করবেন না। একান্নবর্তী পরিবারেও তিনি দাদাদের কাছ থেকে কম দুর্ব্যবহার পান নি। তিনি ভূয়োদর্শী ছিলেন। দাদাদের কূপ-মণ্ডূকতা তাঁর মধ্যে ছিল না। বাইরের আলো যথেষ্টই তিনি পেয়েছিলেন। তাই তিনি চাননি, তাঁর ভবিষ্যত বংশধরেরা সম্পত্তি ও স্বার্থের মধ্যে বড় হোক্।

তাই বোধ হয় তিনি বৃত্তি হিসাবে ব্যবসাকে গ্রহণ করেন। ভাই-দের থেকে পৃথক হয়ে আসেন। এ কারণেই বুঝি, পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি ইত্যাদির উপর তাঁর সমান অধিকার ষোল আনা থাকা সত্ত্বেও একেবারে প্রায় সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চলে আসতে পেরেছিলেন। তাই তিনি নীলু ও রমলাকে নিয়ে ক্যানেলের এপারে এসে ঘর বাঁধলেন। কিন্তু তিনি ঘরে এলেও মন থেকে তার শৈশবের অভি-মান সরে যায় নি। তাই পরে তিনি দাদাদের সঙ্গে পারতপক্ষে কোন সম্পর্ক রাখতেন না এবং তাঁদের বাড়ীও যেতেন না, বলতে গেলে, আর চাইতেন, নীলু যত কম যায়।

কিন্তু ভবানীপ্রসাদ এবং হরপ্রসাদ একসঙ্গে যৌথ সংসারে থেকে ছিলেন। থেকে যেতে পেরেছিলেন ঐ নিয়মের হেতু। তাঁরা

ছোটবেলা থেকে শরীক হয়ে বড় হননি। তবে আজীবন তাঁদের একান্নবর্তী পরিবারে থেকে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। ভবানীপ্রসাদ নিঃসন্তান ছিলেন বলে। বলতে গেলে দু-ভায়ের মধ্যে হরপ্রসাদই ছিলেন একমাত্র শরীক। আর যেহেতু ছোট ভাই সব কিছু ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন, তাই প্রকৃতপক্ষে তিনি হয়েছিলেন তাঁর বাপের বিষয়সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। যা অনায়াসলভ্য হয়, তা মানুষকে লোভী করে তোলে। হরপ্রসাদও হয়েছিলেন তাই-ই। কিন্তু এসব কথা নীলু বুঝেছিল অনেক পরে।

অবস্থাবৈগুণ্যে মেধাবী ছাত্র হয়েও শংকরীপ্রসাদ দাদাদের উপর অভিমানে পড়াশুনা ছেড়ে ঘর ছেড়েছিলেন। গিয়ে ভাল হয়েছিল। না হলে তিনি তার জীবনে যতদূর উঠতে পেরেছিলেন, তা হয়ত হত না, পাঁচজনের মধ্যে একজন হিসাবে চিহ্নিত হতে হয়ত তিনি পারতেন না। তাঁর উত্তরপুরুষরাও মানুষ হত অন্যভাবে। এ সমস্ত আলোচনার মধ্যে না গিয়েও মোদ্দা কথাটা বলা যায় যে, পড়াটা তার হয়নি, এবং এ নিয়ে দুঃখটাও তাঁর কোনদিন যায়নি।

এই দুঃখটা তিনি ঘুচাতে চেয়েছিলেন নীলুকে অনেক দূর পর্যন্ত পড়িয়ে। তাই তিনি গোড়া থেকেই নীলুর পড়াশুনার ব্যাপারে সাধ্যমত কোন ত্রুটি রাখেননি। তাই ছোটবেলা থেকে ইসকুলে, ঘরে নীলুর পড়ার ছিল এত ঘটা। এটা স্বাভাবিক। কারণ বাপ ছেলের মধ্যে বেঁচে থাকতে চায়, পূর্বপুরুষ উত্তরপুরুষের মধ্যে বাঁচতে চায়। শংকরীপ্রসাদ নিজে পড়াশুনা করতে পারেননি বলে যেটুকু মনে মনে মৃতপ্রায় হয়েছিলেন; সেই মৃত্যুকে জয় করে বাঁচার স্বপ্ন তিনি দেখলেন নীলুকে নিজের মত করে গড়ে তুলে।

এই জন্যই তাঁর পৃথক সংসার পাতা, পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তির অধিকার স্বেচ্ছায় বর্জন করে অন্য বৃত্তি গ্রহণ এবং সকাল সন্ধ্যা নীলুর জন্য মাষ্টার-পণ্ডিতের ব্যবস্থা করে ছেলের জন্য সরস্বতীর কৃপা প্রার্থনা। আর দুষ্টা সরস্বতী যাতে ছেলেকে ফেলে পালিয়ে যেতে না পারে, তাই অত কর্মযজ্ঞের মধ্যে থেকেও তাঁর দুটো চোখের একটাকে সর্বক্ষণ

ছেলের পড়াশুনার দিকে নিবদ্ধ রেখেছিলেন।

নীলু আজ ভাবে, সরস্বতী সত্যই দুষ্টা। শংকরীপ্রসাদের অন্য চোখকে ফাঁকি দিয়ে সত্যই তিনি নীলুকে ফেলে অন্য একটা দিক দিয়ে পালিয়েছেন। শংকরীপ্রসাদ বেশ ভালই গাইতে পারতেন। নিজে তিনি ছিলেন সংগীতের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর সংগীতের আসরে নামী-দামী, খ্যাত; অখ্যাত শিল্পীর অভাব ছিল না! নীলুর গলা ও সুরজ্ঞান যে চমৎকার, তা তিনি নিশ্চয়ই জানতেন। তবু তিনি ছেলেকে এক-দিনের জন্যও গান শেখান নি বা শেখার উৎসাহ দেননি। তা না হলে নীলু এদিকেও তার প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারত।

গানবাজনা যে একটা শিক্ষা এটা শংকরীপ্রসাদ জানলেও প্রচলিত লেখাপড়ার দিকেই ঝোঁক দিয়েছিলেন কেবলমাত্র। তিনি আর একটু হিসাবী হলে দুটোই একসঙ্গে নীলুর ক্ষেত্রে চালাতে পারতেন। তা অসম্ভব হতো না, কারণ কথায় আছে, 'যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে।' এ অতি সত্যি কথা।

কিন্তু তা হয়নি। ফলে নীলুর এক সহজাত প্রতিভা চিরতরে নষ্ট হয়ে গেল। রাসুকেও তিনি গান শেখান নি, বোধ হয় এই ভয়ে যে, নীলু তাহলে পড়াশুনা বাদ দিয়ে গানে ঝুঁকবে আর রাসুরও পড়াশোনার কিছু হবে না। অতএব রাসুর সহজাত প্রতিভাও বিকশিত হল না।

প্রতিভার মৃত্যু দুঃখজনক। নীলুরও সেজন্য দুঃখ হয়। কিন্তু সে নিয়ে বাবার প্রতি আজ তার মনে কোন অভিমান জাগে না। প্রত্যেকেরই একটা দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। তার বাবারও ছিল। অতএব এ নিয়ে কোন অভিমান করা নিরর্থক।

অতএব নীলুর পড়াশোনার ঘোড়াটা বেশ টগবগিয়ে দৌড়াতে লাগল। এলো ইং ১৯৪২ সাল। নীলু এখন তৃতীয় শ্রেণীতে! কালা ও পুলিন তাই। রাসু দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠল। রাণী ঐখানেই পড়ার ইতি করে দিল। দ্বিতীয় শ্রেণী পাশ করলে বলা হত এল, পি, পাশ (Lower Primary)। মেয়েদের পক্ষে তখনকার দিনে এটাই

যথেষ্ট বলে বিবেচিত হত। চতুর্থ শ্রেণী পাশ করলে বলা হত ইউ পি পাশ (Upper Primary)। মেয়েরা কেউ ইউ পি পাশ করলে তো সে রীতিমত বিদুষী।

নীলুর বয়স তখন হবে আট আর রাণী বোধ হয় নয় পেরিয়ে দশে পা দিয়েছে। তখন ঐ বয়সেও মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত। সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে তাই হত বেশীরভাগ। তাই মেয়ে নয় পেরিয়ে দশে পড়েছে দেখলে অভিভাবকেরা মনে করতেন মেয়ে বড় হয়েছে। আর বড় মেয়েকে ইসকুলে পড়ানো বন্ধ হয়ে যেত। তার পর চলত তার বিয়ের যোগাড়। মনোমত পাত্র পেলে তখনই তাদের বিয়ে হয়ে যেত। না পেলে কেউ আরো পড়ত, কেউ বা ঘরে থেকে মায়ের কাছ থেকে আশু বৌ-গিরির তামিল নিত হাতে-কলমে। কিন্তু ইউ, পি, পাশ করে গেলে আর কোনক্রমেই মেয়ের পড়াশুনা চলত না। অন্ততঃ নীলু তো তার ছোটবেলায় তাই দেখেছে। এর কারণও ছিল। আশেপাশে মেয়েদের কোন ইসকুল ছিল না। আর ইউ পি পাশ করা এগারো-বারো বছরের মেয়ের দেহে যৌবনের ফুলকুঁড়ি ফুটে ওঠে। অতএব ঐ রকম মেয়েকে পরে ছেলেদের ইস্কুলে পড়াতে পাঠানোকে একরকমের অতি দুঃসাহসিক পর্বতাভিযানের মত কাজ বলে সকলে মনে করত।

ক্বচিৎ-কদাচিৎ কোন মেয়ে হয়ত তার পরেও পড়েছে কিন্তু সে নিয়ে অভিভাবকদের বিড়ম্বনার অবধি থাকত না। নানা কুৎসার কথা তাদের শুনতে হত। তখন তাড়াতাড়ি অরক্ষনীয়া কন্যাকে পাত্রস্থ করে তাঁরা ধাতস্থ হতেন।

অতএব রাণী নিতান্ত স্বাভাবিক কারণে তার পড়া বন্ধ করল। সে নিয়ে তার কোন অভিযোগও ছিল না। কারণ সে জানত, বড় মেয়েদের আর ইসকুলে পড়তে নেই। সে নিজেকে এরই মধ্যে যথেষ্ট বড় বলে ভাবতে সুরু করেও দিল। ইস্কুলে সে গেল না কিন্তু তাই বলে নীলুর সঙ্গে তার খেলাধূলাটা একেবারেই তখন বন্ধ হল না। অবশ্য খেলার রকমও পালটিয়ে গেছে তাদের। বর-বৌ তখনও তারা খেলত

কিন্তু সে কম। বরং তারা অন্য পাঁচজনের মত সকলকে নিয়ে চড়ুই-ভাতি বা ঐ জাতীয় খেলাই খেলত। তাও সেগুলো নিত্যদিনের খেলা ছিল না।

নীলু ও রাসু যথাক্রমে তৃতীয় ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওঠার পর তাদের জন্যে কোলকাতা থেকে নতুন বই আনা হল। নিয়ে এলেন কান্তি জেঠা বাবার ফরমায়েশ মত। পাঠ্য বই-এর সঙ্গে এল তাদের জন্য দুটো অন্য বই যা ছিল তাদের পাঠ্য তালিকা বহির্ভূত। একটির নাম 'ধর্মস্তোত্র' আর অন্যটির নাম 'চানক্যশ্লোক'।

এই বইগুলো বাবাই তাদের পড়াতেন। বইগুলো সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু বাংলা হরফে। বাবা তাদের পড়িয়ে বুঝিয়ে দিতেন অর্থগুলো। তারপর মুখস্ত করে দিতেন। মুখস্ত না হলে বকতেন। মুখস্ত হয়ে গেলে আবার নতুন পড়া দিতেন। ঐ সব পড়া ছিল ইস্কুলের পড়া আর ঘরে সুরেশ পণ্ডিতের পড়ার বাইরে। তাই এগুলোকে তারা বলত বাবার পড়া। রাসু নীলুর মাকে মা বলে ডাকত কিন্তু বাবাকে ডাকত 'বাবু' বলে।

ধর্মস্তোত্রের একটা স্তোত্র বাবা বেছে নিয়ে তাদের মুখস্ত করতে দিলেন। ঐ স্তোত্র মুখস্ত হয়ে যাওয়ার পর সূর্যোদয়ের অনেক আগে বিছানায় বসে বাবার সঙ্গে পাঠ করতে হত। ভোর বেলায় এজন্য শংকরীপ্রসাদ তাদের জাগিয়ে দিতেন। স্তোত্রপাঠ করতে হত হাটু মুড়ে পূর্বদিকে মুখ করে এবং হাত জোড় করে। শংকরীপ্রসাদ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঐ স্তোত্র পাঠ করে গেছেন। নীলুর অবশ্য বড় হয়ে আর করা হয়নি। শৈশবের সেই স্তোত্র পাঠ এখনও নীলুর মনে সুখস্মৃতি জাগায়। এখনও মনে আছে সেই স্তোত্র :—

ব্রহ্মামুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহুকেতবঃ কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্‌॥
কালীতারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধুমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।

এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ ॥

*　　*　　*　　*

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি।
জানাম্য ধর্ম্ম ন চ মে নিবৃত্তি ॥
ত্বয়া হৃষিকেশঃ হৃদিস্থিতেন।
যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥'......

প্রথম প্রথম ঐভাবে রোজ নিয়ম করে স্তোত্রপাঠ করতে নীলুর ভাল লাগত না। সঠিক উচ্চারণ করতে সে পারত না। অর্থগুলোও কেমন যেন ভাসা-ভাসা লাগত তার কাছে। কিন্তু আস্তে আস্তে ঐ বাধ্যতামুলক স্তোত্র পাঠের ব্যাপারটা নীলুর কাছে সহজ হয়ে এল। বার বার পাঠে উচ্চারণ দোষ এবং আড়ষ্টতা কেটে গেল। সহজ, স্বচ্ছন্দ উচ্চারণের ফলে নীলু সংস্কৃত ভাষার মধ্যে ছন্দ আর ধ্বনিমাধুর্য অনুভব করল। ভাষার অং-বং-টাকে তখন বীনার টুং-টাং-এর মত মিষ্টি মনে হতে লাগল। সংস্কৃত ভাষার প্রতি সে আগ্রহী হয়ে উঠল। উত্তরজীবনে তার সংস্কৃত চর্চ্চার উৎস ছিল ঐ স্তোত্র পাঠ।

তা ছাড়া বার বার পাঠে অর্থটা আরো পরিষ্কার হল তার কাছে। ধর্ম, ঈশ্বর ও মানুষ, এ তিনের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমন্বয় সম্বন্ধে ঐ বয়সে মোটামুটি একটা ধারণা তার মনে গড়ে উঠতে লাগল। স্তোত্রের ঐ অংশটা—'জানামি ধর্ম্মং' ইত্যাদি তার বেশ ভাল লাগল।

—আমি ধর্ম কি জানি না, জানতে চাই না। তুমি আমার হৃদয়ে সর্বক্ষন আছ। তুমি আমাকে দিয়ে যা করাও, আমি তাই-ই করি। বাবা ঐরকম বলে তাদের বুঝাতেন।

শৈশবে মানুষের মনে যে ধারণা গড়ে ওঠে, কালক্রমে তা অনুকূল পরিবেশে কালচারের মধ্যে একটা উপলব্ধি এনে দিতে পারে। পরে গীতায় সে পড়েছিল—'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'— কর্ম্মেই তোমার অধিকার 'কর্মফলে তোমার কখনও অধিকার নেই। তুমি ফলের আশা ছাড়।

গীতার ঐ বাণী পড়ে শৈশবের অনুভূতিকে আরো নিবিড় করে অনুভব করেছিল নীলু। এবং সেই সঙ্গে সে তার উপলব্ধির পথে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল।

আবার আরো পরিণত বয়সে সে যখন গাইত :—

'সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার যন্ত্রে চলি,
যেমন রাখ তেমনি থাকি, মা, যেমন বলাও তেমনি বলি।'

তখন সে তার চরম উপলব্ধির দ্বারপ্রান্তে আসতে পেরেছিল বই কি! উপলব্ধি একদিনে হয় না, সহসাও হয় না। এ কথা নীলু মনে প্রানে বিশ্বাস করে সে, সহসা যাদের হয় বলে মনে হয়, তাও সহসা নয়। তার পেছনে মনের অবচেতন স্তরের ধারণা হয়ত কিছু ছিল, যা বাইরে প্রকাশ পায়নি। আর নয়ত সেটা পূর্বজন্মের উপলব্ধিগুলির ক্রমিক যোগফলের ফলেই সম্ভব হয়। এই বিপুল বিশ্বে যেখানে নিয়তই প্রতিটি শ্রেণীর কিছু মরছে, আবার জন্মাচ্ছে—সেখানে জন্ম ও মৃত্যুর ছুটো ধারা স্পষ্টতঃই গড়ে উঠেছে। এ ছুটো ধারার মাঝখানে নিশ্চয়ই অদৃশ্য আরও একটা ধারা রয়েছে। যা গড়ে ওঠে মৃত্যুর ঠিক পরেই এবং থাকে পুনর্জন্মের আগে পর্যন্ত। জল থেকে বাষ্প হয়। বাষ্প মেঘ হয়ে আকাশে জমে। আবার ঐ মেঘ থেকে জল হয়। এভাবেই পৃথিবীতে জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জন্মের চক্রটি আবর্ত্তিত হচ্ছে। অতএব মানুষ মরে গেলেই তার সব শেষ হয়ে গেল না। মানুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তার আগের জন্মের পাপ ও পুণ্যের ক্রমিক মুলধনগুলো আপনিই পায়। সেগুলো হারিয়ে যায় না, শুধু কিছুকাল আড়ালে চলে যায় মাত্র—ব্যাংকে নোটের অবশিষ্ট তাড়াগুলো যেমন দিনের কাজের শেষে সেফ্‌ভল্টে চলে যায়, আবার পরের দিন কাজের সুরুতে যেগুলোকে সেফ্‌ ভল্ট থেকে বার করে আনা হয়।

অতএব শৈশবের গড়ে ওঠা ধারণাই মানুষকে উপলব্ধির দ্বারপ্রান্তে এনে দিতে পারে। সে উপলব্ধি অস্তিবাচকও হতে পারে, আবার নাস্তিবাচকও হতে পারে। সেজন্য সকল কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে অভিভাবকদের উচিত শৈশব থেকেই কল্যাণবুদ্ধির ধারনাগুলো শিশুর

মনে গড়ে তোলা। শংকরীপ্রসাদ নীলুর মনে সে ধারণা এনে দিতে পেরেছিলেন বলে নীলু তার বাবার কাছে কৃতজ্ঞ।

ইস্কুলে ধর্মগ্রন্থ পাঠ ছিল বাধ্যতামূলক। একই পাঠ্য বইতে যেমন রামায়ণ মহাভারতের অমৃত কাহিনী, ধ্রুব ও প্রহ্লাদের কাহিনী ছিল তেমনি ছিল হজরত মহম্মদের, যীশুখ্রীষ্টের কিংবা গৌতম বুদ্ধের কাহিনী। বিদেশী সরকার দেশের লোককে দাবীয়ে রাখতে চাইলেও কারোর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানায় সাহসী হয় নি। এর ফল শুভই হয়েছিল।

প্রত্যেক শিশুর মনে ছোটবেলা থেকেই ধর্ম, ঈশ্বর এবং জীবনের অনিত্যতার মর্মোপলব্ধি, যা গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন :—

'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোহ পরানি।
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥'

এ উপলব্ধির পর তাঁদের কি মৃত্যুভয় ছিল ? তাই তো তাঁদের কাছে ছিল :—

'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।'

আর তাই ব্রিটিশ সিংহকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করতে পেরেছিলেন তাঁরা। সেকালে শিশুর মনে এসব ধারণা যে শুধু অভিভাবকেরা গড়ে দিতেন তা নয়, ইস্কুলের শিক্ষকেরাও সেই ধারণাকে গড়তে সাহায্য করতেন। অগ্নিযুগের ইতিহাস ঘাঁটলে এমন অসংখ্য নিদর্শন মিলবে যেখানে শিক্ষা অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষাগুরু আর ছাত্র দীক্ষাপ্রাপ্ত নির্ভিক সৈনিক। যারা কাপুরুষ তারাই তো মরতে ভয় পায় আর তারাই দেহের মৃত্যুর আগে অসংখ্যবার মরে বা মরে মরে বেঁচে থাকে বা মরতে মরতে মরে যায় বা সরে যায়। কিন্তু সাহসী

যে, সে মরতে ভয় পায় না। কি সে সাহস? সে হলো আত্মিক সাহস।

আত্মা অবিনশ্বর, পরমাত্মার অবস্থান মানবদেহে, মৃত্যু মানে দেহের বিনাশমাত্র—আত্মার লয় নয়, আমি পরমাত্মার অভিষ্ট কাজই করতে এসেছি—এসব জিনিষ যখন কারোর উপলব্ধি হয় তখন তাকে মারে কে? সেই উপলব্ধির উৎস হল শৈশবের ধারণাগুলো।

সেই ধারনাগুলো তখনকার দিনে ঘরে-বাইরে, ইসকুলে-পাঠশালায় ছেলেদের মনে আস্তে আস্তে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। নীলু-ভাই-ই দেখেছে তার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে। তাই তো সেদিন সম্ভব হয়েছিল মেদিনীপুরের তথা সারা বাংলার তথা সারা ভারতবর্ষের অগ্নিবিপ্লব। এই বিপ্লব গায়ের জোরে হয় না। মনের বিপ্লবই আসল বিপ্লব। ফরাসী দেশে ষষ্টদশ লুই-এর কালে বিখ্যাত বিপ্লব—স্বাধীনতা যুদ্ধটি হয়। তাতে প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল। কিন্তু সেটি ছিল বিপ্লবের দিক। আসল বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন রুশো, ভল্‌তেয়ার প্রমুখ স্বাধীনতাবাদীরা। স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ব—Liberty, Equality and Fraternity এই কথাগুলিই সেদিন ফরাসীদের প্রাণে আগুন ছড়িয়েছিল। সেই আগুনই তাদের মনে বিপ্লবের সূচনা করেছিল। অতএব বিপ্লব মানে মনের বিপ্লব।

বিপ্লব যখন আসে তখন তা আপনিই প্রকাশিত হয়। গায়ের জোর তখন কসরত করে দেখাতে হয় না। হাত আপনিই ওঠে তখন।

নীলাদ্রি তার এ জীবনে অনেক বিপ্লব দেখেছে—পুরানা জমানার বিপ্লবও দেখেছে, দেখ্‌ছে নয়া জমানার বিপ্লবও। নয়া জামানার বিপ্লবের পেছনে নেই কোন মনের প্রস্তুতি। আছে শুধু গায়ের জোর আর ছ'টা রিপুর প্রাবল্য। তাই এ বিপ্‌লব নয় অপপ্লব, যার অর্থ অযথা লম্ফন। আর এ হেন বিপ্লবীদের বিপ্লবী না বলে প্লাবক বা প্লাবনকারী বলাই সঙ্গত।

নীলাদ্রি ভাবে, এদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। শিশুকাল থেকে

এদের মনে কি অভিভাবক, কি শিক্ষক কেউই কোন ধারণা গড়ে দিতে পারেনি বা দেয়নি। ধারনা যাতে না গড়ে তার জন্য লোকায়ত (Secular) সরকার পাকাপোক্ত ব্যবস্থাই করে রেখেছেন। ইসকুলের পাঠ্যপুস্তক থেকে সযত্নে ধর্মের নামগন্ধ বাদ দিয়েছেন। ফলে চরিত্র গড়ছে কিন্তু জীবনের নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে নি, তাই সেটা ভ্রষ্টচরিত্র। নৈতিক চরিত্র এখন সুদূরপরাহত। তাই ভক্ত প্রহ্লাদেরা আর কোনদিন ফিরে আসবে না। শুধু হিরণ্যকশিপুরা দাপাদাপি করে যাবে। স্বর্গে অসুরেরাই রাজত্ব করে যাবে। তাই অগ্নিযুগের বিপ্লবীরাও আর ফিরে আসবে না। শুধু প্লাবকের দল আগুন নিয়ে খেলা দেখাবে। দ্বাপরে যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল, ভারত বীরশূন্য হয়েছিল। কলির শেষে পৃথিবীই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে আর হীনবীর্যেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

নীলাদ্রি ভাবে, এই বুঝি নিয়তি। কান্তি জেঠার কথাই ঠিক। কলির শেষে পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হবে। লক্ষনেই তা বোঝা যায়:—

ধর্ম্মঃ সংকুচিস্তপো বিরহিতং সত্যঞ্চ দূরং গতং।
ক্ষৌনী মন্দফলা নৃপাশ্চ কুটিলাঃ শাস্ত্রেতরা ব্রাহ্মণাঃ॥
লোকাঃ স্ত্রীবশগাঃ স্ত্রিয়োঽতিচপলাঃ পাপানুরক্তা জনাঃ।
সাধু সীদতি দুর্জ্জনঃ প্রভবতি প্রায়ঃ প্রবৃদ্ধে কলৌ॥'.....

আবার গোটা পৃথিবী "প্রলয়পয়োধি জলে'-র অন্তরালে চলে যাবে, সারা পৃথিবীব্যাপী প্লাবকেরা সেই দিকেই নিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীটাকে।

তবু নীলাদ্রির উপলব্ধি হল যে, পৃথিবীতে হয়ত ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চলবে কিন্তু পৃথিবী একেবারে লয়প্রাপ্ত হবে না। যুগে যুগে যখনই পৃথিবী পাপের ভারে ক্লেদাক্ত হয়েছে তখনই সেই মহাশক্তি ধরের আবির্ভাব ঘটেছে যিনি পাপের বিনাশসাধন করে আবার ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছেন। গীতাতেই শ্রীভগবান বলেছেন—

'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

অতএব হতাশ হবার কিছু নেই। নীলাদ্রি ভাবে, মহাজীবনের গান তাকে লিখে যেতেই হবে।

সে তার গোটা জীবনের সমস্ত কিছুকেই একটা পুরো গানের ঐক্যতান বলে মনে করে। শুধু মনে নয়। সে কথা উপলব্ধি করে এই উপলব্ধি নিয়ে সে মহাশক্তিধরকে অনুভব করতে চায়, দেখতে চায় তার প্রকাশ। কিছুমাত্র উপলব্ধি যদি তার আজ হয়ে থাকে তবে তার দায়ী তার শৈশবে গড়ে ওঠা ধারণাগুলো। আর সেই ধারনার কথা বলতে গেলে, সেই স্তোত্রপাঠের কথাও বলতে হয়।

শংকরীপ্রসাদ তাদের চানক্যশ্লোকগুলোও মুখস্ত করতে দিতেন। চানক্যের অনেকগুলি শ্লোকই এখন প্রায় প্রবচনে দাঁড়িয়ে গেছে। যথা—

'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে'

কিংবা

'মাতৃবৎ পরদারেষু-পরদ্রব্যেষু-লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ ॥'

ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্লোকগুলি সবই ছিল নীতিশিক্ষামুলক। এগুলো বার বার পড়ে নীলুর মনে তাৎক্ষনিক কিছু ধারণা নিশ্চয়ই হয়েছিল। কিন্তু তার মুল্য যে তখন সবসময় দিতে পেরেছে, এত বড় মিথ্যাকথা বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু বহুবারের পড়া, বোঝা এবং আলোচনার ফলে নীতিবচনগুলো তার মনে একটা সংস্কারের মত প্রভাব অবশ্যই এনেছিল। এ কথা না বললে, মিথ্যাকথাই বলা হবে।

শিশু বয়সেই এসব শিক্ষার দরকার হয়। 'Charity begins at home' কথাটা মিছে নয়। আমাদের যেটা মুল স্বভাব বা Abstract Quality তা একেবারে আদি এবং অকৃত্রিম। শত উত্থান পতনে তার সামান্যই পরিবর্তন হয় বা আদৌ হয় না। এটি

আমরা জন্মসূত্রেই পাই। এটিকে আমরা বংশগত বা পৈত্রিক গুণ বলি। এর কিছু ব্যাখ্যা জীববিজ্ঞানীরা দিয়েছেন মানুষের শরীরের কোষের মধ্যমণি নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম্ এবং জিন্সের বিচার করে। কিন্তু সেই বিচারই শেষ বিচার একথা আজো বলা যায়নি। কারণ মানুষের স্বভাবের কিছু ব্যাখ্যা ওতে পাওয়া গেলেও সব ব্যাখ্যা ওতে পাওয়া যায়নি।

এই সিদ্ধান্ত যদি নেওয়া যায় যে মুল স্বভাব বা Abstract Quality পাল্টায় না তবে চোরের ছেলে চোরই হবে আর সাধুর ছেলে সাধুই হবে। কিন্তু বাস্তবে তা তো হয় না। বরং অনেক ক্ষেত্রেই উল্‌টো হয়। এর ব্যাখ্যা নীলাদ্রি খুঁজে পেয়েছে তার উপলব্ধি দিয়ে এবং সেই উপলব্ধি এসেছে তার শৈশবের ধারণাগুলো থেকে।

কথায় বলে, 'Habit is the second Nature'—অভ্যাস হল দ্বিতীয় প্রকৃতি। একই কাজ বার বার করতে করতে বা একই ভাব বার বার ভাবতে ভাবতে ঐ কাজ করা বা ঐ ভাবনা ভাবা মানুষের প্রকৃতিতে পরিণত হয়। ক্রমে সেটা একটা সংস্কারে পরিনত হয়। সংস্কারটা ভালোর দিকে গড়ে উঠলে সেটাকে বলা হয় সংস্কার আর খারাপের দিকে গেলে বলে কু-সংস্কার, অথবা বলা যেতে পারে অভ্যাস আর বদভ্যাস। আমরা সংস্কারের আসল অন্তর্নিহিত অর্থ না বুঝে তাকে নিতান্ত গতানুগতিকভাবে মানতে গেলে সেটি বিকৃত হয়ে যাবে তখন সেটাও কুসংস্কারের পর্যায়ে পড়তে পারে।

শিশু বয়সের নীতি শিক্ষাটাকে অভ্যাসে পরিনত করতে পারলে শিশু মনে সংস্কার গড়ে ওঠে। আর সেই সংস্কারই তখন মানুষের স্বভাবকে পরিচালিত করতে পারে তার উত্তরজীবনে। তার ফলে মানুষের মুল স্বভাব চাপা পড়ে যেতে পারে। আবার এই সংস্কার যেমন ব্যক্তিগত শিক্ষার ফলে গড়ে ওঠে তেমনি পরিবেশেও গড়ে। পরিবেশ থেকে মানুষ সমষ্টিগত বা সামাজিক শিক্ষাও লাভ করে। সে কুশিক্ষাও যদি হয়, তবু শিক্ষাই বটে।

অতএব সংস্কার মানুষের স্বভাবকে পাল্‌টাতে না পারলেও তাকে

অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এর ফলে মানুষ তার মুল স্বভাবকে সুপ্ত করে রেখে সংস্কারজাত স্বভাব দ্বারা (যাকে দ্বিতীয় স্বভাব বলে) পরিচালিত হতে পারে। এগুলি তখন হয়ে ওঠে তার বাস্তব গুণ বা Objective Quality. এই কারণে চোরের ছেলে সাধু হতে পারে এবং বিপরীত ক্রমেও।

কিন্তু এ তো দেখা যায়, চোরের ছেলে সাধু হয়ে গেল আবার কিছু কাল পরে চোরও হয়ে গেল। এটা হয় যখন মানুষ তার সংস্কারের কালচার করতে পারে না। একমাত্র অনুকূল পরিবেশে থেকে এই কালচার সম্ভব। প্রতিকূল পরিবেশে যখন কালচার ব্যহত হয় তখন তার দ্বিতীয় স্বভাবকে অবদমিত করে তার মুলে স্বভাব আবার মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠতে পারে। তখন তার আসল রূপ ফুটে ওঠা মোটেই বিচিত্র নয়। তবে এগুলো হল সহসা পদস্খলন বা পদোন্নতি।

অতএব শিশুকালে যেমন সংস্কার গড়ে ওঠার জন্য ক্রমাগত অভ্যাসের মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে তেমনি সেই সংস্কারের কালচার যাতে সারাজীবন ধরে সে করে যেতে পারে সে শিক্ষাও দিতে হবে। না হলে ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্র যেমন গড়ে উঠবে না তেমনি সামাজিক নৈতিক চরিত্রও গড়ে উঠবে না। আর সামাজিক চরিত্র না গড়ে উঠলে পরিবেশ সৃষ্টি হবে না। সেই পরিবেশের অভাবে ব্যক্তিগত চরিত্র ও কালচারের অভাবে নষ্ট হয়ে যাবে। সনাতন ধর্মে বারোমাসে তেরো পাবন, গ্রীষ্মকালে অশত্থগাছে জলদান, ইতুপূজা ঘেঁটুপূজার ঘটা, তুলসীমঞ্চে জলদান এরকম কত বিধানই নিত্যকর্ম হিসাবে কথিত আছে। এর কারণ কি ? অন্য কিছু নয়, মনটাকে ছোট থেকেই ঈশ্বরমুখী করা। মন একদিনেই ঈশ্বরমুখী হয় না। তার জন্যও অভ্যাসের প্রয়োজন রয়েছে এবং রয়েছে সেই অভ্যাসের কালচার। এসবের অন্তর্নিহিত বৃহৎ অর্থ না বুঝে আমরা মহামুর্খের মত এগুলোকে কুসংস্কার বলি। কিন্তু আমরা ভুলে যাই, যে অভ্যাস মানুষকে মদ্-মাতাল করে, সেই অভ্যাসই আবার তাকে মন-মাতাল করতেও পারে।

নীলুদের সেই ছোটবেলায় এই সব অভ্যাস বাড়ীতেই গড়ে উঠত।

যাদের সে সুযোগ ছিল না তাদের গড়ে দিতেন পণ্ডিতমশায়েরা বা পাশাপাশি পাঁচজন। পাড়ার এক ছেলে পড়াশোনার সময় খেলাধুলা করলে, যে তাকে দেখত—সেই তাকে তিরস্কার করত। অতএব তার উপায় থাকত না খেলার। এভাবে তাকে অভ্যাসের পথে আসতেই হত। এবং এর জন্য ছিল সেকালের পরিবেশ। নৈতিক চরিত্র কি এমনিতেই গড়বে ? নীলাদ্রি আজ নৈতিক চরিত্রের মুল্যায়ণ করতে বসলেই তার শৈশবে শেখা চাণক্য শ্লোকগুলোর কথা এবং তাদের অসামান্য অবদানের কথা মনে না করে পারে না।

শংকরীপ্রসাদ যে তাঁদের শুধু পুঁথিগত শিক্ষাই দিতেন তা নয়, বাস্তব শিক্ষাও দিতেন। ছেলেদের পড়াশোনার সাথে সাথে চরিত্র গঠনের দিকেও ছিল তাঁর কড়া নজর। একদিনের ঘটনার কথা নীলাদ্রির মনে পড়ছে :-

তাদের বাড়ীর সোজাসুজি ক্যানেলটার অপর পারে ছিল তাদের এক পুকুর। তার পাড়ের চারধারে ছিল অসংখ্য বাব্‌লাগাছ। তাই পুকুরটাকে বলা হত বাব্‌লাবনী পুকুর ঐ পুকুরের পাড়েই ছিল ভজহরি গিরির পানবিড়ির দোকান। শংকরীপ্রসাদের অনুমতি নিয়েই ভজহরি তাঁর এই পুকুরপাড়ে নিজের খরচে দোকানটা করেছিল। এর পাশ দিয়ে চলে গেছে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তা যেটা খেজুরী পর্যন্ত গেছে। লোকে ক্যানেলের খেয়া পেরিয়ে এই পথ ধরত। প্রথমেই পড়ত ভজহরির দোকান। সেখানে লোকে পান, বিড়ি, ছোলাভাজা, দই, মুড়ি, এসব কিনে খেত। দোকানটা বেশ চল্‌ছিল। তারপর কি কারণে যেন বন্ধ হয়ে যায়। ভজহরি শেষে দোকানঘরের চালের খড়, বাতা, জানালা, কবাট সব খুলে নিয়ে যায়। ক্রমে ঘরটা একটা পোড়া ভিটেয় পরিণত হয়।

একদিন নীলু ওপারে গিয়ে দেখে ঐ ঘরের ভেতরে রয়েছে অনেকগুলো রঙীন কাচের শিশি-বোতল। এমনিই পড়ে আছে ওখানে ওগুলো। কারোর দরকারে লাগে না। নীলু তাই একটা নীল আর একটা লাল রঙের কাচের শিশি নিয়ে এল। শংকরীপ্রসাদ

শিশিগুলো দেখে জানতে চাইলেন, নীলু ওগুলো কোথায় পেল। নীলু সত্যি কথাই বলল।

শংকরীপ্রসাদ তখন নীলুকে অবাক করে দিয়ে আদেশ করলেন যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে আসতে। বললেন—পরের জিনিস যেখানেই থাক তোমার দেখার দরকার কি? কার কাজে লাগল কি নাই লাগল, তাই বা ভাবনা কেন তোমার? যাও রেখে দিয়ে এসো আর কখনও এ জিনিষ যেন না দেখি, জানোনা, পড়নি?— 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ'।

নীলু কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়ে লজ্জা পেল। সেই মুহূর্তেই শিশিগুলো সে যথাস্থানে রেখে দিয়ে এসেছিল। আর কোনদিন সে এহেন প্রবৃত্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। নীলু আজ ভাবে, তার বাবার শেখানো পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে বাস্তব শিক্ষার চমৎকার মিল হয়েছিল ঐ ঘটনায়। এবং এর ফলে যে সংস্কার তার গড়ে উঠেছে তা তার সারাজীবনের অক্ষয় সম্পদ।

ক্লাশ টেন-এ পড়ার সময় নীলুরা মাতব্বরী করে একবার ইস্কুলে ষ্ট্রাইক্ ডেকেছিল। সে কাহিনী যথাস্থানে। সে সময় শংকরীপ্রসাদ যে সাংঘাতিক শিক্ষা তাকে দিয়েছিলেন তার জন্যে নীলু তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। অমন নির্মম শিক্ষা সেদিন না পেলে সে হয়ত বিপথে চলে যেত। তার জীবনই অন্যরকম হয়ে যেতে পারত, যা কল্পনা করতে সে শিউরে ওঠে। অতএব সংস্কারের গুন বড় কম নয়, যদি তা ঠিকপথে চালিত হয়।

ধর্মমূলক শিক্ষা: নীতিমূলক শিক্ষা তখনকার দিনে ছিল বলেই সার্থক হয়েছিল অগ্নিবিপ্লব. এটাই নীলাদ্রির ধারণা। যাঁরা ব্রিটিশ সিংহের বিরুদ্ধে লড়াই করে অবহেলায় প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা সকলেই নির্ভীক এবং দেশমাতার জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ গোড়ার দিকে ছিলেন না। হতে পেরেছিলেন ঐ সব গড়ে ওঠা সংস্কারের গুণে। নীলু তাদের গায়ে বসেই সেদিন দেখেছে. কাপুরুষও হয়েছিল মৃত্যুঞ্জয়ী বীর শহীদ। আবার সে ঐ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে এমন

অনেককে দেখেছে তারা মুলত: ছিল কাপুরুষ, যাদের ছিল না কোন নৈতিক শিক্ষা। যারা চিরকাল দলভারী করার জন্য দলে আসে, তারা সেকালেও ছিল তবে তারা ছিল নগন্য। তাদের কাহিনী যথাস্থানে।

আর একটা জিনিস নীলু শংকরীপ্রসাদের কাছ থেকে প্রায় উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল—নিরলস কাজ করে যাওয়ার শিক্ষা, নীলু ছোটবেলা থেকেই দেখেছে বাবা কোনদিন, কোন সময় বিনা কাজে সময় কাটান না। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি পরিশ্রম করে গেছেন। যখন বাবার হাতে কোন কাজ থাকত না, তখন তিনি বসে বসে পাটের দড়ি তৈরী করতেন কিন্তু নিরর্থক আড্ডা মেরে বা শুয়ে বসে সময় নষ্ট করতেন না।

শংকরীপ্রসাদ তাস খেলতে খুব ভালবাসতেন। খেলাতে তিনি সময় সময় কিছুটা বেহিসাবীভাবেও সময় কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু সেই খেলার নেশাতেও তাঁর ছিল অপূর্ব সংযম! যখন তাঁর হাতে জরুরী কাজ থাকত তখন তিনি শত ইচ্ছাতেও খেলায় যোগ দিতেন না। অনেকদিন এমনও নীলু দেখেছে, বাবার বন্ধু বান্ধবেরা বসে মহানন্দে তাস খেলছেন আর বাবা তাঁদের থেকে একটু দূরে বসে হিসাব-নিকাশের পাতায় নিমগ্ন অথবা শৈলমামার সঙ্গে ব্যবসায়িক আলোচনায় মত্ত। নেশা অনেকেই করে কিন্তু কজনের নেশায় সংযম বোধ থাকে? অনেকেই নেশার দাস হয় কিন্তু কজনই নেশাকে দাস করে রাখতে পারে?

বাবা মাঝে মাঝে নীলু ও রাম্নুকে বলতেন—দুনিয়াতে যাঁরা যত বড় কাজই করুন না কেন, তাঁদের প্রত্যহের দিনরাত্রিটা কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার বেশী ছিল না। এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক একজন পৃথিবীর ইতিহাস পাল্‌টিয়ে ফেলেন আবার এক একজন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় যাদের কোন খোঁজ কেউ রাখে না। অতএব জীবনে মহৎ কিছু করতে গেলে প্রতিটি ঘণ্টা, মিনিট, মুহূর্তকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে, যা কিছু তোমাদের, ঐ চব্বিশ ঘণ্টার দিনরাত্রির মধ্যেই করতে হবে।

বাবা শুধু মুখেই বলতেন না এসব, নিজে করতেনও তাই। সূর্যোদয়ের বহু আগে তাঁর দিন সুরু হত আর রাত্রি দশটার আগে সে দিন শেষ হত না। যেটুকু সময় তিনি খেলা বা কথাবার্তার মধ্যে কাটাতেন তারও প্রয়োজন ছিল বই কি। শরীরের ক্ষয় পূরণ করার জন্য যেমন আমাদের আহারের প্রয়োজন তেমনি মনের অবসাদ বা ক্লান্তি অপনোদনের জন্যও ঐ সবের প্রয়োজন রয়েছে।

নিজের জীবন দিয়ে বাবা তাকে যা শিখিয়েছিলেন তা নীলুর অজ্ঞাতসারে কখন নীলুরই হয়ে গেছে। সে প্রতি মুহূর্তে কাজ করে তবু তার খেয়াল থাকে না বাবার কথা। শুধু মনে পড়ে যখন সেও তার ছেলেদের শিক্ষা দেবার জন্য বলে—Rest is only offer death. শরীরের প্রয়োজনে শোবার বা ঘুমের প্রয়োজন আছে। ওটা বিশ্রাম নয়। আবার মনের জড়তা দূর করার জন্যও অনুরূপ কিছুর দরকার আছে। তবে সেটাও শুয়ে বসে নয়। সেখানে Rest মানে Change of work. যে লোক অভিনয় করে যে মনের ক্লান্তি ঘুচাতে টেনিস খেলে আবার টেনিস খেলোয়াড় পাড়ার ক্লাবে সখের থিয়েটার করে। Absolute Rest মানেই মৃত্যু।

যখন ছেলেদের এ কথা বোঝায় তখন বাবাকে নীলুর বারে বারে মনে পড়ে।

এভাবেই বুঝি বাপ তার ছেলের মধ্যে বেঁচে থাকে। মহাজীবনের অর্থ যদি হয় অনেক জীবনের যোগফল তাহলে পুরুষানুক্রমিক মানবের জীবন ধারার মাঝে এমন অনেক সাধারণ ছন্দ খুঁজে পাওয়া যাবে। তাকেও মহাজীবনের গান বলা যেতে পারে।

॥ ১৪ ॥

'অনেক জলে জলাশয়,
অনেক আশায় মহাশয়।'

এই মুল্যবান ছড়াটি নীলুকে শুনিয়েছিল ঘাটমাঝি পদ্মলোচন। পদ্মলোচন এ এক পদ্মসম সৃষ্টি। কথাটি ছোট্ট কিন্তু ভাবটি সুবৃহৎ।

ভাবটিকে আরো প্রসারিত করলে দাঁড়াবে: জলাশয় যদি বাধা না থাকে তবে সে হ্রদ হতে পারে, হতে পারে নদী। অনেক নদী নিয়ে মহানদী, অনেক মহানদী নিয়ে সাগর, অনেক সাগর নিয়ে মহাসাগর। অনেক মহাসাগর নিয়ে তো পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগ। তারপর অনেক পৃথিবী নিয়ে তো সৌরজগৎ, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড......। থাক্, ওগুলো পর পর কল্পনার বাইরে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

নীলু কল্পনার মধ্যেই ফিরে আসে।

অনেকগুলো দিন নিয়ে একটি মানুষের জীবন। সে জীবন দুদিকে প্রসারিত,—একটি দিক হলো, তার পূর্বপুরুষ থেকে উত্তর-পুরুষদের দিকে, আর, আর একটি দিক হলো তার স্বগোত্রীয়দের দিকে।

কয়েকটি জীবন নিয়ে গড়ে ওঠে একটা পরিবার। একটা পরিবারে এভাবে অনেকগুলো জীবন পাওয়া যাবে। তাদের প্রত্যেকের কিছু ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও কোন না কোন জায়গায় মিল থাকবেই। প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে এরকম মিল খুঁজে পাওয়া যাবে এবং সে মিলগুলো আলাদা আলাদা। এই পরিবারগত মিলগুলোকে বলা যেতে পারে বৈশিষ্ট্য।

এমনি করে অনেকগুলো পরিবার নিয়ে গড়ে ওঠে অনেকের মিলিত জীবন বা মহাজীবন। সেই মহাজীবন হলো মানুষের সমাজের দেশের বা জাতির। প্রতিটি মানুষের জীবনকাল নির্দিষ্ট হলেও, মানুষের জীবনধারা অনন্তকালের। একথা তার দুদিকে প্রসারিত জীবনধারার ক্ষেত্রে সত্য। আবার প্রতিটি মানুষ যার নির্দিষ্ট জীবন-

কালের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখে যেতে পারে যার জন্য তাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। একথাও দ্বদিকে প্রসারিত জীবনধারার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

এই বৈশিষ্ট্যগুলিই হল মানবের মহাজীবনের কর্মধারার ফসল। এই ফসলগুলির সমগ্র মানবসমাজ পুষ্ট—মানবের দেশ, জাতি ও সমাজ পুষ্ট।

কিন্তু কি তার রূপরেখা ?

হাটে, মেলায় বা মানুষের ভীড়ে কোন কথা পরিষ্কার শোনা যায় না। তাই মানুষের সেই সম্মিলিত কণ্ঠস্বরকে আমরা বলি কোলাহল বা হট্টগোল। আবার ইসকুলের ছেলেমেয়েরা যখন সারিবদ্ধ হয়ে প্রার্থনাগীত গায় তখন তাকে আমরা হট্টগোল বলি না, বলি সমবেত সংগীত। কেন ? কথাকে ছন্দের মালায় গাঁথলে তা হলো গানের ভাষা। সেই ভাষা ছন্দে কথিত হলে বা গীত হলে কানে বাজে সুর, ছন্দোবদ্ধ হয়ে মানুষের যে কথা গান সৃষ্টি করে, ছন্দহীন হয়ে তা-ই আবার হট্টগোলের সৃষ্টি করে। অতএব হট্টগোলই হলো সাধারণ জিনিস কিন্তু গানটা হলো মানুষের বৈশিষ্ট্য।

মানুষ তার আপন আপন স্বাতন্ত্র্য নিয়েও সামাজিক মানুষ। আবার সে দেশ বা জাতিরও একজন বটে। অথবা বলা যায়, সে মহাজীবনের অংশও বটে। যুগে যুগে, কালে কালে মানুষের মহাজীবনেরও বৈশিষ্ট্য থাকে। মহাজীবনের সকল জীবন যখন একই ছন্দে চলে তখনই রচিত হয় মহাজীরনের গান। মহাজীবনের ধারা যখন বদ্‌লায় তখন তার গানও বদলিয়ে যায়—বদ্‌লিয়ে যায় তার ভাষা ও সুর। তাই মহাজীবনের ধারাবদলের সঙ্গে তার গানেরও বদল হয়।

যে মহাজীবনে মানুষ ছন্দে চলে না, সে-মহাজীবন থেকে কোন মহাজীবনের গান জন্মলাভ করে না—জন্ম হয় হট্টগোলের। মানুষ তখন হারিয়ে ফেলে তার বৈশিষ্ট্য, মহাজীবনের গান তখন অগীত থেকে যায়।

কিন্তু কেনই বা গান রচিত হয় না ?

তার উত্তর পেতে হলে মনে রাখতে হবে, গান সকলে রচনা করে না বা গানে সকলে সুর দিতে পারে না কিন্তু মোটামুটি গাইতে পারে সকলে সমবেত ভাবে। গান যে রচনা করে সে গীতিকার, যে সুর দেয় সে সুরকার, যে গাওয়ার মত গাইতে পারে সে গায়ক। সমবেত কণ্ঠের গান গাওয়ার জন্য দরকার হয় যত না গানের ব্যাকরণ তার চেয়ে বেশী প্রাণের টান। অতএব যদি গীতিকার আর সুরকার না থাকে তবে গানই বা আসবে কেমন করে ?

মানুষের মহাজীবনের ধারায় মাঝে মাঝে এমন সব গীতিকার আর সুরকারেরা আসেন, যাঁরা এমন গান রচনা করেন যা মহামানবের প্রাণে সমবেত সংগীতের কলরোল তোলে। মানুষের শত হট্টগোল ছাপিয়ে তখন শুধু ছন্দোবদ্ধ সমবেত সংগীতই শোনা যায়। তেমন গান হলো মহাজীবনের গান। সেই গীতিকার এবং সুরকারেরা যখন মহাজীবনের মাঝে থাকেন না তখন মহাজীবনের ধারা বয়ে চলে ঠিকই কিন্তু তার কূলে কূলে মর্মরিত হয় না কোন মহাজীবনের গান।

আবার এও সত্য, গান যতই সুন্দর হোক, গায়ক যদি প্রাণমন ঢেলে, দরদ দিয়ে না গাইতে পারে তবে তার আবেদন শ্রোতাদের কাছে সঠিক পৌঁছাতে পারে না। আবার এ কথাও সমভাবে সত্য, গায়ক যতই প্রাণমন ঢেলে গান গেয়ে গান না কেন, শ্রোতারা যদি সত্যিকারের শ্রোতা না হয় তো গানের আবেদন মাঠে মারা যাবে। অতএব একটি সার্থক মহাজীবনের গানের জন্য যেমন যথার্থ গীতিকার, সুরকার ও গায়ক চাই, তেমনি চাই সংবেদনশীল সার্থক শ্রোতৃবৃন্দ। এ হেন সর্বাঙ্গ সুন্দর সমন্বয় একটা জাতির জীবনে সচরাচর ঘটে না। মানুষের জীবনের চরম কোন উত্তরণ লগ্নে রচিত হয় একটি মহাজীবনের গান এবং মানুষই তার স্রষ্টা।

নীলাদ্রির আজ মনে হয়, ১৯৪২ এর আগে থেকেই রচিত হচ্ছিল অমন একখানি অপূর্ব সার্থক মহাজীবনের গান যেটি স্পষ্ট রূপ নেয় ১৯৪২-এ এসে। তখন জাতির জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এমন সমস্ত

মনীষী এসেছিলেন, যাঁরা সকলে মিলে জাতিকে শোনাতে পেরেছিলেন সেই মহাজীবনের গান। সে গানের মর্মার্থ ছিল—ইংরেজ, তুমি ভারত ছাড়, আমরা তোমার গোলামী করব না।

যাঁরা এ গান গেয়েছিলেন, তাঁরা দরদ দিয়েই গেয়েছিলেন। তাদের আমরা বলেছি নেতা। এই নেতাদের মধ্যে ছিল না ভণ্ডামী, নীচতা বা ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি। নিজেদের জীবনই ছিল তাঁদের বাণী। কথায় আর কাজের মধ্যে তফাত ছিল না একচুলও।

তাই তাঁদের গানের আবেদন ছিল সকলের কাছে। শ্রোতাদের মনপ্রাণও ছিল প্রস্তুত। শুনে তারাও সমবেত কণ্ঠে গেয়েছে সেই গান। দুদিকেই হয়েছিল সুবর্ণ মিলন। মনের এই প্রস্তুতি গড়ে উঠেছিল সকলের ঘরে ঘরে, ঘরে-বাইরে, ইস্‌কুলে, কলেজে, পাঠশালায়, সর্বত্র। নীলুর মনে যে ভাবধারাগুলো তার বাবা, মা, পাঠশালার পণ্ডিত-মশায়েরা তার ঐ ছোট বয়সে গড়তে পেরেছিলেন, সেইভাবে নীলুর মত লক্ষ কোটিদের মনেও ঐ সময় সেইসব ধারণা গড়া হচ্ছিল, হচ্ছিল তার আগে থেকেও। অতএব প্রস্তুতি ছিল অতি বৃহৎ এবং ব্যাপক।

নীলু তার জ্ঞানোন্মেষের কাল থেকে যেমন শুনে এসেছিল পৃথিবী ব্যাপী ইংরেজ-জার্মান-জাপানীদের যুদ্ধ তেমনি শুনে এসেছিল আর একটি নাম—মহাত্মা গান্ধী। পরে পরে আরো অনেক বরেণ্যদের। নীলুর মনে হয়, গান্ধী ছিলেন সে সময় মহাজীবনের গান রচয়িতাদের পুরো-ভাগে। তাঁর কথায় সারা দেশটা যেন একই ছন্দে মনপ্রান দিয়ে নেচে উঠত, বেজে উঠত। সে সব ইতিহাস আলোচনায় তার কাজ নেই। সে শুধু নিজের অনুভূতিটুকুই বলে যেতে চায়।

নীলু প্রায়ই দেখত, দলে দলে লোক শোভাযাত্রা করে, তিনরঙা পতাকা উড়িয়ে নানারকম দেশাত্মবোধক ধ্বনি দিতে দিতে তাদের বাড়ীর সামনে ক্যানেলের পাড় দিয়ে যাচ্ছে। তাদের পরনে থাকত যতদূর সম্ভব খদ্দরের জামাকাপড় আর মাথায় থাকত গান্ধী টুপি। সেই সব শোভাযাত্রায় থাকত সমাজের সকল শ্রেণীর লোক—ইতর-ভদ্র,

ছোট বড়। এদের বলা হত কংগ্রেসী, ভলাণ্টিয়ার বা সংক্ষেপে ভল্টু, তাদের সেই শ্লোগানগুলো আজো স্পষ্ট মনে পড়ে নীলুর :—

বন্দে মাতরম্।
মহাত্মা গান্ধীজীকী—জয়।
নেতাজী সুভাষ বোসকী—জয়।
স্বাধীন ভারতকী—জয়।

অথবা

বুকের রক্ত দিতে হবে,
তবেই ভারত স্বাধীন হবে।

তখন অবশ্য 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেওয়া হত আরও টেনে টেনে, এখনকার মত ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ ধরনে নয়।

নীলু, পুলিন, রাসু, রাখাল, প্রানেশ, এরা সকলে মিলে 'স্বদেশী খেলা' খেলত। সে খেলায় রাণীরও স্থান হত। এ খেলায় একদল ভল্টু সাজত। তারা ঐ রকমের শ্লোগান দিতে দিতে শোভাযাত্রা করে যেত। আর একদল দারোগা-পুলিশ সেজে তাদের ধরার জন্য তাড়া করে যেত। ধরে মারধোর করত। এ ছিল তাদের এক মজার খেলা।

নীলুর তখন সঠিক ধারণা হয়নি, যে জিনিস নিয়ে তারা তখন মজার খেলা খেলছে, সেই একই জিনিস নিয়ে গোটা ভারতবর্ষ তখন মরণখেলা খেলে চলেছে। নীলু কেন, অনেক বড়দেরও সে সময় পুরোপুরি সে ধারণা হয়নি। এর একমাত্র কারণ হতে পারে, তখনকার দিনে নীলুদের গ্রামের মত গ্রামে দেশব্যাপী আন্দোলনকে সত্যসত্য প্রচার করার জন্য খবরের কাগজ, বেতার বা ছায়াছবির মাধ্যমের অতটা সুযোগ-সুবিধা ছিল না।

এই স্বদেশী খেলা খেলতে খেলতে ছেলেরা মুখে মুখে নানান্ মজার ছড়া কাটত। নীলুদের এমনি দুটি প্রিয় ছড়া ছিল :—

বন্দে মাতম্।
পুলিশের মাথা গরম।

অন্যটি,

সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি,
বোম্ ফেলেছে জাপানী।
বোমের ভেতর কেউটে সাপ,
ব্রিটিশ বলে, বাপ্‌রে বাপ।

সে বছরের ছবিটা আজ নীলুর স্পষ্ট মনে পড়ে। নীলু তাদের গ্রাম বা আশেপাশের গ্রামের চেহারাটা অনুমান করতে পারত নিজের ঘরে বসেই। প্রতিদিন তাদের বাড়ীতে অজস্র লোকজনের আনাগোনা হত। নীলু ধীরে ধীরে লক্ষ্য করতে লাগল, সকলের মুখে আজকাল যেন দুটো কথাই বেশী করে শোনা যায়। তা হলো যুদ্ধ চলছে তিন বছর ধরে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে ভীষন। কবে যে সর্বনাশা যুদ্ধ শেষ হবে। আর দ্বিতীয়টি হলো ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে এবং সে প্রসঙ্গে নেতাজী মহাত্মাজী প্রভৃতি দেশবরেণ্যদের নিয়ে আলোচনা হত।

যারা নিতান্ত ছা-পোষা, মুখ্যসুখ্য বা সাধারণ স্তরের মানুষ তাদের মনে স্বাধীনতা ও স্বরাজের স্পষ্ট রূপরেখা তখনও ফুটে ওঠেনি। তারা বলাবলি করত নীলুদের দোকানে বাজার করতে এসে—রাজা ছাড়া তো রাজ্য চলে না। ব্রিটিশকে তাড়াতে পারা অত সস্তা নয়। আর তারা গেলে আবার কেউ রাজা হবে। আমরা প্রজা, আমাদের অত দরকার কি কোন্ রাজায় রাজায় যুদ্ধ হচ্ছে? যুদ্ধটা থামলেই বাপু বাঁচি। না হলে দেখ, টাকায় তের সের করে চাল। ছেলেপুলে নিয়ে এরপর আমরা বাঁচব কেমন করে? গেল বছরও টাকায় ষোল-সের চাল ছিল।

কিন্তু পূর্ণেন্দু-কাকা, শৈল মামা, রাখাল মিশ্র, শংকরীপ্রসাদ এবং তাঁদের স্তরের লোকেরা যখন যুদ্ধের দরুন বাজারে আগুন লাগার কথা আলোচনার পরও স্বাধীন ভারতের রঙীন ছবি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করত তখন নীলুর মনে এক সোনার দেশের ছবি আঁকা হতে থাকত। যে দেশটা ছিল ঠিক রামায়নের অযোধ্যার মত। আর

সে দেশের রাজা ঠিক রামচন্দ্রের মতই একজন। সেই রামচন্দ্রকে নীলু সুভাষ বোস ছাড়া অন্য কাউকে কল্পনা করতে পারত না। গান্ধীজী মন্ত্রী হলেই যেন ভাল হয়। এসব তখন ভাবত নীলু।

ক্রমে দেখা গেল আকাশে যুদ্ধের উড়োজাহাজের সংখ্যা ও আনা-গোনা বেড়ে গেছে। তেমনি দেশের স্বাধীনতা নিয়ে সকলে যেন আরো বেশী করে মাথা ঘামাচ্ছে। এর কারণ, মহাত্মাজীর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত কংগ্রেসীরা গ্রামের লোকদের কাছে স্বরাজ কি ও কেন, তার অর্থ বোঝাবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছে। শাপলা গ্রামের আশেপাশে কংগ্রেসীরা প্রায়ই সভা সমিতির আয়োজন করে চলেছেন। সেই সভায় কাঁথি, মেদিনীপুর, কোলকাতা থেকে বড় বড় কংগ্রেসী নেতারাওএসে ভাষন দিচ্ছেন। লোকে তাঁদের ভাষণ শুনতে ভীড় করে। তাঁদের থেকে লোকে স্বরাজের অর্থ কিছু কিছু যেন বুঝতে পারল।

লোকে শুনছে, বক্তা বলে চলেছেন—ব্রিটিশ আমাদের কোন উপকার করার জন্য এ দেশ শাসন করছে না। প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা তারা ভারতবর্ষ থেকে নিজেদের দেশে নিয়ে যাচ্ছে। সে সব টাকা তাদেরই কাজে লাগছে। ব্রিটিশ যুদ্ধ করছে, সে যুদ্ধে তারা জয়লাভ করুক বা পরাজিত হোক তাতে আমাদের কোন লাভ নেই। কিন্তু আমাদের দেশে সব জিনিসের দাম হু হু করে বেড়ে চলেছে। দেশের সমস্ত পণ্য ব্রিটিশ প্রভুরা টেনে নিয়ে নিজের গুদামে রাখছে, শুধু মিলিটারীদের খাওয়াবার জন্য। তাই জিনিসপত্রের এত চড়া দাম। বহু বছর ধরে ইংরেজ আমাদের শাসন করছে, আমাদের প্রায় নিঃস্ব করে দিয়েছে। আর নয়, এবারে আমরা আমাদের দেশ নিজেরাই শাসন করতে চাই। মহাত্মাগান্ধী যে অহিংসার প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই সুরু করেছেন, তাতে ব্রিটিশকে একদিন এ দেশ ছেড়ে যেতে হবেই।

ভাষণ দিচ্ছেন মলিন সেন হরিপুরে আয়োজিত জনসভায়। নীলু শৈল মামার কাছে শুনেছে, মলিন সেন এক অসাধারণ মেধাবী ছাত্র। তিনি এম-ই-তে বৃত্তি পরীক্ষায় সারা বর্দ্ধমান বিভাগের মধ্যে প্রথম হয়ে

বৃত্তি পেয়েছিলেন। তারপর ম্যাট্রিক এবং আই, এ-তেও বৃত্তি পেয়েছেন। এখন কাঁথি কলেজে বি, এ, পড়েন।

নীলু অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল মলিন সেনকে। বয়স এমন কিছু বেশী নয়—বছর কুড়ি-একুশ হবে। রোগাটে চেহারা, ময়লা রং। চেহারার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য নেই কিন্তু চোখ দুটো আকর্ষণীয়রকমের উজ্জ্বল। গলার স্বর সুরেলা—ভারী মিষ্টি। কথা তো নয়, যেন গানের সুর।

মলিন সেন সকলকে অনুরোধ করে আবার বলেন—আপনাদের কাছে তাই আমার নিবেদন, আপনারা বিদেশী জিনিস ব্যবহার করবেন না। নিজের পরনের কাপড় চরকা কেটে নিজেরাই তৈরী করে নিন। মহাত্মাজী নিজেই নিজের পরনের কাপড় তৈরী করেন। সমস্ত ব্যাপারে আপনারা শাসক শ্রেণীর সঙ্গে অসহযোগিতা করুন। বিদেশী জিনিস সম্পূর্ণরকমে বর্জন করুন। মহাত্মাজী আমাদের তাই-ই করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সকলেই যদি মহাত্মাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চলি, তবে ইংরেজ দেশ শাসন করবে কাকে নিয়ে? ওদের নিজেদের দেশে আর ক'জন ইংরেজ আছে? অথচ পৃথিবীর অর্দ্ধেকটা ওরা নিজেদের অধিকারে রেখেছে। সমস্ত ইংরেজ যদি নিজেদের দেশ ছেড়ে সমস্ত দেশে শাসন করতে বেরিয়ে পড়ে, তবে অত লোক কোথায় ওদের দেশে?

—অতএব এ দেশ শাসন করতে হলে—দেশের লোক দিয়েই ওদের করতে হবে। তাই সকলেই যদি আমরা ওদের সঙ্গে অসহ-যোগিতা করে চলি, তবে ওদের এদেশে শাসন করার উপায় নেই। তাতে ওরা এদেশ ছেড়ে পালাতে পথ পাবে না। আর এই হলো সময়। এ সময় ব্রিটিশ বাইরে জার্মান জাপানদের কাছে মার খাচ্ছে। এ সময় যদি আমরা দেশের ভেতর থেকে চাপ সৃষ্টি করতে পারি এভাবে তবে স্বরাজ আমাদের হাতের মুঠোয়। সকলে এক হলে স্বরাজ আমরা এক মুহূর্তেই অর্জন করতে পারি।······

এরকম নানা কথাই মলিন সেন সেদিন বলেছিলেন। সব আর

আজ নীলুর মনে নেই। তবে এ তার বেশ মনে আছে যে, সেদিন মলিন সেনের বক্তৃতা শুনে সে নিজের ভেতরে এক অদ্ভুত উত্তেজনা বোধ করেছিল। একই উত্তেজনা সে সকলের চোখেমুখেও দেখেছিল।

এভাবে আস্তে আস্তে সাধারণ লোকদের মধ্যে স্বরাজের অর্থটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল। কিন্তু তখনও একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত সময় আসেনি।

গান্ধীজীর নীতি ও আদর্শ মোটামুটি ঐভাবে আস্তে আস্তে সকলের মধ্যে প্রচারিত হলেও সকলেই যে ঐ নীতির অভ্রান্ততা এবং কার্যকারিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন, এমন নয়। অনেকেরই কাছে এগুলো কিছুটা অবাস্তব বলেও মনে হয়েছিল। পাশাপাশি অনেকের কথাবার্ত্তা থেকে নীলু এটা বেশ বুঝতে পেরেছিল।

হরিপুরের সভায় মলিন সেনের ভাষণ শোনার আট-দশদিন পরে এক বিকালে রয়টার এলো নীলুদের ইসকুলে। যথারীতি ছেলেরা পড়া ভুলে এবং মাষ্টারমশাই-এরা পড়ানো ভুলে রয়টারের কথা শোনার জন্য আগ্রহী হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

তামাকে টান দিতে দিতে বড় পণ্ডিতমশাই রয়টারকে বললেন—আপনার কি মনে হয় ভূতুবাবু, গান্ধীজীর কথায় ইংরেজ আমাদের স্বরাজ দিয়ে দেবে ?

রয়টার অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সুরে বলে—পাগল হয়েছেন ? ব্রিটিশ পলিসী কি জিনিস, বুঝা খুব শক্ত। ওরা এখন, বুঝলেন না, বাইরে যুদ্ধ করতে গিয়ে বেশ নাজেহাল হচ্ছে। তাই গান্ধীজীকে হাতে রাখতে চাইছে। অনেকটা যেন, এ্যাই দিচ্ছি, দেব ভাব। এরকম করলে দেশের লোক বেশী মাতামাতি করবে না। তারপর যুদ্ধ তো একদিন শেষ হবেই। তখন কলা দেখাবে।

কথা শেষ করে রয়টার বৃদ্ধাঙ্গুলি বাঁকিয়ে কলা দেখানোর মুদ্রা করে।

বড় পণ্ডিতমশাই তামাক খেয়ে কলকেটা রয়টারের হাতে দিতে দিতে কাশির বেগ সামলাতে সামলাতে বলেন—আমারও কতকটা

তাই-ই মনে হয়। হাজার হোক, ব্রিটিশ সিংহ বলে কথা! তাকে কি আর অমন সব নরম কথায় আর ব্যবহারে বাগে আনা যায়?

কলকেটা দুহাতে চেপে ধরে জোর এক টান দেয় রয়টার। তারপর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে—সে আর বলতে? এই তো, গতকালের দৈনিক বসুমতীতে কি ব্যঙ্গচিত্র ছেপেছে জানেন না? ছবিটা হলো—চার্চিলের পা থেকে অনেকগুলো শেকড় বেরিয়েছে। তার পায়ের নীচে আঁকা রয়েছে ভারতবর্ষ। শেকড়গুলো সব ভারতবর্ষের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। নীচে লেখা আছে—কি করে ছাড়ি? ভারতের মাটিতে যে শেকড় ঢুকে গেছে।

ছোট পণ্ডিতমশাই বলেন—এ কথার অর্থ?

ভারিকি চালে মাথা দুলাতে দুলাতে রয়টার বলে—হুঁহুঁ, এর অর্থ বুঝতে হলে রোজ খবরের কাগজ পড়া চাই। অনেকেই বুঝতে পারে নি এর অর্থ। শংকরীবাবু অবশ্য বুঝেছেন। মহাচালাক লোক তো, আর সব খবরই রাখে। ব্যাপারটা হলো, কয়েকদিন আগে খবর বেরিয়েছিল কাগজে, চার্চিল বিলেতের সভায় ঐ রকম বলেছে। গান্ধীজীর আন্দোলনের কথাপ্রসঙ্গে সভায় কেউ কেউ ভারতকে স্বাধীনতা দেবার কথা বলায় চার্চিল বলেছে—অসম্ভব, ভারতের মাটি থেকে সরে আসতেই পারি না। ও মাটিতে আমরা শেকড় গেড়েছি। তাই কাগজে ঐ ব্যঙ্গচিত্র বেরিয়েছে, বুঝলেন না?

নীলু সেই প্রথম চার্চিলের নাম শুনল। পরে শৈলমামার কাছে জেনেছিল, চার্চিল হলো ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে নীলুর সঠিক ধারণা হয়নি, তবে মন্ত্রী যে চার্চিল, এটা বুঝতে তার অসুবিধা হয়নি।

গান্ধীজীর মতাদর্শের কার্যকারিতা নিয়ে লোকের মনে দুরকম ধারণা গড়ে উঠলেও এটা ঠিক যে, যারা কোনদিন স্বরাজ-ফরাজ নিয়ে মাথা ঘামাত না, তারাও মাথা ঘামাতে লাগল। অর্থাৎ আন্দোলনের ঢেউ দেশের কয়েকটা জায়গাতে শুধু সীমাবদ্ধ ছিল না। তা দেশময় ছড়াতে

লাগল। নিস্তরঙ্গ সাগরের বুকেও যদি একটিমাত্র ঢেউ জাগে, তবে দেরীতে হলেও ঢেউ গোটা সাগরের বুকে ছড়াবে।

এরই মধ্যে একদিন গ্রামে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল। পুলিশ নাকি মলিন সেন এবং আরো কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রাজদ্রোহিতা। ঘরে ঘরে তখন অনেক যুবকই গান্ধী টুপি মাথায় দিয়ে শোভাযাত্রাগুলোতে যোগ দিচ্ছিল। তারা যেন ঐ ঘটনায় একটু হক্‌চকিয়ে গেল। যে সব অভিভাবক চিরকাল হিসাবী তারা যে যার ঘরের ছেলেদের সাবধান করতে লাগল। কিন্তু তখনও কেউ কল্পনা করেনি আন্দোলন শেষ পর্যন্ত কোনদিকে মোড় নেবে।

আরো কিছুদিন পরে গাঁয়ে আগের বছরের মত একটা থিয়েটার করার কিছু তোড়জোড় চলল। সে বছর যেহেতু স্বদেশী ভাবনার সাড়া পড়ে গিয়েছিল তাই আবার সিরাজদ্দৌলা নাটকই মঞ্চস্থ করার কথা হল। রিহার্সেলও কিছুদিন চলল নীলুদের সেই দক্ষিণের বারান্দায়। কিন্তু হঠাৎ একদিন সব কিছু বন্ধ হলে গেল। কারণটা আর কিছু নয় যারা অভিনয়ে নেমেছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন যুবককে পুলিশ একদিন রাতের বেলায় এসে বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে গেছে একই অভিযোগে।

নীলুদের দোকান ঘরের বারান্দায় এক সন্ধ্যায় কথাবার্ত্তা বলছিলেন শংকরীপ্রসাদ এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা যে, পুলিশ এখন গাঁয়ের সমস্ত যুবকদের নামের তালিকা প্রস্তুত করে ফেলেছে। পুলিশের চোখে এখন যুবকমাত্রেই স্বদেশী, আরে স্বদেশী মানে ডাকাতদের সমগোত্রীয়, গ্রামের চারিদিকে যেন একটা সন্ত্রাসের ছায়া নেমে এল। যুদ্ধের খবর জিনিসপত্রের অগ্নিমুল্য, গান্ধীজীর স্বরাজ, সব কিছু ভাবনা ছাপিয়ে যে ভাবনাটি বড় হয়ে দাঁড়াল সকলের মনে, তা হলো, কখন কাকে পুলিশ ধরে। গ্রামের যুবকরা যেন পালাই পালাই করতে লাগল। তখনও নীলু বুঝতে পারেনি আর কয়েকমাস পরে কি ভাষণ জিনিসই না ঘটতে যাচ্ছে।

এই সময়ে স্বদেশী যাত্রার নামটা নীলু শুনতে পায়। সে যাত্রায় নাকি রাজা-রাজড়ার সাজ-পোষাক কিছুই লাগে না। যে যার ধুতি জামা পরে অভিনয় করে। মোটেই তা কেষ্টযাত্রা, নিমাই সন্ন্যাস বা বেহুলা ভাসানের মত নয়। তাতে কংগ্রেসী, পুলিশ, সাহেব এই সব রয়েছে। খুব কম খরচে নাকি এই যাত্রাগান করা যায়। এগুলো সব লোকশিক্ষামূলক, উদ্দেশ্য, দেশের লোকের সামনে স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বরূপটি ফুটিয়ে তোলা। এই যাত্রদলগুলো পেশাদারী নয়, অনেকটা সখের যাত্রাদলের মত।

রমেন জেঠাদের গ্রাম, রায়পুরে নাকি এক সখের যাত্রাদল গড়ে উঠেছে, নীলু শৈলমামার কাছে এ খবর পেল। শৈলমামার বাড়ী তো ঐ রায়পুরে। নীলুর বহু ইচ্ছা একদিন শৈলমামার বাড়ী গিয়ে সেই আশ্চার্য স্বদেশী যাত্রা দেখে। তার যেন কিছুতেই বিশ্বাস হয় না সাধারণ কাপড়চোপড় পরে কি করে অভিনেতারা অভিনয় করতে পারে। আসন্ন শিব-চতুর্দশীর মেলায় নীলু শৈলমামার বাড়ী যাবে স্বদেশীযাত্রা দেখতে, ঐ রকম কথা হয়ে আছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত নীলুর যাওয়া হয়ে উঠল না। একদিন খবর এলো, যাত্রার আসর থেকে শৈলমামার ভাইকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। যে বইটার গান হচ্ছিল. সেটি শৈলমামার ভায়ের লেখা এবং তিনি ওতে অভিনয়ও করেছিলেন।

পুলিশের এত ধরপাকড়ে আন্দোলন কিন্তু থেমে গেল না, বরং বেড়েই গেল! যে জিনিসের প্রতি লোকের কিছুমাত্র আকর্ষণ নেই তাকে যদি কোনক্রমে নিষিদ্ধ বলে প্রচার করা হয় তবে দেখা যাবে লোকে তাই-ই দেখতে ভীড় করেছে এ হলো যেন অনেকটা তাই। যারা খুবই সাধারণ লোক, তারা স্বরাজ-ফরাজের ধার ধরত না বা তাদের মনে ও নিয়ে বিশেষ চিন্তাভাবনাও জাগেনি। পুলিশই ধরপাকড় করে তাদের ভাবনাগুলো জাগিয়ে দিতে লাগল। যা নিষিদ্ধ, তাই দ্রষ্টব্য।

তবে তফাৎ হলো এই, যারা পথে নামার তারা তো নেমে গেছে। তবে তারা এখন একটু দেখেশুনে পথে চলাফেরা করে। আর যারা

নামেনি, তারা নামার কথা ভাবতে লাগল। পুলিশের উৎপাতে যাত্রা না চলুক, থিয়েটার না হতে পারুক, কিন্তু গানের মজলিশে গান? এতো পুলিশের বাপের সাধ্যি নেই বন্ধ করতে পারে। নীলু দেখতে পেল, তার বাবার সান্ধ্য গানের মজলিশে দিনে দিনে রাগাশ্রয়ী গান কমে যাচ্ছে। সেখানে আমদানী হচ্ছে নিত্যনূতন স্বদেশী ভাবনার বা দেশবন্দনার গান। আর সেইসব গানে গলা মেলাচ্ছেন শংকরীপ্রসাদ শৈলমামা সকলে।

পরম আশ্চর্যের কথা, একদিন মজলিশে দোর্দ্দন্তপ্রতাপ ইংরেজী মাষ্টারও গেয়ে শোনালেন সেই বিখ্যাত গান :—

'একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি।
হাসি' হাসি' পরব ফাঁসি দেখবে জগতবাসী।'···

নীলু লক্ষ্য করেছে, সে গান গাওয়ার সময় ইংরাজী মাষ্টারের চোখ শুষ্ক ছিল না, ছিল না উপস্থিত শ্রোতাদের কারোর। নীলুর মনে পড়ে, ঐ গান শুনে তারাও সকলে কেঁদেছে। পরের দিন রমলা ইংরাজী মাষ্টারকে বাড়ীর ভিতরে ডেকে এনে তাঁর গলায় সে গান শুনেছেন আর নীলুকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদেছেন।

এই সব আসরে পূর্ণেন্দু কাকারা সে সময় অনেক অনেক সুন্দর গান শুনিয়েছেন যা কিছু কিছু মনে পড়ে। এরকম হলো :—

পৃথিবী আমারে চায়,
রেখো না বেঁধে আমায়,
খুলে দাও প্রিয়া, খুলে দাও বাহুডোর।
প্রণয় তোমার মিছে নয়, নিছে নয়,
ভালোবাসি তাই মনে জাগো এত ভয়।
চাঁদ ডুবে যাবে, ফুল ঝরে যাবে,
মধুরাতি হবে ভোর।
শোন না কি ঐ আজ দিকে দিকে, হায়
কত বধূ কাঁদে, কাঁদে কত অসহায়?

পথ ছেড়ে দাও, নয় সাথে চলো,
ঘুচে নাও আঁখিলোর।

এমনি আর একখানি গান হল :—

'জেগে আছি একা, জেগে আছি কারাগারে।

* * * *

বাতাসে জাগিছে বাতাবী ফুলের গন্ধ;
বনে বনে জাগে ঝিল্লীর পুরছন্দ,
জোনাকীরা গাঁথে আলোকের মালা
বাহিরে অন্ধকারে।'···

এসব গান তখন সকলের মুখে মুখে ফিরত।

এই সময় একবার হরিপুর হাই ইসকুলে চমৎকার একটি অনুষ্ঠান দেখে এল নীলু। কাঁথি কলেজের ছাত্রীছাত্রীরা হরিপুরে এল। তাদের লোকে বলছিল স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী। সকলের সাদা পোশাক, সব খদ্দরের। ফুলপ্যাণ্ট, জামা আর মাথায় খদ্দরের টুপী। মেয়েদেরও ঐ একই পোশাক। একটা ব্যাণ্ড পার্টি'ও তাদের সঙ্গে ছিল। নীলুর মনে আছে, তারা ব্যাণ্ডের বাজনার তালে তালে দু'দলে ভাগ হয়ে কুচকাওয়াজ করেছিল, মেয়েরা আর ছেলেরা আলাদা হয়ে। সমবেত কণ্ঠে তারা যে গানটি গেয়েছিল তা ছিল নজরুলের।

'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীতে যাত্রীরা হুসিয়ার!'···

ঐ গান শুনে সকলের মনে কি যে উন্মাদনা জেগেছিল তা যেন আজ ভাবা যায় না। সকলে ছাত্রছাত্রীদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল আগামী দিনের স্বাধীনতার যোদ্ধারা কিভাবে জন্ম নিচ্ছে।

পরের দিন ইসকুলে ছাত্রছাত্রীদের আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতা ইত্যাদি হল। ছাত্রছাত্রীদের অনুষ্ঠান শুনতে সারা দেশ ভেঙ্গে যেন এল। একজন ছাত্রী আবৃত্তি করেছিল রবীন্দ্রনাথের—

'হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান'
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'...

একজন ছাত্র গেয়েছিল—

'নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার—
জানি জানি তোর বন্ধনডোর ছিঁড়ে যাবে বারে বার।'...

ছাত্রছাত্রীদের অনুষ্ঠানের শেষে বড়রা অনেকে গান গেয়ে শোনালেন। একখানি রবীন্দ্রসংগীত হল—

'এবার অবগুণ্ঠন খোল।
বিজন বনছায়ায় গহন মেঘমায়ায়
তোমার আলয়ে অবলুণ্ঠন সারা হল ॥'

সেই অনুষ্ঠানে পূর্ণেন্দুকাকাও একটি সুন্দর গান গেয়েছিলেন যা নীলু প্রথম শুনল :—

'আমি দুরন্ত বৈশাখী ঝড়, তুমি যে বহ্নিশিখা।
মরনের ভালে এঁকে যাই মোরা জীবনের জয়টিকা।
মোদের প্রেমের দীপ্ত দীপকরাগে
দিকে দিকে ঐ সুপ্ত জনতা জাগে।
মুক্তি-আলোকে ঝলমল করে আঁধারের যবনিকা।
দু'শ বছরের নিঠুর শাসনে গড়া যে পাষানবেদী
নূতন প্রানের অঙ্কুর জাগে তারি অন্তর ভেদি।'
তোমার আমার পুণ্যমিলন ব্রতে
আশার কমল ফোটে অশ্রুর স্রোতে,
নব ইতিহাস রচিব আমরা মুছি' কলংকরেখা।'

এইভাবে আন্দোলনের প্রস্তুতি হচ্ছিল সকলের মনে মনে—জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে। এই আবৃত্তি ও গানের মাধ্যমে। কথাগুলো ভাবতে গিয়ে নীলুর আজ একটা সুন্দর উপমার কথা মনে হয়। নদীর সামনে বাধা এলে সে সাময়িক থম্‌কে দাঁড়ায় ঠিকই কিন্তু পথ খুঁজে নিয়ে বেরিয়ে যেতেও দেরী হয় না। এর কারণ, জলের ধারা বুঝি অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী হলো মানুষের প্রাণধারা। প্রাণধারা বইবেই। বাধা পেলে অন্যখাতে সে বইবেই। আর তার সামনে কোন ঘাত যদি না থাকে তবে সে

বাধাকেই নিশ্চিত করে দেবে—যতই দুর্বার হোক সে বাধা। এই চিরন্তন সত্যটি চিরকাল শাসক সম্প্রদায় জেনেও চোখ বন্ধ করে রাখে। কিন্তু সত্য চিরকালই সত্য। তাই শাসক শ্রেণীদেরও শেষ নিশ্চিত হতে হয়।

আজ দেশ অনেক বছরই স্বাধীন হয়েছে। এই ক'বছরে ব্রিটিশ সিংহ কতটা হীনবল হয়েছে তা একবার ভাবুন। ইং ১৯৭৪ সালের তেরোই জানুয়ারীরও যুগান্তর পত্রিকায় ছিল খবরটা। খবরটা অবিকল ছিল এই রকম :—

'এবার উল্টো দৌড়'

'ব্রিটিশসিংহ অনেকদিন আগেই উল্টো দৌড় দিয়েছে, এবার তার প্রজারা চাইছে উল্টো দৌড়ে যোগ দিতে। দীর্ঘমেয়াদী শিল্পে অশান্তি, বর্ধমান মুল্য, বিদ্যুৎসংকট ইংরেজদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। দলে দলে ইংরেজরা এই ধোঁয়াশায় ভরা শহর ছেড়ে চলে যেতে চাইছে সূর্যকরোজ্জ্বল সেই সব দেশে একদা যা ছিল ব্রিটেনেরই উপনিবেশ, দেশত্যাগের দরখাস্ত ক্রমেই বাড়ছে।

সপ্তাহে মাত্র তিনদিন কাজ, বেকারী, মুল্যবৃদ্ধি, রেলসড়কে যাতায়াতে দুর্ঘটনা, জ্বালানী ঘাটতি, আলো ও তাপের উপর বাধা আরোপ তো আছেই। এর উপর সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমনই আজ ইংরেজদের দেশছাড়া করেছে মনে হয়।

বেশীরভাগ ইংরেজ যেতে চাইছে নিউজিল্যাণ্ডে। ডিসেম্বরে নিউজিল্যাণ্ড হাই কমিশন অফিসে ১৫,৩৫৯ জন দরখাস্ত করেছে যেখানে বাস করার অনুমতি চেয়ে। গত বছর এই সময় এ সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৮৫৮। জানুয়ারীতে এই সংখ্যা আরোও বাড়ছে।

অষ্ট্রেলিয়া হাইকমিশনের খরর, আবেদনের সংখ্যা দ্বিগুন হয়েছে। কানাডা হাইকমিশনেও সংখ্যাটি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী বলেই খবর এসেছে।' —'ইউ, এন আই।'

ব্রিটিশ সিংহের লেজ, দাঁত নখ সবই গেছে। এখন তার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পালা যে সুরু হয়েছে তা যুগান্তরের ঐ ছোট্ট সংবাদেই

প্রকাশ। অবশ্য নিশ্চিন্ত আক্ষরিক অর্থে না হলেও মর্মার্থে তো বটেই।

নীলু আজ মনে করতে পারে না, সেদিন হরিপুর হাই ইসকুলে কেন ঐ সব অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। তবে এটা বেশ মনে আছে। ঐ সব আবৃত্তি ও গান থেকে লোকে একটা ধারণা করেছিল যে সংগ্রাম সামনে আসছে, তাতে ছেলে, মেয়ে সকলকেই যোগ দিতে হবে। মেয়েদের আর ঘোমটার আড়ালে থাকলে চলবে না। বর্ণ-বিদ্বেষের মোহে পড়ে থাকাও চলবে না। তবেই হয়ত সকলের সামনে বন্ধ দরজাটা খুলে যাবে। আর সকলে এক হলে ভয় নেই কোন। মহাত্মাজী তো সকলকে সেই পথে যেতে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন।

জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। আন্দোলন যেন কিছু একটা রূপ নিতে যাচ্ছে। শংকরীপ্রসাদ এসব বুঝতে পারেন, তিনি প্রথম জীবনে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘর ছেড়েছিলেন। তিনি তাই এ সবের অর্থ বোঝেন, অন্তত: অন্য পাঁচজনের চেয়ে বেশী বোঝেন। কিন্তু এই বয়সে তিনি আর সোজাসুজি অন্দোলনের মধ্যে যেতে চাইলেন না। অথচ তিনি উত্তেজিত। পারলে তিনি যেন সোজা ওদেরই মত পথে নেমে পতাকা তুলতেন। কিন্তু না, তা বোধ হয় আর সম্ভব নয়। নীলু রয়েছে যে, ওকে যে মানুষ করতে হবে!

তাই বুঝি তিনি মধ্যপথ অবলম্বন করলেন। নীলু লক্ষ্য করত, থানার দারোগা শাপলা এলেই নীলুদের বাড়ীতেই উঠবে দলবল নিয়ে। থাকবে, খাবেও। কিন্তু সেজন্য গ্রামের কেউ শংকরীপ্রসাদের উপর বিরুক্ত নয়। এদিকে দারোগাবাবুর সঙ্গে শংকরীপ্রসাদের ভাব খুব। তারা এলে তিনি তাদের জামাই-আদরে রাখেন। নানারকম জিনিসও তাদের উপহার দেন। নীলু তার বাবার ব্যবহারগুলো ঠিক বুঝতে পারত না।

একদিনের এক ঘটনায় ব্যাপারটা তার কাছে কিছু পরিস্কার হল। একবার পুলিশ রাণীর দাদাকে ধরে নিয়ে গেল। যে কোনকালে স্বদেশী ছিল না। অপরাধের মধ্যে একটাই, তার যৌবন। যুবক-মাত্রেই তো পুলিশের চোখে স্বদেশী। অতএব বাঁধ ওদের। রাণীর

মা-বাবা তো কেঁদে-কেটে একশেষ। কিন্তু শংকরীপ্রসাদ তাদের অভয় দিলেন। সপ্তাহখানেক পরে রাণীর দাদা হাসতে হাসতে ঘরে ফিরে এসে জেলেখানায় ডাল-ভাতের গল্প সবিস্তারে বলে বেড়াতে লাগল।

কিভাবে রাণীর দাদা অত সহজে ছাড়া পেল তা নীলু বুঝতে পারল একদিন রমলা ও শৈলেশ্বরের কথা থেকে। শৈলমামা মাকে বলছিলেন; শংকরীপ্রসাদ নাকি অনেক টাকা খরচ করে রাণীর দাদকে ছাড়িয়ে এনেছে।

নীলু আরও জানল, শংকরীপ্রসাদ নাকি এভাবে প্রচুর খরচ করেন গাঁয়ের যাদের জেলে ভরে রাখে, তাদের সংসার অচল হলে সেগুলোকে সচল করতে তিনি সাধ্যমত তেল ঢালেন। এভাবে নাকি তাঁর অনেক টাকাই যায়। ব্যাপারটা জানার পর নীলুর গর্ব হয় তার বাবার জন্য। শৈলমামা মাকে আরো বলেন, এভাবে শংকরীপ্রসাদের যতই খরচ হোক না কেন, তা তাঁর আয়ের তুলনায় এমন কিছু নয়।

নীলু ঐ সময় আরো জানল, তাদের পাকা বাড়ী হবে। দোকান ঘরের চালও আর টালীর থাকবে না। আসছে দুর্গাপুজার পরই পাকা বাড়ীর কাজে হাত দেওয়া হবে। এসব শুনে নীলুর আনন্দ ধরে না।

কিছুদিন পরে একদিন কোলকাতা থেকে কান্তিজেঠা এলেন। দেশে এলে তিনি যেমন নীলুদের বাড়ী আসেন, তেমনই আসতে লাগলেন। একদিন চা খেতে খেতে কান্তিজেঠা শংকরীপ্রসাদের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয় নিয়ে কথা বলছেন। নীলু একটু দূরে দাঁড়িয়ে শুনছে।

গান্ধীজীর কথা উঠতেই কান্তিজেঠা যেন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলতে লাগলেন—ঐ সব অহিংসার বুলি আউড়িয়ে ভাবছ ইংরেজ তাড়ান যাবে? শংকরী, তুমি মনে কষ্ট কর আর যাই কর, আমি একটা স্পষ্ট কথা বলি, গান্ধী থাকার জন্য ব্রিটিশের মস্ত সুবিধা হচ্ছে বরং। তারা গান্ধীজীকে নানারকম ভাঁওতা দিয়ে দেশের মধ্যে আন্দোলনটাকে

চেপে রেখে বাইরে যুদ্ধক্ষেত্রটা সামলাচ্ছে। দেশের লোককে তিনি ভুল পথে চালাচ্ছেন।

শংকরীপ্রসাদ আহতকণ্ঠে বলেন—এটা, বোধ হয়, ঠিক বললেন না, কান্তি দা। স্বাধীনতা কি, কেন আমরা চাই, এতে আমাদের কি উপকার হবে, এসব কথা তো তিনি দেশের সর্বস্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং দিচ্ছেনও।

কান্তিজেঠা উত্তেজিত কণ্ঠে উঠে বলেন—মানি সে কথা। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। এখন গান্ধীজীর উচিত আন্দোলন থেকে সরে আসা। ব্রিটিশ তাড়াতে হলে চাই সামরিক শক্তি আর তার জন্য চাই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মত লোককে।

শংকরীপ্রসাদ বলেন—কিন্তু সুভাষচন্দ্র তো গান্ধীকে শ্রদ্ধা করেন।

কান্তিজেঠা বলেন—ব্যক্তিগতভাবে তিনি শ্রদ্ধা করেন—সে আমিও করি। কিন্তু পশুশক্তিকে পশুশক্তি দিয়েই জয় করতে হবে। এখানে অহিংসা অচল। অশোকের মৃত্যুর পর বিশাল সাম্রাজ্য যে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল ঐ অহিংসা নীতির জন্য। ছলের সঙ্গে সোজা-নীতি চলে না। 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'। তাই যদি হবে, নেতাজী কেন তবে তাঁর এলগিন রোডের বাড়ী থেকে ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে বিদেশে গিয়ে শক্তিসঞ্চয়ে মন দেবেন? গান্ধীজীর প্রতি শ্রাদ্ধাশীল থেকেও তিনি তাঁর নীতির প্রতি আস্থাশীল নন। তুমি দেখো, শীঘ্রই সুভাষ সৈন্যসামন্ত নিয়ে আসছে দেশে। তাঁর ধাক্কাতেই ব্রিটিশ গলাধাক্কা খেয়ে যাবে! এই সময় দেশের ভেতর থেকেও ব্রিটিশকে গলাধাক্কা দেবার প্রস্তুতির দরকার ছিল। আমাদের উচিত এখন সশস্ত্র আন্দোলনের পথে যাওয়া। আমি তাই বলতে চাই, গান্ধীজী আন্দোলনের ঘোড়াটার মুখ উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে ঘোড়াটাকে পিছিয়ে দিতে চাইছেন। এ সব কথা আমাদের গাঁয়ের লোকে না জানুক, কোলকাতাতে এখন সবাই জানে। সেখানে সকলে তোমার গান্ধীজীকে জানে ব্রিটিশের বন্ধু বলে আর নেতাজীকে জানে

দেশের বন্ধু বলে। সেই দেশের বন্ধু দেশ উদ্ধারে আসছে। আর দেরী নেই।

নীলুর মনে আছে প্রত্যুত্তরে শংকরীপ্রসাদ সেদিন নানা যুক্তিজাল বিস্তার করে কান্তিজেঠার কথা খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন। সে সব কথার সব কথা আজ আর মনে নেই। তবে সেদিন আলোচনার শেষে বিদায় নেবার সময় কান্তিজেঠা শংকরীপ্রসাদকে যে শেষ কথাটি বলেছিলেন তা হলো, – আজ তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না শংকরী কিন্তু তোমার ছেলেরা আমারই কথাগুলো কিছুদিন পরে ইতিহাসে পড়বে। তখন বুঝবে, কে সত্যিকারের ইংরেজ তাড়িয়ে ছিল। তখন দেখবে ছেলেরা বইতে পড়ছে—গান্ধীজী দেশকে জাগিয়েছিল আর নেতাজী ব্রিটিশকে ভাগিয়েছিল।

এভাবে বড়রা তখন দেশের স্বাধীনতার জন্য ইংরেজ তাড়ানোর ব্যাপারে নানারকমের মত পোষণ করতেন। সমস্ত কথার গুরুত্ব নীলু তখন বুঝতে না পারলেও এখন ওগুলোর অর্থ বুঝতে পারে।

যতদিন যেতে লাগল, তত যেন সকলের মধ্যে একটা কি হয়, কি হয় ভাব দেখা যেতে লাগল। অর্থাৎ সেটি ছিল ঝড়ের পূর্বমুহূর্ত।

নীলুর বাড়ীতে রোজ খবরের কাগজ আসত। খবরের কাগজের খবর নিয়ে বড়রা মাতামাতি করত। তাদের কথা থেকে নীলু শুনত বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের খবর, দেশের মধ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধের খবর, জিনিসপত্রের চড়া দাম ইত্যাদি। কিন্তু ঐ বয়সে খবরের কাগজ পড়ার মানসিকতা তার ছিল না। তাদের জন্য মাসিক শিশুসাথী আসত। সে তাই পড়ত।

একদিন – তখনও বোধ হয় দুর্গাপুজা আসতে মাস দুয়েকেরও বেশী দেরী আছে—নীলু লক্ষ্য করল তাদের দোকান ঘরের বারান্দায় বহু লোক খবরের কাগজের উপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। কৌতুহলী হয়ে নীলু সেখানে গিয়ে দেখে, শৈলমামা কাগজখানা হাতে নিয়ে চীৎকার করছেন—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। গান্ধীজী এবার শেষ অস্ত্র ছেড়েছেন। এবার বোধ হয় ব্রিটিশের দিন ফুরিয়ে এল।

সকলে যখন ঐ সব বড় বড় কথা বলে চলেছে, নীলু তখন এক ফাঁকে কাগজের সামনের পাতায় চোখ বুলিয়ে দেখে খুব বড় বড় আর মোটামোটা হরফে একেবারে উপরের দিকে লেখা রয়েছে—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।' যতদূর মনে পড়ে, লেখাটা লাল কালিতে। পাশেই গান্ধীজীর অৰ্দ্ধ নগ্নাবয়বের ছবি—মুখে স্মিত হাসি।

তিনটি শব্দ! ঐ তিন শব্দ যেন নীলুর মনে বিদ্যুতের শিহরণ খেলিয়ে দিল। অর্থ না বুঝলেও শব্দগুলি তার কাছে আশ্চর্য রকমের ধ্বনিময় বোধ হতে লাগল। সে বোঝে, ওগুলি বিশেষ অর্থবহ, সন্দেহ নেই। একটু পরে বড়দের কথাবার্ত্তা থেকে বুঝল যে ওগুলি হিন্দী ভাষায়, অর্থ – হয় করব, নয় মরব।

আরো একটু পরে নীলু বুঝল গান্ধীজী পরিষ্কার বলেছেন—হয় দেশকে স্বাধীন করব, নয় তো মৃত্যুবরণ করব।

অর্থাৎ সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা আর কি! কিন্তু, নীলু ভাবে, গান্ধীজী তো অস্ত্রে বিশ্বাসী-নন। তবে যুদ্ধটা কিভাবে করবেন তিনি? কান্তি জেঠার কথাগুলো তাহলে ঠিক নয়। গান্ধীজী তো এবার অস্ত্র ধরছেনই। কিন্তু নীলু ভেবেই পেল না, এটুকু চেহারায় গান্ধীজী কিভাবে যুদ্ধ করবেন? রাসুকে জিজ্ঞেস কর। সেও বিশেষ কিছু বলতে পারল না। বরং গান্ধীজী যুদ্ধ করছেন, এ কথা ভেবে দুজনেই হেসে উঠেছিল।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই যুদ্ধের চেহারাটা নীলুর স্পষ্ট হয়ে উঠল। দলে দলে লোক কংগ্রেসের তিনরঙা পতাকা নিয়ে নানারকম শ্লোগান দিতে দিতে শোভাযাত্রা করে চলেছে। নানা জায়গায় সভাসমিতি হচ্ছে। মলিন সেন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার সেই রকম নানা সভাসমিতিতে গরম গরম ভাষণ দিচ্ছেন।

যত জায়গায় সভাসমিতি হয়, পূর্ণেন্দু কাকার ডাক পড়ে গান গাওয়ার জন্য। আর সে সব কি আগুন ঝরানো গান! তার সুরেই নীলুর রক্তে যেন দোলা লাগে। দোলায় দোলায় রক্তটা যেন নীল থেকে লাল হয়ে যায়।

নীলাদ্রি আজ অনুভব করে, ঐ 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' শব্দ তিনটি ছিল আসলে একটি মহাজীবনের গানের প্রথম কলির অংশ। গীতি-কার, সুরকার এবং গায়কেরা ঐ গান গেয়ে যেন এক হয়ে যাচ্ছিল।

লোকে যতই মহাজীবনের গান গাইছে ততই পুলিশ নানারকমের অস্ত্রে শান দিচ্ছে। ধরপাকড় যেন প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেল। কিন্তু ঐ 'যৌবন জলতরঙ্গ' রোধিবে কে? একদল জেলে যায় তো আর একদল জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে রাস্তায় নেমে দাঁড়ায়। ঐ বয়সে নীলু ভেবেই পেত না ইংরেজের জেলখানাগুলো কত বড়? কত লোককে তারা এভাবে ধরে পুরে রাখতে পারবে?

নীলু যেন স্পষ্ট শুনতে পেল, তারা সকলে দলে দলে, তালে তালে গাইছে শেকল ভাঙ্গার গান:—

'কারার ঐ লৌহকপাট,
ভেঙ্গে ফেল্ কর্ রে লোপাট
রক্তজমাট শিকল পূজোর পাষাণ বেদী।'...

এ গানের কথা ও সুর নীলুদের রপ্ত হয়ে গেল। আজকাল তাদের ইসকুলেও পণ্ডিতমশায়েরা ঐ সমস্ত কথায় আলোচনা করেন। আশ্চর্যের কথা হলেও সত্যি। ইংরেজী মাষ্টারও পড়ানো ভুলে তাঁদের নানা কাহিনী শোনান। মাষ্টারমশায়েরা সকলে যেন শাসন করতে ভুলে গেছেন। তাঁরা যে এতকাল কি শাসনে রয়েছেন সেইগুলো ভাবতেই যেন ব্যস্ত।

নীলুদের গ্রাম এবং আশেপাশের গ্রাম থেকে পুলিশ প্রচুর লোক ধরে নিয়ে গেছে। এত লোক জেলে গেছে যে, নীলু দেখে, শোভাযাত্রায় যেন লোকের অভাব ঘটেছে। অবশ্য শুধু লোকাভাব নয়, তার মধ্যে পুলিশের চণ্ডনীতির প্রতি ভয়ও ছিল। অর্থাৎ আন্দোলনটা তীব্র আকার ধারণ করে একটু যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেল কিন্তু বন্ধ হয়নি। নীলু সেদিন অবশ্য বুঝতে পারেনি, সেটি ছিল ঝড় সুরু হওয়ার আগের থমথমে ভাবটা মাত্র।

ঐ সময় একদিন সকাল রয়টার অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ইসকুল

ঘরে এসে ঘোষণা করল—এবারে দেশ স্বাধীন না হয়ে যায় না। নেতাজী বাইরে থেকে সসৈন্যে আসছেন ব্রিটিশ তাড়াতে। তিনি বলে পাঠিয়েছেন—তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।

বড় পণ্ডিতমশায় বললেন—তাহলে গান্ধীজীর আন্দোলনের কি হবে ?

রয়টার বলে—ও সব বাদ দিন পণ্ডিতমশাই। বুঝলেন না, ও সব আইন অমান্য আর অসহযোগ করে কিছু হবে না। রক্ত দিতেই হবে। না হলে স্বাধীনতা আসবে না। গান্ধীজীর পথে নয়, সুভাষের পথেই স্বাধীনতা আসবে। মা সন্তানের রক্ত চাইছেন।

নীলাদ্রির মনে হয়, সুভাষের রক্ত দানের আহ্বানও ছিল আর এক মহাজীবনের গান। এ গানের আবেদনও ব্যর্থ হয়নি।

সেদিন নীলুর মনে হয়েছিল, গান্ধীজীর আহ্বানে রক্ত গরম হয় আর নেতাজীর আহবানে রক্ত ঝরে—বুঝি আপনা থেকেই ঝরে। এল বুঝি রক্তঝরার দিনগুলি।

হ্যাঁ, এসেছিল সেই রক্ত ঝরার দিনগুলি। মহাজীবনের গান ব্যর্থ হয়নি। কোনদিনই ব্যর্থ হয় না।

ওরই পরে নীলু দেখে বড়দের কথাবার্তার সুর যেন রাতারাতি বদ্‌লিয়ে গেছে। কোমল গান্ধার থেকে যেন দীপক রাগিনী জন্ম নিয়েছে। এ সুর শুধু ভাঙ্গার। মানার দরকার নেই, সহযোগিতার দরকার নেই—দরকার শুধু ভাঙ্গার। আর সেই ভাঙ্গাটা বুঝি গড়ার আগের ভাঙ্গা।

মুহূর্তে যেন আন্দোলনের মোড়ই ঘুরে গেল। সবাই যেন রুখে দাঁড়াল। এবার অচলায়তনের বদ্ধ দরজা বুঝি ভেঙ্গে পড়বে, দ্বার খুলে যেতে দেরী নেই আর।

এলো সেই রক্তঝরার দিনগুলি !

বর্ষাকাল প্রায় শেষ হয়ে আস্‌ছে। বৃষ্টি থেমেও একেবারে থাম্‌ছে না। দুর্গাপূজা অনেক কাছে চলে এসেছে। বাইরে কত কি যে ঘটে যাচ্ছে, নীলু সব জানে না। শাপলা গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে সব জীবন কাটে।

সেদিন ছিল বুঝি রবিবার, কি এক ছুটির দিন। নীলুর ইসকুল নেই। দুপুরে ভাত খেয়ে নীলু করবী গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিল। ক'দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়ে সেদিন আকাশে চড়া রোদ। তাহলেও ভ্যাপ্‌সা গরম বেশ আছে। বাবা বোধ হয় বিছানায় শুয়ে পড়েছে। তার শুতে ইচ্ছা করল না। রাসু আজ বাড়ী নেই। বাবা তাকে কোথায় যেন কি কাজে পাঠিয়েছে। সন্ধ্যের আগে সে আসতে পারবে না। রাসু বেশ চালাক চতুর। নীলুর চেয়ে অনেক বড়। বাবা তাই মাঝে মাঝে তাকে দিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজও আজকাল করিয়ে নেন। নীলু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল, কোথায় যাওয়া যায়। বাড়ীর বাইরে গেলে বাবা বক্‌তে পারেন।

এমন সময় চুপিসারে এলো পুলিন। পুলিন নীলুকে বলে—এ্যাই নীলু, মাঠে মাছ ধরতে যাবি?

নীলু বলে—আমার তো ছিপ নেই।

পুলিন তাকে আশ্বস্ত করে বলে—আমার একটা বাড়তি ছিপ আছে।

—আমি ঐ নাচানো ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে পারি না রে, নীলু বলে— আর বাবা জানতে পারলে বক্‌বে।

পুলিন বলে—কোন চিন্তা নেই তোর। আমি তোকে ধরা শিখিয়ে দেব। আর তোর বাবা ঘুম থেকে ওঠার আগেই চলে আসব।

নীলুদের গাঁয়ের ধানের মাঠে তখন কম করেও হাঁটুর উপর জল। সেই জলে থাকে শোল, ল্যাঠা, ভেটকী এই সব মাছ। এ সব মাছ

ধরার ছিপ আর বড়শী আলাদা। বড়সীতে ব্যাংএর বাচ্চা, চিংড়ি মাছ বা ঐরকম টোপ-গেঁথে ধান গাছের ফাঁকে ফাঁকে ফেলতে হয়। ফেলে রাখলে হবে না, ছিপকে নাচাতে হবে সর্বক্ষন। তাহলে ঐ সব শিকারী মাছদের দৃষ্টি ঐ টোপের দিকে আকৃষ্ট হবে। তারা যেই ছুটে এসে খেতে চাইবে অমনি টান দিলেই বাছাধনেরা ডাঙ্গায় উঠে আসবে।

এই হলো কায়দা। নীলু ঐ ভাবে ঠিকমত ছিপ নাচাতে পারে না বলে মাছও ধরতে পারে না। কিন্তু পুলিন ভারী ওস্তাদ। নীলু পারে না বলে তার উৎসাও কম। আগে সে পুলিনের সঙ্গে কয়েক-বার গেছে কিন্তু কোনবারই সফল হয়নি। সেদিন যাই হোক যে পুলিনের সঙ্গে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ল।

তাদের বাড়ীর সামনে ক্যানেলের পাড়ের উপর ছিল আদ্যিকালের মস্ত ঝাঁকড়া এক শিরীষ গাছ। গাছ না বলে মহাবৃক্ষ বলাই বোধ হয় ঠিক। তার পরই খেয়াঘাট। পাশে পদ্মলোচন মাঝির খেয়া-ঘাটের ঘর। আরো একটু গেলে পড়ে মস্ত বড় একটা কয়েত বেলের গাছ। গাছটায় এত বেল হয় যে সারা গাঁয়ের ছেলেমেয়া খেয়ে শেষ করতে পারে না। এখান থেকেই ডানহাতে একটা কাঁচা রাস্তা নেমে গেছে পুলিনদের বাড়ীর দিকে। তার আরো একটু পরে পড়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মাটির চওড়া রাস্তা যেটা ক্যানেলের পাড় থেকে ডানহাতে নেমে গেছে। ঐ পথ ধরে কিছুটা গেলে রাস্তার ডানহাতি পড়বে তেলীদের পুকুর। ঐ পুকুর পাড় দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে তেলীদের বাড়ী। দুটো ধানের মাঠের মাঝখান দিয়েই রাস্তাটা— দুপাশে জল, মাঝে রাস্তা।

তেলীদের বাড়ীর পাশেই ধানের মাঠে রয়েছে কতকগুলো কাঠের গুঁড়ি পেতে বাঁধান ঘাট। বর্ষাকালে তেলীরা ঐ ঘাটে থালাবাসন ধোয় এবং অন্য কাজ সারে, ঘাটে তাই ভাত ও অন্যান্য খাবারের অবশিষ্ট পড়ে। তাই ওখানে মাছ ও থাকে। পুলিন সেটা জানে। নীলুর অত জানার কথা নয়।

পুলিন ও নীলু এলো তেলীদের সেই ঘাটে। ঘাটের চারদিকটা লক্ষ্য করে পুলিন বলে—ঐ দ্যাখ্, শোলের বাচ্চারা ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ তো, নীলু বলে।

পুলিন তখন তাকে বুঝিয়ে বলে—ওর নীচে জলের মধ্যে রয়েছে ওদের মা। বড়শী এখানে ফেললে ওদের মা টোপ খাবে, দ্যাখ্।

পুলিন ওখানেই বড়শী ফেলে বেশ কিছুক্ষন ধরে ছিপ নাচাতে লাগল। একটু পরেই সে দেয় টান। হ্যাঁ, ঠিক ধরা পড়েছে শোলমাছ। টানের চোটে শোল মাছ উপরে উঠে গেল। নীলু আনন্দে হাততালি দিতে থাকে।

কিন্তু একি! মাছটা রাস্তার অপর পারের ধানের মাঠে পড়ে গেল যে। দুজনে হায় হায় করতে করতে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে।

একটু পরে বিমর্ষমুখে পুলিন বলে—বড়শীটা ঠিকমত গাঁথে নি, বুঝলি না ? দুজনে বেশ কিছু মন মরা হয়ে থাকল। মাছটা যেখানে পড়ে গিয়েছে সেদিকেই তাকিয়ে রইল। একটু পরে, রোদের তেজ উপেক্ষা করে নূতন উদ্যমে তারা লেগে গেল মাছ ধরতে। অনেকক্ষণ আর কোন শিকার হস্তগত হয় না। নীলু বাবার বকুনির কথা ভেবে মনে মনে বলে—এবার বাড়ী ফিরতে হয়। কিন্তু কথায় আছে—

'তাস, পাশা, ছিপের নেশা—
এ তিন হলো সর্বনাশা।'

নীলু তখনই যেতে পারে না বাড়ী। আরো পরে সূর্য বেরাদের বাড়ীর বাঁশবাগানে ডুব দিল। সন্ধ্যে হয়ে আস্ছে। ঐ সময় হঠাৎ নীলু একটা ল্যাঠামাছ ধরে ফেলল। নীলু এই প্রথম ধরল ধানক্ষেতের মাছ। তার আনন্দ আর ধরে না। পুলিন সেদিন কিছুই ধরতে পারে নি কিন্তু তবু সে খুশী হল শিষ্যের কৃতিত্ব দেখে!

তারপর সন্ধ্যার মুখেই নীলু খুব ভয়ে ভয়ে বাড়ীর পেছন দিয়ে ভিতরে ঢুকল। রমলা নীলুকে দেখে একচোট বকলেন—কোথায়

গিয়েছিল এতক্ষণ ? আহা দেখ না সারা দুপুর রোদে ঘুরে ঘুরে মুখখানা কেমন পোড়া বাঁদরের মত করে এনেছে ?

নীলু কিন্তু তিরস্কার গায়ে মাখে না। উৎসাহে বলে ওঠে—এ্যাই দেখ মা, ল্যাঠামাছ ধরেছি। আমি নিজে ধরেছি। পুলিন একটা শোলমাছ গেঁথেছিল কিন্তু তুলতে পারে নি।

—ও, তাহলে পুলিনের সাথে ছিপ্ ফেলতে গিয়েছিলি ?

—হ্যাঁ মা। জানো, ও আজ কিছুই ধরতে পারে নি; নীলু মার গলা জড়িয়ে ধরে বলে মা, এটা ভেজে দাও না আমায় আলাদা করে।

রমলা বিরক্ত হয়ে বলেন—তোর বাপ হরিপুর গেছে। যাওয়ার আগে খোঁজ করে তোকে পায় নি। এলে তোকেই ভাজবে দেখিস। আসুক কাল সুরেশ পণ্ডিত, কেমন মারটা তোকে খাওয়াই ছ্যাখ না।

মায়ের সকল তিরস্কার সেদিন নীলু অবলীলায় হজম করল তার জীবনের এ হেন প্রথম সাফল্যে। ঘাটে হাত পা ধুতে ধুতে তার মনে হল, আজ তার জীবনের এক স্মরণীয় দিন।

একটু পরে রাসু ফিরল। নীলুর ল্যাটা মাছের চেহারা দেখে রাসু তাচ্ছিল্যভরে বলল—এ তো তোর চেয়ে একটু বেশী বড় রে।

নীলুর ভাল লাগল না কথাগুলো। সন্ধ্যেবেলা সেদিন সুরেশ পণ্ডিত আসেন নি। শৈলমামা ও বাবা হরিপুব গেছেন। দোকানেও আজ লোকজন যেন কম। নীলুরা সেদিকে গেল না। তারা হারিকেন জ্বেলে বইপত্র মাদুরে ছড়িয়ে রেখে শেলেটের উপর অংকের ধাঁধা খেলতে লাগল।

হঠাৎ মনে হল, হরিপুরের দিক থেকে যেন এক বিরাট চীৎকার ভেসে আসছে। নীলুরা কান পেতে শুনল এ কোন শোভাযাত্রার ধ্বনি নয়, কোথায় যেন আগুন লেগেছে। একটু পরে দেখে, দোকানে যারা বাজার করতে এসেছিল তারা সকলেই উর্ধশ্বাসে হরিপুরের দিকে দৌড়াচ্ছে। দোকানঘর ফাঁকা হয়ে গেল।

রমলাও ব্যস্ত হয়ে রান্নাঘর ছেড়ে বাইরে এলেন। এমন সময় দোকানঘর থেকে নগেন কাকা ছুটে এসে রমলাকে বলল—ছোড়্দি,

সর্বনাশ হয়েছে খাসমাহালে আগুন লাগিয়েছে। শংকরী দা রা তো হরিপুরের দিকেই গেছেন।

রমলা ব্যগ্রকণ্ঠে বলেন—কারা লাগিয়েছে আগুন ? কেন ?

নগেন কাকা বলে—স্বদেশীরা, আবার কারা ? এরা কিন্তু অন্য দল, ছোড়দি। এরা নাকি সব থানা, খাসমাহাল, অফিস পুড়িয়ে দেবে। আমার ভয় হচ্ছে, আমাদের দোকানে তো বিলাতী কাপড় রয়েছে অনেক। এখানে আবার না চড়াও হয়। বিলাতী জিনিসও সব নাকি এরা পুড়িয়ে ফেলবে। শংকরী দা যে কোথায় গেল ! শৈলেশ্বরও নেই। কি যে হবে, জানি না। তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও ছোড়দি। আমি দোকান ঘরে যাই। কেউ তো নেই ওখানে। সব তো ঐ খাসমাহালের দিকে দৌড়াল।

মুহূর্তে যেন ঘরের মধ্যে এক ঘন অন্ধকার ছায়া নেমে এল। রমলা তাড়াতাড়ি নীলু ও রাসুকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বুলি ঘুমিয়ে আছে। মানুদা বুড়ী বাতের ব্যথায় শুয়ে কাতরাচ্ছে। নীলু ও রাসুর মুখে ভয়ে কোন কথা নেই। দুজনে চুপচাপ বুলির বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। রমলা বাইরের দিকের দরজা বন্ধ করে রান্নাঘরে গেলেন।

চিরকালই নীলুর ঘুমটা প্রবল। যত দুশ্চিন্তাই থাক তার, বিছানায় শু'লেই চোখের পাতা তার বেশীক্ষন খোলা থাকে না। তাই সে রাতে আর কি হলো না হলো নীলু জানে না। রাতে রমলা হয়ত ডেকে ছিলেন খেতে। ঘুম ভাঙ্গাতে পারেন নি বোধ হয়। সারারাত ধরে নীলু সেদিন শুধু ভয়ের স্বপ্ন দেখেছিল !

ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গতেই তার মনে পড়ল গত রাতের কথা। কিন্তু তার সব ভাবনা ছাপিয়ে ল্যাঠামাছের ভাজা খাওয়ার কথা মনে এল। প্রভাতী সূর্যের উজ্জ্বল আলোতে রাতের অন্ধকারের ভয়টা আর নেই ! তাই ল্যাঠা মাছের জন্য লোভটাই প্রবল হয়ে দাঁড়াল। হাজার হোক, ওটি ছিল তার স্মরনীয় দিনের এক রমনীয় ফসল। কিন্তু নীলু তখনও

বুঝতে পারে নি তার জীবনের স্মরণীয় দিন তাদের খেজুরী থানার পক্ষেও এক স্মরণীয় দিন বটে।

একটু পরেই নীলু শুনল, স্বদেশীরা সমস্ত ইসকুল বন্ধ রাখতে বলেছে মাষ্টারমশাইদের। নীলু ভাবে, হ্যাঁ, এটা খবর বটে। রাসুও পুলকিত হয়। একটু বেলা হতেই নীলু, রাসু ও পুলিনেরা দল বেঁধে হরিপুরের খাসমাহালের দিকে গেল। গিয়ে দেখল, গোটা অফিসটাই যেন এক পোড়া বাড়ী হয়ে গেছে। আগুন সবে নিভেছে, মনে হচ্ছে। ম্যানেজার ও কর্মচারীদের বাসাগুলো পোড়ান হয় নি। ওখানে তখনও অনেক লোকের ভীড় জমেছিল। রাসু পোড়া অফিসের মধ্যে একটা অর্দ্ধদগ্ধ সিকি কুড়িয়ে পেয়েছিল।

কয়েকদিন পরে তারা শুনল এক সাংঘাতিক এবং অবিশ্বাস্য ঘটনা। তাদের থানায় এখন কোন দারোগা পুলিশ নেই। খেজুরী থানার অফিস এখন সম্পূর্ণ স্বদেশীয়দের দখলে। থানা নীলুদের বাড়ী থেকে বারো-তেরো মাইল দূর। তাই অতদূরে গিয়ে দেখে আসা তাদের পক্ষে সম্ভব হল না।

ঘটনাটা শোনা গেল। এক রাতে বিরাট এক সংঘবদ্ধ জনতা অতর্কিতে থানার চারপাশ ও অস্ত্রাগার ঘিরে ফেলে। পুলিশরা কোন প্রকার প্রস্তুতির সুযোগও পায় না। স্বদেশীরা সার্কেল ইনস্পেক্টারকে বেঁধে তাদের এক ক্যাম্পে রেখেছে। সে ভদ্রলোককে গোটা পথ চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জনতার হাতে কোন মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। তবু তারা এ অসাধ্য সাধন করার সাহস কোথা থেকে পেল তা নীলু ভেবে পায় নি।

নিত্যনূতন ঘটনা ঘটতে লাগল এবং সেগুলি শোনা যেতে লাগল। কিছু খবর সদ্য সদ্য কিছু বা দেরী করে আসতে লাগল। স্বদেশীরা নাকি চারিদিকে টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়েছে। বাইর থেকে পুলিশ বা মিলিটারি যাতে গাড়ী করে আসতে না পারে তার জন্য নাকি চারিদিকের রাস্তাঘাট, পুল সব স্বদেশীরা ভেঙ্গে দিয়েছে এবং দিচ্ছেও

ঐ সময় ভগবানপুর থানার এক মর্মন্তুদ ঘটনা শাপলা গ্রামে এসে পৌঁছাল। ঘটনা ঘটে যাওয়ার বেশ কয়েকদিন পরে এল খবরটা, একদল বিরাট জনতা একই দিনে বোধ হয়, ভগবানপুর থানাও রাতের অন্ধকারে ঘিরে ফেলে, পুলিসরা নিরুপায় হয়ে এক চাল খেলে। তারা জনতার কাছে নিবেদন করে যে তাদের পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হোক, তারা তাদের ছেলেপিলে নিয়ে থানার চৌহদ্দি ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

মানবিক কারণে স্বদেশীরা তাদের যে অনুরোধ রেখেছিল আর করেছিল মস্ত বড় এক ভুল যার খেসারত দিতে হয়েছিল অন্তত ত্রিশ-চল্লিশজনের প্রান দিয়ে। ঐ অল্প সময়ে মধ্যে পুলিশরা অস্ত্রাগারে স্থান করে নেয়। তারা অস্ত্রাগারের জানালার গরাদের ফাঁকে ফাঁকে রাইফেলের নল বার করে বসে থাকে। মুহূর্তে রাইফেলগুলো সব গর্জে ওঠে। বিপ্লবীরাও মুহূর্তেকালের জন্য হক্‌চকিয়ে যায়। তারপর তারাও গর্জে ওঠে।

এক প্রত্যক্ষদর্শী নীলুদের দোকানঘরে বসে বর্ণনা দিচ্ছিল। সে বলল—সে দৃশ্য দেখার মতই বটে ? তাদের কাছে তখন একটা জীবনের দাম বোধ হয় একটা আধ পয়সাও নয়। গুলি দেখে তারা একটু পিছিয়ে এল। তারপর তাদের মধ্য থেকে সাত-আটজন কতকগুলো করোগেটেড শীট্ সামনে আড়াল দিয়ে রাইফেলের দিকে এগোতে লাগল। সকলের মুখে তখন এককথা—ভাইসব, থানায় আমাদের স্বাধীন পতাকা উড়াতেই হবে।

একটু থেমে লোকটা আবার বলে--কিন্তু রাইফেলের গুলির কাছে কি আর পাতলা টিনের শীট্ কখনও টেকে বাবু ? দলে দলে লোক মারতে লাগল। চোখের সাম্‌নে সে দৃশ্য দেখেও আবার একদল যাচ্ছে। তারা পড়ে যাচ্ছে, আবার আর একদল এগিয়ে যাচ্ছে। এভাবে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন শেষ হল বাবু। একদিকে তাদের কান্নার রোল, অন্যদিকে জনতার জয়ধ্বনি।

লোকটা চোখের জল মুছতে মুছতে বলে—এ দৃশ্য দেখা জীবনে সৌভাগ্যও বটে আবার দুর্ভাগ্যও বটে। রাইফেলের সঙ্গে জনতা

এভাবে কতক্ষন আর খালিহাতে লড়তে পারে বলুন ? শেষে সব পিছিয়ে এল ! খেজুরী থানায় স্বাধীন পতাকা উড়েছে। একটু ভুলের জন্য—ভগবানপুর থানায় উড়ান গেল না। কতকগুলো তাজাপ্রাণ শুধু শহীদ হলো।

আজ যদি সেই লোকটির সঙ্গে দেখা হয় তো নীলাদ্রি বলবে—না, কোন শহীদের রক্ত বৃথায় যায় না। তাদের রক্তই প্রেরনা দিয়েছিল আরো রক্ত ঝরাবার। তাই তো এসেছিল সেই রক্তঝরার দিনগুলো।

ব্রিটিশ ঠিক কি কারণে এ দেশ ছেড়ে গেছে সেই আসল সত্যগুলো বর্তমান কালের ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। সে গুলো আজ থেকে এক শতাব্দী পরে হয়ত কোন গবেষক সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারবেন যখন বর্তমান রাজনীতির সমস্ত কোলাহল স্তব্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু এটা ঠিক, ব্রিটিশ যদিও বা কোন চাপে পড়ে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলও বা, তবু সে অত সহজে যেত না যদিনা একটা গলাধাক্কা দেওয়া যেত। তাকে দূর করার আগে গলাধাক্কাটি দেবার জন্য এই রক্তঝরা দিনগুলোর দরকার ছিল। শহীদের রক্ত থেকে শহীদ জন্ম নেয়। অতএব সেদিনের কোন রক্তই ব্যর্থ হয় নি।

নীলাদ্রি ভাবে, সে আজও ঠিক জানে না, ব্রিটিশ সরকার পরে ভগবানপুর থানার দারোগা ও পুলিশদের সম্মানিত এবং পুরস্কৃত করেছিল কিনা, যারা সেদিন আপন ভাইদের প্রবল বীরত্ব দেখিয়ে শেষ করে দিয়ে চার্চিলের পায়ের শেকড় গুলোকে ভারতবর্ষের মাটির আরো গভীরে ঢুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিল। হয়ত করেছিল পুরস্কৃত তাদের সার্থক একনিষ্ঠ গোলামীর নিদর্শনের স্বীকৃতি স্বরূপ। সরকারী পুরানো নথীপত্র ঘাঁটলে হয়ত সে সন্ধান পাওয়া যাবে। যদি দেখা যায় তারা পুরস্কৃত হয় নি তবে আমাদের এখনই উচিত হবে তাদের কেউ বেঁচে থাকলে যথোচিত পুরস্কৃত করা। না করাটা আমাদের জাতীয় অপরাধ হবে, কারণ ব্রিটিশ চলে গেলেও আমরা তাদের একনিষ্ঠ গোলামদের কখনও চলে যেতে বলি নি। তাহলে ভগবানপুর থানার তৎকালীন কর্তব্যনিষ্ঠ পুলিশেরা কি দোষ করল ?

যাই হোক্, সেদিন ভগবানপুরে স্বদেশীদের ব্যর্থতা এলেও খেজুরীতে তা পুষিয়ে গেল। তখন খেজুরী থানা প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে out of British rule একমাত্র আকাশপথ ছাড়া বাইরে থেকে সরকারী পুলিশ বা সৈন্যদের থানায় আসার উপায় নেই। আর একটা পথ অবশ্য ছিল বঙ্গপোসাগর দিয়ে।

নিত্যনূতন তখন আরো অনেক ছোটবড় ঘটনা শোনা যেতে লাগল। কেথায় যেন স্বদেশীরা পুলিশের লঞ্চ ডুবিয়ে দিয়ে তাদের বন্ধুক কেড়ে নিয়েছিল। কোথায় বাড়ীর চালে প্রানভয়ে কে উঠেছিল, তাকে পুলিশ গুলি করে মেরেছে। তার লাশটা পুকুরের জলে পড়েছিল। এ রকম কত কাহিণী।

বিগত সেই রক্তঝরার দিনগুলোর কথা মনে এলে নীলাদ্রির মনে হয় তখনও পুলিশের মধ্যে কিছু প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন যাঁদের মন ছিল দেশের দিকে কিন্তু পেটের দায়ে ব্রিটিশের চাকরী করে যাচ্ছিল। আবার স্বদেশ প্রেমিকদের মধ্যেও কিছু এমন লোক ছিল যাদের কথা মনে পড়লে সে নিজেই লজ্জা পায়।

স্বদেশীরা এমনই একজন পুলিশ অফিসারকে নিজেদের ক্যাম্পে মাসখানেক আটকিয়ে রেখেছিলেন: সে রাখুক, আপত্তি নেই, কিন্তু কেন তাঁর ঘড়ি, আংটি, কলম খুলে নিয়ে মেরে দেওয়া হল, এইখানে নীলুর আপত্তি। তাঁকে যে সব জঘন্য খাদ্য দেওয়া হত, তা সমর্থনযোগ্য নয়।

পরে সেই অফিসারকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আরো পরে পুলিশ কয়েকজন স্বদেশীদের নামে আদালতে মামলা করে। মজার কথা, সেই অফিসার ভদ্রলোক আদালতে সনাক্তকরণ প্যারেডে নাকি কাউকে সনাক্ত করতে পারেন নি। তাই মামলাটি ফেঁসে যায়। ভদ্রলোক ইচ্ছে করেই যে মামলা ফাঁসিয়ে দিয়েছিলেন, এটা আর তখন কারোর বুঝতে বাকী ছিল না।

আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে। অনেককাল—এক শতাব্দীর সিকি ভাগের তো উপরই। নীলুর মনে পড়ে শৈশবের সেই সোনাঝরা

দিনগুলিতে সে এক সোনার স্বাধীন ভারতের কল্পনা করছিল। আরো পাঁচ বছর পরে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। সেই পাঁচ বছরে নীলুর সেই সোনার স্বাধীন ভারতের ছবিটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সেই ছবির সঙ্গে বর্তমান স্বাধীন ভারতের ছবিখানা যখন সে মিলিয়ে দেখে তখন তার হাসি পায়।

আপনমনে সে যেন বলে - দেশ স্বাধীন হয়েছে। সোনার দাম বেড়েছে—পঁচিশ টাকা থেকে পাঁচশ টাকা হয়েছে সোনার ভরি। পৃথিবীর বৃহত্তম সোনার আনাগোনার দেশ হল এই ভারত, যা আজ স্বাধীন। তবু ভারতের সঙ্গে স্বাধীন শব্দ যুক্ত হলেও সোনা শব্দটা মোটেই যোগ করা চলে না।

আরো কিছু কঠিন প্রশ্ন তার মনে উঁকি মারে। কিন্তু সেগুলোর সঠিক উত্তর কি তা কে তাকে বলে দেবে ? সিংহ কি কোনদিন চাল কলা খায় ? পশুশক্তি কি ক্ষাত্রতেজ বিনা দমিত হয় ? ভালো কথা তো ভালো লোকদের জন্য, দুর্জনদের জন্য তবে লাঠি নয় কি ? চোর কি কোনদিন ধর্মের কাহিনী শোনে ?

বহুকাল পরে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের মধ্যে নীলু মোটামুটি একটা উত্তর পেয়েছে। সে উত্তরটি হলো—পাকিস্থানের শাসনে জর্জরিত বাংলাদেশের মুক্তির জন্য ভারত ক্রমাগত এবং অবিরত দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্থান এবং বিশ্বের সমস্ত বৃহৎ শক্তির কাছে আবেদন নিবেদন করেছে। তাতে কোন ফল হয়নি। বরং ঐ সুযোগে পাকিস্থান সরকার আরো বেশী বাঙ্গালী শেষ করেছে। কিন্তু ভারত যেই ক্ষাত্রশক্তি দেখাল অমনি গলাধাক্কা খেয়ে যেন মুহূর্তে পাকিস্থান সরে গেল। এটাই প্রমাণ করে আবেদন নিবেদন ও মিষ্টি কথায় কোনদিন পশুবলে বলীয়ান শাসকদের চৈতন্যদয় হয় না। নিবেদন তাদের বরং সুযোগসন্ধানী করে তোলে। তাদের জন্য চাই ক্ষত্রিয়ের গলাধাক্কা যা তারা গলাধঃকরন করতে পারে না।

মনে রাখতে হবে, শাসক ব্রিটিশ পাশবিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন। সিংহ যতই মহারাজ হোক্ সে পশুই। দু-শতাব্দীর উপর ব্রিটিশ এ দেশে যে

সব অত্যাচার চালিয়ে গেছে তাদের যদি কোন অত্যাচারের এককের ক্রমিক যোগফলে প্রকাশ করা হয় তবে দেখা যাবে ইয়াহিয়ার ন'মাসের অত্যাচারের এককের যোগফল তার ধারে কাছেও যেতে পারে নি।

এভাবে একক ধরা যেতে পারে। নারীধর্ষণ কুড়ি একক, মানুষকে গুলি করে মারা দশ একক, লাথি মারা তিন একক—এভাবে একক নির্দিষ্ট হতে পারে। অতএব এই পশুদের কি গলাধাক্কা ছাড়া তাড়ান যেত শেষ পর্যন্ত ?

ব্রিটিশ মহাযুদ্ধে হীণবল হয়েছিল বলে ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল, এমন কথাও অনেকে বলেন। কিন্তু নীলু ভাবে তাই বা কেন ? বাঘ গলিত নখদন্ত, বৃদ্ধ হলেও সে বাঘ তো বটে। যতই সে বৃদ্ধ হোক তার আদরের থাবা ছড়ে সে কি আর যে কোন মানুষের ধড়টা নামিয়ে ফেলতে পারে না ? অতএব ব্রিটিশ যতই হীনবল হয়ে পড়ুক গলাধাক্কা ছাড়া শেষ পর্যন্ত তাকে তাড়ান যেত না। স্বাধীনতার শতাব্দী পরে যে গবেষক এ বিষয়ে গবেষণা করবেন তাঁর জন্য এই প্রশ্ন ও উত্তর রইল নীলুর।

আরো কিছুদিন পরে তখন দুর্গাপুজা এসে গেছে প্রায়—নীলুরা রয়টারের কাছে শুনল, চার্চিল নাকি অর্ডার দিয়েছে খেজুরী খানকে এ্যারোপ্লেন থেকে মেশিনগান দেগে উড়িয়ে দিতে। সেজন্য সাতশো ফৌজ নাকি পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু এ সব খবরে তখন যে কেউ চিন্তিত হয়েছিল, তা মনে হয় নি নীলুর।

কিন্তু শাসকদের সে সাধ মেটে নি। এমনিতেও বোধ হয় হতো না, কারন মহাজীবনের গান কোনদিন মেশিনগান দিয়ে স্তব্ধ করা যায় না। তবু যে সে সময় মহাজীবনের গানটা থেমে গিয়েছিল কিছুকালের জন্য, তা মেশিনগানে নয়, প্রলয়কানে। সে এক দুঃস্বপ্ন।

॥ ১৬ ॥

পৃথিবীটা যেন এক বিরাট অতিথিশালা—সব সময়ই কিছু অতিথি এখান থেকে বিদায় নিচ্ছে, আবার এখানে কিছু নতুন অতিথিরও আবির্ভাব ঘটছে। নীলুদের সংসারে সে বছর পূজোর মাসখানেক আগে এক নতুন অতিথি এলো। সে হলো মালতী—নীলুর দ্বিতীয় বোন।

সে বছর—সেই ইং ১৯৪২ এর আগষ্ট আন্দোলনের সময় সারা দেশে যেমন সাড়া পড়ে গিয়েছিল তেমনি ঘরে ঘরে কান্নার রোলও উঠেছিল। কান্নাহাসি মেশানো বিয়াল্লিসের সেই রক্তঝরা দিনগুলো! তেমনি ঐ সময় মা জগজ্জননী মহিষাসুরমর্দিনী আসছেন। তাঁর শুভ আগমনে সে বছরও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সাড়া জাগছিল। সাড়াটা অন্যান্য বছরের চেয়ে বেশী করে জাগা উচিত ছিল। কারণ মায়ের ছেলেরাও যে অসুর নিধনে ব্যস্ত ছিল। মা এসে তাঁর ছেলেদের বুকে আরো বল ও দেহে আরো শক্তি যোগাবেন যে!

কিন্তু লোকে বুঝি ততটা উল্লিসিত হতে পারছে না। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধটা থামছে না আর জিনিসপত্রের দাম যেন তালে তালে লাফে লাফে বেড়েই যাচ্ছে। বিশেষ করে ধানচালের দামের তো কথাই নেই। আর এই আশ্বিন-কার্তিকের দিকে সকলের ঘরেই মা লক্ষ্মী একটু বাড়ন্ত হন।

তবু বাঙ্গালী পিছপা নয়। মা আসবেন। মেয়ে আসবে। অতএব যতই অভাব অভিযোগ থাক, কেউ কি সে নিয়ে মুখভার করে থাকতে পারে? এদিকে ইংরেজের শাসনের অত্যাচারে ঘরে ঘরে তো শোক ও সন্ত্রাসের ছায়া পড়েছে। তাই বলে সেই ছ য়া দেখে তো কেউ ভয় পাচ্ছে না। অতএব আকাশে বাতাসে পুজার আগমনী সুর বাজতে রইল বই কি!

তখনকার দিনে আজকালকার মত সার্বজনীন দুর্গাপুজা হত না। পুজা কেবল বিবস্থাপন্ন বাড়ীতে হত। পুজাটা পরিবার কেন্দ্রিক হলেও

আনন্দটা কিন্তু প্রকৃত অর্থে সার্বজনীন ছিল। নীলুদের গ্রামে দু'ঘর অবস্থাপন্ন পরিবার ছিল। এক হলো পুর্ণেন্দু মিশ্র বা নীলুর পুর্ণেন্দু কাকাদের বাড়ী আর এক হলো জগৎ মাইতিদের বাড়ী। দুই পরিবারেরই গাঁয়ের মধ্যে পাকাবাড়ি, পাকা পুকুরঘাট ও বিস্তর ধানজমি রয়েছে। তবে পুর্ণেন্দু কাকাদের বাড়ীটা ছিল বহু পুরান আমলের। তার ছাদের কোন কোন অংশে অশ্বত্থ গাছ ও আগাছা জন্মেছে। কোন কোন দেওয়ালের সব ইট বার হয়ে গেছে। কিন্তু জগৎ কাকাদের বাড়ী প্রায় নতুন, সুন্দর এবং ঝক্‌ঝকে। এই জগৎ কাকা নীলুর বাবার বিশেষ বন্ধু। তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে নাম ধরেই ডাকেন। সিরাজদ্দৌলা বইতে জগৎ কাকা জগৎশেঠ সেজেছিলেন। তাঁর বিরাট ভুঁড়িটির জন্য বোধ হয়, ঐ চরিত্রে অভিনয় করতে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। এ বাদে নীলুদের বাড়ীর শিবমন্দিরটি ছিল পাকা। এ ছাড়া গাঁয়ে আর কোন পাকাবাড়ী ছিল না।

পুর্ণেন্দু কাকাদের বাড়ীতে প্রতিবছর শরৎকালে দুর্গাপূজা হত কিন্তু জগৎ কাকাদের বাড়ীতে বসন্তকালে বাসন্তীপুজা হত। শরৎকালের দুর্গাপুজা আর হত নীলুদের ক্যানেলের ওপারে পুরানো বাড়ীতে। যেখানে শিবের নিত্য পুজা হত, আজো হয়। তার পাশেই ছিল দুর্গার মণ্ডপ। মণ্ডপটি অবশ্য মাটির। সেখানেই দুর্গাপুজা হতো, আজো হয়। তবে আগের মতন তেমন জাঁকজমক অবশ্য হয় না।

নীলুর জেঠামশাইরা কেউ বড়লোক ছিলেন না। তবে অনেকটা যেন পারিবারিক বিগ্রহের পুজা বলেই দুর্গাপুজাটা হত। এই পুজার সঙ্গে অবশ্য শংকরীপ্রসাদের কোনরূপ যোগ ছিল না। তিনি ওসময় যেতেনও না। তবে নীলুরা অবশ্য যেত। ও-বাড়ী হলেও সেটা কোন-ক্রমেই নীলুর নিজের বাড়ীর চেয়ে কম ছিল না কিছু। অতএব নীলুর মনে হত, তার নিজের বাড়ীতেই পূজা হচ্ছে।

প্রত্যেক বছর পুজোর সময় কোলকাতা থেকে নীলুদের বাড়ীতে তার আর এক মামা আসতেন। তিনি হলেন নীলুর কৃপাসিন্ধু মামা বা কৃপা মামা। তিনি বেহালা না কোথায় যেন ইস্কুলে পড়াতেন।

এই মামা এলে নীলু বিশেষ উৎফুল্ল হত। কৃপামামা বেশ মজার মজার কথা বলেন। তিনি নীলু বা বুলিকে তাদের আসল নাম ধরে ডাকতেন না। যখন যে নাম তাঁর মনে আসত সেই নামেই তিনি তাদের ডাকতেন, যেমন হনুমান, হনু, পুঁচ্‌কে পুচ্‌কী, এই রকম।

এই কৃপামামা কিন্তু নীলুর আপন মামা নন, এমনকি আত্মীয়তার কোন সম্পর্কে মামা নন। এই কৃপামামার বাড়ী রাসুদের বাড়ীর কাছাকাছি কোথায় যেন। সেখানে তাঁর বাবা ও মা রয়েছেন। তাঁরা বেশ গরীব ছিলেন। রমলার বাপের বাড়ীর গ্রামে কৃপামামার কোন আত্মীয় বাড়ী রয়েছে। সেখানে অনেক বছর আগে রমলা এই কৃপামামাকে—তিনি তখন বালক, দেখতে পান। ছেলেটির জন্য তাঁর কেমন যেন মায়া হয়। তিনি তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন এবং নিজের ভাই-এর মত করে মানুষ করেন।

শংকরীপ্রসাদ তাঁকে আপন শ্যালকের মতই মানুষ করেছেন। কৃপামামা হরিপুর হাই ইসকুলে পড়াশুনা করে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তিনি খুবই মেধাবী এবং পরিশ্রমী ছাত্র ছিলেন। তিনি যখন ম্যাটিক পাশ করেন, নীলু তখন একেবারে ছোট—হামা-গুড়ি দেয়। সে শুনেছে, তারপর কৃপামামা তার বাবার খরচে ভি.এম. পাশ করেন। তারপর থেকেই তিনি কোলকাতায় কাজ করে আসছেন। ছুটিতে দেশে এলেই তিনি শাপলা গাঁয়ে চলে আসেন। ছুটির বেশীর ভাগ সময় তিনি এখানেই কাটান। এখানেই রয়েছে তাঁর বন্ধুবান্ধব, বিশেষ করে শংকরীপ্রসাদ এবং রমলা যাঁদের তিনি পিতামাতার মতই শ্রদ্ধা করেন এবং ভালবাসেন। নীলুর কাছে পুজা আসা মানেই কৃপা-মামার আসা। এবং সেটা পূজোর আনন্দের চেয়ে কিছু কম ছিল না!

সেবছর ষষ্ঠীর পাঁচসাতদিন আগে থেকেই আকাশ বড় অকরুণ-ভাবে মেঘলা হতে লাগল। কোথায় বর্ষণমুক্ত আকাশে সাদা মেঘেরা ভেলা ভাসিয়ে বেড়াবে, না, যেন মেঘের দল মুখ কালো করে নৌকা বাইতে সুরু করে দিল। নীলু আকাশের দিকে তাকিয়ে মুখ ভার করে। তবু মনে আশা, পূজোর আগে আগেই বৃষ্টি নিশ্চয়ই থেমে যাবে।

কিন্তু না, যতই পুজোর দিনগুলো কাছের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল, ততই যেন বৃষ্টির মাত্রা বাড়তে লাগল। সকলের মুখে বিরক্তির সুরে ঐ এক কথা—কি ছিঁচ্‌কাদুনে অলুক্ষনে বৃষ্টি সুরু হলো রে বাবা!

কৃপামামা বোধ হয় ষষ্ঠীর দিন, কি তার আগের দিন নীলুদের বাড়ীতে এলেন। ষষ্ঠীর দিন বৃষ্টি নয়, আকাশ যেন অবিশ্রান্ত ধারায় শুধু ঢেলে চলেছে। গোটা আকাশে মেঘের আস্তরনে একটুকু ছিদ্র নেই। সূর্য যেন সেই কবে দেশ থেকে উধাও। কোনকালে সূর্য যে ছিল, আবার কোনদিন যে সূর্য আকাশে আসবে তা যেন ভাবাই যায় না।

দোকানে লোকজনের আনাগোনা বেশ কম। ধানের মাঠ সব জলে জলময়। কোন কোন মাঠে ধানের সবুজ রং অদৃশ্য, কোথায়ও হয়ত একটু সবুজের আভা দেখা যায়। নীলুদের ক্যানেলের পাড়েই বাড়ী। তার পাড় বেশ উঁচু। কিন্তু ক্যানেলের জল পাড়ের সমান উঁচু হতে আর মাত্র হাত দু-তিন বাকী আছে। বিকালের দিকেও বৃষ্টি একই রকমের রইল, কিন্তু তার সঙ্গে যোগ হল ঝড়ো বাতাস। নীলুদের দুটো পুকুরই জলে ভর্তি হয়ে এল প্রায়। পাড়ের সমান জল থই থই পুকুরে।

সন্ধ্যেবেলায় দোকান ঘরে বলতে গেলে কোন লোক ছিল না। সুরেশ পণ্ডিত পুজোর ক'দিন পড়াতে আসেন না! আর আসতে চাইলেও এ ঝড়-বৃষ্টিতে আসতে পারতেন না। শৈলমামা ছুটি নিয়ে বাড়ী গেছেন। সন্ধ্যের মুখে নগেনকাকাও বাড়ী গেল। বাড়ীতে থাকার মধ্যে রয়েছে নীলু, রাসু, শংকরীপ্রসাদ, কৃপামামা, মানদা বুড়ী, পতিতপাবন বক্‌সী আর নীলুর ছোট দুই বোন—বছর দুয়েকের বুলি আর মাসখানেকের মালতী। আশ্রিত আরো রয়েছে—দুটো গাই, ভুলো বেড়াল, বাঘা কুকুর আর রমলার পোষা সেই ভেড়াটা।

এ বৃষ্টিতে সকলের বাইরে যাওয়া বন্ধ। সবাই তাই ঘরের ভেতরে, আর রমলার কাজ বাড়ে। সকলেই এরকম আবহাওয়ায় ঘন ঘন চা,

মুড়ি ভাজাভুজি খেতে চায়। এমন হয়েছে, হরিটাও সেবার যেন কোথায় আর আত্মীয় বাড়ী গিয়ে আর আসে নি। এ বৃষ্টিতে আসাও বোধ হয় সম্ভব ছিল না। রমলাকে দু'হাতে সব কিছু করতে হচ্ছে। বাড়ীর সকলের হুকুম তামিল তো আছেই, ওদিকে আবার গরু ভেঁড়ার খাওয়ারের দিকেও লক্ষ্য নজর দিতে হচ্ছে তাঁকে। রান্নাঘর, পুকুরঘাট গোয়ালঘর এই সব করতেই তিনি এ বৃষ্টির দিনেও গলদঘর্ম হয়ে যান। গোটা ঘরের মেঝে বৃষ্টির ছাটে, মানুষের ভেজা পায়ের দাগে দাগে স্যাঁতস্যাতে।

বেশ কয়েকদিন ধরে নীলুরা বাইরে খেলতে বা বেড়াতে যেতে পারে নি। ঘরের মধ্যে থেকে থেকে তাদের যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। এমনই বৃষ্টি যে, সকাল আর বিকাল বোঝা যায় না। মাঝে দুপুরে একবার ভাত খেতে হয়। তার পরেরটা বিকাল, তাই বিকালটা বোঝা যায়। বিকাল এলে মন খারাপ হয়ে যায়। আগের দিনও বিকালের দিকে আচার্য পাড়াতে একটু বেড়িয়ে এসেছে নীলু। আজ ঘরের বাইরে পা বাড়াবার প্রশ্নই আসে না।

সন্ধ্যের মুখে মুখে ঝড়ো বাতাসটা ক্রমেই বেশী অশান্ত হয়ে উঠেছে। রাণীদের বাড়ী কত কাছে, কিন্তু সেখানে যেতে হলে এক হাঁটু কাদাজল ভেঙ্গে যেতে হবে। নীলু বসে বসে ভাবছে, যদি কোনক্রমে রাণী, কালা বা পুলিনরা, কেউ তাদের বাড়ীতে আসত পারত তাহলে খেলার অসুবিধা হত না। গোয়ালঘর, পাটের গুদাম, ধানের মরাই ঘর মিলিয়ে খেলার মত অনেক জায়গা তাদের বাড়ীতে!

সন্ধ্যে হয়ে আসছে বোধ হয়। নীলু ও রাসু গোয়ালঘরে এল। পিছনের দরজাটা খুলে ফেলল রাসু। ওর পেছনেই একটা পুকুর। নীলু দেখে কি, পুকুরটা একেবারে ভর্তি হয়ে গেছে সারাদিনের অবিশ্রান্ত বর্ষণে।

রাসু পুকুরের দিকে চেয়ে থেকে বলল—আর বেশী বৃষ্টি হলে রাতের বেলায় পুকুর ডুবে যাবে। তখন সব মাছ বেরিয়ে যাবে। আমাদের পুকুরে মাছ তখন সাউদের পুকুরে চলে যাবে।

—কেন ? নীলু বলে—ওদের পুকুর ড়ুবেব না ?

রাসু সাউদের পুকুরের দিকে চেয়ে বলে—ওদের পুকুরের পাড় আমাদের পুকুরের পাড়ের চেয়ে উঁচু তো। তাই ওটা চট্ করে ডুববে না। তবে কালও যদি এরকম বৃষ্টি হতে থাকে তবে ওটাও নির্ঘাৎ ডুববে।

নীলু বিষন্নস্বরে বলে—তাহলে এবারে পূজোর আনন্দই হবে না, না রে রাসু ?

—দূর তোর আনন্দ, রাসু উপেক্ষার হাসি হেসে বলে—যা বৃষ্টি আর বাতাস, পূজোই হয় কিনা দ্যাখ্। বৃষ্টির জলেই বন্যা হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

নীলু কোনদিন বন্যা দেখে নি। সে কৌতূহলী হয়ে বলে—বন্যা কি রকম হয় রে দেখতে ? তুই দেখেছিস ?

রাসু ভারিক্কি চালে বলে—কত, কত ! আমাদের ভগবানপুর তো প্রায় বছরই বন্যায় ডোবে। কেলেঘাই নদীর নাম শুনিস্ নি ? বর্ষা কালে পাহাড়ের জল নেমে কেলেঘাই ভাসিয়ে দেয়। তার জলে আমাদের ওদ্রিকটা ড়ুবে যায়। চারদিকে তখন জল, শুধু জল। ধানগাছ বা ছোট ছোট গাছ সব ডুবে যায়। উঁচু জায়গার উপর বাড়ীগুলো আর বড় বড় গাছের মাথাগুলো জেগে থাকে। বন্যা যেবছর. বেশী হয়, সে বছর তাও থাকে না।

নীলু কিছুক্ষণ চিন্তা করে। বন্যার চেহারাটা কি রকম তা যেন ভাবার চেষ্টা করে। একটু পরে বলে—তা তোর কেলেঘাই-এর জল এদিকে আসতে পারে না ?

—কি জানি, রাসু বলে—নদীতে খুব বেশী জল এলে এদিকে এলেও আসতে পারে। এ পর্যন্ত তো শুনি নি এদিকে বন্যা হয়েছে বলে।

নীলু আপশোষের সুরে বলে—এলে বেশ মজা হত, না রে ? একটা নৌকা থাকলে আমরা বেশ নৌকা করে চারদিক ঘুরে বেড়াতে পারতাম। বৃষ্টি-কাদার মধ্যে কোথাও যাওয়ার অসুবিধা আর থাকত না।

রাসু বলে—নৌকার কি দরকার ? কলার ভেলা তৈরী করে নিলে হল। মজা আছে আরো। চারদিকে তখন মাছের ছড়াছড়ি হয়ে যায়। বাইরের কত মাছ এসে পুকুরে ঢোকে। তেমনি কষ্টও আছে। বন্যায় ধান, পাট, সব ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। মাটির ঘর অনেক পড়ে যাবে। নিজের পুকুরের মাছগুলোও বেরিয়ে যাবে। সেগুলোও ভেবে দ্যাখ্ মজা করার আগে।

লজ্জা পায় নীলু। কিন্তু তবু তার কৌতূহল থেকে যায় বন্যা দেখার জন্য। সেদিন রাতে তাদের পড়াশোনার কোন কথা ছিল না। ঘরে ইসকুলে, দুজায়গায়ই পূজার ক'দিন ছুটি। নীলু ও রাসু বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্প করতে লাগল। রাসু তাদের বাড়ীর দিকের বন্যার নানা গল্প বলে যাচ্ছিল। নীলুর শুনতে বেশ ভাল লাগছিল। বাইরে না বেরুতে পারার কষ্টটা আপাততঃ আর তার মনে ছিল না।

রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা গন্ধে নীলু বুঝতে পারে মা খিঁচুড়ী রাঁধছেন। এই বৃষ্টিতে খিঁচুড়ীর চেয়ে ভালো কিছু আর হয় না। নাকে গন্ধ লাগার সাথে সাথে নীলুর জিভে জল আসে। সে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে।

এক সময় খেয়ে দেয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে নীলু। ঘুমিয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে নীলু টের পেল বাতাসের বেগটা যেন ক্রমে বাড়ছে আর সেই সঙ্গে বৃষ্টিটাও। এত বৃষ্টি কোথায় ছিল কে জানে। বৃষ্টি হবার কি আর সময় ছিল না রে, বাপু ? তবু তার মনে হল সকালে উঠে সে নবোদিত সূর্যের প্রসন্ন মুখ দেখবে। সূর্য তার কাছে সকল বিশ্বাসের প্রতীক। পৃথিবী এমনভাবে রসাতলে যাবে না।

নীলু কখন ঘুমিয়ে গেল ভাবতে ভাবতে। সারারাত আর তার কোন চেতনা রইল না। সে জানতেও পারল না, ঐ সারারাতে বিধাতা আর চার্চিল মিলে মানুষকে কি শাস্তি দেবার পরিকল্পনা করে

সকাল যে হয়েছে, তা মায়ের ডাকেই নীলু বুঝতে পারল। চোখ মেলে দেখে, বাইরে প্রবল বৃষ্টির সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড় বইছে। মনটা তার

হতাশার অন্ধকারে ডুবে গেল সূর্যের মুখ না দেখতে পেয়ে। সে ভেবে নিল প্রলয়কাল বুঝি আসন্ন।

মুখহাত ধুয়ে খেয়ে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে দেখে, রাস্তায় কোথাও লোক-জনের চিহ্নমাত্র নেই। দোকানঘরের দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে দেখে, ক্যানেলের জল প্রায় পাড় ছুঁয়েছে। আর একটু হলেই পাড় ছাপিয়ে যাবে জল। চারদিকে চেয়ে দেখে জল থই থই করছে সাদা হয়ে, ক্যানেলের পাড়টাই যা জেগে আছে।

হঠাৎ গতকালের রাসুর কথাটা তার মনে পড়ল। সে আপনমনে বলে ওঠে—এই তো, বন্যা এসে গেছে, চারদিকে জল ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু তার মজা না হয়ে কেমন যেন ভয় হতে লাগল। বন্যার জল যদি ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়? তখন তারা যাবে কোথায়? এখন তাহলে উপায়?

একটানা ঝড়ের প্রবল শোঁ শোঁ শব্দ বয়ে চলেছে। দশহাত দূরের লোক কি বলছে তা শোনা যায় না।

পেছন থেকে রাসুর ঠ্যালা খেয়ে মুখ ঘুরিয়ে দেখে রাসু বলছে—কিরে, এত কাছ থেকে ডাকছি তোকে, শুনতে পাচ্ছিস না? দেখবি আয়, কত বড় একটা শোল মাছ ধরেছি। পুকুরের পাড়ে লাফাচ্ছিল, ধরে ফেলেছি দু'হাতে। বোধ হয় মাঠ থেকে উঠে এসেছে।

নীলু চীৎকার করে বলে ওঠে—তাহলে বন্যা এসে গেছে, না রে? মাঠের মাছ চলে এসেছে বলছিস যখন—

—না, না বন্যা কেন হবে? রাসু বাধা দিয়ে বলে—বেশী বৃষ্টি হলে অমন বন্যার মত হয়ে যায়। চল, মাছটা দেখবি না?

তাড়াতাড়ি নীলু রান্নাঘরে এসে দেখে, হ্যাঁ মস্তবড় শোলমাছই বটে। রমলা রাসুকে দেখে অপ্রসন্ন মুখে বলে ওঠেন—কোত্থেকে মাছ ধরে আনলি। এমনই বৃষ্টি-বাদলার দিন। এখন একে তৈরী করতে হবে।

নীলু মার কথা শুনে অবাক হয়: ভাবে—মা-টা যেন কি! বৃষ্টির

দিন বলে কেউ মাছ খাবে না, নাকি ? রাসু একা অতবড় মাছটা ধরল, মা কোথায় খুশী হবে, না, উল্টো।

সময়ের কোন আন্দাজ নেই কারোর। দোকানঘরে একটা দেওয়াল ঘড়ি আছে। সেখানে গিয়ে সময় না দেখে এলে সময় বোঝা ভার। বাইরের দিকে চেয়ে নীলু বুঝতে পারে. বৃষ্টি কিন্তু আগের মত অত বেশী হচ্ছে না। অবশ্য যা হচ্ছে তাও কম না। কিন্তু প্রবল ঝড় বইছে।

বাড়ীর সামনে ক্যানেলের পাড়ের আদ্যিকালের শিরীষ গাছটার দিকে তাকায় নীলু। গাছটা যেন পা-টা মাটিতে স্থির রেখে কোন বাজনার তালে তালে নাচছে। পুকুরপাড়ের নারকেল গাছগুলোকে দেখে ভারী মজা লাগে তার। নীলুর মনে হয়, গাছগুলো যেন মাটিতে মাথা ঠেকাবার দুরূহ কসরত করে চলেছে। ধনুকের মত তাদের শরীরটা বেঁকে যাচ্ছে, আবার সোজা হয়ে যাচ্ছে।

দৃষ্টি ফেরায় সে ক্যানেলের জলের দিকে। জলে যেন সাগরের উত্তাল ঢেউ। হঠাৎ নীলু দেখতে পায়, একটা কাক মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। সে বোঝে. প্রবল ঝড়ে বেচারীর গাছের আস্তানা গেছে উড়ে। ডানায় লেগেছে জলের ঝাপটা, ডানা ভিজে গেছে। তাই অন্য কোথাও উড়ে যেতে চেয়েও প্রবল ঝড়ের মধ্যে তাল সামলাতে পারে নি। ঝড়ের ঝাপটায় মরে পড়ে গেছে, বেচারা।

ওটা যে মরে গেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবু বাতাসের দোলায় তার ভেজা পালকে ঢেউ খেলে যায়, ডানায় কাঁপন লাগে, শরীরটা কুঁকড়ে যায় আবার ফুলে ওঠে। কাকটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে নীলুর মনে হয়, কাকটা বুঝি মরে নি, মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছে। বৃষ্টির শীতলতা আর মৃত্যুর শীতলতার সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে গিয়ে ওর শরীরটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। মুখ ফুটে নীলু বলে ফেলে—আহা রে, বেচারা।

হঠাৎ নীলুর হাত পা যেন অসাড় হয়ে আসে। তার মনে হয়, যদি এই আশ্রয় ঝড়ে উড়ে যায় আর তাকেও ঐ অসহায় কাকের মত

অন্য কোন নিরাপদ আস্তানায় যাবার জন্য এই প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পথে নামতে হয়, তাহলে তার অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? কথাটা ভাবতেই ঐ কাকের মতই নীলুর সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

মনের এই অসহায় ভাবনাটাকে দূর করার জন্য সে দোকানঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। সেখানে ফরাসের উপব বসে বাবা, কৃপামামা ও পতিত জেঠা কথা বলছিলেন। বাবা ও কৃপামামা চা-মুড়ি খাচ্ছিলেন।

শংকরীপ্রসাদ একবার বাইরের দিকে চেয়ে চিন্তিত মুখে বললেন—কান্তি দা বলেন, কলির শেষে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই সময় বুঝি আসন্ন! কলি বোধ হয় শেষ হয়ে এলো কৃপাসিন্ধু।

কৃপামামা স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সুরে বলেন—পৃথিবীটা বুঝি অতটুকু জায়গা? এ ঝড় বৃষ্টি এখন বুঝি সারা পৃথিবী জুড়ে হচ্ছে? পৃথিবীর কথা বাদ দিন, এই মুহূর্তে ভারতবর্ষেরই কত জায়গায় খট্‌খটে রোদ ঝরছে। তবে হ্যাঁ মনে হচ্ছে, এখানে একটা খণ্ডপ্রলয় হবে। কোলকাতায় থাকলে আলীপুর হাওয়া অফিসের খবরে ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস কিছু জানা যেত।

শংকরীপ্রসাদ বলেন—খবরের কাগজেও ঝড় বৃষ্টির সংবাদ থাকে। কিন্তু খেজুরী থানা স্বাধীন হয়ে গিয়ে ডাকঘর তো উঠে গেছে। তাই কাগজ আর পাই কোথা? কেই বা খবর পাবে? জানবই বা কার কাছে? কিন্তু ঝড় এভাবে বেড়ে চললে এখানে থাকা তো নিরাপদ নয়।

কৃপামামা সান্ত্বনার সুরে বলেন—চিন্তার কথা বটে। বাড়ীর সামনে ক্যানেল, তার ওপারে আবার মাইল দুয়েক ফাঁকা ধানের মাঠ। তাই এ ঘরে বাতাসের দাপাদাপিটা বেশী মনে হচ্ছে। পাড়ার ভেতরে কারোর বাড়ীতে যেতে হতে পারে। যাদের বাড়ীর সামনে বাঁশের বন বা ঘন গাছপালা রয়েছে সেখানে ঝড় নিশ্চয়ই কম মনে হবে।

পতিত জেঠা এই সময় বলে ওঠেন—যেতে হয় তোমরা যাও, বাপু আমার এখন যাওয়ার সময়। অবস্থা যা দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে

এখানে থাকলেই যেতে পারব। মিছে মিছি বাইরে বেরিয়ে কষ্ট ভোগ করি কেন?

নীলু আশ্চর্য হয় পতিত জেঠার কথা শুনে। হ্যাঁ, সাহস আছে বটে পতিত জেঠার! এতবড় বিরাট বাড়ীতে এ সময় একা থাকা কি চাট্টিখানি কথা?

বেলা বারোটার মধ্যে তুপুরের খাওয়া হয়ে গেল। রাস্থুর ধরা শোলমাছের ঝোল দিয়ে খেতে বেশ ভাল লাগল নীলুর। অন্যদিনের চেয়ে সে আজ যেন বেশী খেল। মা কিন্তু খেতে দেবার সময় উল্টো কথাই বললেন—রাস্থু শোলটা না ধরলে আজ নিরামিষ খেতে হত। রান্নার বিশেষ কিছু ছিল না।

সকলেই যেন একটু বেশী বেশী খেল, এক শংকরীপ্রসাদ ছাড়া। নীলু চেয়ে দেখে, বাবা যেন বেশ ভয় পেয়েছেন। তাঁর চোখে স্পষ্টতঃ দারুণ চিন্তার ছাপ। তিনি যেন খুব অনিচ্ছাসত্ত্বে খাচ্ছিলেন।

সকলের খাওয়া হয়ে গেলে মা দোকানঘরে পতিতপাবন জেঠাকে তুধ আর মুড়ি দিয়ে এলেন। তিনি ভাত খাবেন না বলে আগেই বলে দিয়েছিলেন। তারপর মা মানদা বুড়িকে ডেকে রান্নাঘরে খেতে বসলেন।

নীলু এসে বাবার সঙ্গে লেপ মুড়ি দিয়ে খাটে শুয়ে পড়ল। অন্য ঘরে রাস্থু কৃপামামার সঙ্গে শুয়েছে। নীলু লেপের ফাঁক দিয়ে আড় চোখে চেয়ে দেখে বাবার চোখ খোলা। তিনি কান্নার স্থরে কোন্ এক অদৃশ্য দেবতার কাছে বিড় বিড় করে কি প্রার্থনা জানিয়ে চলেছেন।

সহসা ঝড়ের বেগ যেন দ্বিগুণ, তিনগুণ বা চতুর্গুণ হয়ে গেল। মহাকাল যেন অট্টহাস্যে হাঃ হাঃ করে প্রলয়নৃত্য স্থরু করে দিল। প্রবল ঝড়ে গোটা বাড়ীটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠল। খড়ের চালে মট্ মট্ শব্দ হতে লাগল। ঝড় বাড়ছে, গোটা ঘরটা যেন তালে তুলছে।

শংকরীপ্রসাদ আচম্বিতে একপাশে লেপ সরিয়ে রেখে হাঁটু মুড়ে বিছানায় বসে নীলুকে বললেন—বাবা রে, আজ বোধ হয় মহাপ্রলয় স্থরু হয়ে গেল! আজ বোধ হয় পৃথিবীর শেষ দিন, আমাদেরও। তার

আগে বিশ্বপিতার কাছে প্রার্থনা করি আয়।

বাবা যেন কিরকম অসংলগ্ন প্রলাপ বকে চলেছেন। তিনি শিশুর মত আকুল হয়ে কাঁদছেন। বাবা যে কাঁদতে পারেন, এ ধারণা নীলুর ছিল না। সে হকচকিয়ে যায়। মন্ত্রমুগ্ধের মত সেও কখন লেপ ছেড়ে বিছানার উপর হাঁটু মুড়ে বসে বাবার মত হাত জোড় করে স্তোত্রপাঠ সুরু করে বাবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে :—

'ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী।
ভানু শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ ॥'

আজ মহাকাল বুঝি সত্যিই রুদ্র। কোন স্তবস্তুতিতে তিনি আজ শান্ত হবেন বলে মনে হয় না। কান্তি জেঠা বলেছিলেন, নীলুর মনে পড়ে, মানুষের পাপের বোঝা পূর্ণ হলে কলির শেষ। আর কলির শেষে মহাপ্রলয়, মহাপ্লাবন। তারপর আবার পৃথিবী সেই প্রাণ সৃষ্টির মুহূর্তে ফিরে আসবে। আবার সেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এভাবে যুগে যুগে, কালে কালে পৃথিবী ধ্বংস হচ্ছে আবার নতুন করে জাগছে।

জীবনের কোন পরমলগ্নে ক্ষুদ্র মানুষের মনে চরম সত্যের ক্ষণিক আলোর ঝলকানি খেলে যায়। সে মুহূর্তটা সচরাচর আসে না, কারোর জীবনে আসেই না। সেই মুহূর্তে যা তার উপলব্ধি হয় তা সঠিক এবং অভ্রান্ত। ঠিক ঐ মুহূর্তে ছোট্ট নীলুর এক বিরাট উপলব্ধি হল যেন।

সে আপনমনে যেন বলে যেত লাগল—কিন্তু মানুষ কি এমন বা এত পাপ করেছে যে পৃথিবী আজ শেষ হবে?

উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গেই সেদিন তার ভেতর থেকেই কে যেন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুরে দিয়েছিল—হ্যাঁ, করেছেই তো। না হলে সারা পৃথিবীতে মহাযুদ্ধ সুরু হল কেন? কেন থামছে না? তুমি তো শুনেছ আগেও এরকম একবার হয়ে গেছে। তারপর আবার? কত পাপ করলে একটা যুদ্ধ হয় জানো তা? ইংরেজ কত পাপ করেছে, হিটলার কত পাপ করেছে? তোমরাও কি পাপ কর নি?

নীলু যেন আর্তস্বরে বলে ওঠে মনে মনে—না, না, বিশ্বাস করো আমরা কোন পাপ করি নি।

—কর নি? আবার সেই কণ্ঠস্বর—তবে তোমাদের লোক তোমাদেরই গুলি করে মারছে কেন? ভ্রাতৃহত্যার পাপ, বন্ধুহত্যার পাপ, গুরুহত্যার পাপ—কত পাপ করেছ, করছ তোমরা সকলে? আর কত পাপ করতে চাও তোমরা? থাক্, তার আর দরকার নেই, তার আগে আমিই তোমাদের শেষ করে মুক্তি দিয়ে যাই।

ঐ চরম উপলব্ধির ক্ষণে নীলু মনে মনে যা স্বীকার করেছিল তা হলো—এ আমার পাপ, এ তোমার পাপ, এ পাপ তোমার আমার—সকলের।

সেদিনের সেই উপলব্ধির কথা আজও নীলাদ্রির মাঝে মাঝে মনে পড়ে। তখন সে একটু হাসে আর মহাকালের উদ্দেশ্যে বলে—মহাকাল তুমি আমায় সেদিন শুধু ভয় দেখিয়েছিলে, তখনই শেষ করতে চাও নি তুমি। তুমি ভয় দেখিয়েছিলে এইজন্য যাতে আমরা আর পাপ না করি। কিন্তু তোমার পরিহাস কে বোঝে? আজ ভিয়েতনামে পাপ চলছে, বাংলাদেশে কতবড় পাপের অনুষ্ঠান হয়ে গেল। নিজের দেশে কত যে পাপ চলছে তাকে শুধু পাপ বললে কিছুই বলা হয় না। পাপের বাপের বাপ বললে তবু কিছুটা বলা হয়। তবে আমার আর কোন সন্দেহ নেই, এবারে তুমি সত্যসত্যই আসছ।

—এই শতাব্দীর শেষে তুমি নিশ্চয়ই আসছ সেই তৃতীয় মহাযুদ্ধের ভেতর দিয়ে। পতিতপাবন জেঠা সেদিন যেমন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, আমরাও তেমনি সমস্ত রকমের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র মজুত করে প্রস্তুত হয়েই আছি মৃত্যুর জন্যে। এখন শুধু তোমার একটিমাত্র ইঙ্গিতের অপেক্ষা!

—একবার ক্ষমা করেছ, দু'বার ক্ষমা করেছ, তৃতীয়বারে আর নয়। বার বার তিনবার! তোমার আগমন দেখতে হয়ত এ পৃথিবীতে ততদিন আমি থাকব না। তাই তার আগে লিখে যাই তোমার আগমন বারতা এই মহাজীবনের গানে।

—মহাকাল, আবার যদি কোন যুগ আসে, পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন জাগে, আবার যেন আসতে পারি, এ আশ্বাস তুমি আমায় দিও। যত পাপই থাক্ তবু এই রূপরস গন্ধভরা মাকে ফেলে আমি কোন স্বর্গে যেতে চাই না। পাপ করবো, তার প্রায়শ্চিত্ত কারো, তবু আবার আসবো, আবার, আবার······।

সহসা কৃপামামা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে নীলুদের ঘরে ঢুকে বলে উঠলেন—ছোড়্দা সর্বনাশ হয়েছে, দোকানঘরের টালির চালের অনেক টালি ঝড়ের এক দম্‌কায় উড়ে গেছে। আর পর পর খই, মুড়ির মত উড়ে যাচ্ছে। কি করবো? টালি উড়ে গেলে উপরের ছাদ নষ্ট হতে কতক্ষণ?

শংকরীপ্রসাদ কোন কথা বলছেন না দেখে কৃপামামা থেমে যান। নীলু দেখে, বাবা শুধু ভাবলেশহীন মুখে মামার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন

কৃপামামা তখন তাঁকে ঠ্যালা দিয়ে বলেন—ও ছোড়্দা উঠুন, এভাবে বসে থাকবেন না। বাইরে দেখবেন চলুন।

শংকরীপ্রসাদ যেন চেতনা ফিরে পেয়ে বলেন—এ্যাঁ, হ্যাঁ চলো।

নীলুও এলো বাবার পেছন পেছন। রাসু, রমলা সকলে এসে দাঁড়িয়েছেন বাইরের বারান্দায়। দোকানঘরের দিকে যাওয়া যাচ্ছে না একেবারে। যেভাবে টালি উড়ছে তাতে ওদিকে যাওয়া বিপজ্জনক।

রমলা সহসা চীৎকার করে বলে ওঠেন—হায়, হায় অতকালের অতবড় শিরীষ গাছটা উল্‌টে পড়ে আছে! শ্বশুরমশাই-এর কাছে শুনেছি তিনিও তাঁর ছেলেবেলায় এ গাছ বড়সড়ই দেখেছেন।

সকলের দৃষ্টি এবার শিরীষ গাছটার দিকে পড়ে। নীলু দেখে শিউরে উঠল। ঝড়ের কি বেগ! কি ক্ষমতা! অতবড় মোটা শেকড় যে গাছের, সে গাছও মুলসুদ্ধ উপ্‌ড়ে যেতে পারে? কি মোটা মোটা শেকড়। শেকড়গুলোই যেন এক-একটা গাছের গুঁড়ি।

শংকরীপ্রসাদ ভীতিবিহবল কণ্ঠে অতিপ্রাকৃত সুরে কোন্ দূর থেকে যেন বলে উঠলেন—কৃপা, বিপদ যখন এসে গেছে তখন আর এভাবে

এখানে থাকা চলে না। চলো. পাড়ার ভেতরে নিরাপদ-জায়গায় কোথাও যাই। ভেতরের দিকে বাতাস একটু কম হবে।

রমলা আকুল হয়ে বলে ওঠেন—আমরা সব যাব কিন্তু এত জিনিস, দোকানের মালপত্র, ধান চাল, এসবের কি হবে ?

শংকরীপ্রসাদ অসহায় ভঙ্গীতে বলেন—নিজেদের কি হবে সেটাই আগে ভাবো, ছোট-বৌ। কি হচ্ছে, আর কি হতে যাচ্ছে সেটাই আগে ভাবো। নিজেরা বাঁচলে তো জিনিসের কথা। চলো, চলো, আর দেরী নয়! গায়ে দেবার কিছু কাপড় অন্ততঃ কোন কিছুতে জড়িয়ে নাও। আর দেরী নয়, বেরিয়ে পড়ি চলো।

নীলু বাবার কথাবার্তায় আশ্চর্য না হয়ে পারে না। এই মানুষ একটু আগে কত যেন ভেঙ্গে পড়েছিলেন আর এখন সমূহ বিপদের মধ্যে তিনি কেমন যেন স্থিতধী, বিচারশীল এবং সাহসী হয়ে গেলেন। নীলু তার বাবার চরিত্রের এই সহনীয় দিকটা আরো বহুবার দেখেছে।

সকলে মোটামুটি তৈরী হয়ে নিল। বিশেষ তো সঙ্গে কিছু নেওয়া যাবে না। দু একটা মাদুর, সকলের একপ্রস্থ করে কাপড় চোপড়, এরকম যেগুলো না হলেই নয় সেগুলোই কেবল নেওয়া।

কোথায় যাওয়া যায় ? অবশেষে ঠিক হলো নাপিতদের বাড়ীতেই যাওয়া যাক। নাপিতদের বাড়ী মানে কালাদের বাড়ী। কালার সঙ্গে দীর্ঘ তিন চার দিনের পরে দেখা হবে ভেবে এত বিপদের মধ্যেও নীলুর আনন্দ হলো। কালাদের বাড়ীর চারদিকেই বাঁশবাগান এবং নানারকমের গাছ গাছড়ার ঝোপ। অতএব ওখানে বাতাস যে কম লাগবে সকলে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হল। কিন্তু, নীলু ভাবে, রাণীদের কি হলো, কে জানে ?

এমন সময় রমলা এসে বলেন—মানদা বুড়ী ঘর ছেড়ে কিছুতেই যাবে না বলছে। বলছে, এখানেই মরবে, মরতে তো একদিন হবে। কি মুশকিল ছাখো তো।

মায়ের কথায় বাবার হঠাৎ খেয়াল হয়; বলেন—আরে বকসীদাকে যে সঙ্গে নিতে হয়। ইস্ কি দুর্যোগ আর বিপদ ছাখো তিনি দোকান

ঘরে বসে রয়েছেন, তাঁর কথা কারোর মনে নেই। বিপদে মাথা ঠিক রাখা সত্যিই কঠিন কাজ।

শংকরীপ্রসাদ ও কৃপামামা খুব সাবধানে গেলেন দোকানঘরে। অবশ্য টালি তখন আর বেশী উড়ছিল না। প্রায় সবই উড়ে গেছে। ঘরের উপরে দোতলার মাটির ছাদ রয়েছে বলে এখনও ঘরটা টিকে আছে কিন্তু ছাদ চুইয়ে চুইয়ে জল পড়ছে। কিছু পরে তারা পতিত পাবনের হাত ধরে নিয়ে এলেন নীলুরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে।

পতিত জেঠা কাঁপতে কাঁপতে বলে যাচ্ছেন—শংকরী, নিজেকে নিয়ে আমার কোন চিন্তা নেই। আমি এখানেই থাকব ভাই। তোমরা আর দেরী করো না। এখনই বেরিয়ে যাও।

শংকরীপ্রসাদ বলেন—তা হয় না, দাদা। আপনাকে ছেড়ে আমরা যেতে পারি না।

এই সব তর্কবিতর্কে অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে দেখে কৃপামামা বুদ্ধি করে বলেন—ছোড়দা, আপনারা তো আগে চলুন। আপনাদের রেখে আসি। তারপর ফিরে এসে বুড়োবুড়ীকে নিয়ে যাব।

সকলে তাঁর কথায় সায় দেয়। রমলা মানদা বুড়ীকে এই কথা বলতে ঘরের ভেতরে গেলেন। কিছুপরে ফিরে এসে বললেন—বুড়ী সিঁড়ির নীচের চোরাকুঠিতে আশ্রয় নিয়েছে। তার ধারণা, ওটাই আগে পড়বে। অতএব তার মরণ তাড়াতাড়ি হবে। কি করি বলো তো?

শংকরীপ্রসাদ বলেন—থাক্ আপাততঃ। তারপর তো কৃপাসিন্ধু এসে এদের নিয়ে যাচ্ছেই।

পতিত জেঠা বললেন—শংকরী, ভাই, আমিও ঐ চোরা কুঠরীতে আশ্রয় নিই বরং। কৃপাসিন্ধু ভায়াকে আর বোধ হয় কষ্ট করে আসতে হবে না। তার আগেই বোধ হয় আমি ইষ্টনাম জপ করতে করতে সজ্ঞানে চলে যেতে পারব। তোমাদের সঙ্গে এই বোধ হয় আমার শেষ দেখা। এসো ভাই, আর দেরী করো না।

তাঁর কথায় সকলের চোখ সজল হয়ে ওঠে। শংকরীপ্রসাদ বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন—দাদা, যাওয়ার কথা কে বলতে পারে? সময় না

হলে শত চেষ্টাতেও কেউ যেতে পারে না। আমরা এই যে বেরিয়ে যাচ্ছি ঘর ছেড়ে, কে জানে, আমাদেরই কপালে বা কি লেখা আছে? ঠিক আছে, আপনি ওখানেই যান। ওখানে একটু গরমবোধ হবে আপনার। কৃপাসিন্ধু এই এলো বলো। চল কৃপাসিন্ধু।

এবারে নীলুদের সামনে এলে এক কঠিন কাজ। পথ বেশী নয় কিন্তু দুর্গম, দুস্তর। কালাদের বাড়ী বড় জোর দু' ফার্লং পথ কিন্তু বাইরে যা অবস্থা তাতে নীলুর মনে হল, ওর চেয়ে চীনের তুষারগলা পাহাড়ের উপর দিয়ে একমাইল হেঁটে যাওয়া বরং অনেক সহজ।

নীলু, রাসু পরস্পর দুজনে হাত ধরাধরি করে দাঁড়াল। রমলা নিয়েছেন একমাসের মালতীকে—মাদুরে জড়িয়ে বগলের মধ্যে চেপে। শংকরীপ্রসাদ বুলিকে কোলে নিয়েছেন। আর কৃপামামা কাপড়ের পুঁটলিটা নিয়েছেন।

ঘরে চার পাঁচখানা ছাতা আছে কিন্তু কোন ছাতা তাঁরা নিলেন না। ছাতা মাথায় দেবার প্রশ্নই আসে না। ঝড়ের বেগে মানুষই দাঁড়াতে পারছে না, তায় ছাতা তো কোন্ ছার! সকলে মাথায় কিছু কাপড় বা চট চাপিয়ে ঘর ছেড়ে পথে নামল আশ্রয়ের সন্ধানে। আর পেছনে ফেলে রেখে গেলেন দোকান, ঘরবাড়ী, সবকিছু।

পরে শংকরীপ্রসাদের এক হিসাবে নীলু জেনেছিল তখন দোকানে সেকালের দিনের অন্ততঃ বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকার মাল ছিল। এছাড়া গোলায় ছিল ব্যবসার দেড়শ মন চাল, শতিনেক মণ ধান ইত্যাদি। ঘর দোর সব কিছু মিলিয়ে সেদিনের পঞ্চাশ হাজার টাকার বিষয় সম্পত্তি ফেলে অনিশ্চিত আশ্রয়ের সন্ধানে পথে নামলেন শংকরীপ্রসাদ এবং তাঁর পরিবারবর্গ।

—+—

॥ ১৭ ॥

কিন্তু কোথায় পথ ? পুকুর আর পুকুরের পাড় জলে একাকার। জেগে রয়েছে শুধু পাড়ের গাছ বা ঢিবি ছ' একটা। সেগুলো নিত্যদিন দেখে দেখে সকলের অতি পরিচিত হয়ে গেছে। কেবলমাত্র সেইগুলো দেখে পথটা কোথায় ছিল তার নিশানা মেলে, যা নতুন আন্তকের পক্ষে সম্ভব নয়। এ যেন অন্ধকারে পথ চলা। গভীর রাতে মানুষ বিছানা থেকে উঠে অন্ধকার ঘরে যেমন জলের গেলাসে হাত বাড়ায় বা মেয়েরা ছোট মাথার কাঁটাটাও পর্যন্ত যেমন অনায়াসে অভ্যাসবশে খুঁজে নিতে পারে, নীলুদের পথচলা যেন হল অনেকটা সেইরকম ব্যাপার।

ঠিক ঘর ছেড়ে পূর্বমুহূর্তে গোয়ালঘরের দিকে দৃষ্টি ফেলে আকুল হয়ে রমলা বলে ওঠেন—ওগো, গরুগুলোর কি হবে গো ? বক্‌নাটা গাভীন ছিল। ওগুলোর দড়ির বাঁধন না হয় খুলে দিই। যেদিকে পারে চলে যাক্। গোয়ালে থাকলে দেওয়াল চাপা পড়ে মারা যাবে।

শংকরীপ্রসাদ বলে ওঠেন—সেটা কি ভাল হবে ছোট বৌ? কোথায় বলতে কোথায় চলে যাবে আবার ?

কৃপামামা বিরক্ত হয়ে বলেন—আপনাদের যতসব অযথা চিন্তা! নিজেরা কোথায় যাবেন তার ঠিক নেই, এখন গরু! কিরকম চাল্‌তার মত বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা সব গায়ে এসে বিঁধছে দেখতে পাচ্ছেন না ? এভাবে দাঁড়ান যায় ? চলুন চলুন। আর এক মুহূর্ত দেরী নয়।

গোয়ালঘরে বাঁধা গরুগুলো অসহায় চোখ মেলে সকলের দিকে তাকিয়ে আছে। অবলা জীব কথা বলতে পারে না। তবু নীরব চোখের ভাষায় যেন বলতে চায়—আমাদের ফেলে তোমরা কোথায় যাও ?

নীলু ওদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বাবা-মার উপর দৃষ্টি রাখে। দেখে সেই দুই জোড়া চোখেও গাই দুটির মত অসহায় চাহনী। আর সেই দু জোড়া চোখেও যেন নীরব ভাষায় বলছে—তোমাদের সঙ্গে নিয়ে কি করবো ? আমরা যে নিরাশ্রয়।

কৃপামামা এবার সত্যসত্যই ধমক দিয়ে বলেন—কি হচ্ছে কি ? এগোন।

কৃপামামার তিরস্কারে সকলে অবিলম্বে পথ চলতে সুরু করে। সবাই একেবারে জড়সড় হয়ে পথ চলছে। দলের কেউ কেউ পড়ে যাচ্ছে বা পড়তে পড়তে থেকে যাচ্ছে।

শংকরীপ্রসাদ সকলের উদ্দেশ্যে বলেন—সাবধান। পড়ে যাও ক্ষতি নেই কিন্তু ভুলে পুকুরে পড়ে যেও না যেন। নিশানা ধরে পথ চল সকলে।

কিন্তু পা কি ঠিক থাকে? ঝড়ের বেগে পা যেন মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠতে যায়। তার উপর বড় বড় জলের ফোঁটার আঘাত। আঘাতে আঘাতে সকলে অস্থির হয়ে ওঠে।

সহসা কৃপামামা পেছন থেকে চীৎকার করে ওঠেন—ও ছোড়দি, এ কি করেছ? তোমার মেয়ে যে মাতুরের খোল থেকে বেরিয়ে গেছে।

সকলে থম্‌কিয়ে পেছন ফিরে তাকায়। দেখে, এক সর্বনাশ কাণ্ড। রমলা মালতীকে মাতুরে জড়িয়ে বগলে চেপে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতির নির্দয় আক্রমনে তাঁর বোধ হয় বোধশক্তি ছিল না। মালতী যে কখন মাতুরের খোল থেকে বেরিয়ে গেছে তা তিনি টের পান নি। কৃপামামা মাটিতে পড়ার আগেই ধরে ফেলেছেন। না হলে মালতীর ঐখানেই শেষ গতি হয়ে যেত। মালতী কাঁদছে কিন্তু রমলা সে কান্নার শব্দ ত্ব'হাত আগে থেকেও শুনতে পাননি। এমনই প্রবল ঝড়।

ঐ ত্ব' ফার্লং পথ অতিকষ্টে তারা অতিক্রম করে এল। আসার পথে নীলু দেখল, রাণীদের বাড়ী হাটখোলা হয়ে রয়েছে, চালের খড় সব উড়ে গেছে, ঘরে কেউ নেই মনে হয়। ওরাও হয়ত কোন আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে গেছে। অবশেষে তারা এল কালাদের বাড়ীতে। সেখানে সবিস্ময়ে নীলু দেখে পাড়ার অর্দ্ধেকেরও বেশী লোক এসে জড় হয়েছে। কি মজা রাণীও এসে গেছে! তাদের বাড়ীর সকলেও এসে হাজির হয়েছে।

নীলু ছুটে গিয়ে রাণীর হাত ধরে। রাণী বলে—আমরা এই একটু আগে এসেছি।

নীলু এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বলে—দেখে এলাম, তোদের বাড়ীর চালে খড় নেই একটাও :

—কি দেখছিস রে, রাণী বলে।

নীলু বলে—কালাকে দেখছি না কেন রে।

রাণী বলে—ও কালা ? কালা এই তো ছিল। ওদের গোয়াল থেকে গরুটা দড়ি ছিঁড়ে এখনই পালাল। কালা ওটাকে ধরে আনতে বাইরে গেল এখনই এসে যাবে।

হঠাৎ প্রচণ্ড এক শব্দে সকলে চমকিয়ে ওঠে। নীলু প্রথমে ভাবল বুঝি বাজ পড়ল। সেই মুহূর্তে আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল, এ কদিনের বৃষ্টিতে একটাও কিন্তু বাজ পড়ে নি। কিন্তু পরক্ষনেই বুঝতে পারে ঐ বিকট শব্দটা বাজের নয়, কালাদের বাড়ীর পেছনের আদ্যিকালের তেঁতুল গাছটা চালের উপর আছড়িয়ে পড়েছে। গাছের ভারে একটা দেওয়াল কাত হয়ে পড়েছে। সবাই প্রাণভয়ে চাৎকার করতে করতে বেরিয়ে এল।

বিপদের তখন তো সুরু মাত্র। তারা কালাদের বাড়ীতে বোধ হয় পাঁচ-সাত মিনিট ছিল। ঐখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। তাহলে সকলে দেওয়াল চাপা পড়ে মারা যাবে। কালাদের বাড়ীতে আসার আগে পড়ে সাউদের বাড়ী। সকলে মিলে ঠিক করল, এখানেই যাওয়া যাক। ওটা মাটির বাড়ী হলেও বেশ মজবুত আর ভিতও বেশ উঁচু। সেখানে অবশ্য বাতাস বেশী লাগবে, কারণ ওর সামনে গাছপালা কম।

কেউ কেউ অবশ্য মিশ্রদের মাইতিদের পাকা বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নেবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু শংকরীপ্রসাদ সকলকে বোঝালেন—দুটো বাড়ীই এক মাইলের কাছাকাছি পথ। পথে পুকুর, ধানের মাঠ পড়বে। ওগুলো চেনা যাবে না। অতএব ও পথে যাওয়া মানে অবধারিত মৃত্যু। তার চেয়ে এখানেই থাকা ভালো। মৃত্যু যদি কপালে লেখা থাকে তবে আটকাবে কে ? রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে ?

সবাই অতএব সাউদের বাড়ীতে যাওয়াই স্থির করল। ঐ সময়

রমলা শুধু একবার আপশোষের স্বরে বললেন—আমাদের বাড়ীটা যদি পাকা হতো! আর মাসখানেক পরে পাকা বাড়ী ওঠার কথা ছিল।

কেউ তাঁর কথায় কান দিল না। সকলে সাউদের বাড়ীর দিকে বেরিয়ে পড়লেন। সামান্য পঞ্চাশ-ষাট হাত গেলেই ওদের বাড়ীতে যাওয়া যাবে। কিছুক্ষণের মধ্যে সকলে এসে সাউদের বাড়ীতে পৌছাল। বাড়ীর মধ্যে যে ঘরখানা মোটামুটি বেশ সুরক্ষিত সেখানে এসে সকলে আশ্রয় নিল। ঘরটা বেশ গরম বলে বোধ হল নীলুর বাতাসটাও বেশ কম লাগছে এখানে। সকলে মাদুর বা চাঁটি পেতে বসে পড়ল। ঘরের ভেতর একটা কেরোসিনের কুপী জ্বলছে। তখনও সন্ধ্যা হয়নি। তবু ঘরের ভেতরটা বেশ অন্ধকার। ঐটুকু কুপীর আলোতে সামান্যই অন্ধকার দূর হয়েছে।

এবারে পাড়ার কে কে এসেছে সকলে নিজেদের মধ্যে খোঁজ নিতে লাগল। দেখা গেল, পাড়ার দশ ঘরের মধ্যে পুলিনদের বাড়ীর কেউ আসে নি। এই সব বলতে বলতেই পুলীনদের বাড়ীর সকলে হুড়মুড় করে এসে হাজির হল সেখানে।

তারপর কে যেন বলে উঠল—এ বাড়ীর ছোটকর্তা, শ্রীহরিই যা নেই।

শ্রীহরির দাদা মুরারি বলে—ও তো খেজুরীর দিকে মাসখানেক আগে মাটি কাটতে গেছে। ভগবান জানে, তার কি হলো।

নীলু লক্ষ্য করে, শ্রীহরির যুবতী স্ত্রী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এমন সময় কালার দিদিমা ঘরে ঢুকেই চীৎকার করে বলে ওঠে—বাবারে, আমার কি হবে রে। গরুটা গোয়াল থেকে দড়ি ছিঁড়ে পালাল। কালাকে ধরে আনতে পাঠালাম। সে তো এখনও এল না। তোরা কেউ যা না রে, বাপ। কি হল রে—এ—এ—এ।

কালার দিদিমা আকুলস্বরে একটানা কেঁদে যায়। সকলের খেয়াল হয়, এতক্ষণ এখানে কালার দিদিমা ছিল না এবং কালা এখনও নেই। পাড়ার দুজন যুবক কালার দিদিমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—তুমি চিন্তা করো না, মাসী, কালা ধারে কাছেই কোথাও আছে। তুমি কান্নাকাটি করো না, আমরা যাচ্ছি, ওকে খুঁজে আনছি।

সেই প্রলয় দুর্যোগের মধ্যে দুজনে বেরিয়ে গেল। রমলা উৎকণ্ঠিত হয়ে বলেন—কৃপাসিন্ধু ওদের নিয়ে কখন ফিরতে পারবে কে জানে?

নীলুরা ভেজা কাপড় জামা ছেড়ে ফেলল। যেগুলো গায়ে ছিল সেগুলো খুব শুকনো বলা যায় না। তবু নীলুর মনে হলো ওগুলো গায়ে দিয়ে সে বেশ আরাম বোধ করছে। ঘরের ভেতরটাও বেশ গরম লাগছে এখন। ঐ দুজন লোক যে এখন কি ঠাণ্ডার মধ্যে পড়বে সে কথা ভাবতেই নীলুর গাটা যেন শিরশির করে উঠল। পরক্ষণে কালার কথা ভেবে তার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়।

রমলা একটু পরে কৃপামামাকে বলেন—ভাই কৃপা, তুই তো বুড়োবুড়ীদের আনতে যাবি। আসার সময় যদি মুড়ির টিনটা আনতে পারিস তো ভাল হয়, ভাই। না হলে সারারাত ছেলেগুলো খাবে কি? তাড়াতাড়িতে আসার সময় এ কথা খেয়াল হয়নি।

কৃপামামা ঘাড় নাড়লেন। একটু পরে তিনিও দুর্যোগ উপেক্ষা করে বেরিয়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে এখন সকলে টুকরো কথাবার্তা বলছে। নীলু দেখে, সকলের কথাবার্তার মধ্যে এখন দুশ্চিন্তার ছাপ যেন আর নেই। একসঙ্গে থাকার জন্য সকলের সাহস যেন ফিরে এসেছে।

এমন সময় কে যেন বলে উঠল আমরা একটা ঘরে সকলে রয়েছি। যদি একটা দেওয়াল পড়ে তো গোটা পাড়াটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

অমনি সকলে হাঁ হাঁ করে ওঠে। লোকটার এই অমঙ্গলে, অলুক্ষণে কথার জন্য সকলে তাকে তিরস্কার করে। কিন্তু লোকটি যে কিছুটা ভবিষ্যত বাণী করেছিল তা বোঝা গেল যখন সামনের একটা ঘরের দেওয়াল সশব্দে পড়ে গেল। ঐ শব্দে সকলের সমস্ত কথা এক নিমেষে বন্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ কারোর মুখে আর কোন কথা ফোটে না।

একটু পরে শংকরীপ্রসাদ বলে উঠলেন সকলে একমনে ভগবানকে ডাক। তাঁর ইচ্ছাই আজ পুর্ণ হবে। মৃত্যু যদি আজ আমাদের সকলের কপালে লেখা থাকে তাহলে তা রোধ করার সাধ্য কারোর নেই। অতএব সে চিন্তা না করে তাঁকে ডাক।

সামনের ঘরের দেওয়ালটা পড়ে যাওয়ার জন্য বৃষ্টির জলের ছিটা কিছুটা এখন ঘরের মধ্যে ঢুকছে। রাণীর বাবা উঠে দরজাটা বন্ধ করতে যাবে এমন সময় সেই দুজন লোক, যারা কালাকে খুঁজতে গিয়েছিল, দরজার সামনে এসে গেল। লোক দুজন পুরো ভিজে গেছে। দারুণ ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপছে। তাদের সঙ্গে কালাকে দেখতে না পেয়ে সকলে বুঝল, কালাকে তারা খুঁজে পায় নি। তাদের একজন অতিকষ্টে বলে—কালাকে অনেক খুঁজলাম, পেলাম না। আর বেশীক্ষণ বাইরে থাকা গেল না, এত ঠাণ্ডা।

তার কথা শেষ হবার আগেই কালার দিদিমা চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। বুড়ী দরজার দিকে ছুটে যেতে যেতে বলে—আমি যাব। না পাই মরব, তবু খুঁজে দেখব। ওরে কালারে এ—হে-হে।

কয়েকজন এসে বুড়ীকে ধরে ফেলে, নিরস্ত করে। তারা নানা-রকমে বুড়ীকে বুঝাতে থাকে—এ সময় যেও না মাসী। খুঁজে তো পাবে না, বেঘোরে প্রাণ দেবে।

বুড়ী হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে—আমার বেঁচে থেকে কি লাভ রে। ওরে কালারে, কতটুকু বয়সে তোর বাপ মা মারা গেল, আমি কত কষ্ট করে তোকে মানুষ করলাম রে।

বুড়ী আর কথা বলতে পারে না। ব্যথার কুণ্ডলী দলা পাকিয়ে উঠে তার কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিল। বুড়ী মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। কয়েকজন বুড়ীর পরিচর্যায় লেগে যায়।

ঘরের মধ্যে নীলু সব লক্ষ্য করে যাচ্ছে। সে যেন নাটক দেখছে। প্রতি মুহূর্তে সে যেন দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখে যাচ্ছিল। বুড়ী মূর্চ্ছিত, ওদিকে শ্রীহরির বৌ কাঁদছে। ছোট একটা ঘরে গাদাগাদি করে এতগুলো লোক। ঘরের মধ্যে স্তিমিত আলোর রেখা যেন প্রেত-লোকের ছায়া ফেলে চলেছে। কালা যে মরে যেতে পারে, এ ভাবনা এতক্ষণে নীলুকে পেয়ে বসল। কালার জন্য তার বুকটা টন্‌টনিয়ে ওঠে।

পরক্ষণে তার মনে হল দেওয়াল চাপা পড়ে সেও মরে যেতে পারে।

তাহলে আর বাবা, মা, রাসু, রাণী এদের কাউকে আর কোনদিন সে দেখতে পাবে না। ক্রমে তার দৃঢ় ধারণা হয়, নিশ্চিত মৃত্যু লেখা রয়েছে তাদের কপালে। সে ফিরে ফিরে আপন প্রিয়জনদের যেন শেষবারের মত দেখে নিতে থাকে। এসব ভাবতে ভাবতে সে এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে, রাণী যে তাকে ডাকছে সে বুঝতেই পারে নি।

—এ্যাই নীলু, সরে বোস্, রাণী বলছে তাকে - তোর পায়ের কাছে জল, দেখতে পাচ্ছিস না ?

নীলু সরে বসে রাণীর কথায়। সকলেই সিক্ত শরীরে ঘরে ঢুকেছে। শরীর ও কাপড়ের জল এখন ঘরময় ছড়াচ্ছে। নীলু রাণীর দিকে আরো সরে আসে। তার শরীরে শরীর লাগিয়ে ঘন হয়ে বসে। নীলু রাণীর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চাপ দিতে থাকে। রাণী কৌতুহলী হয়ে বলে--কি ?

নীলু লজ্জা পায় নিজের ভাবাবেগে। রাণীর হাত ছেড়ে দিয়ে বলে – কিছু না রে।

ওদিকে কালার দিদিমার জ্ঞান ফিরে এসেছে। পুনরায় সে চীৎকার করে কাঁদতে সুরু করেছে। ঐ একই কথা -- কালারে, ওরে কালারে— এ—এ – হেঁ—হে— ।

বুড়ী উঠে পড়তে চায়। কয়েকজন তাকে ধরে শুইয়ে রাখে। অনেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে – মাসী, চিন্তা করো না। কালা নিশ্চয়ই কোথাও আশ্রয় নিয়েছে। হয়ত গরুটা আচার্যপাড়ার দিকে গিয়েছিল। কালা হয়ত সেখানে গিয়ে আর ফিরতে পাবে নি। সে ঠিক ঐ আচার্য পাড়াতেই কারোর বাড়ীতে রয়েছে।

বুড়ী কাঁদতে কাঁদতে প্রবলবেগে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে – না, না, তোরা সব মিছে কথা বলছিস। আমার মন বলছে, সে আর নেই। ওরে কালা—আ, আ— । বুড়ীমর্মভেদী আর্তনাদ করে পুনরায় মুর্চ্ছিত হয়ে পড়ে।

সকলে দুর্যোগ ও বিপদের কথা ভুলে বুড়ীর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ, ঘরের মধ্যে থেকেও সে কথা টের

পাওয়া যায়। কালার দিদিমা আর উঠছে না, শুয়েই আছে। মাঝে মাঝে অবশ্য নিরুদ্ধ আবেগে 'কালারে—' বলে চীৎকার করে উঠছে। আবার অসহনীয় যন্ত্রণায় তার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

নীলুর মনে হয় তারা যেন সকলে প্রেতলোকে বসে রয়েছে। টুকরো টুকরো কথার মাঝে মাঝে কালার দিদিমার চীৎকার আর শ্রীহরির বৌ-এর ফোঁপানি, সবকিছু মিলিয়ে যেন এক অতিপ্রাকৃত জগতের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। নীলুর মনে হয় সেই জগতে যেতে দেরীও নেই, শুধু একটা মাটির দেওয়াল পড়ারই যা অপেক্ষা।

রমলা চিন্তিত হয়ে বলেন—কৃপাসিন্ধুরাতো এখনও এল না। কি কি যে হলো ওদের। হায় ভগবান, আর যে পারি না।

শংকরীপ্রসাদ অসহায় ভঙ্গীতে বলেন—কি আর এখন করবো বলো ? সবই ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে বসে আছি।

সহসা রমলা উৎকর্ণ হয়ে কোন শব্দ যেন শুনতে চাইলেন। একটু পরে তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন—কে যেন বাইরে ডাকছে মনে হচ্ছে গো।

সকলে এবার কান পেতে বাইরে থেকে কোন শব্দ আসছে কিনা শোনার চেষ্টা করে। কানে ভেসে আসে বাইরে প্রবল ঝড়ের একটানা শব্দ। ঝড়ে দরজার পাল্লার খট, খট, খটাখট শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। সামনের ঘরের দেওয়াল পড়ে যাওয়ার পর থেকেই বাতাসে দরজার পাল্লা নড়েই যাচ্ছে। কিন্তু কারোর গলার স্বর তো শোনা যাচ্ছে না। সকলে তাই-ই বলল।

রমলা কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বলেন—না, কৃপাই ডাকছে। তোমরা দরজা খোল, না হয়, নাই-ই হবে। খুলতে কি দোষ ?

একজন উঠে দরজা খুলতেই চরম নাটকীয় দৃশ্যের অবতারনা হল। কৃপামামা, মানদা বুড়ী আর পতিতপাবন জেঠা পরপর আছড়িয়ে ঘরের ভেতরে পড়ে গেলেন। কৃপামামার কোমরে একটা ধুতি লম্বা করে বাঁধা। তাতে বাঁধা রয়েছে মানদা বুড়ী আর পতিতপাবন। দরজা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হল।

কিন্তু কৃপাসিন্ধুর যে কোন সাড়া নেই। রমলা তাঁর গায়ে হাত দিয়ে বলে উঠলেন—ও মা, কৃপা যে মুর্চ্ছা গেছে গো। ওর মুখে জল দিতে হবে।

কিন্তু কোথায় জল ? ঘরের মধ্যে পানীয় জলের কোন পাত্র নেই।

বিধাতার কি পরিহাস। বাইরে এত জল-বৃষ্টি কিন্তু ঘরের ভিতর মুর্চ্ছিত লোকের মুখে দেবার মত এক ফোঁটা জল নেই! রমলা শেষে দরজা খুলে বৃষ্টির মধ্যে আঁচল পেতে ধরেন। সেই আঁচল-নিংড়ানো জল তিনি কৃপামামার মুখে দিতে লাগলেন।

কিছুক্ষন পরে কৃপামামা চোখ মেলে চাইলেন। কাঁপতে কাঁপতে বললেন—উঃ, ছোড়দি ভীষণ শীত।

রমলা তাড়াতাড়ি তাঁকে একটা শুকনো কাপড় দিলেন পরতে। বুড়োবুড়ীকেও শুকনো কাপড় দেওয়া হল। আরো কিছু কিছু পরে তিনজনে সুস্থ হয়ে বসলেন। এখন আপাততঃ এক কালা ছাড়া আর কারোর জন্য দুশ্চিন্তা নেই। এবং সকলের কথাবার্তা থেকে মনে হচ্ছে, নিজেদের সরে যাওয়ায় সম্ভাবনার কথা আপাততঃ আর কেউ ভাবছে না এখন।

একটু পরে কৃপামামা যে ভয়ংকর কথা শোনালেন তা শুনতে শুনতে সকলে শিউরিয়ে উঠলেন। সকলে জানলেন বন্যা এসে গেছে এবং সে বন্যার জলের স্বাদ লোনা। সাগর থেকে যে বান এসেছে, সে বিষয়ে কারোর সন্দেহ রইল না। প্রবল ঘুর্ণিঝড়ে সাগরের জল উপছিয়ে বান এসেছে বলে কৃপামামা মন্তব্য করলেন।

শংকরীপ্রসাদ প্রশ্ন করেন—আমাদের বাড়ীর কি হাল তবে ?

তার উত্তরে কৃপামামা যা ঘটে গেছে তা বলতে লাগলেন। তাঁর কথায় যা দাঁড়ায়, তা হলো :—

আমি তো বেশ কষ্টে ঘরে ফিরে গেলাম। দরজা খোলা ছিল। বুড়োবুড়ী তেমনি চোরাকুঠরির মধ্যেই ছিল। গিয়ে দেখলাম দোকান ঘরের সব দেওয়াল ধ্বসে পড়েছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলাম। খুব ক্লান্ত লাগছিল। ভাবলাম একটু বিশ্রাম করি; পরেই যাব।

দোলনাটায় হেলান দিয়ে বসলাম। কখন যে ঘুমিয়ে গেছি, খেয়াল নেই। ঘুম ভেঙ্গে দেখি সন্ধ্যা হয়ে এসেছে প্রায়।

চেয়ে দেখি, ঘরের মেঝের চারদিকে জল! ভাবলাম, বাইরের বৃষ্টির জল জমে জমে দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকছে। কি ব্যাপার দেখার জন্য যেই দরজা খুললাম অমনি প্রবল জলের তোড়ে ভাসিয়ে দিল। বুঝতে বাকী রইল না যে, বন্যা এসে গেছে। দরজা না খুললে একটু পরে বন্যার জলের চাপে এমনিতেই দরজার পাল্লা খুলে যেত।

মুহূর্তে ঘরের মধ্যে হাঁটু-সমান জল হয়ে গেল। এ জল আরো বাড়লে মৃত্যু। চোরাকুঠরির মধ্যে জল ঢুকেছে। বুড়োবুড়ী বেরিয়ে এসে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঐ হাঁটুসমান জলের মধ্যে। তাদের দিকে চেয়ে মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। দড়িতে একটা ধুতি দেখতে পেলাম। কোন বাক্য ব্যয় না করে বুড়োবুড়ীকে একসঙ্গে সেই ধুতিতে বেঁধে একপ্রান্ত নিজের কোমরে বেঁধে নিলাম। তারপর জলের মধ্য দিয়ে কখনও হাঁটতে হাঁটতে কখনও বা ভাসতে ভাসতে এগোতে লাগলাম। পথের চিহ্ন বলতে গাছের মাথাগুলো। না হলে পথ আর পুকুর এক। কিন্তু এই ঘরটার নিশানা কিছুতেই পাচ্ছিলাম না।

বোধ হয় একই পথে আমরা অনেকবার ঘুরেছি, হেঁটেছি বা সাতরিয়েছি। মাত্র তো এইটুকুন পথ কিন্তু আমাদের পথের আর শেষ হচ্ছিল না। মাথায়, মুখে বৃষ্টির ফোঁটা, ঝড়ের ঝাপটা, তার উপর সারাশরীর ঠাণ্ডা জলে কাহিল। এর উপর, চোখে মুখে লোনা-জল ঢুকে যাচ্ছে। একেবারে যেন খাবি খাওয়ার অবস্থা। আমার অবস্থা তো কাহিল। তার চেয়ে বেশী বুড়োবুড়ী। চিন্তায় পড়লাম শেষে মান্নাদের উঁচু ভিটেটা চোখে পড়ল। আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম, তাহলে বাড়ী থেকে আমরা এতক্ষনে কয়েক হাত এসেছি, ঐ ভিটে একটু উঁচু বলে তখনও বন্যার জলে ডোবে নি। আপাততঃ সেইখানে এসে আমরা দাঁড়ালাম।

এ বাড়ী যে খুব বেশীদূরে নয় তাও বুঝতে পারছি কিন্তু কোথায়

কোন দিকে ? এইসব ভাবলাম বেশ কিছুক্ষণ। ওদিকে দেখি বন্যার জল বাড়ছে। একটু নীচে আমাদের পায়ের নীচে যে জল এসে দাঁড়াবে সে বিষয়ে সন্দেহ রইল না। কি করা যায় ভাবছি, এমন সময় একটা সরু আলোর রেখা চোখে পড়ল চারদিকের ঘন অন্ধকারের মধ্যে। তখন ধারণা হল এই বাড়ীর অবস্থানটা। মাঝে দুটো পুকুর পড়বে জানি। আন্দাজ করে দুই পুকুরের মাঝের রাস্তা ধরে এগোলাম। পথেও হেঁটেছি আবার পুকুরেও ভেসেছি।

এ বাড়ীর চোহদ্দি বেশ উঁচুই মনে হল। জল সবে লেগেছে। বাড়ীর ভিতে লাগে নি এখনও। কিন্তু জল বেশী বাড়তে থাকলে আমাদের এ ঘরেও জল ঢুকবে। এসে দরজা ধাক্কা দিচ্ছি, দিয়ে যাচ্ছি, ছোড়দি ছোড়দি বলে কত ডেকে যাচ্ছি কিন্তু দরজা খুলছে না।

ঘরের মধ্যে সামান্যতম শব্দও হচ্ছে না। সকলে রুদ্ধশ্বাসে কৃপামামার কথা শুনে যাচ্ছে। কৃপামামা একটু থামতেই রমলা বললে বাতাসে দরজায় অনবরতই তো শব্দ হচ্ছিল। তাই তোমার দরজায় ধাক্কা দেওয়া বোঝা যায় নি। কিন্তু তোমার ডাক আমি শুনতে পেয়েছিলাম!

শংকরীপ্রসাদ এই বিপদের মধ্যেও একটু রসিকতা করলেন রমলার সঙ্গে। বললেন—ওটা তোমার কাছে তোমার ভাই-এর ডাক ছিল। না হলে আমরাও তো কেউ না কেউ শুনতে পেতাম।

সবাই কিছুটা আশ্বস্ত হল। কিন্তু বন্যার জলের কথা ভেবে চিন্তাও বাড়ল দ্বিগুন। বন্যার জল দেওয়ালের গোড়ায় লাগলে দেওয়াল নির্ঘাৎ পড়ে যাবে সেটা ভেবে সকলে চিন্তিত হয়ে পড়ে।

এই সব কথাই সকলে বলাবলি করছিল। হঠাৎ পুলিনের বাবা বলে উঠল—যদি দেওয়াল পড়ে তাহলে আমরা তো সকলে শেষ। শেষ পর্যন্ত লোকে হয়ত দেখবে, যে দুজনের জন্য আমরা চিন্তা করছি তারাই বেঁচে রইল। আমরা মরে ভূত হয়ে তাই-ই দেখতে লাগলাম।

সকলে হেসে উঠল। ঘরের শ্বাসরোধকারী পরিবেশ অনেকটা যেন হালকা হয়ে উঠল সকলের হাসিতে।

নীলু ভাবছিল—যারা মৃত্যুর চিন্তায় বিহ্বল, মৃত্যু বলতে গেলে যাদের শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে তারা হাসতে পারে ? আশ্চর্য !

আরো অনেক বয়সে বুঝেছিল কথাটা। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে বিপদের সঙ্গে সহাবস্থান মানুষকে করতেই হবে। সর্বস্ব খোয়াবার ভয়, মানসম্ভ্রম হারানোর ভয়, প্রিয়জন হারাবার ভয়, এরকম আরো কত রকমের ভয় মানুষের থাকে যা মৃত্যুভয়ের চেয়ে কম নয়। অতএব মানুষ থাকবে, বিপদ থাকবে, ভয় থাকবে। মানুষ বিপদে পড়ে দিশা-হারা হবে। হলেও যেহেতু সে মানুষ তাই সে ওরই মধ্যে হাসবে, খেলবে, ভালোবাসবে, পৃথিবীর রূপ, রস ও গন্ধ উপভোগ করে যাবে। বিপদের মুখে পড়ে যে মানুষ ভয়ে-ভাবনায় অস্থির হয় সেই মানুষই আবার বিপদের মুখে ডবে গিয়ে রসিয়ে রসিয়ে বিপদের রূপ উপভোগ করে। তাই তো কবি-সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে ট্রেঞ্চের মধ্যে থেকেও, মেশিন-গান, উড়োজাহাজ আর বোমার বিকট, ভয়াল শব্দের মধ্যেও গান গায় যুদ্ধ নিয়ে কবিতা লেখে অথবা প্রণয়লিপি রচনা করে চলে প্রেমিকা বা পত্নীর উদ্দেশে।

রাত বাড়ছে বাইরে কিন্তু ঘরের ভেতরে রাত একই রকম। নীলু ও অন্যান্য ছেলেমেয়েরা ক্ষুধায় কাতর কিন্তু কেউ মুখে কিছু বলছে না। তবু মা বাবারা সে কথা বুঝতে পারে। কিন্তু নিরুপায় বলে ও নিয়ে তারাও কিছু বলছে না।

নীলু একটা কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। একটু পরেই নিদ্রাদেবী এসে তার সকল ক্ষুধাতৃষ্ণা ভয়-ভাবনার অনুভূতিটাকে মুছিয়ে দিয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে গেল। বাইরে যত প্রলয়ই চলুক, নীলুর আর তা বোঝার উপায় রইল না।

রাত কত কে জানে, হঠাৎ যেন নীলুর মনে হয় তার দমটা বুঝি বন্ধ হয়ে আসছে। সে প্রাণপনে চোখ মেলতে চাইছে, যেন পারছে না। অনেক চেষ্টার পর সে চোখ মেলে। দেখে তারই পাশে শুয়ে থাকা রাণীর একখানা হাত তার গলা বেষ্টন করে আছে। তারজন্যই তার

অমন শ্বাসকষ্ট বোধ হচ্ছিল। সে বুঝতে পারে, তার মুখটাও রাণীর ঠিক বুকের মাঝে।

নীলু অবাক হয়, রাণীর বুকটা কেমন যেন অসমতল আর বেশ নরম। একটু পরেই সে বুঝতে পারে, ওটা রাণীর দেহে বয়সের ছাপ কথাটা ভেবেই তার শরীরের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত হয়। সে মুখ সরিয়ে আনে। আস্তে আস্তে গলায় চেপে থাকা রাণীর হাতটাকে সরিয়ে দেয়। আবার ইচ্ছা হয়, মুখটাকে ঐ নরম জায়গায় রাখে কিন্তু কি এক লজ্জার অনুভূতি তাকে বাধা দেয়।

রাণীর গভীর প্রশ্বাসের শব্দে নীলু বুঝতে পারে রাণী ঘুমাচ্ছে। তার ইচ্ছা আবার প্রবল হয়। সে আবার মুখটাকে ঐ জায়গায় ধীরে ধীরে রাখে। এমন সময় রাণী কি এক অস্ফুট শব্দ করে পাশ ফিরে শোয়। সহসা এক নিদারুণ অপরাধবোধ নীলুকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সে সঙ্গে সঙ্গে সরে শোয়।

ঘরের ভেতরে কি হচ্ছে, বাইরে কি হচ্ছে সে বিষয়ে এতক্ষণ তার চেতনা ছিল না। রাণীর দেহের সান্নিধ্য থেকে সরে আসার পর সে চেতনা যেন তার ফিরে আসে। মনে হল, বাইরে ঝড়ের শব্দ যেন কিছুটা কম। নীলু চেয়ে দেখে, সে ছাড়া অন্যান্য ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে আছে। বড়দের সকলেই জেগে আছে, কালার দিদিমা ও শ্রীহরির বৌ ছাড়া। তারা শুয়ে পড়েছে। বোধহয় ঘুমিয়ে গেছে তারা।

রাণীর বাবার বুঝি খুব তামাকের নেশা হয়েছিল। হুঁকো কলকে তামাক এই ঘরেই আছে। আগুনও রয়েছে কিন্তু আগুন ধরাবে কিসে? ঘরের ছাদ থেকে বুঝি একটু দড়ি ঝুলছিল। তামাক ধরাবার জন্য রাণীর বাবা উঠে লাফ দিয়ে ঐ দড়িটা ছিঁড়তে চাইল। সকলে বিপদের আশংকা করে হাঁ-হাঁ করে চীৎকার করে উঠল। রাণীর বাবা নিরস্ত হল। সকলের চীৎকারে যারা ঘুমিয়েছিল তারা সকলেই প্রায় জেগে উঠল।

ঝড়ের আওয়াজ যেন আরো কম মনে হচ্ছে। সহসা যেন মনে হল বাইরে কেউ যেন কয়েকবার বেশ জোরে ডেকে উঠল! ডাকটা

যেন বহুদূর থেকে ভেসে এল কিন্তু খুব তীব্র সে ডাক। সবাই উৎকর্ণ হয়ে শুনল কিন্তু কিসের ডাক তা কেউ বুঝতে পারল না। কিন্তু তারপর থেকেই ঝড়ের বেগ মন্দীভূত হতে থাকল। বৃষ্টির আওয়াজ কমে এল। আরো পরে আকাশ পরিষ্কার হয়ে আলো দেখা যেতে লাগল যেন। সবাই বুঝল, ভোর হয়ে আসছে।

অবশেষে বাইরের সমস্ত প্রলয় গর্জন স্তব্ধ হল। তিমির রজনী প্রভাত হল। সকলে দরজা খুলে বাইরে এসে আনন্দ, বেদনা, দুঃখ, হতাশার অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে গেল। আনন্দ—সব থেমে গেছে! দুঃখ সব ভেসে গেছে!

সেদিন ছিল বুঝি বাং ১৯৪৯ সালের ৩০ শে আশ্বিন, শনিবার। সেই শনিবারের সকালটাকে নীলু কোনদিন ভুলতে পারবে না। তবে বর্ণনার ভাষাও তার জানা নেই। নীলু বাইরে চেয়ে দেখে, সে এক সীমাহীন সমুদ্র—চারদিকে জল, শুধু জল। গাছের ডগা আর ঘরের চালগুলোকে মনে হচ্ছে যেন ছোট ছোট দ্বীপ বা দ্বীপপুঞ্জ। কোন্টা ক্যানেল, কোনটা পুকুর আর কোন্টা ধানের মাঠ, তা আর বোঝার উপায় নেই। ঘরের ভগ্নস্তুপ আর গাছের নিশানাগুলো ছাড়া আর কোন কিছু আন্দাজ করা অসম্ভব!

আর সেদিনের সেই প্রভাতী সূর্য। এক কথায় অপরূপ—লাল, প্রশান্ত। আর সেই প্রভাতী নির্মেঘ আকাশ। তার বুকে যে আগের দিনও এত ঝড় জল বয়ে গেছে, তা বিশ্বাস করা যায় না। আকাশ নির্মল, নীল। একখণ্ড মেঘের টুকরোও সে আকাশে নেই।

সব কিছু মিলিয়ে নীলুর মনে হয়েছিল, যে বিশ্বসৃষ্টির কথা সে শুনেছে, তার প্রথম লগ্নটি বোধ হয় এই রকমই ছিল। পৃথিবীর বুকে সীমাহীন জলধি, উপরে অনন্ত দিগন্ত প্রসারিত আকাশ আর সেই আকাশে অক্ষয় দ্যুতিমান, পৃথিবীতে সকল শক্তির উৎস সূর্য, যে আমাদের চির-বিশ্বাসের প্রতীক।

এ সব নীলুর ভাবনা। ছেলেমেয়েরা কি করছে কে জানে। তবে তাদের সকলের চোখেমুখে অপার বিস্ময়। কিন্তু অভিভাবকদের ভাবনা

অন্য। সকলে শোকে মুহ্যমান। কেউ কপাল চাপড়িয়ে কাঁদছে, সেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে হা-হুতাশ করছে। বন্যা ও ঝড় সকলের অনেক কিছু, প্রায় সব কিছুই নিয়ে গেছে। তিল তিল করে, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করেছিল বা সঞ্চয় করেছিল, তা যে এত অস্থায়ী কে জানত? সব কিছু ধ্বংস হতে কতটুকুই বা সময় লাগল?

নিজেদের বাড়ীর দিকে নীলু চেয়ে দেখে, কোন দেওয়াল দাঁড়িয়ে নেই। তাদের বাড়ীটা অনেক নীচু জায়গায়। তার চারদিকে জল। জেগে রয়েছে শুধু খড়ের চাল। আর সেই চালের উপর দাঁড়িয়ে তাদের বাবা কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করছে আর ভেড়াটা তার স্বরে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে যাচ্ছে।

চারপাশে নীলু চেয়ে দেখে অজস্র ডাব, নারকেল ভেসে যাচ্ছে। বড় বড় গাছ জলে পড়ে রয়েছে। আর ভাসছে অসংখ্য কলাগাছ। যে বাড়ীটায় তারা সারারাত ছিল সেদিকে চেয়ে সে অবাক হয়। সাউদের বাড়ীর ঐ একটিমাত্র ঘর ছাড়া আর একটাও ঘর আস্ত নেই। ঐ ঘরের উপরে ছিল মাটির ছাদ আর তার উপর ছিল খড়ের চাল। সে চালের অর্দ্ধেকও নেই। বন্যার জল ভিতের কিনারা পর্যন্ত উঠেছিল তা দাগ দেখলে বোঝা যায়। আরো একটু উঠলে দেওয়ালগুলো দাঁড়িয়ে থাকত কিনা সন্দেহ। কেন যে ঘরটা পড়ল না তা সে ভেবেই পেল না।

দু'দিন পরে নীলু খবর পেয়েছিল তাদের ওপারের চণ্ডীর মন্দিরের চারটা মাটির দেওয়ালই পড়ে গেছে কিন্তু সবই পড়েছে বাইরের দিকে। তাতে চণ্ডীর প্রতিমার এতটুকু ক্ষতি হয়নি। এও কিভাবে সম্ভব হল? সব চেয়ে বড় কথা তাদের পাড়ার এতগুলো লোক বাঁচল কি করে? নীলু ভাবে তাকেও তো বাঁচার কথা নয়। এ সব কথা ভাবলে নীলুর হাসি পায়! মনে মনে সে বলে—তাহলে মহাজীবনের গান লিখত কে?

ছেলেরা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল। তারা সকলে দৌড়াদৌড়ি করে ডাব নারকেল কুড়াতে লাগল। ওগুলো খেয়ে পেট ভরাতে লাগল।

বড়রা যে যার ঘরের দিকে ফিরে যাচ্ছে। সকলে চেষ্টা করে দেখছে ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে কতখানি আস্থাবর সম্বল উদ্ধার করা যায়।

শংকরীপ্রসাদ লোকজন নিয়ে দোকানঘরের মধ্যে মাটি চাপা পড়ে থাকা ক্যাশবাক্সটা উদ্ধারের চেষ্টায় মন দিলেন। ওর মধ্যে বুঝি হাজার তিনেক টাকা ছিল। আচার্য পাড়ায় ক্ষতি কমই হয়েছে। তারাই এ ব্যাপারে শংকরীপ্রসাদকে সাহায্য করতে লাগল।

আশ্চার্য! শংকরীপ্রসাদ—যখন ক্যাশবাক্স উদ্ধারে ব্যস্ত তখন পাড়ার কেউ কেউ লুকিয়ে এবং প্রকাশ্যেই তাঁর দোকানের কাপড়-চোপড় এবং জিনিসপত্র পাচারে উদ্যোগী হল। সত্যিই আশ্চর্য এই মানুষের চরিত্র। গতকাল সমূহ বিপদের মধ্যে যে মানুষ নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে সহায়তার হাত বাড়িয়েছিল, সেই মানুষই বিপদ দূর হওয়ায় মুহূর্তেই আপন ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে গেল।

পুলিন, রাসুরা এখন কোথায় কে জানে? রাণী আর নীলু ডাব, নারকেল কুড়িয়ে জড় করছে। এটা তাদের কাছে এখন এক চমৎকার খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কুড়াবার সুবিধার জন্য তারা কলার গাছ দিয়ে একটা মস্তবড় ভেলা তৈরী করে ফেলল। সেই ভেলায় চড়ে বাঁশ দিয়ে ভেলা ঠেলতে ঠেলতে তারা নাপিতবাড়ী ছাড়িয়েও অনেক দূরের দিকে চলে গেল। অভিভাবকদের কোন শাসন নেই, ভেলায় চড়ে কোন জায়গায় যাওয়ার বাধা নেই, পেটের ক্ষুধা নেই, বাইরের ঠাণ্ডা নেই। অতএব কোন কিছুতেই তাদের অসুবিধা নেই। তারা মনের আনন্দে ভেলায় ভেসে বেড়াতে লাগল।

নাপিতবাড়ীর কাছে আসার সময় দেখল, কালার দিদিমা বুড়ী মাটিতে মাথা ঠুকিয়ে ঠুকিয়ে অতি করুন উচ্চ স্বরে 'কালারে, কালারে' বলে কাঁদছে। রাণী ও নীলু সেদিকে তাকায়, তাদেরও কান্না পায়। তারা বেশীক্ষন সেখানে থাকতে পারে না, তাড়াতাড়ি বাঁশ ঠেলে ভেলার গতিকে দ্রুত করে। যে যার নিজেকে নিয়ে এখন ব্যস্ত। কালার খোঁজ কে-ই বা রাখে?

কালাদের বাঁশবাগান পেরিয়ে কলার ভেলাটা পুকুরের উপর দিয়ে

ভেসে যেতে থাকে। আরো একটু দূরে যেতেই তারা দেখতে পায় ছোট পণ্ডিতমশায়ের বাড়ীর সামনের সেই অতি পরিচিত কৃষ্ণচূড়া গাছটা জলে পড়ে আছে। তার গায়ে একটা খড়ের চাল এসে লেগেছে।

কৃষ্ণচূড়া গাছটার এ দশা দেখে নীলুর মনটা ভারী হয়ে আছে। সেদিকে চেয়ে রাণী বলে—চল্ নীলু, ঐ চালের কাছে যাই।

ভেলা বাইবার আনন্দে নীলুর দুঃখবোধটা বেশীক্ষন স্থায়ী হয় না। মহানন্দে নীলু জোরে জোরে ভেলা বাইতে থাকে। একটু দূর থেকে তারা দেখতে পায় ঐ চালের গায়ে কোন জন্তুর মৃতদেহ যেন আটকিয়ে রয়েছে। আরো একটু এগিয়ে এসে তারা দেখতে পায়, ওটা জন্তুর নয়, মানুষের মৃতদেহ। কার মৃতদেহ হতে পারে তা ভেবে তারা কৌতূহলী হয়ে পড়ে।

একেবারে কাছাকাছি এসে দুজনে যুগপৎ চীৎকার করে বলে ওঠে একি, কালা!

কাছে গিয়ে দেখে কালার মৃতদেহটা কিছুটা ফুলে উঠেছে। খড়ের চালের সঙ্গে কালার মৃতদেহটা আটকিয়ে রয়েছে বলে ঐখানে থেকে গেছে, না হলে ভেসে কোথায় চলে যেত, কে জানে।

দুজনে দৃশ্যটা দেখে শোকে এতই অভিভূত হয়ে পড়ল যে বেশ কিছুক্ষন তারা কোন কথা বলতে পারল না, শুধু নীরবে সেদিকে তাকিয়ে রইল। শেষে তারা তাদের বন্ধুর প্রতি শেষ কর্তব্য স্থির করে ফেলে। কালার মৃতদেহটা ভেলার একপাশে তুলে নিয়ে নীরবে তারা নাপিতবাড়ীর দিকে ভেলার মুখ ঘুরিয়ে ভেলা বাইতে থাকে।

সারাটা পথ কেউ কোন কথা বলতে পারে না। দুজনেরই দৃষ্টি মহাকাশের দিকে নিবদ্ধ। কেউ যেন কালার দিকে তাকাতে পারছে না। মাঝে মাঝে আড়চোখে তারা তাকায় আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। উভয়েই তাদের দুঃসহ সুখস্মৃতির রোমন্থন করে চলে।

নাপিতদের বাড়ীতে পৌঁছাতেই এক শোকাবহ দৃশ্যের অবতারনা হল। কালার দিদিমা কালার মৃতদেহ দেখামাত্রেই গগনভেদী চীৎকার

করে উঠল—কালারে, ওরে কালারে, তুই কেন গেলিরে। যম কেন আমাকেও নিয়ে গেল না রে।······

বুড়ীর চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে প্রতিবেশীদের অনেকেই ছুটে আসে। দৃশ্যটা দেখে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে যায়। এ যেন অকল্পনীয়! মেয়েদের কারোর চোখই শুষ্ক ছিল না। মৃতদেহের কাছে বুড়ীকে রাখা ঠিক নয় ভেবে মেয়েরা বুড়ীকে জোর করে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল। বুড়ী সেখান থেকে ছুটে বাইরে আসতে চায়। মেয়েরা জোর করে বুড়ীকে ধরে রাখে।

বড়রা রাণী ও নীলুকে জিজ্ঞেস করতে লাগল তারা কালার মৃতদেহ কোথায় পেয়েছে। তারা সব বলল।

মেয়েরা বুড়ীকে সান্ত্বনা দেয়। বুড়ী শোক সহ্য করতে না পেরে এখনই ছুটে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিতে পারে। তাই মেয়েরা চারদিক থেকে ঘিরে রাখে। পুরুষেরা মুখে একটু আধটু সান্ত্বনা দিয়ে অনেকেই যে যার কাজে কেটে পড়ল। তখনও পুলিনের বাবা প্রভৃতি দু'একজন ছিল সেখানে। পুলিন ছিল না। সে তার মামার বাড়ীর খোঁজ নিতে গেছে। গাঁয়েরই একপ্রান্তে তার মামারা থাকে। মেয়েরা যারা সান্ত্বনা দিচ্ছিল তারা পুরুষদের বলতে লাগল কালার মৃতদেহের সৎকার করার জন্য।

পুলিনের বাবা অমনই বলে উঠল—কাঠ আছে কিন্তু সব তো ভেজা। আর পোড়াবার জায়গাই বা কোথায়? চারদিকে তো জল। পোড়াতে হলে তো ঘরের মধ্যেই পোড়াতে হয়। সেখানেই যা একটু ডাঙ্গা মিলতে পারে। কিন্তু তা কি সম্ভব?

মেয়েদের একজন বলে—তাহলে উপায়?

পুলিনের বাবা ঠোঁট উল্টিয়ে বলে - কি আর উপায়? জলেই মরেছে, ওকে জলে ভেসে যেতে দাও।

কথা কটি বলেই পুলিনের বাবা সরে পড়ে। তার সাথে অন্য পুরুষেরাও। মেয়ের দল কি করবে কিছু ঠিক করতে পারে না। বুড়ী সমানে চীৎকার করে চলেছে। তাকে ছেড়ে মেয়েরা কোথাও যেতে

সাহস পাচ্ছে না। কালার মৃতদেহ ভেলার উপরেই পড়ে থাকে। সহসা বুড়ী মুর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। মেয়ের দল বুড়ীর পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

নীলু ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে ছিল রাণীর দিকে। রাণীও একইভাবে নীলুর দিকে তাকিয়ে ছিল।

সহসা নীলু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ওঠে—চল্ রাণী, কালাকে এই কলার ভেলায় করে ক্যানেলের জলে ভাসিয়ে দিই। আমাদের বাড়ীর পাশে ক্যানেলের পাড়ে ঐ বটগাছের কাছে যাই চল্। ওখান থেকেই ভেলা ভাসিয়ে দেব।

কথাগুলো বলে নীলু চুপ করে। রাণীর চোখ সজল হয়ে ওঠে। তা দেখে নীলুরও। একটু পরে নীলু আবার বলতে সুরু করে—রাণী, মনে পড়ে, একদিন ঐ বটগাছের কাছে আমি আর তুই ক্যানেলের জলে কলার ভেলায় সতী বেহুলা খেলছিলাম। কালা একটু পরে এসে তোর সঙ্গে সতী বেহুলা খেলতে চেয়েছিল। তুই ওর সঙ্গে খেলতে চাস নি। মনে পড়ে? আজ না হয় তুই একবার, আর এই শেষ বারের মত কালার সাথে সতী বেহুলা খেলে নে। তুই না হয় একবার অসতীই হলি রাণী। আমি কিছু মনে করব না রে।

নীলু শেষের দিকে যেন আর কথা বলতে পারছিল না। কান্নায় তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। রাণীও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

এ আর এক সতী বেহুলা খেলা। নীলু ও রাণীর জীবনে আর কোনদিনই এ খেলা খেলা হয় নি। কলার ভেলায় কালার মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছে। ভেলার উপর মৃতদেহের পাশে বসে রাণী। নীলু এক হাতে বাঁশটা জলের মধ্যে ফেলে ফেলে পথের নিশানা করে চলেছে আর পেছন থেকে হাত দিয়ে ভেলা ঠেলে ঠেলে যাচ্ছে। ভেলায় চড়ে রাণী কাঁদছে। নীলুও বুকসমান জলে চলতে চলতে সাগরের জলের সঙ্গে নিজের চোখের জল মিশিয়ে চলেছে। দুয়েরই স্বাদ লবণাক্ত!

ভেলা এলো সেই বটগাছের কাছে। এ গাছের অনেক স্মৃতি নীলুর মনে একসাথে ভীড় করে আসে। গাছটা খুব বড় নয়। তাই

বোধ হয় ঝড়ে পড়ে নি। এই গাছের তলায়ই নীলু আচার্যের সঙ্গে তার আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধু পাতান হয়েছিল। এই গাছেরই তলায় কতদিন রাণী, সে ও কালা খেলেছে। কখনও কালা তার বাঁশের বাঁশী বাজিয়েছে, নীলু গেয়েছে। আবার কখনও নীলুর সঙ্গে গলা মিলিয়েছে রাণীও।

পুর্ণেন্দু কাকারা যে সব গান গাইত তারা সেগুলো শিখে নিত। নীলু ও রাণী সেগুলোর সুর গলায় তুলে নিত আর কালা তার সাধের বাঁশের বাঁশীতে। কখনও এমন হয়েছে, তারা তিনজনে গাছের তলায় খেলে ক্যানেলের জলে নেমে সাঁতার দিয়েছে। কালা তার বাঁশের বাঁশীটা বটের গুঁড়ির ফাঁকে রেখেই হয়ত জলে নেমেছে। জল থেকে উঠে বাঁশীটা নিয়ে যেতে হয়ত আর তার মনে নেই নীলু ভাত খেয়ে পুকুরঘাটে মুখ ধুতে এসে বাঁশীটা দেখেছে। তখনই মনে হয়েছে—এ কালার বাঁশী—বটের তলায় পথের ধুলার উপর কালা বাঁশীটা তার ফেলে রেখে গেছে। অমনই সে তুলে রেখেছে। এমনি কত স্মৃতি।

এখান থেকেই ক্যানেলের স্রোতে **কালার মৃতদেহ** সমেত কলার ভেলাটাকে ভাসিয়ে দিতে হবে। দিতে তো মন চায় না। একেবারে যেতে দেবার আগে যেন কিছুক্ষনের জন্য ধরে রাখার প্রয়াস!

রাণী ভেলায় বসে মুখ নীচু করে কাঁদছিল, নীলু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরান দিনের হারিয়ে যাওয়া কথাগুলো ভাবছিল। আস্তে আস্তে কখন যে নীলু তার হাতের বাঁশটাকে দুহাতে তুলে ধরেছে আর বাঁশটা তার ঠোঁটে লাগিয়েছে তা বুঝতে পারে নি। ভাবের আবেশে তখন তার মনে হয়েছিল, এটা বুঝি সেই বটের তলায় ফেলে যাওয়া বাঁশের বাঁশী। কালা খেলতে এলে তাকে দিতে হবে। তার আগে যেমন সে একটু করে বাজিয়ে নেয় তেমনি সে যেন বাজিয়ে নিচ্ছে।

কি আশ্চর্য! বাঁশীটা বাজছে। যে বাঁশীতে সে কোনদিনই সুর তুলতে পারে নি আজ সেই বাঁশী সুন্দর বাজছে—কালা যেমন সুন্দর করে বাজাত সেরকমই, হ্যাঁ, পারছেই তো! সেই গানেরই সুরটা তো

অবিকল বাঁশীতে বাজছে। সেই মিষ্টি সুরটা তার কানেও বাজছে। সেই গান :—

'দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে
আমার বাটে বটের ছায়ায় সারা বেলা গেল খেলে ॥
গাইল কি গান সেই তা জানে, সুর বাজে তার আমার প্রাণে—
বলো দেখি তোমরা কি তার কথার কিছু আভাস পেলে ॥
আমি তারে শুধাই যবে, 'কী তোমারে দেব আনি'—
সে শুধু কয়, 'আর কিছু নয়, তোমার গলার মালাখানি।'
দিই যদি তো কী দাম দেবে যায় বেলা সেই ভাবনা ভেবে—
ফিরে এসে দেখি ধূলায় বাঁশীটি তার গেছে ফেলে ॥'

গানের সুরটা মনে খেলে যাচ্ছে আর নীলু ভাবছে—কালা এক দূরদেশী বটে! সে এখন দূর আকাশপথে তার কোন্ আপনদেশে পাড়ি দিয়েছে. কে জানে? দুদিনের জন্য সেই রাখাল ছেলে তাদের গাঁয়ের গরুচরার মাঠে গরু চরাতে এসেছিল। সেই ফাঁকে তাদের মত সাথীদের সঙ্গে খেলেও গেল। আর সে সময় এই বটের তলায় বসে তার বাঁশের বাঁশী বাজিয়েও শুনিয়ে গেছে। আজ সেই রাখাল ছেলেটা গরুচরার মাঠ, শাপলা গ্রাম, তার বটগাছ, গরু তার সাথী, এমন কি তার অত সাধের বাঁশের বাঁশীখানাও ফেলে রেখে গেছে।

উদ্বেলিত হৃদয়ে নীলু ভাবনার জাল বুনে চলে। সহসা সে জাল ছিন্ন হয় এক কঠিন প্রশ্নে। কালা কি কোনদিন রাণীর গলার মালা চেয়েছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ চেয়েছিলই তো। —সে যে রাণীর সাথে সতী বেহুলা খেলতে চেয়েছিল এমনই এক কলার ভেলায় চড়ে এই ক্যানেলের জলে এই বটের কাছে। রাণী কি বিনিময়ে কালার কাছে কিছু চেয়েছিল?

কালা কি দাম দিতে পারত? এক, বাঁশীর সুরে অপরকে মুগ্ধ করা ছাড়া তো আর কোন আকর্ষণীয় গুন ছিল না তার। রাণী কি সে সুরে মুগ্ধ হয় নি? তাই বুঝি কালার কাছে বিনিময়ে কিছু পাওয়ার আশা নেই ভেবে রাণী সেদিন কালার সতী হতে রাজী হয় নি?

কিন্তু কালা বুঝি আজ রাণীর সকল ভাবনার নিবৃত্তি করে গেল নিজের জীবন দিয়ে গিয়ে। এর বেশী কি আর সে দিতে পারত ?

নীলু বুঝতে পারে, রাণী সে কথা বুঝেছে। বুঝেছে বলেই সে আজ স্বেচ্ছায় কালার মৃতদেহের পাশে একই ভেলায় বসেছে তার সতী হয়ে। অসতী হয়ে যাবার কোন চিন্তাই তো আজ রাণীর মনে নেই।

নীলুর একথা ভেবে ভাল লাগল যে, সেদিন যদি রাণী কালার পাশে বসত কলার ভেলায় তবে সেটা খেলা ছাড়া অন্য কিছু হতো না, কারণ কালা তখন জীবিত আর তাই রাণী তার পাশে বসে অমন আকুল হয়ে কাঁদত না। কিন্তু আজ কালার মৃতদেহের পাশে ভেলার উপর বসে রাণী যেভাবে নীরবে চোখের জল ফেলে যাচ্ছে, এ কখনই খেলা হতে পারে না। এ তবে কি ?

এর উত্তর আজ নীলু পেয়েছে। এ হলো লীলা—মহাজীবনের লীলা ! সকল জীবনের মাঝে ছড়িয়ে রয়েছে সেই মহাজীবন। এ লীলা সত্য। সে সত্য হল বিরহ। বিরহই চিরন্তন, মিলন শুধু ক্ষণিকের মিলনে হারাবার ভয় আছে কিন্তু বিরহে সে ভয় নেই। সেখানে ঘটে চলেছে মানুষের অনন্তকালধরে প্রাপ্তি, শুধু প্রাপ্তি। এ লীলাও মানুষকে কাঁদায় কিন্তু সে কান্নায় ছড়িয়ে আছে, মিশে রয়েছে এক গানের সুর। সে গান চিরকালের। সে গান—মহাজীবনের গান !

আর দেরী নয়। এবার কালাকে চিরদিনের মত বিদায় দিতে হবে। অতিথি তো চিরদিন থাকে না। দূরদেশী রাখাল ছেলের বাঁশী তো চিরকাল বটের তলায় বাজে না। কিন্তু তার সুর অনন্তকাল মুগ্ধহৃদয়কে আনন্দে আপ্লুত করে যায়।

নীলু দীর্ঘক্ষণের নীরবতা ভঙ্গ করে বলে—রাণী এবারে তুই নেমে আয়। আমরা ভেলাটাকে ভাসিয়ে দিই। স্রোতে ভেলাটা কালাকে নিয়ে ভেসে যাক।

রাণী বাক্যব্যায় না করে ভেলা থেকে নেমে আসে। দুজনে মিলে ভেলাকে ক্যানেলের স্রোতের মুখে ঠেলে দেয়। ভেলা কালাকে নিয়ে

ভেসে যেতে থাকে ধান গোলার হাটের দিকে, সেই মালতী ধোপানীর বাড়ীর দিকে।

সহসা এক বেদনার কুণ্ডলী নীলুর পেটের মাঝ থেকে যেন দলা পাকিয়ে উঠতে চায়। চোখের জলে দৃষ্টি আবছা হয়ে যাচ্ছে, ভেলাটাকে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু সহসা তার মনে পড়ে, কালা পূর্ণেন্দু কাকাদের কাছ থেকে শেখা গানের সুরগুলো ছাড়াও অনেক অন্য সুর বাজাত। সে সব কোন্ গানের সুর ছিল? সে সব কি ছিল কালার নিজের গান? সেই সব সুরে সুরে কালা তাদের কি বলতে চেয়েছিল? মনটা হায় হায় করে ওঠে নীলুর, কেন সে কালার কাছে জেনে নেয় নি বলে। আর তো কোনদিন জানা হবে না। পেটের ভেতর থেকে ওঠা বেদনার কুণ্ডলী নীলুর হৃৎপিণ্ড মথিত করে চলে।

সহসা কালার সেই পরিচিত মুখটা যেন অতি স্পষ্ট হয়ে নীলুর মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। ফুটে উঠেছে কালার সেই ভ্রমরকৃষ্ণ চোখে কৌতুকের হাসি। কালা তার অভ্যস্ত ভঙ্গিমায় যেন তার বাঁশের বাঁশীটা তুলে নিয়ে বাজাতে লাগল। গানের সুরটা নীলু যেন স্পষ্ট শুনতে পায়। সেই গানের সুর শুনে নীলু বুঝতে পারল, কালা তার সেই আগের সুরগুলোতে কি বলতে চেয়েছিল তাদের।

মনের অগোচরে কখন যে নীলু কালার বাঁশীর সুরে গলা মিলিয়েছে খেয়াল নেই :—

আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান
তার বদলে আমি চাইনি কোন দান ॥
ভুলবে সে গান যদি না হয় যেয়ো ভুলে
উঠবে যখন তারা সন্ধ্যাসাগর কুলে,
তোমার সভায় যবে করব অবসান
এই কদিনের শুধু এই ক'টি মোর তান ॥
তোমার গান যে কত শুনিয়েছিলে মোরে
সেই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন করে?

সেই কথাটি, কবি, পড়বে তোমার মনে
বর্ষামুখর রাতে ফাগুন-সমীরণে—
এইটুকু মোর শুধু রইল অভিমান
ভুলতে সে কি পার ভুলিয়েছ মোর প্রাণ !!'

গানের মাঝে খেয়াল হয় নীলুর, রাণীও কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে গলা মিলিয়েছে।

কালার কলার ভেলা আর দেখা যায় না। বোধ হয় মালতী ধোপানীর ঘাট ছাড়িয়ে কালা এতক্ষণে স্বর্গে তার আপন ঘাটে ভেলা ভিড়িয়েছে। অবাধ্য চোখের জল মুছতে মুছতে ওরা ঘরের দিকে ফেরে।

প্রথম পর্ব সমাপ্ত

দ্বিতীয় পর্ব

॥ ১৮ ॥

'বিধাতার মার
তুনিয়ার বা'র।'

বিধাতার মারের হিসাব মানুষ করতে পারে না। কিন্তু বিধাতা হঠাৎ অমন অকরুন হয়ে যান কেন তাঁর সৃষ্ট মানুষের উপর? কান্তি জেঠা বলতেন, মানুষের পাপের ভারে পৃথিবী যখন পরিপুর্ণ হয়ে যাবে তখন বিধাতা পৃথিবীতে মহাপ্রলয় ঘটাবেন। সেটাই হবে কলির শেষ।

১৯৪২ সালে মানুষ বুঝি এত পাপ করেছিল যার জন্য মানুষকে নির্মম শাস্তি দিতে বিধাতাপুরুষ অমন রুদ্রমুর্তি ধারণ করেছিলেন। তবু ভালো, পৃথিবীটা একেবারেই লয়প্রাপ্ত হয়ে যায় নি। অতএব একটা সান্ত্বনা নীলাদ্রির আছে এই যে, মানুষের পাপের ভারে পৃথিবী তখনও একেবারে পূর্ণ হয়ে যায় নি। আজ ১৯৭৪-এ এসে গোটা দেশ আর গোটা পৃথিবীর দিকে চেয়ে নীলাদ্রির মনে হয় সে যেন ডেকে বলে—হে বিধাতাপুরুষ, আর কত পাপ করলে পৃথিবী পাপের ভারে পূর্ণ হবে বলো? আর দেরী কেন প্রভু? এবারে তোমার সেই শেষ প্রলয়টা ঘটিয়ে দাও।

নীলাদ্রি ভেবে পায় না, সেই ১৯৪২-এ মানুষ কি এমন পাপ করেছিল যে অতবড় একটা মহাপ্রলয় ঘটে গেল? দেশের সাধারণ লোক তখন বেশী হয়ত অশিক্ষিত ছিল কিন্তু এত অসৎ ছিল না। তারা মাঠে, ঘাটে, বাটে যে যার বৃত্তিতে নিয়োজিত ছিল। সত্য কথা ও সদাচরণের সামাজিক মুল্য তখনও স্বীকৃত ছিল যা আজ নিতান্ত উপহাসের বস্তু। দেশের ব্যবসায়ীরা তখন ধান চাল গুদামজাত করে প্রচুর মুনাফা লুটে নি। কালোটাকার তখনও জন্ম হয় নি। চালে কাঁকর, তুধে জল, তেলে ভেজাল তখনও অকল্পনীয়।

তখন অবশ্য বামুন ঠাকুরেরা অন্যায় বিধান দিয়ে লোককে বিভ্রান্ত করেছে। জোতদারেরা চাষীদের উপর জুলুম করেছে। পুরুষেরা মেয়েদের উপর নির্দয় ব্যবহার করেছে। অতএব সমাজে তখন অবশ্যই

কিছু পাপ ছিল, কিছু অন্যায় ছিল। কিন্তু সেদিনের সমাজের সেই চিত্রটা আজকের সমাজের চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে নীলাদ্রি একবাক্যে স্বীকার না করে পারে না যে, যতই নীতিবিগর্হিত কাজ তখন মানুষ করুক না কেন, দুর্নীতি মানুষকে তখন অমন করে পেয়ে বসে নি। মানুষ তখন অসামাজিক কাজ কিছু করে থাকলেও সেদিন অসামাজিক লোকেরা আজকের মত সমাজের শিরোমনি হয়ে বসে নি।

মনে পড়ে, বড় হয়ে নীলু একবার ঈশ্বর জেঠাকে প্রশ্ন করেছিল, তিনি অতবড় জ্যোতিষী, তবু তিনি কেন গণনায় অমন প্রলয়কাণ্ডের খবর জানতে পারেন নি আগে থেকে?

উত্তরে ঈশ্বর জেঠা বুঝিয়েছিলেন—মানুষ গণনা করে মানুষের ভাগ্যফল সঠিক বলে দিতে পারলেও, সে কখনই মহাকালের লীলার কথা বলতে পারে না। ত্রিকালদর্শী ঋষিরা হয়ত পারতেন। আমাদের মত লোকের পক্ষে তা অসম্ভব। মহাকালের খেলা সকল অতীত। তিনি যে কখন প্রলয়, খণ্ডপ্রলয়, মহাপ্রলয় ঘটাবেন তা কেউ জানতে পারে না। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—এ তিন জিনিস থাকবেই কিছু লয় না হলে স্থিতি নেই। চিন্তা করে দেখো, মানুষ যদি না মরত তাহলে পৃথিবীতে মানুষ বাঁচত কিনা।

ঈশ্বর জেঠা একটা বাস্তবসম্মত উত্তর দিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। তিনি মানুষের পাপের কথা বলেন নি, বলেছিলেন মহাকালের অজ্ঞাত, গণনাতীত লীলার কথা। তবু বলা যায়, মানুষ তখন না পারলেও এখন সেই মহাকালের লীলার কিছু খবর আগেভাগেই গণনা করে জানতে পারে। যে নিম্নচাপ সৃষ্টির ফলে সমুদ্র থেকে ঝড় বয়ে আসে বা সমুদ্রে জলোচ্ছাস দেখা দেয় তার খবর মানুষ 'রডারে' আগেই ধরে ফেলে। আর সেই খবর খবরকাগজে লোকে আজকাল আগেই পড়ে বা বেতারে শোনে।

এ সবের কোনটাই সেই ১৯৪২-এ সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। তবে নীলু শুনেছিল, খবরটা কাঁথির মহকুমা শাসকের অফিসে আগেই এসেছিল কিন্তু কোন বিশেষ অঙ্গুলিসংকেতে সে খবর

প্রচারিত হয়নি। কিন্তু সে কথা থাক্, মানুষ জানলেই বা কি হত? কিভাবেই বা মানুষ সেই মহাপ্রলয়ের গতিরোধ করতে পারত?

নীলাদ্রির মনে হয়, মানুষ কোনদিন ঝড়, প্লাবন, ভূমিকম্প, এই সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের গতিরোধ করতে পারবে না। যদি কোনদিন পারে তাহলে লয় থাকবে না, শুধু সৃষ্টিই হতে থাকবে। কিন্তু সেই সৃষ্টির ভারে স্থিতিটা এত বেশী হয়ে যাবে যে পৃথিবীতে মহাপ্রলয়—শেষের সেই প্রলয় আপনিই এসে যাবে এবং অনেক আগেই। নীলাদ্রি মনে মনে হেসে বলে—সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিনগুলোতে তবে হিটলার, চার্চিল এইসব বড় বড় লোকেরা বিধাতার ভূমিকা নিয়ে লয়-সাধন করে যাচ্ছিলেন শুধু উত্তরকালের পৃথিবীর মানুষদের স্থিতিশীল করতে।

সে যাই হোক, মানুষ মহাপ্রলয়ের গতিরোধ করতে না পারুক, তার আগমনবার্তা আগেভাগে জানিয়ে দিয়ে মানুষকে সাবধান করে দিয়ে তার ধনপ্রান কিছুটা রক্ষা করতে পারে। মহাপ্রলয়ের পরে যে মহামারী আসে তা মানুষ অনেকাংশেই রোধ করতে পারে। মানুষের মনুষ্যত্বের পরীক্ষা হয় এই মহাপ্রলয়ের পরে।

সেই ১৯৪২-এর মহাপ্রলয়ে বিধাতা আর ক'টা লোককে প্রাণে মেরেছেন? সে সব আঙুলে গোনা যায়? কিন্তু তারপর মানুষই মানুষকে এত বেশী মেরেছে যে, মৃতের সংখ্যা গুণে শেষ করা যায়নি।

নীলাদ্রি তার নিজের শাপলা গাঁয়েরই কথা বলতে পারে। তাদের পাড়ায় বন্যার দিনে একমাত্র কালাই মরেছিল, আর সারা গাঁয়ে তিনটি কি চারটি মানুষ মরেছিল কালাকে নিয়ে। কিন্তু তার পর এক বছরের মধ্যে গ্রামের লোকসংখ্যা মরতে মরতে অর্দ্ধেকে দাঁড়িয়েছিল। যে মানুষ সেদিন মানুষকে মেরেছিল, তারা কারা?

নীলু সেদিন তাদের খবর জানতে পারে নি, সে তখন ছোট। তার তখন অত জানার কথা নয়। কিন্তু তার গাঁয়ের সাধারণ লোকেও জানতে পারে নি, সে কথা। বন্যার পর মহামারী যখন এসে একের পর এক লোকের প্রাণ নিয়েছে তখন মানুষ শুধু বিধাতাকেই দোষ

দিয়েছে বন্যায় সমস্ত মাঠের ফসল আর খামারে মজুত খাদ্য নষ্ট হয়েছে বলে।

তারা জানতে পারে নি, বিধাতা যা নষ্ট করেছিলেন তা এমন কিছু নয়। অন্য মানুষেরা তাদের খাদ্য থেকে কিছু কিছু দুর্গতদের দিলে সেদিনে নীলুদের জেলার লোক হয়ত এভাবে মরত না। কিন্তু তারাও দিতে পারে নি। আর একদল মানুষই তাদের দিতে দেয় নি। কারা সেই লোক?

ইতিহাস বড় নির্মম। ইতিহাস তাদের পাপ ঢেকে রাখে নি। নীলাদ্রি পরে তাদের চিনেছে। চিনেছে তাদের গ্রামের সাধারণ মুখ্যুসুখ্যু মানুষগুলোও। কিন্তু চিনেই বা তারা কি করতে পেরেছে? তাদের স্বরূপ আজ নীলাদ্রি তার মহাজীবনের গানে এঁকে যেতে চায়।

আর এক মহাপ্রলয়ের কথা নীলুর মনে পড়ে। ১৯৬৮ সালে তিস্তা-নদীর বন্যায় জলপাইগুড়ি শহরে মহাপ্লাবন আসে। সে বন্যা এসেছিল মহালক্ষ্মী পূজার দিন রাতে। যে সময় নীলাদ্রি ঐ জেলায় চাকুরীরত। জলপাইগুড়ি শহরের সেই মহাপ্রলয় দেখে তার ছোটবেলায় দেখা সেই মহাপ্রলয়ের কথা মনে পড়েছিল। প্রলয়ের চিত্র প্রায় একই। প্রলয়ের পর পৃথিবীর বুকে ছিল প্রায় একই রকমের ক্ষতচিহ্ন।

কিন্তু আর এক জায়গায় তফাতও সে দেখেছিল বিস্তর। জলপাই-গুড়ি শহরে মহাপ্লাবনের কথা বাইরের লোক কিছু পরে জানতে পারে। কিন্তু বন্যার পর দিনই পঁচিশ মাইল দূরের শিলিগুড়ি শহরের লোকেরা দুঃসংবাদ পেয়ে যায়। পেয়ে সেদিন ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে শিলিগুড়ির লোক অকাতরে, অকুণ্ঠ সাহায্য করেছিলেন জলপাইগুড়ির বন্যার্ত্তদের মাড়োয়ারী ধনী ব্যবসায়ীরাও তাঁদের খাদ্যের গুদাম খুলে দিয়েছিলেন সাহায্যের জন্য। শিলিগুড়ির লোক বহুদিন পর্যন্ত অসংখ্য ট্রাকবোঝাই খাবারদাবার, জামা-কাপড় এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠিয়ে গেছেন জলপাইগুড়ির বন্যাক্লিষ্ট ভাইবোনদের জন্য।

জেলার অন্য অংশের লোকেরাও চুপ করে বসেছিলেন না। প্রতিটি চা বাগান ট্রাক বোঝাই করে হাতে গড়া আটার রুটি, অন্যান্য খাবার ও

কাপড় চোপড় ইত্যাদি পাঠিয়েছিল। নীলাদ্রিরাও অনুরূপভাবে পাঠিয়েছিল।

এভাবে জনসাধারণই প্রথমে এগিয়ে গিয়েছিলেন সাহায্যের দাক্ষিণ্য নিয়ে। পরে, অনেক পরে এসেছিল সরকারী সাহায্য এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের মত অন্যান্য কল্যাণকর্মমূলক সংস্থাসকল তাঁদের সাহায্য নিয়ে। তাতে বন্যার পর অনাহারে কাউকে মরতে হয় নি। পচা গলিত শবদেহ ও অন্যান্য আবর্জনা শহরে মহামারী ছড়াবার উপক্রম করেছিল মাত্র কিন্তু সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে সেই মহামারীকে অংকুরেই বিনাশ করতে পেরেছিল। মহামারীতে নগন্য লোক প্রাণ দিয়েছিল। সরকারী জনস্বাস্থ্য বিভাগ পানীয় জলের জন্য অসংখ্য নলকূপ অতি অল্প সময়ের মধ্যে বসিয়ে পানীয় জলের অভাব দূর করে কলেরাকে আসতে দেয়নি। সরকারী পূর্ত্ত বিভাগ অবিলম্বেই শহরের পলি সরাতে সক্ষম হয়েছিল। এভাবে কয়েকমাসের মধ্যেই জলপাইগুড়ি শহর তার পুরান রূপ ফিরে পায়।

শুধু তাই-ই নয়, বন্যার ব্যাপক ধ্বংসলীলা পরিদর্শনের জন্য তৎকালীন ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোরারজী দেশাইকে জলপাইগুড়ি শহরে ছুটে আসতে হয়েছিল। কিন্তু সেই ১৯৪২-এ কোন নগন্য সরকারী আমলারও পদার্পনের অবকাশ ঘটেনি সেই মহাপ্লাবিত ভূখণ্ডে।

সেই ১৯৪২-এ নীলুদের গায়ে এসব অকল্পনীয় ছিল। বাইরের জনসাধারণের খাদ্য সাহায্য পাঠাবার মত কোন পাকা সড়ক ছিল না। দুর্গতদের মধ্যে যাঁদের কিছু খাদ্য বেঁচেছিল তাঁরা সকলের মধ্যে যথা সাধ্য বিলিয়েছিলেন। কোন নলকূপ আগেও ছিল না পরেও বসেনি পানীয় জলের সব পুকুরই ডুবে গিয়েছিল। তাতে কলেরার শুভাগমন হতে দেরী হয় নি। বসন্ত ও অন্যান্য রোগব্যাধিও দূরে ছিল না।

দেশে তখনও একটা সরকার ছিল—বিদেশী সরকার। তারা পানীয় জল, ওষুধপত্র পাঠানো তো দূরে থাক, খাদ্যেরও কোন ব্যবস্থা করে নি। মহাপ্রলয়ের আগে থেকেই সমস্ত খাদ্য বাজার থেকে সরিয়ে এনে

মিলিটারীদের জন্য গুদামে ভরে রেখেছিল। তারা বাঙ্গালীকে শুকিয়ে মারতে চেয়েছিল। অতএব মেদিনীপুরের সেদিনের সেই দুর্গত জনগন দু'দিক থেকেই প্রচণ্ড মার খেয়েছিল—বিধাতার মার আর মানুষের মার। তারা বিধাতার মারটাই বুঝেছিল, মানুষের মারটা বুঝতে পারে নি। শুধু বিধাতাকে গালি দিয়েছিল। তাই সেই মহাপ্রলয় ও মহামারী তুলনারহিত। আজকের প্রজন্ম সে সবের কল্পনাও করতে পারে না।

কল্পনা যে করতে পারবে না তার আর এক কারণ আছে। ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পুর্ববঙ্গের জনগণ নির্মমভাবে পাকিস্তানীদের অত্যাচারের শিকার হল। ১৯৭২-এর গোড়ায় বাংলা-দেশের আত্মপ্রকাশ শেষপর্যন্ত ঘটল। দীর্ঘ আট-ন মাস ধরে দেশটার উপর দিয়ে ঘটে গেল এক নারকীয় মহাপ্রলয়, বাঙ্গালী যা মরেছিল তা কিন্তু ঐ আট-ন মাসে। তারপরে কিন্তু আর মরতে হয় নি। কারণ সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সকল রকমের সাহায্যই এসেছিল বাংলাদেশে। ভারতের সাহায্যের কথা ছেড়েই দিলাম। ভারত তো ঐ আট ন মাসে এক কোটি দেশছাড়া বাঙ্গালীকে খাইয়েছে। তারই সাহায্যে পাকিস্থানীরা হটেছে। তারপর কতভাবে আজো পর্যন্ত ভারত তো সাহায্য করেই চলেছে।

অতএব বর্তমান কালের শত পাপ, শত অনাচারের মধ্যেও মানুষে মনুষ্যত্বের এ এক উজ্জল ছবি। মানুষ এখন বিপদে মানুষকে সাহায্য করে। অনেকের দেওয়া সাহায্যের মধ্যে হয়ত ভবিষ্যতের জন্য কোন উদ্দেশ্যও থাকে। কিন্তু তবু তো মানুষ বিপদে সাহায্যের হাত বাড়ায়। এটা কম কথা নয়। মানুষের সব গিয়ে মুছেও এখানে এখনও কিছু মনুষ্যত্ব রয়ে গেছে, যা সেই ১৯৪২-এর দিনে ছিল না।

জনসংখ্যার ভারে পৃথিবী আজ টলমল। তাই মানুষের খাদ্যে আজ প্রায়ই টান পড়ে। সেই অভাব মেটাবার জন্য মানুষই মানুষকে সাহায্য করে বা মানুষই মানুষের কাছে ধার করে বা মানুষই মানুষের কাছে অর্থের বিনিময়ে হলেও অসময়ে খাদ্য পেয়ে বেঁচে যায়। দেশের

মধ্যে এক প্রদেশে খাদ্যাভাব ঘটলে কেন্দ্রীয় সরকারকে খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয়—অন্য উদ্বৃত্ত প্রদেশ থেকে সেখানে খাদ্য পাঠাতে হয়। অথবা দেশে খাদ্য না থাকলে বিদেশ থেকে খাদ্য আনিয়ে দেশের মানুষের ক্ষুধা মেটাবার ব্যবস্থা করতে হয়। দেশে খাদ্য নেই, লোকে সরকারের ঐ কৈফিয়ৎ শুনতে আজ রাজী নয়!

আজ ক্ষুধার্ত্ত মানুষ খাদ্য না পেলে বিধাতাকে দোষ দিয়ে বসে থাকে না। তারা খাদ্য দাবী করে সরকারের কাছে। না পেলে আগুন জ্বালে। ১৯৭৪-এ জানুয়ারী মাসে গুজরাটে যে খাদ্য আন্দোলনটা ঘটে গেল সাম্প্রতিক কালে ভারতবর্ষে তার নজীর নেই। যেখানে ঐ প্রদেশে দেড় লাখ টন খাদ্যের প্রয়োজন; সেখানে যোগান ছিল মাত্র ছত্রিশ হাজার টন খাদ্যের। ফলে গমের দাম কেজি প্রতি আট দশ টাকা উঠে গিয়ে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়।

মানুষ তা মেনে নেয়নি। অসন্তোষের আগুন জ্বলে ওঠে গুজরাটে বোধ হয় শতখানেক লোক গুলিতে প্রাণ দেয়। তবু সে আগুন নেভেনি। অবস্থা ক্রমেই আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। শেষে সেনা-বাহিনী ডেকে অবস্থা কিছুটা আয়ত্তে আনতে পারা গিয়েছিল। কিন্তু মানুষের দাবীকেও মেনে নিতে হয়েছিল সরকারকে। আজ আর পৃথিবীর কোন জায়গাতেই ক্ষুধার্ত মানুষকে অসহায় অবস্থায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া যায় না। খাদ্যের জন্য আজ প্রকৃতির রুদ্ররোষের মতই মানুষের রোষবহ্নি জ্বলে ওঠে।

কিন্তু সেই ১৯৪২-এ মানুষ কি ভাবেই বা খাদ্যের জন্য ফেটে পড়তে পারত? বিদেশী সরকার তো চেয়েছিল, যত নষ্টের মুল বাঙ্গালী জাতটাকে না খাইয়ে ঝাড়ে মুলে শেষ করতে। বিপ্লবের পীঠস্থান মেদিনীপুরকে শেষ করতে তো তারা আগেই চেয়েছিল। প্রকৃতি ঝড় বৃষ্টি ও বন্যার কষাঘাত হেনে তাদের সেই একান্ত ইচ্ছাটাকেই তো অনেকটা পুর্ণ করেছিল। তারা তো চেয়েছিল খেজুরী থানাটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিতে, তাদের স্বাধীন হবার বাসনাকে চিরতরে রুদ্ধ করে দিতে।

তবু তারা যদি জানত, বিদেশী শাসকেরা চক্রান্ত করে বাজার থেকে খাদ্য সরিয়েছে তাহলে হয়ত শেষবারের মত রুদ্ররোষে ফেটে পড়তে চাইত। কিন্তু তারা এত সব ষড়যন্ত্রের কথা সঠিকভাবে জানত না যে! অতএব বিধাতাকে দোষারোপ করা ছাড়া আর কি করতে পারত তারা? তাই সেদিনের মেদিনীপুরের সেই অসহায় অবস্থার কথা আজকের দিনের লোকেরা কোনক্রমেই সঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না।

যাই হোক সেদিনের কথাতেই ফিরে আসা যাক। সেদিন কালাকে চিরবিদায় দিয়ে নীলু যখন তাদের বাড়ীর ধ্বংসস্তূপের কাছে এল কি হচ্ছে দেখতে তখন দেখতে পেল তার বন্ধুর বাবা ক্যাশবাকসটি মাটি খুঁড়ে বার করেছেন। সেখানে জগৎ মাইতিও উপস্থিত। তিনি শংকরী প্রসাদের সঙ্গে কথা বলছেন। জগৎ কাকার হাতে মস্ত একটা লাঠি। ঐ লাঠি ঠুকে ঠুকে তিনি বন্যার জলের মধ্য দিয়ে পথ চিনে চিনে তাঁর বাড়ী থেকে আধমাইলের উপর পথ এসেছেন বন্ধু শংকরীপ্রসাদের খোঁজ নিতে।

নীলু ওদের কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারে যে জগৎ কাকাদের পাকাবাড়ীর কোন ক্ষতি হয় নি। ওঁদের বাড়ীটা অনেক উঁচু জায়গায়। বন্যার জল সেখানে বিশেষ ওঠে নি। সহসা নীলুর খেয়াল হয়, তাদের ঘর নেই, এরপর তারা কোথায় যাবে? কথাটা ভেবেই তার হাত-পা অসাড় হয়ে আসে। চেয়ে দেখে রাণী চলে গেছে কখন। তারও নিশ্চয়ই ঐ অবস্থা। রাসুকেও ধারে কাছে দেখতে পাচ্ছে না সে। নিজের অসহায় অবস্থাটার কথা ভেবেই চলে নীলু।

সহসা খেয়াল হয়, জগৎ কাকা বাবাকে বলছেন—ক্যাশবাকস তো উদ্ধার হল, শংকরী। এবার চল সব আমার বাড়ী। আপাততঃ তো ওখানেই থাক।

শংকরীপ্রসাদ বলেন—ভাই তুমি ছিলে বলে এ ঘোর অসময়ে মাথা গোঁজার মত ঠাঁই পাচ্ছি।

নীলুর মনে সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিবোধ আসে। কিছু পরে নীলুরা সকলে

জগৎকাকার বাড়ীতে এসে উঠল। এ বাড়ীতে নীলু এমনি আগেও এসেছে। তবে বাড়ীর ভেতরে ঢোকে নি। কৃপামামাও সেদিন তাঁদের সঙ্গে এলেন। একদিন ছিলেন তিনি। পরের দিনই তিনি ঐ বন্যার জলের মধেই বাড়ীর দিকে রওনা হয়ে যান।

জগৎকাকাদের ঘরের ভেতরে জল ঢোকে নি। তবে বাইরে চারদিকে জল রয়েছে। বাড়ীটা বেশ বড়; বাইরে থেকে অত বড় বোঝা যায় না। তিন শরীকের বাস বাড়ীর ভেতরে। নীলুদের থাকার জন্য জগৎকাকা একটা পুরো ঘরই ছেড়ে দিলেন।

রান্নাটা আলাদা করে করা হল না। নীলুরা সকলে জগৎকাকাদের বাড়ীর সকলের সঙ্গেই খেতে লাগল। এ বাড়ীতে নীলুর খেলার সাথী চার-পাঁচজন ছেলেমেয়ে আছে। রাণী, পুলিনদের থেকে দূরে এসেও নীলুর খেলার সাথীর তাই অভাব রইল না। পাশাপাশি এ পাড়ার অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও নীলুর ভাব জমতে দেরী হল না।

সামনে ডিসট্রিক্ট বোর্ডের যে রাস্তাটা রয়েছে তার উপর বন্যার জল প্রায় সপ্তাহখানেক দাঁড়িয়ে রইল। এ ক'দিন বাবা ও রাসু প্রায়ই তাদের বাড়ীর দিকে যায়। রাসুর মুখে নীলু শোনে, সেখানে বাঁশের খুঁটি পুঁতে পুঁতে পাহারা দেবার মত একটা ঘর নাকি তাদের হচ্ছে। তার নাম টংঘর। সব সময়েই সেখানে কেউ না কেউ থাকছে। না হলে জিনিসপত্র যা উদ্ধার করা হয়েছে, সব লোকে নিয়ে পালাবে। তাই নগেনকাকা, রাণীর দাদা, বাবা ও রাসু এরা পালা করে সেখানে থাকছে। নীলুর খুব ইচ্ছা, একবার গিয়ে দেখে আসে টংঘরটা দেখতে কেমন হচ্ছে। কিন্তু আধ মাইলেরও বেশী দূর। তাছাড়া রাস্তায় তখনও জল রয়েছে। তাই রমলা তাকে যেতে দেন না।

বোধ হয়, দিন দশেক পরে যখন রাস্তাঘাট মোটামুটি জেগে উঠল তখন একদিন রাসুর সঙ্গে নীলু এল তাদের টংঘর দেখতে। তখনও ধানের মাঠ, পুকুর, ক্যানেল বন্যায় ভর্তি হয়ে রয়েছে। মাঠে ধান বলে আর কিছু নেই। তবে পুকুরে, মাঠে, ক্যানেলে প্রচুর মাছ রয়েছে। তা এমনি দেখলে বা মাছের লাফ দেখলেই বোঝা যায়।

টংঘরটা নীলুর বেশ পছন্দ হয়ে গেল। রাসু তাকে নগেন কাকার কাছে ছেড়ে দিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। ঘরটার চাল খুব নীচু। তাদের সেই দক্ষিণের বারান্দার মেঝের উপরই হয়েছে ঘরখানা।

নগেনকাকা তার নিজের জন্য রান্নাবান্না করছিল। নীলু দেখে, তাদের পুকুরের মধ্যে প্রচুর ভেটকীমাছ ঢুকে গেছে। নগেনকাকা জাল ফেলে কয়েকটা ছোট ছোট ভেটকী ধরেছে। সেই মাছের ঝোল চাপিয়েছে নগেনকাকা। নীলুকে নগেনকাকা খেতে বলল। নীলু যদিও খেয়ে এসেছিল তবু সে খাবে বলল।

নগেনকাকা রান্না করতে করতে নীলুকে নানা কথা শোনায়। নীলু জানতে পারে, তাদের দোকানঘর থেকে যা কাপড়-চোপড় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল তা প্রায় সবই শংকরীপ্রসাদ ইতিমধ্যে গাঁয়ের বন্যার্ত্তদের মধ্যে বিলিয়েছেন। মরাইতে যে কয়েক শ' মন ধান, চাল ছিল ব্যবসার জন্য তার অর্দ্ধেকই বন্যার জলে ভেসে গেছে। যা উদ্ধার করা গিয়েছিল তার থেকে নিজেদের খরচের জন্য রেখে বাকীটা সমস্তই শংকরীপ্রসাদ অসহায় গাঁয়ের মানুষদের মধ্যে বিলিয়েছেন। এ সব কথা শুনে নীলুর মনে বাবার জন্য খুব গর্ববোধ হয়।

কথা বলতে বলতে নগেনকাকার ঝোল হয়ে যায়। ঝোলটা নামিয়ে রাখে নগেনকাকা। নীলু তাকিয়ে দেখে টংঘরের মধ্যে কিছু ধানচালের বস্তা সাজানো রয়েছে। সে জিজ্ঞেস করে—এত ধানচালের বস্তা এখানে রয়েছে কেন?

নগেনকাকা ঝোলের কড়াইটা একটু দূরে সরিয়ে রাখতে রাখতে বলে—এসব আমাদের, তোমাদের খাওয়ার জন্য। শংকরী দা জগৎ দাদাদের বাড়ীতে সংসার খরচের জন্য কিছু নিয়ে গেছেন। কিছু আরোও যাবে ওখানে। আর কিছু যাবে আমার বাড়ী। বাকী তো সব বিলি হয়ে গেছে বললাম। তোমাদের পুকুরে প্রচুর ধান পড়েছে। বোধ হয় বিশ-ত্রিশ মন, কি তারও বেশী হবে। পুকুরে নামলেই ধান ভেসে ওঠে। মাছ ওগুলো খেয়ে খুব বড় হবে।

নীলুর হঠাৎ মনে পড়ে, এ কয়দিন কারা যেন এসে জগৎ কাকাদের

বাড়ী থেকেও ধানচাল নিয়ে যাচ্ছে। কারা নিয়ে যাচ্ছে, এ খেয়াল নীলু আগে করেনি। এখন নগেনকাকার কথায় তার মনে হয়, জগৎ কাকারাও তাহলে তার বাবার মত-অনুরূপ সাহায্য করে যাচ্ছেন গ্রামের লোকদের। ব্যাপারটা ঠিক কিনা তা জানার জন্য নীলু প্রশ্ন করে—বাবা তো অনেককে ধানচাল দিয়েছে। জগৎ কাকারাও দিয়েছে, তাই না, নগেনকা' ?

নগেনকাকা বলে—হ্যাঁ, ওরাও দিয়েছে তবে তোমার বাবার মত অত নয়। এই কার্তিক মাসে গ্রামে ক'জনেরই বা ধানচাল ছিল ? ছিল জগৎ দা'দের বাড়ী আর মিশ্রদের বাড়ী। ওগুলো ওদের নিজেদের জমির ধান। তোমার বাবার ছিল ব্যবসার ধান। জমির ধান হয়ত বিলান যায় কিন্তু ব্যবসার ধান বিলাতে সকলে পারে না। তবে মিশ্রদের বাড়ী বিশেষ একটা সাহায্য করে নি। মিশ্রদের বুড়ো ভুবন মিশ্র যা কঞ্জুস—হাতের মুঠি খোলে না! এবার তুমি হাতমুখ ধুয়ে এসো, ভাত বেড়ে দিচ্ছি।

নীলু হাতমুখ ধুতে তাদের সদর পুকুরের ঘাটে গেল। পুকুরে প্রচুর আগড়া ভেসে রয়েছে দেখল। প্রচুর শোল আর ল্যাঠা মাছ ভেসে রয়েছে, লাফ দিচ্ছে। মাছ দেখে নীলুর আনন্দ ধরে না। নীলু মুখ ধুয়ে টংঘরে ফিরে আসে।

ভাত মুখে তুলেই নীলু মুখ বিকৃত করে। মুখ থেকে গ্রাস বা'র করে ফেলে।

নগেনকাকা লক্ষ্য করে বলে ওঠে—কি হল ? ওঃ হোঃ, তেতো লাগছে তো ? লাগবেই তো। চাল যে সব বন্যার লোনা জলে ডুবে গিয়েছিল। তোমরা এ ক'দিন তো জগৎদার বাড়ীর চাল খেয়েছ। তাই এর স্বাদ পাও নি। এই-ই জিনিস কিন্তু খেতে হবে এর পর। আমরা তো খাচ্ছি।

নীলু লজ্জা পেয়ে আবার মুখে গ্রাস তুলতে থাকে। ভাতের স্বাদ তেতো দেখে সে ঘাবড়িয়ে গিয়েছিল, না জানি, ভাতে কিছু মিশে গেছে কিনা। লোনা জলের জন্য এরকম স্বাদ হয়েছে আর তাই-ই

সকলে খাচ্ছে জেনে নীলুর আর কোন আপত্তি হল না। তাছাড়া গরম গরম ভেটকি মাছের ঝোল তো আছে। ঐ ঝোল দিয়ে ভাতগুলো খেতে এখন তার বেশ ভালই লাগল।

খেতে খেতে নগেনকাকা আরো বলে চলে—ঐ চাল তোমার ওপারের জেঠাদের বাড়ীতেও গেছে। প্রায় মন পাঁচ-সাত তো হবে। তেতো হোক, গন্ধ হোক. দেখতে খারাপ হোক—যাই-ই হোক, এই-টুকুন তো সম্বল। তারপর কি যে হবে! এ বছর মাঠে কিছুমাত্র ধানের আশা নেই। কার ঘরেই বা আর ধানচাল আছে? যদিও বা কিছু ছিল তার অনেক তো বন্যায় ভেসে গেল। আর কারোর কিছু থাকলে সে নিজে খাবে, না, অপরকে দেবে। বন্যায় আর ক'টা লোক মরেছে বাবা? দেখই না, এরপর না খেতে পেরেই সব শুকিয়ে মরে যাবে। ভগবান ঝড় বন্যায় আমাদের বাড়ীঘর সবই নিয়েছে। প্রাণটুকু না নিলে তার শান্তি নেই।

নীলুর মনে খুব ভয় ধরে যায়। খাবারের কষ্ট যে কোনদিন হতে পারে, এমন কোনদিন যে আসতে পারে যেদিন ঘরে খাবার নেই বলে ক্ষুধায় পেটের মধ্যে নাড়িভুঁড়ি চচ্চড়ি হচ্ছে, এ যেন ভাবাই যায় না। ছোটবেলা থেকে প্রাচুর্যের মধ্যে সে মানুষ। তার আশেপাশে দারিদ্র্য সে দেখেছে কিন্তু সে না খেতে পাওয়ার মত মর্মান্তিক দারিদ্র্য নয়। সখ করে সে কখনও কখনও দরিদ্রের অন্নে ভাগও বসিয়েছে কিন্তু আজ সত্যসত্যই সকলকে না খেতে পেয়ে মরতে হবে, এতটা বাড়াবাড়ী সে যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না।

সে ভয়ে ভয়ে মুখের ভাত নামিয়ে রেখে বলে ওঠে—তাহলে কি হবে, নগেনকা?

নগেনকাকা বলে—কি হবে? সকলকে মরতে হবে। এর আর কোন ভুল নেই জেনো। লোকে কোথা থেকে চাল পাবে বলো? মাঠে যা ধান হয়েছিল' বন্যায় সব শেষ। লোকের ঘরে যা বেঁচেছে, তা এখন একে অন্যের বিপদে কিছু দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ক'দিন আর কে দিয়ে যেতে পারে? অতএব যাদের কিছু নেই তারা আগে মরবে।

যাদের কিছু আছে তারা শেষে মরবে। এর কোন ভুল নেই। এ হবেই।

নীলু তবু ভয়ে ভয়ে বলে ওঠে—কেন আবার মাঠে ধান হবে না?

নগেনকাকা হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে। হাসি থামিয়ে বলে—বেশ বলেছ বটে! তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ। মাঠে নামতে এখনও ছ'মাস দেরী। ততদিন বেঁচে থাকার মত খাবার কি সকলের ঘরে আছে, ভাবো? যদি বা কেউ বেঁচেও থাকে, মাঠে চাষ হবে কি করে? সব ধানের জমিতে লোনা জল ঢুকে গেছে। এবছর ভালো বৃষ্টি হলে জমির কিছুটা লোনা ভাব কাটবে। তার পরের বছর সামান্য চাষ হতে পারে। জমির লোনাভাব একেবারে কাটতে কাটতে, সে পাঁচ-সাত বছরের ধাক্কা। ততদিনে নির্ঘাৎ কেউ বেঁচে থাকবে না।

নীলুর খুব মন খারাপ হয়ে যায়। মাত্র কয়েকদিন আগে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তারা বেঁচে গেছে। তখন মারা গেলে আজ তাকে এই না খেতে পেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে শুকিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর ভাবনা ভাবতে হত না! তার এত মন খারাপ হয়ে যায় যে, সে আর ভাত খেতে পারে না। অর্দ্ধেক ভাত ফেলে রেখেই সে উঠে পড়ে। মুখ ধোওয়ার জন্য পুকুরঘাটের দিকে যায়।

পুকুরঘাটে এসে দেখে, পুকুরের অপর পাড়ে একটা ছোট নালার মধ্যে রাসু কি যেন দেখছে বেশ মন দিয়ে। মুখ ধুতে ধুতে এপার থেকে নীলু চেঁচিয়ে বলে—কি দেখছিস রে অত ঐ নালার মধ্যে?

রাসু মুখ না ঘুরিয়েই জবাব দেয়—নালার মধ্যে মস্তবড় কি একটা যেন নড়ছে রে! কোন জন্তু-টন্তু হবে বোধ হয় রে। নদী বা সাগর থেকে হয়ত ভেসে এসেছিল। জল কমে গিয়ে এখন নালার মধ্যে আটকিয়ে গেছে।

নীলু ছুটে ওপারে চলে যায়। দেখে, সত্যি সত্যি কি একটা প্রকাণ্ড জন্তু যেন চলে বেড়াচ্ছে। দুজনে মিলে বেশ কিছুক্ষণ কথা না বলে মনোযোগ দিয়ে দেখে যেতে লাগল। সহসা রাসু চেঁচিয়ে বলে ওঠে—বুঝেছি রে, এটা ভেটকী মাছ।

নীলু রাসুর কথা উড়িয়ে দিয়ে বলে—দূর, অতবড় ভেটকী মাছ আবার হয় নাকি ?

রাসু সোজা নীলুর দিকে তাকিয়ে বলে—তুই জানিস, নদীর পোনামাছ কতবড় হয় ? এক একটা দু তিন মন পর্যন্ত হয়, তা জানিস ? নদীর ভেটকী মাছ তবে অত বড় হবে না কেন ? আচ্ছা, দেখবি ? তুই এক কাজ কর, চীৎকার করিস না, লোক জানাজানি হয়ে যাবে। নগেন কা'কে একটা বস্তা নিয়ে আসতে বল। না, না একটা নয়, দু-তিনটে যা পায়। নালার এক মুখ তো বন্ধ আছে। আর একটা মুখে মাটি দিয়ে বন্ধ করছি।

নীলু রাসুর কথা শুনে দৌড়ে চলে যায় টংঘরে। নগেন কাকা খবর শুনে লাফিয়ে ওঠে। গোটাকয়েক বস্তা হাতে নিয়ে নগেন সামন্ত নালার কাছে এসে মাছ দেখে আনন্দে বলে ওঠে—হ্যাঁ রে, এটা বোধ হয় ভেটকী মাছই। বাপ্ রে, কি লম্বা শিরের কাঁটা সব! এক একটা এক হাতেরও বেশী লম্বা হবে।

কি ভাবে ধরা হবে বিস্তর জল্পনা কল্পনা হল। নালায় জল খুবই সামান্য। মাছটা বলতে গেলে জলে ভেসে নেই। তার শরীরের কিছু অংশ পাকে ডুবে আছে।

নগেন কাকা বলল—এর ওজন আধমন তো হবে। এ নদীর মাছ না হয়ে যায় না। কিন্তু নালার জলে বস্তা দিয়ে চেপে একে ধরার বিপদ আছে। শিরের কাঁটা যদি গায়ে লাগে তো এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাবে। নালায় কতটুকুই বা জল ? জল সিঁচে দেওয়া যাক বরং।

যেমন কথা, তেমন কাজ। রাসু ও নগেনকাকা লেগে গেল নালাকে জলশূন্য করতে। আধ ঘণ্টার মধ্যে সব জল সেঁচা হয়ে গেল। মাছ তখন খাবি খাচ্ছে। তবু খুব সাবধানে তিন চারখানা বস্তা চাপা দিয়ে ধরা হল সে মাছ। তারপর তিনজনে মিলে তাকে নিয়ে এল সামনে। দোকানের দাঁড়িপাল্লা আর ওজনের বাটগুলো মাটির তলা থেকে উদ্ধার করা গিয়েছিল। সেই দাঁড়িপাল্লা দাঁড় করিয়ে মাছটার ওজন নিয়ে দেখা গেল, ওজন হয়েছে চব্বিশ সের।

নীলু তারপর ভাল করে লক্ষ্য করে দেখে, তার মুখের হাঁ-তে মানুষের মাথা ঢুকে যাবে। তার গোটা গায়ে শ্যাওলা জমে গেছে। মনে হচ্ছে, মাছটার গায়ে যেন চুল গজিয়েছে। সেজন্যই জলের ভেতর থাকার সময় ওটাকে জন্তুর মত মনে হচ্ছিল। নীলুর আনন্দ আর ধরে না। তারপর রাণীর দাদাকে ডেকে আনল নগেনকাকা। খবর শুনে রাণীও এসে হাজির। তারা তো মাছ দেখে থ।

শেষে নগেনকাকা রাণীর দাদার মাথায় মাছটা চাপিয়ে পাঠিয়ে দিলেন জগৎ মাইতির বাড়ীতে শংকরীপ্রসাদের কাছে। নীলু ও রাম্বু চলল পেছন পেছন, যেন কোন এক বিখ্যাত ব্যক্তিকে সংবর্ধনা করে নিয়ে যাচ্ছে তারা।

জগৎ মাইতিদের বাড়ীর সামনে যখন মাছ নামান হল তখন গোটা পাড়া ভেঙ্গে এল দেখতে। রাম্বু প্রথম মাছটা দেখেছিল বলে সে-ই সকলের প্রশংসা কুড়াল বেশী করে। অনেক সমস্যার পর সে মাছ কাটা হল। জগৎ মাইতিদের সমস্ত শরীকদের মধ্যে সে মাছ বিতরণ করা হল। রাণীর দাদা কিছু পেল। নগেনকাকার জন্যও কিছু পাঠান হল। কিন্তু এই মাছ নিয়ে সেদিন এক বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল। অবশ্য ঘটনাটা যখন ঘটে তখন নীলু ঘুমিয়ে। পরে সে শুনেছে।

জগৎকাকাদের তিন শরীকের মধ্যে জগৎকাকা আর তাঁর ছোট ভাই একসঙ্গে থাকেন। ছোট ভাই এর তখনও বিয়ে হয় নি। বাড়ীর অর্দ্ধেক অংশ জুড়ে থাকেন জগৎকাকার বড় ভাই-এর পরিবার। বড় ভাই মৃত কিন্তু তাঁর ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী ঐ অংশে থাকে। জগৎকাকা-দের বাড়ীর পাশেই জগৎকাকাদের জেঠার বাড়ী। তাঁর নাম অন্নদা মাইতি। তাঁর বাড়ীতেও কিছু মাছ পাঠান হয়েছিল। অন্নদা মাইতিকে নীলু দাদামশাই বলে ডাকে। রমলা ছিলেন অন্নদা মাইতির ধর্মকন্যা। তিনি অন্নদা মাইতিকে আপন পিতার মতই ভক্তি করতেন।

গোলমালটা বাধল ঐ মাছের মুড়োটা নিয়ে। নীলু রমলার কাছে বায়না ধরেছিল ঐ মাছের মুড়োটা যেন তাকে আর রাম্বুকে দেওয়া হয়। যেহেতু তাদের জন্যই মাছটা ধরা পড়েছে তাই ছিল ঐ দাবী।

কিন্তু রান্নার পরে জগৎ কাকার স্ত্রী মুড়োটা নিজেদের জন্য সরিয়ে রাখে। নীলু তখন না খেয়েই ঘুমিয়ে গেছে। রাসু সে নিয়ে কান্নাকাটি বা কোন কিছু বলে থাকবে। ফলে সে জগৎ কাকার ছোটভাই কানাই মাইতির হাতে সামান্য প্রহৃত হয়। এই নিয়ে রমলা ও শংকরী প্রসাদ নিদারুণ অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁরা বোধ হয় সেই রাতেই তাঁদের টং-ঘরে চলে যেতে চান। যখন মনোমালিন্য ও কথা কাটাকাটি চরম পর্যায়ে ওঠে তখন অন্নদা মাইতি সকলের মাঝে এসে মীমাসা করে দেন।

তিনি শংকরীপ্রসাদকে বলেছিলেন—তোমাদের এখানে থাকা না পোষায়, আমার বাড়ীতে চলে এসো। আমার যখন ঘর রয়েছে তখন আমার মেয়ে জামাই, নাতি-নাত্‌নীরা আমার ঘরেই থাক।

সেই রাতেই তাঁরা সকলে অন্নদা মাইতিরদের বাড়ীতে চলে এসেছিল। নীলু ঘুমিয়েছিল। কেউ তাকে কোলে করে নিয়ে এসে থাকবে। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে সে সব কথা শোনে।

অন্নদা দাত্বর গোটা মাথা ছিল পাকা চুলে ভর্তি। তখন তাঁর বয়স আশীর কম নয়। কিন্তু তিনি ঐ বয়সে যথেষ্ঠ শক্ত-সমর্থ ছিলেন। লম্বা, পাতলা এবং মেদ বিহীন চেহারা ছিল তাঁর। ঘরে ছিল তাঁর দুই স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রীর কোন সন্তানাদি হয় নি। তিনি তখন একেবারে বুড়ী। দ্বিতীয়া স্ত্রীর বয়স তখন বোধ হয় চল্লিশের কাছাকাছি।

এখানে হৈ-হট্টগোল কম। খেলার সাথীরও অভাব হয়নি নীলুর। সাথী ছিল সতী মাসী, দীপু—অন্নদা দাত্বর ছেলে। দীপু ছিল তারই বয়সী। দীপু নীলু ও রাসুকে মামা বলত। তারাও দীপুকে মামা বলত। নীলু এখানে এসে একটা পরিবর্তন যা লক্ষ্য করল তা হলো, রমলা আলাদা রান্নাঘরে রান্না করতে লাগলেন। এখন খাওয়ার সময় সেই তেতো চালটা তাদের খেতে হয়। এক বাড়ীতে দুই হেঁসেলের রান্নাকরা তরকারী চালাচালি হয়। বেশ আনন্দে কেটেছে এখানে নীলুদের।

এখানে থাকার সময় নীলু একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে, যখন

কয়েকজন মেয়ে বা পুরুষ একসঙ্গে বসে ঝড়-বন্যার গল্প করত নিজেদের মধ্যে তখনই একটা কথা সকলকে বলে তা হলো, সেদিন ঝড় থেমে যাবার আগে ভোর রাতে যে তিনটে ডাক শোনা গিয়েছিল তা সকলেই স্পষ্ট শুনেছে।

সেদিন বিকালে এসেছিল মোক্ষদা পিসী। মোক্ষদা ধোপানী। বন্যায় তার স্বামী প্রাণ হারিয়েছে। সে তখন ভর যুবতী। মোক্ষদা এসে মাঝে মাঝে সকলের ময়লা জামা, কাপড়, শাড়ী ইত্যাদি নিয়ে যায়। কাপড় কেচে আবার দিয়ে যায়। পয়সা নেয় না। মা ও দিদিমা তাকে মুড়ি বা চাল দেয়। পয়সা দিয়ে তো পেট ভরবে না। মোক্ষদার কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। সে থাকত নীলুদের ইসকুলের পুকুরপারের ধোপাপাড়ায়, কামারশালের উল্টোদিকে। মোক্ষদার সঙ্গে অন্নদা দাদুর খুব ঠাট্টা ফাজলামো চলত। মোক্ষদা সেদিন রমলাকে বলল—হ্যাঁ দিদি, আমরাও স্পষ্ট শুনেছি সে ডাক। কে যেন বলছে আয়, আয়, ফিরে আয়। তিনবারই কে যেন বলল এ কথা।

সবাই একবাক্যে স্বীকার করে সে কথা। দিদিমা বলে—শিবঠাকুরই তো তাঁর ভূতপ্রেতদের পাঠিয়ে এত কাণ্ড করালেন। তিনিই বোধ হয় শেষকালে ওদের আবার ডেকে নিলেন। না হলে তো মা বসুমতী একেবারে জলে তলিয়ে যেতেন।

এই একই ধরনের কথা নীলু বহুবার সকলের মুখে শুনেছে। সকলে অবশ্য একরকম ব্যাখ্যা দিত না। কিন্তু সকলেই বলত শুনেছে সেই ডাক—আয়, আয়, ফিরে আয়!

বড় হয়ে নীলু অনেক চিন্তা করেছে, কি ছিল সেই ডাক? সকলে হয়ত সেদিন শোনে নি। অপরের মুখে শুনে হয়ত কেউ কেউ বলে থাকবে তারা নিজেরা শুনেছে বলে। কিন্তু সকলে মিথ্যে কথা বা মনগড়া কথা বলেছে, এ না ও হতে পারে। অনেক ভেবে একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নীলু পেয়েছিল।

চাপের তারতম্যের কারনেই বায়ুমণ্ডলে প্রবাহের সৃষ্টি হয় চাপেরই সমতা রক্ষার জন্য। প্রবাহ জোর হলেই ঝড়ের সৃষ্টি হয়। আবার

তারতম্যের অবসান ঘটার মুহূর্তে বায়ুমণ্ডলে প্রবল ধাক্কা লাগা সম্ভব যার ফলে ঐ রকম কিছু শব্দের সৃষ্টি হওয়া খুব অসম্ভব ব্যাপার নাও হতে পারে।

আপাততঃ নীলুদের পড়াশোনের কোন বালাই নেই। ইসকুল ঘরটা বেঁচেছে কিন্তু তার দেওয়াল ও চালের বেশ ক্ষতি হয়েছে। ঘর সারান না হলে ইসকুলে পড়ান সুরু হওয়া অসম্ভব। নীলুদের তাতে অবশ্য কোন দুঃখ নেই। বরং যত দেরীতে সারান হয় ততই ভালো।

পৌষমাস এসে গেল। শীত পড়েছে! শীতের ধানক্ষেত ফাঁকা। ধানকাটার আর এ বছর কোন ঝামেলা নেই। কোন বাড়ীতে এবছর ধানের গাদা বসে নি। কিন্তু সকলেই ডাঙ্গা জমিতে প্রচুর শীতের সব্‌জি লাগিয়েছে এবার। ফলছেও প্রচুর। এক একটা বেগুন হচ্ছে প্রায় এক সের করে। এত বড় বেগুন আগে কেউ এ অঞ্চলে কোনদিন দেখেনি। নীলুদের বাস্তুজমিতে আলু, লালালু, সোনামুগ, কপি এরকম অনেক কিছুই লাগান হয়েছে। নীলু মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসে।

একদিন নীলুকে জমির তদারকী করতে করতে নগেন কাকা বলেছিল—ভগবান এবার যেমন অন্ন দেয় নি তেমন প্রচুর তরী-তরকারী দিয়েছে। এখন লোকে এ সব খেয়ে কিছুদিন বেঁচে থাকবে।

সকলের মুখেই ঐ কথা। এবারের অত্যাশ্চর্য সবজী ফলন এক-মাত্র ভগবানের দয়াতেই সম্ভব হয়েছে বলে সকলের ছিল বিশ্বাস। নীলু পরে বুঝেছে কথাটা। মাটি ছিল যথেষ্ঠ ভেজা। তার উপর পড়েছিল প্রচুর পলিমাটি। যথেষ্ঠ জলে ও খাদ্যের জন্য গাছের ফল দানে কোন কার্পন্য ঘটে নি। পুরানো মাটির দেওয়ালের মাটি বেগুন গাছের পরম উপাদেয় খাদ্য। সেই মাটিরও সে বছর কোন অভাব ছিল না। তাই অমন বড় বড় বেগুন ফলেছিল সেবার।

একদিন ক্যানেল পেরিয়ে ওপারে জেঠাদের বাড়ী গিয়েছিল নীলু সেখানে তার বাবার দেওয়া তেতো চালের ভাতই খেয়েছিল। হ্যাঁ, মাছ বটে ওখানে! জেঠাদের বাস্তুর চারদিকের পরিখায় যা মাছ

ঢুকছে এবার তা সারা বছরেও ওরা খেয়ে শেষ করতে পারবে না। নগেন কাকার কথাই ঠিক—লোকে আপাততঃ কিছুদিন এই মাছ আর তরকারী খেয়ে বাঁচবে। কিন্তু তারপর ? তারপর কি ? নীলু জানে না। ওসব বেশীক্ষণ নিয়ে মাথা ঘামাতেও সে পারে না, তার ভয় করে।

নীলু প্রায়ই আসে তাদের বাস্তু বাড়ীতে। নগেন কাকা তখন লোকজন লাগিয়ে তাদের বাস্তুজমি পরিষ্কার করায় ব্যস্ত দিনের পর দিন। যে আম, নারকেল এবং তেতুল গাছগুলো পড়ে গিয়েছিল ঝড়ে সেগুলো চিরে জ্বালানীর কাঠ ও তক্তা আলাদা আলাদা করে জমা রাখা হচ্ছে। ঘরের পড়ে যাওয়া দেওয়ালের মাটি সরিয়ে এক জায়গায় ক্যানেল পাড়ের সমান করে উঁচু করা হচ্ছিল। ঐ উঁচু ভরাট জমিতে তাদের নতুন বাস্তু হবে বলে নগেনকাকা তাকে বলেছে। নতুন বাড়ী তৈরী হলে তারা এখানে উঠে আসবে। ঘরের কাজ তখনও সুরু হয় নি।

এখানে এলে রাণীর সঙ্গে দেখা হয়। দেখা হয় পুলিন, প্রানেশদের সঙ্গেও। রাণীদের খাবারের যে খুব কষ্ট চলেছে তা রাণীর মুখ দেখে সে বুঝতে পারে। তাদের বাস্তুজমি বিশেষ নেই। তাই যথেষ্ট সবজি তারা ফলাতে পারে নি। তবে রাণীর বাবা ও দাদা এখন লোকের বাড়ীতে ঘরামির কাজ করে। নতুন ঘরের কাজে অনেকেই হাত দিয়েছে। এতএব তাদের কাজের অভাব নেই। কিন্তু হলে হবে কি, উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও ভাতের যোগাড় করা মুশকিল: সেদিন যা ঘরে নিয়ে আসে তাই দিয়ে রান্না হয় তাদের। যেদিন কিছু না পায় সেদিন উপোসে থাকতে হয় তাদের। তাদের নৌকা বন্যার জলে কোথায় ভেসে গিয়েছে।

একদিন রাণীদের বাড়ীতে গিয়ে নীলু দেখে, রাণী ভাতের হাঁড়ি উনানে চাপিয়ে শুকনো মুখে বসে আছে। তার দাদা বা বাবা কেউ নেই বাড়ীতে। রাণীর মা নীলুদের পুকুরে কলমী শাক তুলছে। নীলু দেখে রাণী দরজার দিকে পেছন ফিরিয়ে বসে রয়েছে।

নীলুর মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল। সে পা টিপে টিপে এগিয়ে

গিয়ে পেছন থেকে দু'হাত দিয়ে রাণীর চোখ টিপে ধরে। রাণী শুষ্ক মুখে বলে—নীলু! হাত সরিয়ে নে।

নীলু হাসতে হাসতে বলে—ভাত রাঁধছিস্?

রাণী যেন কেমন চমকিয়ে ওঠে। তারপর নীলুর দিকে উদাস দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষন নীরবে তাকিয়ে থেকে বলে—ভাত রাঁধছি?

বলতে বলতে তার চোখে জল এসে যায়। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে রাণী, নীলু অবাক হয়। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—এ কি রে রাণী, তুই কাঁদছিস?

রাণী চোখের জল মুছতে মুছতে বলে—তাকিয়ে ছাখ, হাঁড়ির মধ্যে কি রান্না হচ্ছে?

নীলু কৌতূহলী হয়ে হাঁড়ির ভেতর দৃষ্টি চালায়। দেখে জল ফুটছে কিন্তু ভেতরে আর কিছু আছে বলে তার মনে হল না। সে কিছু বুঝতে পারে না, কি রাঁধছে রাণী। তাই প্রশ্ন করে—দেখলাম কিন্তু কি ফুটছে রে।

রাণী ম্লান হেসে বলে—জল। জল ফুটছে রে।

নীলু বলে—তবে যে বললি, ভাত রাঁধছিস?

রাণী এবার উজ্জ্বল হাসিতে মুখের সমস্ত দুঃখভাব সরিয়ে দিয়ে বলে ওঠে—আমি বললাম কোথায়? তুই তো বললি। ভাত রাঁধব যে, চাল পাব কোথায়? কাল সারাদিন, বলতে গেলে, পেটে আমাদের কিছুই পড়ে নি। সামান্য ক্ষুদভাজা একমুঠো করে খেয়ে কাটিয়েছি। আজ সকালে দাদা চাল আনতে গেছে। লোকে খাটিয়ে পয়সা দিতে চায় কিন্তু চাল কেউ দেয় না। পয়সা দিয়েও চাল মেলে না। ভাতের জল ফুটাচ্ছি। দাদা চাল আনতে পারলে ভাত হবে। নয়তো এই জলে মা যে কলমী শাক তুলছে তাই-ই সেদ্ধ হবে আজ। তাই-ই খেতে হবে।

রাণীর কথা শুনে বুকে বেদনা অনুভব করে নীলু। সে কোন উত্তর না দিয়ে ঘুরে টংঘরের দিকে দৌড়িয়ে যায়। পেছন থেকে রাণী চীৎকার করে ডাকে—এ্যাই নীলু, কোথায় যাস? শুনে যা।

নীলু দৌড়াতে দৌড়াতে মুখ না ঘুরিয়েই বলে—আসছি, এখনই আসছি।

টংঘরে এসে দেখে ঘর খোলা। নগেন কাকা দূরে লালালু গাছের গোড়ায় মাটি দিচ্ছে। নীলু ঘরে ঢুকে সন্তর্পনে চালের বস্তা থেকে কিছু চাল বার করে একটা ছোট চটের ব্যাগে ভরে চাদরের আড়ালে লুকিয়ে তাড়াতাড়ি রাণীর কাছে ফিরে আসে।

চাল দেখে রাণী অবাক হয়, ভীত হয়ে পড়েও। সভয়ে বলে ওঠে একি! এ কি করেছিস তুই? তুই ঘর থেকে চাল চুরি করে নিয়ে এলি? তোর চুরি করা চাল আমি নেব না! না পাই খেতে, তবু এ আমি নেব না।

নীলু সহজ সুরে বলে—আমার খুব খারাপ লেগেছে রে রাণী, তুই না খেয়ে আছিস। নগেন কাকা কি বলেছে জানিস? সবাই শেষ পর্যন্ত না খেতে পেয়ে মারা যাবে। দেশে তো এবার ধান হয়নি। আমাদের যা আছে তাও শেষ হয়ে যারে। শেষ হলে আমরাও মারা যাব। কিন্তু এখন তো এগুলো তুই নে। তোর খুব ক্ষিদে পেয়েছে না রে রাণী?

রাণী আমতা আম্‌তা করে বলে—তা পেয়েছে। কিন্তু—

নীলু সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—অথচ ছাখ্ আমার পেট ভর্তি। তুই না খেয়ে আছিস জেনে আমি কি আর খেতে পারব ভাবিস? নে, এগুলো নে। একহাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে অপর হাতে রাণীর হাত ধরে নীলু বলে—নে, ধর।

রাণী ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে। নীলু তার চাদরের একপ্রান্ত দিয়ে রাণীর চোখের জল মুছিয়ে দেয়। কিছু পরে রাণী একটু সহজ হয়, চোখ মোছে। তারপর সহজ হয়ে নীলুর দিকে হাত বাড়ায়। নীলু অমনই ব্যাগটা তার হাতে তুলে দেয়। নীলুর দিকে চেয়ে রাণী হাসে। নীলুও রাণীর চোখে চোখ রেখে হাসে। দুজনের হাসিতে দুজনের ব্যাথা দূর হয়ে যায়।

নীলুকে বসিয়ে রেখে রাণী পুকুর থেকে চাল ধুয়ে আনে। হাঁড়িতে

চাল চাপিয়ে দিয়ে বসে নীলুর সঙ্গে গল্প করতে যাবে এমন সময় শ্রীহরির বৌ এল। তার হাতে কিন্তু খড়। সে রাণীর উনুনে খড়গুলো ধরিয়ে নিয়ে আগুন নিয়ে যাবে। দেশলাই খরচ বাঁচিয়ে এভাবে মেয়েরা একের রান্নাঘর থেকে খড় জ্বেলে আগুন নিয়ে যায় নিজেদের রান্নাঘরে। শ্রীহরির বৌ নীলুকে দেখে অল্প হাসে। তারপর খড়ে আগুন ধরাতে ধরাতে রাণীকে বলে—ভাত রাঁধছিস? চাল পেলি কোথায়?

রাণী সহজ ভাবেই জবাব দেয়—মিশ্রদের বাড়ী থেকে দাদা এনেছিল। দাদা তো এখন ওদের গাছ চিরাই-এর কাজ করছে। তোমাদের রান্না হচ্ছে, খুড়ী?

শ্রীহরির বৌ যেতে যেতে বলে—হচ্ছে। তবে তোদের মত ভাত নয়। ঐ শাক ডাঁটা এইসব বসাব। একটু গিয়ে থেমে পেছন ফিরে বলে—কাল হয়েছিল চাট্টি ভাত, খেয়েছি। আজ তোরা খা। আমি চলি।

শ্রীহরির বৌ চলে গেল। নীলু হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। রাণী যদি অসাবধানে বলে দিত যে নীলু তাকে চাল এনে দিয়েছে তাহলে বিপদ হত তার। সহসা নীলুর মনে খটকা লাগে, শ্রীহরি কি ভাবে ফিরে এসেছে? না হলে তার বৌ অত হেসে হেসে কথা বলত না। ঝড়ের রাতে শ্রীহরির বৌয়ের ফোঁপানির কথা নীলুর মনে পড়ল। ব্যাপারটা জানার জন্য সে রাণীকে বলে—শ্রীহরি কি ফিরে এসেছে?

রাণী বলে—হ্যাঁ, দিন সাতেক আগে মাত্র ফিরেছে।

নীলু শুধায়—এতদিন তবে কোথায় ছিল?

রাণী বলে যায়—সে অনেক কথা। শ্রীহরি কোনরকমে বেঁচে গেছে। ও জন্‌কা গিয়েছিল মাটি কাটতে। ও জায়গা তো আবার সাগরের একেবারে কাছে। ওখানে আরো অনেক বেশী জল হয়েছিল। শ্রীহরি এসে গল্প করেছে ও নাকি সাগর থেকে মস্ত বড় তিনটে ঢেউ উঠে আসতে দেখেছে।

—কত বড় ঢেউ? নীলু শুধায়।

—এক একটা নাকি তালগাছের ছেয়েও উঁচু, রাণী হাত তুলে দেখিয়ে বলে—ঐ তিনটে ঢেউ-এর জলেই নাকি বন্যা হয়ে গেল। সেই জলেই আমাদের এখানে এসেছে। ও যে বাড়ীতে ছিল সে বাড়ীর কিছু ছিল না। শ্রীহরি ভেসে যায় বন্যার জলে। ভাসতে ভাসতে ও একটা খড়ের চালে আশ্রয় পায়। চালটা একটা গাছের মাথায় আটকিয়ে ছিল।

নীলু হঠাৎ বলে ওঠে—সেই যে রে কালা যেমন ছিল? বলেই নীলু চুপ করে যায়। স্মৃতিটা বড় বেদনার। রাণী কথা থামিয়ে নীলুর দিকে তাকায়। কিছু সময়ের জন্য কথা বলতে সে যেন ভুলে যায়।

একটু পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাণী বলে—সেও যদি শ্রীহরির মত বাঁচতে পারত! যাক গে, যা বলছিলাম, ঐ চালের উপর সারারাত ছিল শ্রীহরি। সকালে দেখে, ওরই পাশে গাছের ডালে রয়েছে এক জ্যান্ত কেউটে সাপ। সেটা ডালকে জড়িয়ে ধরে রয়েছে। সারারাত শ্রীহরি কেউটে সাপেরই পাশাপাশি ছিল তবু সাপ ওকে কামড়ায় নি। এমনই ভগবানের খেলা!

—তারপর? রুদ্ধশ্বাসে নীলু বলে—তারপর কি হল?

—তারপর বহু কষ্টে, নানা জায়গায় আশ্রয় নিতে নিতে, এতদিনে বাড়ী ফিরেছে। মাঝে নাকি ওর মাথাও একটু খারাপ হয়েছিল। এখন তো বেশ ভালই দেখা যাচ্ছে। খাটছে-খুটছে, কাজকর্ম করছে। না হলে দেখলি না, শ্রীহরির বৌ কেমন হাসছিল?

কথা শেষ করে রাণী নীলুর চোখে চোখ রেখে বলে—কি অত দেখছিস?

—তোকে দেখছি, নীলু খুব আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে।

রাণী লজ্জা পায়, বলে—কি দেখছিস আমাকে?

নীলুও লজ্জা পায়। চোখ নামিয়ে বলে—তুই খুব সুন্দর হয়েছিস দেখতে।

রাণী সশব্দে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে—খেতে পাই না।

না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে মরছি আর তুই বলছিস কিনা আমি সুন্দর হয়েছি !

নীলু চোখ তুলতে পারে না। একইভাবে বলে—না রে, তুই সুন্দর হয়েছিস।

রাণী এগিয়ে আসে। কাছ থেকে খুব আস্তে আস্তে বলে—আমাকে তোর খুব ভালো লাগে, না রে ?

নীলু অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে—হুঁম্। তোর জন্য খুব কষ্ট হয় রে আমার।

রাণী হাত দিয়ে নীলুর মুখ ঘোরায়। নীলু চোখ মেলে চায় রাণীর চোখে। সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে ফেলে। রাণী ঝুঁকে বলে কষ্ট ?

—হ্যাঁ রে, খুব কষ্ট হয় তোর জন্য।

—কিসের কষ্ট ?

সহসা নগেনকাকা দূর থেকে নীলুকে ডাকে। অমনি নীলু তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—যাই এখন। আবার যখন আসব তখন কিছু চাল নিয়ে আসব। এই বলে সে রাণীর উত্তরের অপেক্ষা না করে টংঘরের দিকে দ্রুত পা বাড়াল।

আরো কিছুদিন এভাবে কেটে গেল। শীত প্রায় যায় যায় করছে। গরম তখনও আসি আসি করেও যেন আসছে না। একদিন শংকরীপ্রসাদ তাঁর নতুন ঘরের পত্তন করলেন। ঈশ্বর আচার্য এসে অনেক মাপজোক করে খুঁটি পুঁতে দিয়ে গেলেন। বাড়ীটা এবারে হচ্ছে পাটের গুদাম আর দক্ষিণের বারান্দার মাঝামাঝি এবং ক্যানেলের পাড় ঘেঁষে। বাড়ীর ভিত ক্যানেলের পাড়ের চেয়ে হাত দেড়েক উঁচু।

কিছুদিন হলো, নীলু ও রাসু এক নতুন মাষ্টারের কাছে পড়াশোনা করছে। তাঁকে সকলে রজনী মাষ্টার বলে ডাকে। তিনি এই গাঁয়েরই লোক। অনেক দূরের কোন ইসকুলে মাষ্টারী করতেন যেন। সেখানেও বন্যা হয়েছে। ইসকুল ঘর সেখানে নষ্ট হয়ে গেছে। আপাততঃ তিনি অন্নদা মাইতির বাড়ীর বারান্দায় একটা পাঠশালা খুলেছেন। সেখানে কেবল সকালেই পড়ান হয়। দুপুর, বিকাল আর রাতে ছুটি।

অফুরন্ত ছুটির মাঝে একটুখানি যেন আটকিয়ে থাকা। পড়াশোনার তেমন কোন চাপ নেই। অনেক কিছু এ ক'মাসে তারা ভুলে গেছে। রজনী মাষ্টার পুরানো পড়াগুলোই আবার পড়াচ্ছেন। আপাততঃ।

বড়রা অনেকে রজনী মাষ্টারের পাঠশালায় কথাবার্তা বলতে আসেন। তাঁরা গল্প করেন। অতএব এ পাঠশালায় পড়ার চেয়ে গল্পই হয় বেশী। কেউ না থাকলে অন্নদা দাদু তো আছেই। মাষ্টার-মশাই খুব তামাক খান। কল্‌কেতে আগুন সাজাবার জন্য কারোর প্রয়োজন হয় না তাঁর। তাঁর পাশেই থাকে খড়ের নুটি। তাতে সর্বক্ষন রাবনের চিতার মত আগুন জ্বলে। যখন ইচ্ছে তাঁর নিজেই তামাক সাজিয়ে খাচ্ছেন। কেউ এলে খাওয়াচ্ছেনও।

ছেলেরা গল্প শোনে আর যে যার মত পড়ে। যখন তিনি তামাক সাজান তখনই নীলুর মনে পড়ে যায় কালার কথা। তখনই তার বুকটা এক অব্যক্ত বেদনায় টন্‌টন্‌ করে ওঠে।

দুপুরে প্রায় নীলু তখন বাস্তুর দিকে আসে। সে দেখে তাদের নূতন বাড়ীর দেওয়াল মাটির হচ্ছে না। টালির ঘরের গরান আর শাল কাঠ দিয়ে ছিটে বেড়ার দেওয়াল হচ্ছে। নগেনকাকা বলেছে উপরে অবশ্য খড়ের চালই হবে। টালির টুকরোগুলো ভাঙ্গা হচ্ছে। ওগুলো নাকি মাটির মেঝের নীচে দেওয়া হবে যাতে ইঁদুরের গর্ত খোঁড়ার অসুবিধা হয়। দোকানঘরের সামনের পাকা থামগুলো সামনের পুকুরে পর পর ফেলে সাজিয়ে সাজিয়ে চমৎকার ঘাট বানানো হয়ে গেছে।

এবারে ঘর অবশ্য বেশ ছোট—আগের ঘরের তুলনায় খুবই ছোট। মাঝে একটাই বড় ঘর। তার তিনপাশে ঢাকা বারান্দা—বেশ চওড়া বারান্দা। সামনে খোলা বারান্দা। তবে এটা খুবই ভাল লাগে নীলুর যে এবারে সামনের বারান্দায় বসেই ক্যানেলের জল দেখা যাবে।

একদিন দুপুরে নীলু এসেছে টংঘরে। রাসু তাকে দেখে বলল—চল্‌ ক্যানেলে এক জায়গায় তগি ফেলব।

তগি কি জিনিস বুঝতে পারে না নীলু। তাই প্রশ্ন করে। রাসু বলে—চল না, দেখবি।

বাড়ী থেকে ফার্লং দুই দূরে এসে রাস্থর তগি দেখে নীলু বুঝতে পারে তগি কি জিনিস। কিন্তু এতে কিভাবে মাছ ধরা যাবে সে বুঝতে পারে না।

রাস্থ তগির কাছে এসে বসে। নীলুও বসে তার পাশে। হঠাৎ বেশ কিছু পরে নীলু দেখে ক্যানেলের মাঝে একটা মাছ লাফ দিয়েছে আর তগির দড়ি খুলে খুলে যাচ্ছে। রাস্থ দু'হাতে দড়ি গুটাতে থাকে একটু পরে এক পাঁচ-ছ সেরের মত রুই মাছ ডাঙ্গায় উঠে আসে। নীলু রাস্থর কাণ্ড-কারখানা দেখে অবাক হয়। মনে মনে ভাবে, রাস্থ যে কত বিদ্যাই জানে।

একটা গামছা জলে ভিজিয়ে মাছটাকে বেঁধে রাস্থ নীলুকে বলে—যা এটা সদর পুকুরে ছেড়ে দিয়ে আয়। তাড়াতাড়ি যাবি না হলে মাছ মরে যাবে।

নীলু মাছ নিয়ে দৌড় দেয়। পুকুরে মাছ ছেড়ে দিয়ে আবার দৌড়িয়ে ফিরে আসে। সেদিন রাস্থ অমন আরো দুটো মাছ ধরেছিল আর নীলুকে তিনবারই মাছ নিয়ে দৌড় লাগাতে হয়েছিল।

মাছ ধরতে ধরতে নীলু রাস্থকে প্রশ্ন করেছিল—এসব মাছ পুকুর থেকে আবার কবে ধরা হবে ?

রাস্থ উত্তর দিয়েছিল—আমরা যখন নতুন বাড়ীতে উঠে যাব তখন ধরা হবে। এখন তো বন্যার জল কমে গেছে। যে সব মাছ নদী থেকে বন্যার জলে ভেসে ক্যানেলে এসেছিল তাদের কিছু এখনও রয়ে গেছে। সেইগুলোই এখন তগিতে ধরা পড়ছে। বেশীদিন থাকবে না। যত-গুলো পারি, ধরে রাখি।

নীলু তাকিয়ে দেখে দূরে রাস্থর মত অনেকেই তগি নিয়ে বসেছে নীলু হঠাৎ প্রশ্ন করে—আমাদের বাড়ীটা তুলতে বড্ড দেরী হচ্ছে, না রে ?

রাস্থ নীলুর দিকে পলকের জন্য তাকিয়ে আবার তগির দিকে চোখ ফেরায়। পরে বয়স্কদের মত ভারিক্কি সুরে বলতে সুরু করে—ভাত খাও, চালের দাম তো জান না ? বাবু যে কি কষ্ট করছেন, তা তুই আর কি জানিস ? বাবু ধানচাল সব বিলিয়ে দিয়েছেন, তা জানিস ?

এখন আমাদেরই খাবারে টান পড়ে যাবে। তখন এই মাছগুলো খেয়েই দিন কাটাবি, বুঝলি ? মাইতিদের বাড়ীতে আমরা থাকি মাত্র চাল, তেল, নূন, যা লাগে সব বাবুর। চাল তো ঐ বললাম। আর টাকা কোথায় অত ? ক্যাশ বাক্স থেকে যা পাওয়া গিয়েছে তা-ই সম্বল করে এত সব হচ্ছে। এ ঘরও ঐ থেকে হচ্ছে। এবারে বুঝে ছাখ, বাড়ী করব বললেই করা যায় না।

নীলু লজ্জা পেয়ে বলে—না, না, আমি এমনিই বলছিলাম।

রাসু একইভাবে জলের দিকে দৃষ্টি রেখে বলে—তারপর দোকানের কোন কিছু বলতে গেলে উদ্ধার করা যায় নি। নতুন করে দোকান করা আর সম্ভব নয়। কিছু একটা করতে হবে তো ? যা টাকা বাবুর এখনও রয়েছে, সব খরচ করে দিলে নতুন ব্যবসা-ট্যাব সা হবে কি করে ?

নীলু অতশত বুঝতে পারে না। তবে এটুকু বোঝে, রাসু অনেক খবর রাখে, বাবার সে ক্রমে ডানহাত হয়ে উঠেছে প্রায়।

এমনি একদিন দুপুরে ক্যানেলে তগি ফেলে মাছ ধরার সময় নীলুর জীবনে এলো সেই নিদারুন অপরাধবোধ। সেদিনও রাসুর পাশে বসেই নীলু মাছ ধরা দেখছিল।

হঠাৎ একটা ছোট গর্তের দিকে চেয়ে রাসু বলে ওটে—আরে নীলু ছাখ, ছাখ, ওখানে কয়েকটা বিড়ি কে যেন ফেলে রেখে গেছে। দেশেলাইও রয়েছে একটা। কেউ বো হয়, আমাদের এই জায়গায় বসে রাতে মাছ ধরেছিল। বিড়ি দেশেলাই নির্ঘাৎ তারই।

বলতে বলতে রাসু উঠে গর্তের কাছে গিয়ে বিড়ি দেশেলাই তুলে নেয়। একটু পরে নীলুর দিকে চেয়ে সে বলে—এ্যাই নীলু, খাবি এটা ?

নীলু অবাক চোখ মেলে বলে – কেমন লাগে খেতে ?

রাসু বলে—কি জানি ? খেয়ে দেখি আয় না।

—বেশ ! নীলু কৌতূহলী হয়ে সম্মতি জানায়। রাসু দেশেলাই জ্বেলে বিড়ি ধরিয়ে টান দেয়। খানিকটা টেনে নীলুকে টানতে দিল

সে। নীলু এক টান মেরেই কাশতে স্বরু করে দিল। কাশতে কাশতে মুখ বিকৃত করে বলে—দূর, তেতো লাগছে কেন রে ?

রাস্থ নীলুর হাত থেকে বিড়িটা নিয়ে আবার মনের সুখে টান মারতে মারতে বলে—তেতো লাগবে কেন ? তুই টানতে জানিস না, তাই। এই ছ্যাখ না, এভাবে টানতে হয়।

রাস্থ চোখ মুখ দিয়ে যেন ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়তে স্বরু করে। নীলু অবাক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু দেখে যায়। সহসা নীলুর মনে জাগে এক নিদারুন অপরাধ বোধ। কালা বিড়ি তামাক খেত, মাষ্টারমশাই-এরা জানতেন। কিন্তু তারজন্য তাঁরা কিছু মনে করতেন না কারণ নীচুজাতের ছেলেমেয়েরা ঐ বয়সে ওসব খায়। তাদের মা বাপের ওতে সমর্থন না থাকলেও অসমর্থন নেই, নীলু বেশ বুঝতে পারে। কিন্তু তাদের খাওয়া যে অত্যন্ত গর্হিত কাজ এটা কেউ না বলে দিলেও নীলু বোঝে। বাবা জানতে পারলে যে তাকে আর বাঁচিয়ে রাখবে না, এ বোধও তার আছে। নিজেকে ভারী অপরাধী মনে হয় তার।

পরের দিন রাস্থ কোনরূপ ভণিতা না করে স্বচ্ছন্দে বিড়ি ধরাল। গতকাল কয়েকটা সে পেয়েছিল, নীলু জানে। সে জানে রাস্থ গতকাল একটামাত্রই খরচ করেছে। আজও রাস্থ নীলুকে খেতে বলল। কিন্তু নীলু রাজী হল না। বরং সে রাস্থকে ভয় দেখায় মাকে বলে দেবে বলে।

রাস্থও সঙ্গে সঙ্গে বলে—তাহলে আমিও বলে দেব, তুইও খেয়েছিস।

নীলু দমে যায়। বেশী আর কিছু বলতে সাহস করে না সে। রাস্থর পাল্লায় পড়ে যে অন্যায় কাজটি করে বসে আছে তারজন্য লজ্জায় যেন মরমে মরে যেতে থাকে।

এর কয়েকদিন পরে শংকরীপ্রসাদ রাস্থকে নতুন ঘরের কাজকর্মে আটকিয়ে রাখে। রাস্থ তাই তগি ফেলতে যেতে পারে না। অবশ্য মাছও পর পর কম উঠছিল।

একদিন নীলু বিকালে অন্নদা মাইতিদের বাড়ীতে সতী মাসীর সাথে খেলছিল সতীমাসী রাণীদেরই বয়সী হবে, কি কিছু বড়। ঐ সময় মোক্ষদা পিসী এল কাপড় নিয়ে।

রমলা মোক্ষদার হাত থেকে কাচা কাপড় নিয়ে বললেন—মুখি, আজ ভাই চাল দিতে পারব না। পয়সা নিয়ে যা'। নীলুর বাবা বলেছে, দেখে শুনে চাল খরচ করতে। চাল ফুরিয়ে এসেছে।

মোক্ষদা শুকনো মুখে বলে—দিদি, পয়সা কি চিবিয়ে খাব? ঘরের ঐটুকু ক্ষেতে একা মেয়েমানুষ কষ্ট করে যা তরকারী ফলিয়েছিলাম, সব শেষ। মাটি আর ভেজা নেই। পুকুরের জল সব লোনা। সে জল গাছে দিলে গাছ মরে যাচ্ছে। পুকুরের শুশ্‌নি, কলমী সব শেষ। সকলে খেলে কতদিন আর থাকে? কথায় বলে, সকলে খেলে সাগরও শুকিয়ে যায়। কাল থেকে শাকপাতা খেয়ে আছি। চাট্টি চাল দাও বৌদি। না হলে মরে যাব। তোমার পায়ে পড়ি, বৌদি।

—আচ্ছা, আজ চাট্টী নিয়ে যা, রমলা বলেন – কিন্তু এভাবে আর পারব না ভাই। আমাদেরও তো বাঁচতে হবে।

উদ্‌গত অশ্রু আঁচলে মুছে মোক্ষদা বলে—সে তো সত্যি কথা, বৌদি। নিজে বাঁচলে তো পরেরটা দেখবে। সে কথা ঠিক কিন্তু আমরা কি করি? চালের মন হয়ে গেছে ত্রিশ টাকা। একটা কাপড় কাচলে এক পয়সা দেবে তুমি। তোমাদের কাছে এই পাঁচ-সাত পয়সা করে নিয়ে কতটুকুই বা আর চাল পাবে বলো? তাও পয়সা দিলেই কি, ছাই, চাল মেলে? মিশ্রদের বাড়ীতে কিছু রয়েছে। কিন্তু মিশ্রদের বুড়ো দিতে চায় না। বলে, এ বছরও মাঠে ধান হবে না। সে হিসাব করে আমাদের তো চাল রাখতে হবে। তা বৌদি, এই তো অবস্থা!

রমলা বেতের খুপীতে করে কিছু চাল এনে দেয় মোক্ষদাকে সে চোখ মুছে চাল নেয়। নীলু দাঁড়িয়ে এতক্ষন ওদের কথাবার্তাই শুনছিল। মোক্ষদা নীলুকে দেখতে পেয়ে তার থুত্‌নিতে আঙ্গুল ছুঁইয়ে তাদের আদর করে বলে—বাবা, সোনা, মানিক আমার।

মোক্ষদা পিসী অবশ্য নীলুকে দেখলেই ঐভাবে আদর করে। মোক্ষদা যেতে যেতে রমলার উদ্দেশ্যে বলে—যাই বৌদি! কতদিন

আর বাঁচব, কে জানে! পেটের জ্বালা না জুড়াতে পারলে গলায় দড়ি দেব শেষে। আমার আর কে আছে?

মোক্ষদা পিসী চলে যায়। নীলু খেলা ভুলে ব্যথাহত চোখে তার গমনপথের দিকে বেশ কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকে।

নীলু এ পর্যন্ত খাওয়ার কষ্ট তাদের ভাগ্যে লেখা রয়েছে তা যেন সে এখন থেকে একটু যেন বুঝতে পারে। কিন্তু এখনও তবু সে পেট ভরে খেতে পাচ্ছে, তার আশেপাশের লোকেরা প্রায় অভুক্তই রয়েছে। খাওয়ার সময় যখনই এ কথা নীলুর মনে পড়ে তখনই ভাতের গ্রাস যেন আর তার গলা দিয়ে নামতে চায় না। এক অব্যক্ত বেদনায় তার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে।

নীলুদের নতুন ঘরের ছিটেবেড়ার দেওয়ালের গরান কাঠের খুঁটি-গুলো মাটিতে পোতা প্রায় শেষ। দোকানঘরের টালির চাল থেকে শালকাঠের অনেক কড়ি পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলো গরান কাঠের সঙ্গে পেরেক দিয়ে আঁটিয়ে দেওয়ালকে বেশ মজবুত করা হয়েছে। এরপর ঐ ছিটেবেড়ার উপর মাটি লেপা হবে। চাল হবে খড়ের। প্রচুর বাঁশ কেনা হয়েছে। লোক লাগিয়ে সেগুলো চিরে বাতা তৈরী করা হচ্ছে। চালের কাজ করবে রাণীর বাবা ও দাদা।

খড়ের ছাউনী দিতে প্রচুর পাটের দড়ি দরকার। শংকরীপ্রসাদ ও নগেন সামন্ত রাতদিন পাট কেটে দড়ি তৈরী করছে। রাসুও ঐ কাজে হাত লাগিয়েছে। নীলুরও ইচ্ছা, সে ঘর তোলার কাজে কিছু হাত লাগায়। একবার সে পাট কেটে দড়ি তৈরী করতে গিয়ে সকলের হাস্যাস্পদ হয়েছে। তার দড়ি মোটেই একরকম হয় না, মোটা-সরু হয়ে যায়।

দড়িগুলো তিন তার করে কাঠের ঢেরায় পাক দিচ্ছে রাসু। নীলুর এ কাজটা বেশ পছন্দ হয়ে যায়। এটা সে ভালই করতে পারল। এটা করে সে যে ঘর তোলার কাজে কিছুটা সাহায্য করতে পারছে, সে কথা ভেবে তার আনন্দ হয়। আপাততঃ কিছুদিন সে খেলাধূলা ভুলে এই কাজ নিয়ে মেতে রইল। সকালে রজনী মাষ্টারের কাছে পড়াশুনা

করে খেয়ে দেয়ে রোজ দুপুরে সে তাদের নতুন ঘরের কাছে চলে আসে।

মাঝে মাঝে রাণীর সাথে দেখা হয়। রাণী আজকাল প্রায়ই ঘরে থাকে না। সে আর তার মা যায় লোকের বাড়ীতে ধান ভান্‌তে বা অন্যান্য গৃহস্থলী কাজ করতে। কাজ করে খুব কম দিনই ক্ষুদকুঁড়ো পায়। লোকে পয়সা দিতে চায়, চাল-ক্ষুদের বেলায় বদ্ধমুষ্টি।

এক দুপুরে নীলু রাণীদের বাড়ীতে গিয়ে দেখে রাণীরা সকলে খেতে বসেছে। সকলের পাতে কি যেন এক শাকের ঘণ্ট। শুধু সেই গুলো তারা নুন আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে খাচ্ছে। নীলুর কৌতূহল হল ওগুলো কি শাক তা জানার জন্য। রাণীর দাদা বলে, ওগুলোর নাম 'গিরা' শাক।

—গিরা শাক, সে আবার কি? নীলু বলে ওঠে।

রাণীর দাদা বলে—এগুলো লোনা জায়গার শাক। খেজুরী জনকার দিকে সমুদ্রের কাছাকাছি এগুলো হয়। তবে এ বছর আমাদের এদিকের ধানের মাঠেও হচ্ছে। মাঠ সব লোনাজলে ডুবে গিয়েছিল তো।

কিছু কাঁচা শাক পাশে পড়েছিল। নীলু একটা কাঁচা পাতা ছিঁড়ে মুখে দিয়ে দেখে ওগুলোর স্বাদ লোনা আর কি রকম একটা গন্ধ যেন। নীলু থুঃ থুঃ করে ফেলে দেয় পাতাটা। রাণীর মা দেখে বলে—কি করব বাবা? শাকপাতা প্রায় শেষ। ধান তো শেষ। গতর দিয়ে খাটলে পয়সা মেলে কিন্তু চাল মেলে না। এখন এই গিরাশাক, তারপর মরণ ছাড়া আর কি আছে কপালে, জানি না।

নীলুর পেট ভাত-ডাল-মাছে ভর্তি। রাণীর মায়ের কথা শুনে কি রকম যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসে। নিজেকে কেমন যেন এক চোর, ডাকাত বা অসহায় অপরাধী বলে মনে হয়। বেশীক্ষণ সে সেখানে থাকতে পারে না।

পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে নীলু দেখেছে, সর্বত্রই এই গিরা শাক চলছে। তার বেশ মনে হয় এই গিরা শাক শেষ হলে সব মরবে। পৃথিবী

রসাতলে না গেলেও তার মানুষজন সব শুকিয়ে না খেতে পেয়ে মারা যাবে। কান্তি জেঠা যেভাবে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার কথা বলেছিলেন সেভাবে না হলেও ধ্বংস যে হবেই সে বিষয়ে নীলুর আর কোন সন্দেহ থাকে না।

মাঘমাস শেষ হয়ে ফাল্গুন এসেছে। চারদিকে গরম বাতাস বইছে। গাছগুলো সব ন্যাড়া ন্যাড়া। মাঠে ঘাস নেই। মানুষের তো কথা নেই গরুছাগলগুলোও অনাহারে অস্থিচর্মসার হয়ে ধুঁকছে। ক্যানেলের জলে মানুষ, গরু ছাগলের মৃতদেহ ভেসে চলেছে। মৃতদেহের শোভা-যাত্রা এক নিত্যদিনের দৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মৃতদেহ ভেসে চলেছে তার উপর কাক, শকুন বসে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। ওদিকে জলের ভেতর ট্যাংরা বোয়ালেরা ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে মাংস খায়।

নীলুর প্রথম প্রথম দৃশ্যগুলো দেখে গা গুলিয়ে উঠত কিন্তু পরে ওগুলো যেন গা সওয়া হয়ে যায়। ওদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে, যত মানুষ, গরুছাগল মরবে ততই কাক, শকুন, ট্যাংরা, বোয়াল-দের ভোজ! আকাশে সবসময়েই দেখা যায় নিম্নমুখ লুব্ধ শকুনের দল চক্রাকারে উড়ছে। নীলু ওদের দিকে চেয়ে ভাবে, শকুনের দৃষ্টিতেই বুঝি মাঠ ঘাট সব শুকিয়ে গেল।

জলের ভীষণ কষ্ট সুরু হয়ে গেল। গাঁয়ের সব পুকুরেই প্রায় বন্যার জল ঢুকেছিল। দু একটা যেগুলোর পাড় উঁচু ছিল সেগুলো কোন-ক্রমে বেঁচে গিয়েছিল। সেগুলোর জলই গাঁয়ের লোক খেয়ে এসেছে। জগৎ কাকাদের একটা পুকুর ডোবে নি। সেটার জলই নীলুরা খায়। নলকূপ একটা রয়েছে হরিপুরে। বাড়ীতে কারোর অসুখ-বিসুখ হলে লোক দিয়ে ভারে বা কলসীতে সেখান থেকে জল আনতে হয়। কিন্তু আজকাল চাল না দিলে লোকে জল আনতে চায় না।

জগৎ কাকাদের পুকুরের জলও বিশ্রীরকমের লোনা হয়ে গেছে। আশেপাশের সমস্ত জমিতেই তো বেশ কিছুদিন লোনাজল দাঁড়িয়ে-ছিল। মাটির ভেতর দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে সেই লোনাজল পুকুরের জলে মিশেছে। এতদিন পুকুরে জল বেশী ছিল বলে জলের লোনা স্বাদটা

ততটা বোঝা যায়নি কিন্তু এখন জল শুকিয়ে গিয়ে স্বাদটাকে একেবারে লবনাক্ত করে দিয়েছে। তারপর সকলের ব্যবহারে বা অপব্যবহারে পুকুরের জলে শ্যাপলা জন্মেছে, ছোট ছোট পোকা হয়েছে।

শংকরীপ্রসাদ বাড়ীতে বলেছেন খাওয়ার জলের কলসীতে ফিটকিরি দিতে। তাতে জল কিছুটা পরিষ্কার হলেও স্বাদ লোনাই থেকে যাচ্ছে। তাই একটা ফিলটার বসানো হল কাঠকয়লা আর বালির কলসী সাজিয়ে সাজিয়ে। কিন্তু সব সময় জল ফিলটার করা সম্ভবও হয় না। মাঝে মাঝে ঐ অপেয় জলও তাদের খেতে হয়।

গাঁয়ের সাধারণ লোকের অবস্থা তো আরও খারাপ। লোকে যেখানে জল পাচ্ছে, খাচ্ছে। খাদ্যের যেখানে বাদবিচার নেই সেখানে জলের বাদবিচার আর করে কে? বহু পুকুরের জল এত বেশী লোনা হল বা শুকিয়ে গেল যে মাছ সব মরে ভেসে উঠতে লাগল।

এমনদিনে শোনা গেল পাশের গাঁয়ে কলেরা লেগেছে। লোক মরছে প্রচুর। লোক যে মরেছে প্রচুর তা ক্যানেলের জলেই বোঝা যায়। জলের উপর মানুষের মৃতদেহের মহামেলা। কে অত পোড়ায় অতএব জলেই ভেসে যাক।

নীলুদের বাড়ীতে এখন জল ফুটিয়ে খাওয়া হচ্ছে। কয়েকদিন পরে শোনা গেল গাঁয়ের চক্রবর্তী পাড়ায় কলেরা লেগেছে। একটা আতংকের ছায়া পড়ে গেল সারা গাঁয়ে। নানা গুজব রটতে লাগল। ঘাটমাঝি পদ্মলোচন একদিন নগেন সামন্তের কাছে এক গল্প বলে গেল। সেটি পল্লবিত হয়ে সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল। পদ্মলোচন নগেন সামন্তকে যা বলেছিল তা তার নিজের ভাষাতে দাঁড়ায়:—

তিনচার দিন আগে সন্ধ্যেবেলায় যখন আমি ঘাট থেকে বাড়ী ফিরছি তখন দেখলাম, আচার্যদের বাড়ীর পাশে এক অপরূপ সুন্দরী মেয়েকে পাশের গাঁ থেকে আমাদের গাঁয়ের দিকে আসতে। মেয়েটির বয়স হবে ষোল-সতের। মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল। চুলগুলো মেয়েটার পায়ের পাতা যেন ছুঁয়েছে। এ মেয়ে তো কোনদিন দেখিনি।

—তাই বললাম—বাছা, তুমি কাদের বাড়ীর মেয়ে গো? মেয়েটি

কোন উত্তর না দিয়ে হন্‌হন্ করে চক্রবর্তীদের বাড়ীর দিকে যেতে লাগল। আমিও পিছু নিলাম। ভাবলাম, মেয়েটার নিশ্চয়ই খারাপ চরিত্তির, উত্তর না দিয়ে পালাচ্ছে। মেয়েটাকে প্রায় ধরে ফেলতে যাব এমন সময় দেখি সামনে নেই মেয়েটা। যেন হাওয়ায় ভেসে গেল না মিশে গেল, কিছু বুঝলাম না। তখনই আমার খেয়াল হল। মা মা বলে ডেকে উঠলাম। তখনই বুঝলাম মা গাঁয়ে এলেন।

নীলু রমলার কাছেই কাহিনীটা শুনেছিল। মেয়েদের আসরে রমলা বলছিলেন কথাগুলো যা একদিন নগেন সামন্ত এসে তাঁকে শুনিয়ে গেছে। নীলু পাশে বসে চোখ বড় বড় করে শুনছিল।

রমলা থামতেই নীলু প্রশ্ন করে—ঐ মা কে, মা ?

রমলা বলেন—বুঝলি না ? ঐ মেয়েই তো মা শীতলা রে যাকে তোর পদ্মদা দেখতে পেয়েছিল। তারপরই তো চক্রবর্তীদের পাড়ায় মায়ের দয়া হল।

—দয়া ? নীলু অবাক হয়ে বলে—তবে যে ওদের পাড়ায় কলেরা লেগেছে ?

—ছিঃ বাবা, ওকথা বলে না, জিভ কেটে নিজের কানে হাত চাপা দিয়ে রমলা বলেন—বলতে নেই ওকথা। মা রাগ করেন। মায়ের দয়াই বলতে হয়। পরে রমলা হাত জোড় করে মা শীতলার উদ্দেশে বলেন—অপরাধ নিও না, মা, ছেলেমানুষ জানে না বলে ফেলেছে।

নীলু ভেবে পায় না কি এমন সে অপরাধ করল ঐ কথা বলে।

যাই হোক অচিরেই পদ্মলোচনের শীতলা দর্শনের কাহিনী গ্রামময় ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে ভর করে। সত্যমিথ্যা যাচাই কে করে ? সকলেই বিশ্বাস করে সে কথা। অবিশ্বাসীরা মায়ের দয়ার ভয়ে মুখ ফুটে তাদের অবিশ্বাসের কথা বলতে পারছে না।

এরপর অবস্থা এমন দাঁড়াল, সন্ধ্যে হলেই রাস্তায় লোকজন থাকে না। সকলে ঘরে এসে ঢোকে। কি জানি, সন্ধ্যেয় দৈবাৎ যদি পথের মাঝে সেই অপরূপ লাবণ্যময়ী দিব্যাঙ্গনা দেবীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় আর যদি তিনি দয়া করে সন্তানকে কাছে ডাকেন।

শংকরীপ্রসাদ অবশ্য এসব পাত্তা দেন নি। তিনি নতুন ঘরের কাজকর্ম দেখাশোনা শেষ করে যেমন রাত করে বাড়ী ফিরতেন তেমনি ফিরতে লাগলেন।

একদিন বুঝি খাওয়ার জল গরম করা হয় নি। রাতে খেতে বসে শংকরীপ্রসাদ রমলাকে প্রচণ্ড তিরস্কার করে বললেন—তোমাদের মেয়েমানুষদের অশেষ দোষ। তোমাদের নিয়ে সংসার করা আর নরকে বাস করা একই জিনিস। দেখছ, শুনছ গাঁয়ে, পাশের গাঁয়ে ঘরে ঘরে মড়া। এ ক'দিনে চক্রবর্তীদের পাড়ার অর্দ্ধেক লোক শেষ। আমাদের বাড়ীর পাশের জানাদের পাড়াতেও কলেরা ঢুকেছে। এত জেনেও জল গরম করবে না। নীলুদের সব সময়ে ভরাপেটে রাখবে। বাইরে কোথাও যেন একদম না খায়। ফোটানো জল ছাড়া কেউ যেন না খায়।

পরের দিন নীলু রাসুকে জিজ্ঞেস করেছিল—কলেরা হলে খালি-পেটে বুঝি থাকতে নেই, না রে?

রাসু বলে—খালিপেটে থাকলে চট করে কলেরা ধরে। বাইরের জল বা কোন খাবার মুখে দিবি না। বাইরের কিছু না খেলে তোর কলেরার ভয় নেই। এ তো আর তোর বসন্ত নয় যে বাতাসে রোগ ছড়াবে।

নীলুর আর কোন সন্দেহ থাকে না যে এবার আরো লোক মরবে। ক'জনই বা ভরপেট থাকবে, কজনই বা জল ফুটিয়ে খেতে পারবে?

একদিন দেখা গেল সন্ধ্যেবেলায় একদল গাঁয়ের লোক খোল-করতাল বাজিয়ে নাম-সংকীর্তন করতে বেরিয়েছে। দলের আগে পদ্মলোচন। অন্নদা মাইতির বাড়ীতে এল সংকীর্ত্তনীয়ারা।

গান করার আগে পদ্মলোচনা বক্তৃতার ভঙ্গিমায় বলে—বাবু, ভাইসব, গাঁয়ে মা এসেছেন। আমরা গাঁয়ের শেতলা মন্দিরে তেনার পুজো দিচ্ছি। সেজন্য সকলে যথাসাধ্য আমাদের সাহায্য করবেন। যে যত বেশী চাল দিতে পারবেন, মায়ের আশীর্বাদে তেনার বালবাচ্চারা তত সুখে থাকবে।

পদ্মলোচনের ভাষণের পর নামগান সুরু হল। গানের শেষে

তারা ভিক্ষা চাইতে লাগল। রমলা ও অন্নদা মাইতির স্ত্রী মায়ের রোষ এড়াতে তাদের ঝুলি ভরে চাল দিলেন। উপস্থিত মেয়েদের অনেকেও বাড়ী থেকে চাল এনে দিল। পুরুষেরা তা সত্ত্বেও সিকিটা দুয়ানিটা দিতে লাগল।

পদ্মলোচন ভিক্ষা নিতে নিতে অঙ্গভঙ্গি করে বলতে থাকে—আর শোন সব, খালিপেটে যাহোক কিছু দিয়ে থাকবে। সবসময় জল ফুটিয়ে খাবে, খাবার গরম গরম খাবে। তাহলে মাতা কুপিতা হবে না। মনে থাকে যেন।

এরপর খোল বেজে ওঠে। পদ্মলোচন ছড়া কেটে গাইতে থাকে :

'খালিপেটে দেন গালি, মাতা গরমে নরম—
দুটো কথা রেখো মনে, মায়ের কৃপায়
ধারে ঘেঁষবে না যম।'

কীর্তনীয়াদের দল গাইতে গাইতে চলে যায়। পেছনে ফেলে রেখে যায় এক ভীতির ছায়া। নীলু সংকিত হয়ে ওঠে।

পরের দিনই অন্নদা মাইতির বাড়ীতে বসে নীলু শুনল রাণীর বাবা কলেরায় মারা গেছে। বাইরে কোথায় যেন ঘরামির কাজ করতে গিয়েছিল। দু'তিন-দিন বাড়ী আসে নি। সেখানেই মরেছে। খবরটা জানার পর নীলুর খুব ইচ্ছা হয় রাণীদের বাড়ী যেতে।

কিন্তু রমলা নীলুর ইচ্ছার কথা শুনে ঝাঁঝিয়ে বলে ওঠে—না, কলেরা বাড়ীতে কিছুতেই তোমার যাওয়া চলবে না! এক পা ঘরের বাইরে যাবি তো ঠ্যাং ভেঙ্গে ঘরে ফেলে রাখব।

মার কথা নীলু গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। কিন্তু বাবার শাসনের কথা ভেবে রাণীদের বাড়ী যাওয়া থেকে নিরস্ত হল। কিছুদিন এভাবে সে এক রকম গৃহবন্দী হয়েই কাটাল। রাসু কিন্তু যেমন ও বাস্তুতে যেত, তেমনি যেতে লাগল। এখানে নীলুর সঙ্গী সাথীর অভাব নেই। তবু রাণীর জন্য তার মনটা ছটপটিয়ে মরে।

ক'দিন হল, রজনী মাষ্টার রাতেও তাদের পড়াতে আসছেন। নীলুদের ঘরে আটকিয়ে রাখার এ এক চমৎকার ব্যবস্থা করলেন

শংকরীপ্রসাদ। এ মাষ্টারমশাই মোটেই সুরেশ পণ্ডিতের মত কড়া নয়। তবু তো তাঁর কাছে পড়তে বসতে হয়। মাষ্টারমশাই নরম হলে পড়ায়ফাঁকি মারা না হয় চলে, তাই বলে তো, পড়তে না বসে পালিয়ে যাওয়া চলে না।

রজনী মাষ্টারের কাজ বোধ হয় পড়ানো নয়, পড়াতে এসে ঘুমানো তিনি রোজই ঘুমোন। মাঝে মাঝে ঢুলতে ঢুলতে পড়ে যান। নীলু ও রাসু হাসি চাপতে পারে না। তারা হেসে উঠলে মাষ্টারমশাই বলেন—এ্যাই বাঁদররা, হাঁসছিস কি? পড়্। পড়া না করতে পারলে পিঠের ছাল তুলে নেব।

রজনী মাষ্টার এসব বলতেন বটে কিন্তু কদাচিৎ গায়ে হাত তুলতেন। তারপর তিনি নিদ্রাদেবীকে বিদায় দেবার জন্য ধূম্রদেবীর আরাধনার আয়োজনে লেগে যেতেন। নীলুরা ঐ সময় কিছুক্ষন চেঁচিয়ে পড়ত।

একদিন তাদের এই সান্ধ্য পড়ার আসরে সহসা রয়টার এসে হাজির। মাষ্টারমশাই তখন সবে হুঁকোর মাথায় কল্‌কে বসিয়ে টান দিতে সুরু করেছেন।

রয়টার এসে পাশে বসে পড়তে পড়তে বলেন—কি হচ্ছে গো, মাষ্টারের পো, পড়ানো হচ্ছে?

রজনী মাষ্টারের চোখে তখনও ঘুমের আবেশ রয়েছে। তাই লজ্জিত হয়ে তিনি হেসে বলেন—এ্যাই একটু।

পরে ধূমপান অসমাপ্ত রেখে কল্‌কে হাতে নিয়ে রয়টারের হাতে দিয়ে বলেন—নিন্ ভুতুবাবু, তামাক সেবন করুন।

রয়টার কলকে হাতে নিয়ে বলে—টেনে আর কি হবে মাষ্টার? ক'দিন আর টানবে? সুখটান দেবার আগে শেষটান দেবার ব্যবস্থা করেছে ব্রিটিশ।

কথা ক'টা বলেই রয়টার প্রাণপনে কলকেতে টান দেয়। রজনী মাষ্টার ভীত হয়ে বলে ওঠেন—কেন, কেন? কি ব্যাপার?

রয়টার বলে—আজ হরিপুরের হাটে গিয়েছিলাম, বুঝেছ মাষ্টার। দেখলাম মিলিটারী ক্যাম্প বসেছে। গাদা গাদা সব মিলিটারী ট্রাক

থেমে নামছে। কি সব আয়োজন দেখলাম। রাশি রাশি চাল, ডাল, আটা ময়দার বস্তা, তেলের টিন আরো কত কি সব ট্রাক থেমে নামছে।

রজনী মাষ্টার পুলকিত হয়ে বলেন—সরকার বুঝি ওগুলো এবার বিলোবেন ?

রয়টার প্রচণ্ড হাসির শব্দে ফেটে পড়ে। সেই হাসি আর থামতে চায় না। রজনী মাষ্টার হতবাক হয়ে নির্বোধের মত তার দিকে তাকিয়ে থাকে। হাসির দমকে রয়টারের হাতে ধরা কলকে থেকে আগুন পড়ে যায়।

রয়টার হাত দিয়ে আগুন সরাতে বলে—বেশ বলেছ বটে ! ওগুলো সব তোমাদের খাওয়াবে ? তা না হলে হয় ?

রজনী মাষ্টার ভয়ে ভয়ে বলে—তবে ?

রয়টার ঝাঁঝিয়ে উঠে বলে—তুমি একটা আস্ত পণ্ডিত-মুর্খ মাষ্টার ! ওগুলো সব মিলিটারীরা খাবে বসে বসে, বুঝেছ ?

রজনী মাষ্টার এবারে সহজ হয়ে বলেন—মিলিটারীদের খাওয়াবে ! দেশে এক কনা চাল নেই। আমরা না খেতে পেয়ে মরছি আর সরকার মিলিটারীদের খাওয়াবে। কথা শেষ করে রজনী মাষ্টার দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

রয়টার কল্‌কেয় কয়েক টান মেরে বলে—তোমরা মরলে সরকারের কি ? তারা তো তোমাদের মারতেই চাইছে। সেজন্যেই তো মিলিটারী পাঠিয়েছে। তাদের বাঁচিয়ে রাখতে সরকারের কোন ক্রটি নেই।

রজনী মাষ্টার শংকিত হয়ে বলেন—সে না হয় হল, আমাদের বাঁচা মরায় সরকারের কি ? মিলিটারী বেঁচে থাকলে সরকারের লাভ। কিন্তু মিলিটারী কেন ? পুলিশ তো ছিল।

রয়টার রহস্যের হাসি হাসে যেন। পরে বলে—মনে নেই তোমার বন্যার আগে চার্চিল বলেছিল খেজুরী থানাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেবে ? বন্যা না হলে এতদিনে তাই-ই হতো। জলে ভেসে গিয়েছিলাম বলে এতদিন আগুনে মরি নি, বুঝলে মাষ্টার ? কিন্তু ব্রিটিশ ভোলে নি তার কথা। তারা আমাদের পোড়াবার জন্য সাতশ'

ফৌজের জাহাজ পাঠিয়েছিল। ঝড়ে বঙ্গোপসাগরের জলের তলায় সাতশ' ফৌজ তলিয়ে গেছে। এবারে তাই পাকা ব্যবস্থা নিয়েছে।

—কি রকম ? রজনী মাষ্টার কৌতূহলী হয়ে বলেন। নীলুরা পড়া বন্ধ করে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে শোনে রয়টারের কথা।

রয়টার বলে—প্রত্যেকটি ইউনিয়নে একটা করে মিলিটারী ক্যাম্প বসবে। আমাদের ইউনিয়নেও বসবে। এদের সঙ্গে যোগ দেবে পুলিশ। পুলিশ তো আগেই ভলানটিয়ারদের নামের তালিকা করে রেখেছে। এবারে লিষ্টি মিলিয়ে সব ধরবে আর কোতল করবে।

রয়টার হাতের মুদ্রায় দেখায় কিভাবে কোতল করবে। রজনী মাষ্টার ভয়ে ভয়ে বলে—কোতল করবে ?

রয়টার বলে—হ্যাঁ কোতল করবে। আগের মত লোকে যদি থানা খাসমাহাল, রাস্তাঘাট উড়িয়ে দেয় তবে মিলিটারী কামান আর মেশিনগান দেগে গ্রামকে গ্রাম শেষ করে দেবে! এবারে একেবারে ঢালাও হুকুম—পুলিশ রাইফেল ছুঁড়বে আর মিলিটারী মেশিনগান দাগবে।

রজনী মাষ্টার যেন স্বগতোক্তি করেন—আশ্চর্য! এখন থানা কাছারী পুড়াচ্ছেইটা বা কে ? লোকে না খেয়ে, কলেরায় মরছে। গ্রামে ধানচাল, শাক পাতা পর্যন্ত নেই, ডাক্তার নেই, পথ্য নেই, জল নেই—সবাই ধুঁকছে, শুধু মরার অপেক্ষা : তা' এই মরা মানুষগুলোকে ব্রিটিশের এত ভয় ? তার জন্য এত মিলিটারী, এত কামান মেশিনগান ?

রয়টার কল্‌কেটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বলে—ওরা বাঘের জাত তো ? আমাদেরও, বোধ হয়, বাঘই ভেবেছে ওরা। ওরা আমাদের খাচ্ছে, আমরাও ওদের খেতে চেয়েছি। বাঘ বলে বাঘের স্বভাবটা ওদের জানাই আছে। ওরা জানে, বাঘ অসমর্থ হলেও বাঘ। তাকে বিশ্বাস নেই। বাঘের নিঃশ্বাসে অবিশ্বাস! তাই এবার আঁটঘাট বেঁধে এত সাবধানতা ওদের। তোমরা কেউই ব্রিটিশের এ চরিত্র বুঝতে পারো নি গো। ব্রিটিশ পলিসি বড় সাংঘাতিক জিনিস, বুঝলে মাষ্টার

বড় সাংঘাতিক জিনিস। যাই এখন। গাঁয়ের সকলকে সাবধান করে দিতে হবে।

রয়টার উঠে দাঁড়ায় আসন ছেড়ে। রজনী মাষ্টার আবার যেন স্বগতোক্তি করেন—একেই বলে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা!

রয়টার চলে যায়। রজনী মাষ্টার কিছুক্ষণ গুম্ মেরে কি চিন্তা করেন। পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীলুদের দিকে তাকিয়ে বলেন—যা, আজ ছুটি করে দিলাম।

আজ নীলাদ্রির মনে হয়, তখনও তাদের গাঁয়ে ব্রিটিশের ছল চাতুরী কেউ বিশেষ বুঝতে পারে নি। রয়টারের কথা ঠিক—ব্রিটিশ পলিসি সত্যই সাংঘাতিক জিনিস। বাঙ্গালীকে আঁতে না মারতে পেরে তারা ভাতে মারতে চেয়েছিল।

সেই ১৯৪২-এ ব্রিটিশ সরকার বাঙ্গালীকে মারতে চেয়েছিল বাজারের সব খাদ্য সুপরিকল্পিতভাবে গুদামে ঢুকিয়ে। নীলুদের গাঁয়ের লোক সে খবর রাখত না। আসল চালটা চেলে রেখেছিল চার্চিল চাল সরিয়ে। মিলিটারী বসানো ছিল শুধু ছল।

ছল কি জিনিস নীলু আরো বুঝেছে। কিন্তু সে গুলো ছিল মধুর ছলনা। বাঁচার প্রেরনায় ছলা মাত্র। রাসু তাকে বিড়ি ধরিয়েছিল কায়দা করে। রাসু চেয়েছিল নীলু যাতে ঐ কথা অভিভাবকদের কোনদিন না বলতে পারে। সে জানত নীলু পারবে না কারণ সে নিজে দোষী হয়ে আছে। পরে রাসু তার কাছে স্বীকার করেছে, সে আগেও খেত। যাত্রাদলে থাকার সময় এ বিদ্যা সে রপ্ত করেছিল। রাসু নীলুর সঙ্গে ছল করেছিল।

দ্বিতীয় ছলনাটি ছিল ঘাটমাঝি পদ্মলোচনের। শীতলাদর্শন সম্বন্ধে যা সে রটিয়েছিল সে তো শুধু কিছু চালবানদের (যাদের চাল ছিল সেই অর্থে) কাছ থেকে চাল আদায় করে নেহাত বাঁচার জৈবিক তাগিদে।

কিন্তু ব্রিটিশেরও কি বাঁচার তাগিদ ছিল তখন? পরে জেনেছে, ছিল বৈ কি। বাইরে যুদ্ধে ব্রিটিশ তখন মহাশক্তিমানদের কাছে যে

প্রচণ্ড মারগুলো খাচ্ছিল তা ছিল তার অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক। ভারত ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমনি। এখানে বিদ্রোহ তখন ঠাণ্ডা করতে না পারলে তার বাঁচা কষ্টকর। ধুরন্ধর চার্চিল বুঝেছিল, ভারতকে ঠাণ্ডা রাখতে হলে যত নষ্টের গোড়া বাঙ্গালী জাতটাকে শেষ করতে হবে আগে। বাঙ্গলা ভাগ করতে গিয়ে তারা পারে নি। ঠেঙ্গিয়ে পিটিয়ে, জেলে পুরেও পারছিল না।

ওদিকে চন্দর বোস (সুভাষচন্দ্র) বাইরে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে। কখন সসৈন্যে দেশের দোরগোড়ায় এসে হাজির হয়। তখন তো বাঙ্গালীকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, যাবে না ভারতকেও। অতএব এইবেলা মারো বাঙ্গালীকে একেবারে ভাতে। আর যুবকগুলোকে সব ধরে জেলে পুরে রাখো। সুভাষচন্দ্রের বাংলায় যেন কতকগুলো বুড়ো, অথর্ব আর অর্দ্ধমৃতই থাকে মরণের অপেক্ষায়। তবে বাঁচবে ব্রিটিশ আর তার সাম্রাজ্য।

কিন্তু ইতিহাসের দেবতা বড় নির্মম। আজ ব্রিটিশের অস্তিত্ব ঠিক বিপন্ন না হলেও তার পায়ের তলার মাটি সরে গেছে অনেকখানি। তারা দলে দলে নিজেদের দেশ ছাড়তে চাইছে। কিন্তু পূর্ব-পুরুষদের মত বেনিয়া সেজে বিদেশে ব্যবসা ফাঁদতে গিয়ে ডাকাতি করে রাজা হওয়া আর তাদের কপালে নেই। নতুন দেশে গিয়ে বৃটেনের উপনিবেশ নতুন করে গড়ার স্বপ্ন আজ তাদের চোখে নেই।

সে আকাশ-কুসুম কল্পনা আজ আর নেই তাদের। কোন দেশেই আজ তাদের সাদর অভ্যর্থনা মিলবে না। বড়জোর তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকতে পারে বা গলাধাক্কা খেয়ে আবার ফিরে আসতে পারে। দুশ' বছর ধরে এদেশে এবং অন্যসব উপনিবেশগুলোতে বহুদিন ধরে যে পাপ তারা করেছে, তা আজ কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিতে হবে। এই হল ইতিহাসের দেবতার বিচার। কোন চার্চিল আজ আর তাদের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় নামবে না। এখন ঐ শেকস্‌পীয়ার, মিলটন ও নিউটন প্রমুখ মণীষিদের জয়গান করে কিছুকাল চলবে আপাততঃ।

নীলাদ্রি তাই আপনমনে বলে—চার্চিল তোমার ছল আমি বুঝেছি যেমন বুঝেছি রাসুর ছল, পদ্মলোচনের ছল। কিন্তু তারা কেউ অপরকে ধনে প্রাণে মেরে বাঁচতে চায় নি তোমার মত। তোমার সঙ্গে তাদের বিস্তর পার্থক্য এইখানে।

সত্যসত্যই রয়টারের কথামত কিছুদিন পরে সুরু হয়ে গেল রাতের বেলায় পুলিশী ধরপাকড়। সন্ধ্যেবেলায় কেউ বিশেষ বার হতে পারে না।

একদিন রয়টার এসে আবার রজনী মাষ্টারকে বলে গেল—কেমন ? কি বলেছিলাম মিলিয়ে দেখ। না খেয়ে মরতে হবে, নয়তো রোগে মরতে হবে। যারা না খেয়ে মরবে না বা রোগেও মরবে না তারা পুলিশের মারে মরবে। দেখে নিও।

রজনী মাষ্টার বলেছিলেন—এ যে বাদার দেশ হলো গো ভুতুবাবু! সেখানে শুনেছি, জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ আর গাছে সাপ। কোন-দিকে নিস্তার নেই।

নীলুর সেই সময় মনে পড়ে কথাটা সে রাসুর কাছে শুনেছিল বটে। সুন্দরবনে নাকি ঐরকম অবস্থা মানুষের।

নীলু ভাবে, তবু তো সেখানে লোক বেঁচে আছে। সেখানে মৃত্যুর অতশত ফাঁদ পাতা থাকলেও তো মানুষ বেঁচে রয়েছে। তাহলে, তাহলে কি তারাও বাঁচবে ?

কথাটা ভাবতে ভাবতে নীলুর চোখ দুটো আশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

————

'ধান নাই, চাল নাই, পাতা নাই গাছে।
খালিপেটে জাগি' আছি, পাছে
সুমুন্ধির পো রাতে খোঁজ করে—
ভল্টুরা আছে নাকি ঘরে ?'

উপরের ছড়াটি গ্রাম্য কবি ঘাটমাঝি পদ্মলোচনের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। সেই ১৯৪৩-এর মৃত্যুর ফাঁদ পাতা দিনগুলোর যথার্থ ছবি সার্থকভাবে উপরের ঐ চারটি মাত্র লাইনে কবি এঁকেছে। পদ্মলোচনের সেই 'সুমুন্ধির পো'-রা আর কেউ নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অতন্দ্র প্রহরী লাল পাগড়ীর পুলিশকুল।

তারা আজো আছে। আঙ্গিকে তাদের হয়ত কিছু পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু মুল চরিত্রটি অবিকৃত রয়ে গেছে। তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। কারণ ব্রিটিশের আমলে পরাধীন ভারত শাসিত হত ব্রিটিশেরই স্বার্থে, দেশের লোকের স্বার্থে নয়। আজ স্বাধীন ভারতেও দেশ শাসনের মধ্যেও 'সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে'। রাজতন্ত্র গিয়ে গণতন্ত্র হল। কিন্তু সেই গণতন্ত্রের অসহায় পরিণতি কেবল দলতন্ত্রের দিকে। এখন দেশ শাসিত হচ্ছে কিছু দলের স্বার্থে।

সেই দলগুলির মধ্যে যেমন কিছু রাজনৈতিক দল রয়েছে তেমনি রয়েছে পুঁজিবাদীদের দল যাদের বলা হয় কালোবাজারী। এঁরা স্বাধীন ভারতে পদ্ম-বিভীষণ ! দেশের প্রতিষ্ঠিত নিয়মতান্ত্রিক সরকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এরা সমান্তরালভাবে প্রচ্ছন্ন সরকার চালায়। দেশে তাই এখন দুরকম সরকার। সরকারের রাজ্যপাট রাখার জন্যই পুলিশের দরকার। তাই সরকারের ঐতিহ্যেরও যখন কোন বদল হয় নি তখন পুলিশ ঐতিহ্য হারিয়ে নির্বিষ ও হীনবল হয়ে যায় নি। পুলিশ দুই সরকারেরই সেবা করে।

সেই তিরিশ বছরের আগের দিনগুলোতে নীলু দেখেছে পুলিশের এক চণ্ড ভূমিকা। দেশে ধানচাল শেষ। মাঠে সে বছর এক কনাও

শস্য জন্মে নি। তরীতরকারী যা ফলেছিল তা শেষ। লোকে ঝোপে-ঝাড়ের মানকচু, ওলকচু খেয়ে সব শেষ করেছে। গিরাশাক বা ঐ জাতীয় খাদ্য তালিকা বহির্ভূত কিছু জিনিস খেয়ে ধুঁকছে। ওরই মধ্যে পেয় জলের অভাবে এল কলেরা মহামারীরূপে। কোনরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই! সরকার কোন রকমে সাহায্য করছে না—অন্ন, বস্ত্র পানীয় জল বা ঔষধ কোনটা দিয়ে না। শুধু পুলিশনামধারী কতগুলো নেকড়েকে লেলিয়ে দিল। তাদের কাজ হল ভল্টুদের শায়েস্তা করা। মরণের আর কত ফাঁদ একসঙ্গে পাতা থাকতে পারে?

নীলুরা তখন অন্নদা মাইতির বাড়ীতে। রোজ রাতেই প্রায় শুনতে পায় পুলিশের বুটের আওয়াজ। পুলিশ টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে চারদিকে। মাইতিদের ঐ পাড়ায় পাঁচ-সাতটি যুবক ছিল। তারা পুলিশের ভয়ে রাতে ঘরে শু'ত না। আজ রাতে এর বাড়ী, কাল রাতে তার বাড়ী এরকম করে কাটাত। পুলিশ ভল্টু ধরার একটা 'শর্টকাট' নীতি করেছিল। কে বন্যার আগে আন্দোলনে নেমেছিল কে নামে নি ওসব ভাবার দরকার নেই তাদের। তাদের কাছে যুবক মাত্রেই ভল্টু আর ভল্টু মানেই পাজী। অতএব ধর ওদের। দিনের বেলায় তাদের পাওয়া কষ্ট, পুলিশ দেখলেই দৌড়িয়ে পালায়। কোথায় যে বাঁশবনে পানা পুকুরে গিয়ে লুকায় তা পদ্মলোচনের সমুন্ধির পো-রা আর খুঁজে পায় না। রাতের বেলায় তো বাছাধনেরা ঘরে শোবে। অতএব সেই রাতের বেলাতেই পুলিশ রোজ রোজ লোকের বাড়ীতে হানা দিতে লাগল।

একদিন গভীর রাতে পুলিশের বুটের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে স্পষ্ট শুনতে পায়, কে যেন বলছে—আরে, এ বাড়ীতে কোন শালা ভল্টু আছে কিনা একবার দেখে যাবি না। মারি শালাদের দরজায় লাথি?

নীলু শুনে ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। এত ভয় পেয়ে যায় যে পাশে শুয়ে থাকা রাসুকে ডাকার মত গলার স্বরও তার ফোটে না।

আর একজন কে যেন তরলকণ্ঠে বলে ওঠে—আরে ছেড়ে দে,

ছেড়ে দে, এটা আমার শ্বশুরবাড়ী রে। থাক্ শালারা ঘুমিয়ে। চল বরং একবার মোক্ষদার বাড়ীর দিকে যাই। অনেকদিন মাগীর ওখানে যাওয়া হয় নি।

সবাই খুব জোরে হেসে উঠল। তারপর কি সব কথাবার্তা বলতে বলতে চলে গেল। ওদের পায়ের শব্দগুলো মিলিয়ে যেতে নীলু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

দু'চারদিন অন্তর অন্তর শোনা যায় নীলুদের গ্রাম থেকে এবং পাশের গ্রাম থেকে দু'চারটে করে যুবককে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ওদের থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশ হাজতে পুরে রাখে। বাড়ীর লোকেরা যদি অবস্থাপন্ন হয়, তাহলে টাকাপয়সা দিয়ে তাদের ছেলেদের পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনে। যারা পারে না তাদের ছেলেদের কাঁথির জেলে চালান দেয়। যারা জেল থেকে ছাড়া পায় তারা এসে পুলিশের নির্যাতনের গল্প করে।

বিপিন সামন্ত বলে এমনি একজন ছাড়া পাওয়া যুবকের সারা গায়ে পুলিশী নির্যাতনের চিহ্ন দেখে শিউরে উঠেছিল নীলু। সে কস্মিনকালেও আন্দোলনের মধ্যে ছিল না। তবু তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ তার যৌবনের অপরাধে। নীলু দেখেছিল, বিপিন সামন্তের গোটা গায়ে চাবুকের দাগগুলো নীল হয়ে উঠেছিল। তার পেটে ছিল বুটের কাঁটার দাগ।

পুলিশ মারতে মারতে বিপিনকে নাকি বলেছিল—শালাদের খুব স্বাধীন হবার সখ হয়েছিল, না? খুব থানা পুড়িয়েছিলি। এবারে এমন দাগা তোদের দেব যে আর কোনদিন ঐ সাহস তোদের হবে না।

একদিন পুলিশ পুর্ণেন্দু কাকার ছোট ভাইকে ধরে নিয়ে গেল। পুর্ণেন্দুকাকারা অবশ্য তার পরের দিন থানা থেকে তাকে ছাড়িয়ে আনল। পুলিশ তাকে অবশ্য বিশেষ মারধোর করে নি। কিছু টাকা আদায়ের জন্যই নাকি পুলিশ পূর্ণেন্দু কাকার ভাইকে ধরেছিল। অবশ্য পুর্ণেন্দু কাকার ভাই আগষ্ট আন্দোলনের মধ্যে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল।

এতদিন পুলিশ সাধারণ বাড়ীর ছেলেদের ধরছিল। এই প্রথম এক অবস্থাপন্ন বাড়ীর ছেলেকে ধরল। সে নিয়ে গাঁয়ে দারুন হৈ চৈ হল। বড়রা এসব বলাবলি করে, এর একটা বিহিত না করলে নয়।

নীলু একদিন দুপুরে তাদের ইসকুলের দিকে গিয়েছিল এমনি দেখতে ইসকুল ঘর কতদূর সারানো হল। ওখানে গিয়ে দেখে মোক্ষদার বাড়ীর সামনে কিছু লোকের জটলা। নীলু কৌতুহলী হয়ে সেদিকে যায়।

কয়েকজন যুবক মোক্ষদাকে ধমকাচ্ছে—তুমি ফের যদি পুলিশের কাছে আমাদের সন্ধান দাও তবে এ গাঁয়ে তোমাকে থাকতে হবে না। দেখি, তোমার কোন পুলিশ বাপ তোমাকে রক্ষা করে ?

মোক্ষদা হাঁউমাউ করে প্রতিবাদ জানায়—বাবুরা, আমি পুলিশকে কিছু বলি নি, বিশ্বাস কর।

পুর্ণেন্দু কাকার ভাই বলে ওঠে—তোমার বাড়ীতে পুলিশ আসে না ? কেন আসে তারা ?

মোক্ষদা আমতা আমতা করে বলে—এপাশ দিয়ে যখন টহল দিয়ে ফেরে তখন কোন কোনদিন ওরা জল চেয়ে খেয়ে যায়।

পূর্ণেন্দু কাকার ভাই ভেংচিয়ে বলে—ঢং দেখ না, পুলিশ রাতের বেলায় তেষ্টা মেটাতে তোর কাছে আসে ?

সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। নীলুর সে রাতের সেই পুলিশদের কথাগুলো মনে পড়ে। সে তাই পুর্ণেন্দু কাকার ভায়ের কথার ইঙ্গিত বুঝতে পারে। তাই সে হেসে ওঠে।

পূর্ণেন্দু কাকার ভাই আবার শাসনের সুরে বলে—দ্যাখ্ মোক্ষদা, তোকে শেষবারের মত বলে দিচ্ছি; পুলিশের সাথে পীরিত করা চলবে না।

মোক্ষদা আবার হাঁউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে—এসব কি কথা বলছ তোমরা। বুড়ো শিবের দিব্যি, আমি ওদের জল ছাড়া আর কিছু দিই না।

কে একজন পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলে ওঠে—আহা-হা কি আমার

সতীলক্ষ্মী রে ? তারপর যুবকটি সামনের দিকে এগিয়ে এসে বলে—খুব তো সতীপনা দেখাচ্ছিস্, তাহলে বল তো, তোর চলে কি করে ? দিব্যি তো চাল খেয়ে খেয়ে চেহারাখানা বাগিয়েছিস। তোর পুলিশ নাগরেরা চাল না দিয়ে গেলে কোথা পাস তুই চাল, বল ?

মোক্ষদা এবার কিছুটা তেজ দেখিয়ে বলে—যত সব বাজে কথা। কোনদিন খেতে পাই, কোনদিন পাই না তার ঠিক নেই। আমি বিধবা মেয়েমানুষ বলে তোমরা আমায় এত হেনস্থা করছ। আমি ওসব কিছুর মধ্যে নেই।

পূর্ণেন্দু কাকার ভাই স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ মোক্ষদার দিকে চেয়ে শান্তভাবে বলে—বেশ না হয় নাই-ই তুই। কিন্তু তুই তো বললি পুলিশকে জল খাওয়াস। তারা তবে তোর বাড়ীতে আসে। আর তোর কাছে নিশ্চয়ই খবর পায় রাতে আমরা কে কার বাড়ীতে শুয়ে থাকি।

মোক্ষদা অমনি হাঁ হাঁ করে বলে ওঠে—ও মা, আমি জানব কেমন করে তোমরা রাতে কে কোথায় থাক। আর জানলেই বা আমি বলতে যাব কেন ?

পূর্ণেন্দু কাকার ভাই রেগে উঠে বলে—তবে পুলিশ সেদিন জানল কি করে আমি জানাদের বাড়ীতে শুয়ে আছি ? বল্ এবার।

মোক্ষদা চোখ কপালে তুলে বলে—সে আমি বলি নি। ঐ গিরীশই বলেছে। ওই তো আজকাল সব খবর পুলিশদের দেয়। রাতের বেলায় ও-ই তো পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। নাহলে পুলিশই বা জানবে কেমন করে বলো কোনটা কার বাড়ী ?

পূর্ণেন্দু কাকার ভাই জেরা করে বলে—তুই-ই বা জানলি কেমন করে এ কথা ? পুলিশ তোকে বলেছে ?

মোক্ষদা চোখের তারা ঘুরিয়ে বলে—না, তাই বলে কখনো ? যেদিন রাতে তোমায় পুলিশ ধরল সেদিন যে গিরীশকে দেখলাম ওদের দলে।

—এ কথা বলিস্ নি কেন এতদিন ?

মোক্ষদা কেঁদেকেটে বলে—ভয়ে বলিনি বাবু, পুলিশ আমার উপর তাহলে চোটপাট করত। আমার অন্যায় হয়েছে। বিধবা মেয়েমানুষ মাথার উপরে কেউ নেই। তোমাদের এসব বলে আবার কি ফ্যাসাদে পড়ব কে জানে ?

মোক্ষদা কথা শেষ করে কাঁদতে থাকে। সকলের মুখে দারুন বিস্ময়ের ছায়া পড়ে। ক্রমে বিস্ময় প্রচণ্ড ক্রোধে রূপান্তরিত হয়। সবাই যেন রাগে ফেটে পড়তে চায়। পারলে এখনই তারা গিরীশকে কোতল করে। নানাজনে নানাকথা বলতে থাকে। কেউ বলে—এখনই চল গিরীশের বাড়ী, ওকে শায়েস্তা করা যাক্।

কেউ আবার বলে—এখন যাওয়া ঠিক হবে না। পুলিশ তাহলে আরও বেশী করে অত্যাচার চালাবে।

শেষে পূর্ণেন্দু কাকার ভাই বলে—এ ব্যাপারে একটা চিন্তা করে কিছু করতে হবে। এখান থেকে চল এখন। সকলের সঙ্গে আলোচনা করি আগে।

এরপর গিরীশকে নিয়ে অনেক ঘটনাই ঘটে। নীলু বড়দের মুখে সব পর পর শুনে গেছে। এখনও মনে পড়ে, তারপর তাদের গাঁয়ে পুলিশের আনাগোনা বেড়ে যায়। একদিন হরিপুর থেকে একদল মিলিটারী রাইফেল ঘাড়ে করে সকালবেলা ডিস্‌ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ধরে মার্চ করে সকলকে জানিয়ে যায় যে বেশী বাড়াবাড়ি করলে পুলিশের পেছনে আমরাও আছি। সাবধান !

কিন্তু শাপলা গাঁয়ের লোক ঐ ভয়ে যে ভীত হয়নি পরের ঘটনাগুলিই তার প্রমাণ। মৃত্যুর শত সহস্র মুখের নাগালের মধ্যে থেকেও তারা গিরীশকে চরম শাস্তি দেবার সাহস দেখিয়েছিল। সেসব কথা ভেবে আজ নীলাদ্রি সেই সব মৃত্যুঞ্জয়ী যুবকদের বাহবা দেয়। সেই যুবকেরা আজ কেউ কেউ তার কাকা, জেঠা, দাদা হয়ে বেঁচে আছেন। কেউ কেউ এ পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে গেছেন। যাঁরা গেছেন তাঁদের নীলাদ্রির নমস্কার। যাঁরা আজো বেঁচে তাঁদেরও নীলাদ্রি নমস্কার জানায়।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা তার মনে হয়, সেই ১৯৪৩-এর মৃত্যুর ফাঁদ-পাতা দিনগুলোতে মানুষ অনেক ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল। সেগুলোকে আজ তার মনে হয় মধুর ছলনা। কেউ কেউ চরিত্রভ্রষ্ট, নীতিভ্রষ্ট বা পথভ্রষ্ট হয়েছিল। এরকম এক চরিত্র হলো নীলুর মোক্ষদা পিসী। পুলিশের কাছে সে দেহ বিক্রয় করেছিল নিতান্ত বাঁচার তাগিদে, সন্দেহ নেই। তারজন্য তাকে মানবিক কারণে কোনমতে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু সে পুলিশদের গ্রামের যুবকদের অবস্থানের কিছু কিছু খবর যে একেবারে দিত না এমন নয়। এটা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনে অপরের অস্তিত্বকে বিপন্ন করার কাজকে কেউ-ই বরদাস্ত করতে পারে না।

তবে মোক্ষদা তার ভুল বুঝতে দেরী করে নি। পরে সে পুলিশকে তার যৌবনের গোপন রসের ভাণ্ডারের সন্ধান দিলেও গ্রামের যুবকদের সন্ধান আর দেয় নি। বরং গ্রামের ছেলেরা যে গিরীশকে চরমতম শাস্তিটা দিতে পেরেছিল আর তার ফলে গ্রামে পুলিশদের উপদ্রব কমে গিয়েছিল তা মোক্ষদার সক্রিয় সাহায্যের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। বহুজনের আশীর্বাদে তার দেহ বিক্রয়ের গ্লানিও ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

গিরীশ সামন্ত ছিল এমনি আর এক চরিত্রভ্রষ্ট, নীতিভ্রষ্ট এবং পথভ্রষ্ট লোক। সেও বাঁচার তাগিদে পুলিশের ইন্‌ফরমার সেজে সহজ পথে বাঁচতে চেয়েছিল। পুলিশ তাকে শুধু টাকা পয়সাই দিত না, তারজন্য রেশনও বরাদ্দ করেছিল। বাঁচার অধিকার সকলেরই আছে কিন্তু অপরকে মেরে বাঁচার অধিকার কারোর নেই। এটাই ছিল গিরীশের ভুল যে, সে অপরকে মেরে বাঁচতে চেয়েছিল। যুবকেরা তাকে সাবধান করে দিয়েছিল কিন্তু সে শোনে নি। তাই সে ভুল থেকে মহাভুল করল আর সেই মহাভুলের এক মহা প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতে হয়েছিল নিজের জীবন দিয়ে।

আর একটা কথা মনে করে নীলাদ্রির ভাল লাগে। সেই ১৯৪৩-এর দিনে তার দেখা মানুষগুলো একাধারে ক্ষুধা ও মহামারীর সঙ্গে লড়েছে তেমনি পুলিশের সঙ্গেও পাঞ্জা লড়েছে। কেউ কেউ হয়ত

চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছে কিন্তু সকলে মিলেমিশে থেকেও বেঁচে থাকার এক উজ্জ্বল মহনীয় দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে। তাদের গাঁয়ে কেউ একে অপরের খাবার লুঠ করে নি। যথাসাধ্য একে অপরকে দিয়েছে। 'দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে' সকলে 'ভাগ করে' 'সকলের সাথে অন্নপান' খেয়েছে।

তারা কেউ গ্রাম ছেড়ে শহরের পথে পা বাড়ায় নি। মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেদের গাঁয়েই নিঃশেষে জীবন দিয়েছে তবু শহরে ভিখারীর সংখ্যা বাড়ায় নি বা মৃতদেহের মিছিলকে দীর্ঘতর করে নি। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে গ্রামের মাটিতে যথাসাধ্য ফলাবার চেষ্টা করেছে তবু শহরে ভীড় করে শহরের খাদ্যে ভাগ বসায় নি। বরং পরবর্তীকালে সেই সব মৃত্যুঞ্জয়ীরা গ্রামে এবং শহরে সকলের মুখে অন্ন তুলে দিয়েছে। বিধাতা আর নিজেদের কপালকে ছাড়া আর কাউকে দোষ দেয় নি সেই দুর্গত মানুষগুলো।

মানুষের এই উজ্জ্বল মহনীয় চরিত্র আজ পর্যন্ত কোন শক্তিমান সাহিত্যিক তাঁর মরমী লেখনীতে অঙ্কিত করেন নি। পঞ্চাশের মন্বন্তর বলে বাংলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে তার মধ্যে ফুটে উঠেছে বেশী করে মানুষের চরিত্রের নাস্তিবাচক দিকগুলো। মানুষ সেখানে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে শুধু মজুতদার, লুঠেরা, মেয়েরা চরিত্রভ্রষ্টা নয়তো মেয়েপুরুষ শহরের দিকে ধাবমান। মানুষের চরিত্রের পলায়নী মনোবৃত্তিটুকুই আজ পর্যন্ত চিত্রিত হয়েছে। এগুলো মিথ্যা নয় কিন্তু এগুলো সবটুকু নয়! পঞ্চাশের মন্বন্তরের সেই অসহায় লোকগুলির গঠনমুলক কোন চিত্র সাহিত্যে প্রবেশলাভ করে নি। বাংলা সাহিত্যের এ এক দুর্ভাগ্য!

অনেক আশা নিয়ে নীলাদ্রি বিশ্ববন্দিত চিত্র পরিচালক শ্রীসত্যজিত রায়ের গোল্ডেন বীয়ার পুরস্কারপ্রাপ্ত 'অশনি সংকেত' দেখতে গিয়েছিল কিন্তু তাতে শুধু মানুষের এই নাস্তিবাচক দিক আর পলায়নী মনোবৃত্তির সংকেতই সে দেখেছে। সাহিত্যে যা হয় নি তা হয়ত ছায়াছবিতে হতে পারত। কিন্তু না, তা হয় নি।

তাই সে তার এই 'মহাজীবনের গানে' সেই উজ্জ্বল চরিত্রগুলিকে

ধরে রাখতে চায় যেগুলো আজও তার স্মৃতিপটে অক্ষয়, অম্লান হয়ে আছে। সেগুলি চিরভাস্বর। এতদিন পরে সেই মানুষগুলিকে নীলাদ্রির মনে হয়, তারা যেন ছিল এক মহামানবের মিছিলের অংশ। তারা সেদিন সহস্র মৃত্যুকে উপেক্ষা করে জীবনের যে জয়গান একসঙ্গে মিলে করেছিল তা ছিল আসলে মহাজীবনের গান যা মানবসভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষ বহুবার গেয়েছে এবং গাইবেও। মানুষের জীবন দোষগুণে ভরা কিন্তু মানুষের মহাজীবন বুঝি চিরমহৎ, চিরভাস্বর —জ্বলন্ত ভাস্করের মতই!

নীলাদ্রির এখন স্পষ্ট মনে পড়ে, মৌক্ষদাকে যেদিন গ্রামের যুবকেরা তিরস্কার করে তার কিছুদিন পরে গাঁয়ে নিদারুন ত্রাসের সঞ্চার হল। ত্রাসটা সৃষ্টি করল পুলিশ আর গিরীশ যুগপৎ। গিরীশ হয়ে উঠল এক কালাপাহাড়। যুবকেরা নিশ্চয়ই গিরীশকে সাংঘাতিক কিছু শাসিয়েছিল যার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া এসেছিল ঐভাবে। গিরীশ তখন পারতপক্ষে একা রাস্তাঘাটে বার হত না। তাদের বাড়ীর লোকেরাও তাই। ওদের বাড়ীর কাছে যেতেও কেউ সাহস করত না। লোকে তারপর গিরীশের নতুন নামকরন করল—পুলিশের ফেউ। কিছুদিন পরে তার নাম হল শুধু ফেউ। ফেউ শব্দের অর্থই যেন দাঁড়িয়ে গেল গিরীশ সামন্ত।

গিরীশ বা তার বাড়ীর লোকজন কেউ পথে ঘাটে না বার হলেও তাদের দিন বেশ ভালভাবেই চলতে লাগল। পুলিশের কৃপায় তার কোন অভাবই ছিল না। এরপর দু-ধরণের নতুন অত্যাচার সুরু হল। পুলিশ রাতের বেলায় শুধু একটু অবস্থাপন্ন বাড়ী দেখে দেখে হানা দিতে লাগল—সে বাড়ীতে যুবক কেউ থাক বা না থাক। গিরীশই তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসত। পুলিশ ঘরে ঢুকে ধান চাল ইত্যাদি লুঠ করত। গিরীশ লুঠের বখরাও পেত।

চালের মন তখন প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। তাও সব জায়গায় মেলে না। ধানচাল কেউ বিশেষ মজুত করেও রাখে নি। কোন বাড়ীতে কিছু থাকলে তা নেহাৎ নিজেদেরই প্রয়োজনে। তবু শাপলা

গাঁয়ের লোক একে অপরের খাদ্য লুঠ করে নি। নীলু অবশ্য পরে শুনেছিল অনেক জায়গাতে নাকি ক্ষুধার্ত মানুষ দলবদ্ধ হয়ে মজুত-দারের গুদাম লুঠ করেছে। কিন্তু সেই ১৯৪৩-এ শাপলা গাঁয়ে গৃহস্থের ধানচাল লুঠ করেছিল পুলিশ এবং তাদের ফেউ মিলে। কারোর কোন বাধা দেবার উপায় ছিল না। কেউ কেউ বাধা দিতে গিয়ে পলিশের মারে জখম হয়েছে।

অসহায় গৃহস্থের মুখের গ্রাসেই শুধু টান মেরে পুলিশ ক্ষান্ত হয় নি তাদের মা বোনদের ইজ্জতেও টান মেরেছে। এ ব্যাপারে গিরীশই ছিল বেশী উৎসাহী। একটু সুন্দরী যুবতী মেয়ে দেখলেই ওদের জিভে জল পড়ত। তারা ভল্টু ধরার নামে একই সঙ্গে লুঠপাট ও মেয়েদের শ্লীলতাহানিও সমানে চালিয়ে গেছে।

এই ভল্টু ধরার কাজের সুবিধার জন্য মাইল তিনেক দূরের এক গাঁয়ে একটা পুলিশ ফাঁড়ি বসানো হয়েছিল সে সময়। সেই ফাঁড়ির চার্জে ছিল এক ছোটবাবু। অসহায় মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে গিরীশ ও পুলিশ তাদের বাসনা চরিতার্থ করে আবার ছোটবাবুর ভোগের জন্য ফাঁড়িতে পাঠিয়েছে এমন ঘটনাও শোনা গেছে।

এতদিন গ্রামের যুবকেরাই শুধু পালাই পালাই করেছিল। এবার তাদের সঙ্গে যোগ দিল যুবতীরা ও উদ্ভিন্ন যৌবনা কিশোরীরা। এমনই এক মেয়ে ছিল নীলুদের গাঁয়ে। তার নাম তিলোত্তমা। সে ছিল রাণীদেরই আত্মীয়া। তিলোত্তমা ছিল বালবিধবা। বিধবা হওয়ার পর সে বাপের বাড়ীতেই থাকত। তার চরিত্র সম্বন্ধে কেউ কোনদিন খারাপ কিছু শোনে নি। তখন তার বয়স কুড়ি-বাইশ। গিরীশের অনেকদিন থেকে লোভ ছিল ঐ মেয়েটির উপর।

পুলিশের ভয়ে তিলোত্তমা রাতে রাণীদের বাড়ীতে এসে শু'ত। একদিন পুলিশের দল রাতে তার বাপের বাড়ীতে হানা দিল। তিলোত্তমাকে না পেয়ে দারুন ক্ষিপ্ত হয়ে তারা বাড়ীর সকলকে লাঠি আর বুটের ঘায়ে আধমরা করে রেখে যায়। গরীবের বাড়ীতে লুঠ করার মত কিছুই ছিল না। তাই লুঠ করতে পারে নি। কিন্তু

যাওয়ার আগে আধমরা লোকগুলোকে এই বলে শাসিয়ে গিয়েছিল যে তিলোত্তমা যদি স্বেচ্ছায় তাদের ক্যাঁড়িতে গিয়ে ধরা না দেয় তবে তারা কেউ আর প্রাণে বেঁচে থাকবে না। তিলোত্তমা বাপ-ভাইদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য তাদের হাতে ধরা দিয়ে নিজের অমূল্য ইজ্জত বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিল যা প্রকৃতির শত প্রতিকূলতার মধ্যেও সে হারায় নি।

এ সমস্তই করেছে এ দেশের মির্জাফরেরা। মির্জাফরেরা চিরকাল তাই-ই করে। একদল যখন স্বাধীনতার জন্য জীবন পন করে লড়াই করে যায় তখন মির্জাফরেরা আপন লালসা চরিতার্থ এবং অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য স্বদেশের স্বাধীনতা ও স্বদেশবাসীর মান ইজ্জত সব কিছু শত্রুর হাতে অবলীলায় তুলে দেয়।

ব্রিটিশ মির্জাফরের জন্যই এদেশে শাসনদণ্ড কায়েম করতে পেরেছিল আবার মির্জাফরদের জন্যই দু'শতাব্দী ধরে সমানে শাসন করে গেছে। সেই ১৯৪৩-এর দিনগুলোতে অসহায় মুমুর্ষু লোকগুলি দেশব্যাপী এই নৈরাজ্যের শিকার হয়েছে। প্রতিবাদ করার কোন উপায় ছিল না। কে করবে অন্যায়ের প্রতিবাদ? কার কাছে? বিদেশী শাসকগোষ্ঠী তো চেয়েছেই, এ ধরণের অত্যাচার চলুক যাতে কোনদিন আর লোকে শিরদাঁড়া সোজা করে চলতে না পারে। ইতিহাসে এ ধরণের নজীর প্রচুর রয়েছে। হাতের কাছে রয়েছে, পাকিস্থানী হানাদারদের বাংলাদেশে আক্রমণ, নির্যাতন, লুঠতরাজ, নারী-ধর্ষণ ইত্যাদি।

বিচার যখন চাওয়া যায় না বা প্রতিবাদ যখন করা চলে না তখনও কিন্তু মানুষ বাঁচতে চায়। আর সে বাঁচাটা একমাত্র সম্ভব হয় সংঘবদ্ধতার মধ্য দিয়ে। ইতিহাসই সাক্ষ্য দেবে যে বহু বহুবার দুর্বল মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তি দুর্দান্ত সবলদের একেবারে ধরাশায়ী করে দিয়েছে। দৃষ্টান্তের এখানে কোন প্রয়োজন নেই, শুধু উল্লেখই যথেষ্ঠ।

ঐ কালাপাহাড়ী অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেই ১৯৪৩-এও শাপলা গাঁয়ের মানুষ মরনের মুখে দাঁড়িয়েও এক হয়ে গেল। যুবকেরা তারপর

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ল। একদলের কাজ হল দিনে আর একদলের রাতে। উভয় দলের লক্ষ্য হল গ্রামে পুলিশের আগমন এবং গিরীশের গতিবিধি লক্ষ্য করা। তারা দিনে ও রাতে গ্রামের বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে থাকতে লাগল। পুলিশের দেখা পাওয়া মাত্রই সে সংবাদ গ্রামের সর্বত্র ছড়িয়ে যেত। আর মুহূর্তের মধ্যে সকলে গ্রাম ছেড়ে যাওয়া হয়ে যেত।

এ ছাড়া পুলিশ মোক্ষদার বাড়ীতে এলে মোক্ষদা সে খবর পাশের প্রতিবেশীকে দিয়ে দিত। একদল ছেলেমেয়ে ভিক্ষা করে বেড়াত। তারাও পুলিশের আগমন বার্তা স্বেচ্ছায় গাঁয়ের সর্বত্র পৌঁছিয়ে দিত।

এই সংঘবদ্ধতার ফলে পুলিশ ও গিরীশ বিড়ম্বনায় পড়ে গেল। দৌড়ই শুধু সার, ভল্টু ধরা আর হয় না। এদিকে পুলিশের ছত্র-ছায়ায় থাকার জন্য কেউ গিরীশকে শাস্তি দেবার কথা চিন্তা করতে পারছে না।

এই সময় নীলু একবার কিছুদিনের জন্য জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে থাকল। ঘরে থেকে থেকে হাঁপিয়ে ওঠে সে। যেদিন সে পথ্য করল সেদিন শুনল রাণীর বিয়ে হচ্ছে। বরের বাড়ী মাইল চারেক দূরের এক গাঁয়ে।

রাণীর বিয়ের খবরটা এনেছিল মোক্ষদাই। মাকে যখন সে বলছিল তখন নীলু শুনছিল সব। বরের বাড়ীর অবস্থা নাকি বিশেষ খারাপ নয়। তাদের ঘরে কিছু ধানচাল রয়েছে। রাণীরা জাতে মাহিষ্য। ওদের জাতে মেয়ের সংখ্যা কম। তাই বর পক্ষই উল্টে কন্যা পক্ষকে কন্যাপন দেয়। মোক্ষদা জানাল, রাণীর দাদা রাণীর বিয়েতে ষোল সের চাল আর দুকুড়ি টাকা পাচ্ছে।

রাণীর বিয়ের খবর শুনতে শুনতে নীলু উদাস হয়ে যাচ্ছিল। তার মন থেকে কে যেন বলে ওঠে—এমন তো হবার কথা ছিল না। রাণীকে নিয়ে যে তার কত স্বপ্ন ছিল। আজ এ খবর শুনে সব স্বপ্ন যেন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

মোক্ষদা ওদিকে রমলাকে বলে চলেছে—ভালোই করেছে রাণীর

দাদা, কি বলো দিদি ? মেয়েটা এ দুর্দিনে দু' মুঠো খেয়ে পরে বাঁচবে। এরাও কিছু চাল পেল। কিছুদিন তো আধপেটা খেয়েও এদের চলবে। তারপর, দিদি পুলিশের যা সব কাণ্ড! মেয়েটার উপর কবে না কবে নজরে পড়ত ঐশকুনদের। সেজন্যই এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিল ওর দাদা।

মোক্ষদা চলে যায়। নীলু যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। বার বার মনে মনে সে রাণীর উদ্দেশ্যে বলে—রাণী, তুই অসতী, তুই অসতী!

মনে মনে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে নীলু, রাণীর সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হলেও সে কথা বলবে না তার সাথে।

দিন দুই পরে দুপুরের দিকে একদিন নীলু এল নিজেদের বাস্তুতে। তাদের নতুন ঘরে এখন চালের কাজ হচ্ছে। ছিটেবেড়ার দেওয়ালে মাটি লেপার কাজ শেষ হয়ে গেছে।

এখান থেকে রাণীদের বাড়ীর দিকে চেয়ে নীলুর চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে। রাণী বরের সঙ্গে চলে গেছে। ওদের বাড়ীতে এখন গেলে রাণীর সঙ্গে আর দেখা হবে না। রাণী এলেও সে দেখা করতে যাবে না। তবু অবাধ্য চোখ কেন যে সেদিকেই ঘুরে ঘুরে যায়!

নীলু আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় ওদের বাড়ীর দিকে। রাণীদের বাড়ী আর নীলুদের বাড়ীর সীমারেখার মাঝে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড এক তেতুল গাছ! সেটা ঝড়ে পড়ে নি। ঝড়ে একটু কাহিল হয়েছিল মাত্র। এখন গাছটা যেন নতুন প্রাণ পেয়ে শাখা প্রশাখা মেলেছে।

নীলু তেতুল গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল। ওখান থেকে দেখতে পায় রাণীর দাদা বারান্দায় কলাপাতায় ভাত খাচ্ছে। নীলুর মনে পড়ে রাণীর বিয়েতে ওরা চাল পেয়েছে। সেই চালের ভাত হবে বোধ হয়। থালা বাটি তো সব পেটের দায়ে ওরা আগেই বেচে দিয়েছে। এখন কলাপাতাই সম্বল।

নীলু রাণীর দাদার ভাত খাওয়া দেখছে কিন্তু মন তার অনেক দূরের ছবিগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছে। মনে পড়ল কতদিন সে, রাণী একসঙ্গে ওদের বাড়ীর ভাঙ্গা কাসার বাটিতে মহানন্দে ক্ষুদভাজা

খেয়েছে পাশাপাশি বসে। এমনভাবে বসা আর কোন দিনই হবে না। নীলুর মনটা ভারী হয়ে আসে।

সহসা তার মনে বিদ্যুৎ-চমকের মত এক কঠিন প্রশ্ন খেলে যায়। নীলু ভাবে, মেয়েদের কেন বিয়ে হয়? বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েরা স্বামীর বাড়ী চলে যায়। এটা যে নিয়ম তা নীলুকে কিছুমাত্র কষ্ট করে বুঝতে হয় না কারণ হামেশাই তাই সে দেখছে। কিন্তু বিয়ে কেন হয়?

একদিন রাসুকে জিজ্ঞেস করেছিল সে কথাটা। রাসু বলেছিল, বিয়ে করলে ছেলেপুলে হয়, আমরা সকলে যেমন হয়েছি।

ছেলেপুলে হলে ঝামেলা তো কম নয়। সে কথাও সে রাসুকে বলেছিল। রাসু বলেছিল—ছেলে না হলে বুড়ো বাপকে শেষ বয়সে দেখবে কে?

নীলু তবু অবুঝের মত প্রশ্ন করেছিল—কিন্তু মেয়েরা তো বিয়ের পর বাপের বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। তারা হয়ে তবে বাপের কি সুবিধা হয়?

রাসু হেসে বলেছিল—তুই কি বোকারে! মেয়ে না থাকলে আবার ছেলেই বা হবে কেমন করে?

এ পর্যন্ত ভাবনাগুলো নীলুর আগেই ভাবা ছিল। এর পরের ভাবনাটাই যেন সেই মুহূর্তে নীলুর মনে খেলে গেল।

নীলু ভাবতে থাকে—নাই বা হল আর ছেলেমেয়ে। তাতে কার কি ক্ষতি? মানুষ না থাকলে তো পুলিশ থাকত না। পুলিশ না থাকলে মানুষ আজ মানুষের হাতে এত মার খেয়ে মরত না।

নীলুর ধারণা হয়, রাসু যা বলেছে তা হয়ত ঠিক কিন্তু ওটাই সবটা নয়। আরো কোন গূঢ় কারণ রয়েছে নিশ্চয়ই। ছেলেমেয়েদের জন্ম দিতে মাদের তো কম কষ্ট হয় না। মালতী জন্মাবার আগে তার মা-ই তো তিনদিন কষ্ট পেয়েছিল। নীলু তো নিজেই দেখেছে মায়ের কষ্ট। অতএব বিয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই আরও এমন কোন কারণ আছে যা মানুষের অনেক কষ্টকেও মুছে দেয়।

ঠিক এতখানি ভাবনার মুহূর্তে নীলুর মনে পড়ে যায় ঝড়ের রাতে

সাঁউদের বাড়ীতে তার আর রাণীর জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকার কথা। রাণীর দেহের কি এক অনাস্বাদিতপূর্ব সৌগন্ধ সেদিন তার ঘ্রাণশক্তিকে অচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। আর সেই গন্ধে তার দেহের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

নীলু এখন যেন অবিকল সেই গন্ধটা পাচ্ছে। আর ঠিক সেইরকম তার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সব কিছু তার চোখে যেন এখন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। দেহে মনে কি যেন এক আনন্দের শিহরণ খেলে যায় তার। উত্তেজনার ঘোরে সে এখন বিয়ের কিছু অর্থ যেন ভাসাভাসা-ভাবে বুঝতে পারে কিন্তু তার স্বরূপটা সে স্পষ্ট দেখতে পায় না।

হঠাৎ নীলুর খেয়াল হয় রাণীকে নিয়ে এসব ভাবনা তার ভাবার কোন অর্থ হয় না। রাণী চিরকালের মত তার কাছে আকাশের চাঁদ হয়ে গেছে। নীলুর হৃদয়ে রাণী আর রাণী হয়ে থাকবে না। রাণীর এখন এক পরিচিত মেয়ে মাত্র। নীলু তার কথা আর ভাববে না।

এতক্ষণে সে যেন বাস্তবের মাটি স্পর্শ করে। লজ্জা পায়। লজ্জাটা ঠিক সেই ঝড়ের রাতে রাণীকে দ্বিতীয়বার স্পর্শ করার লজ্জারই মত। সেই লজ্জা পরক্ষনে রাণীর উপর সুতীব্র অভিমানে রূপ নেয়।

ঠিক এই মুহূর্তে মনের এই ভাবতরঙ্গের ওঠানামার মধ্যে যে নিদারুন বাস্তব দৃশ্যটি ঘটে গেল এজন্য নীলু কোনক্রমেই প্রস্তুত ছিল না। সে কিছুক্ষন বিহবল হয়ে ভয় পেতেও ভুলে গেল। কতক্ষন জানে না, পাথরের মত দাঁড়িয়ে থেকে অভূতপূর্ব দৃশ্যটা দেখে গেল।

নীলু দেখল সহসা গিরীশসহ চারজন পুলিশ রাণীদের বাড়ীতে এসে হানা দিল। পুলিশেরা লাথি মেরে রাণীর দাদার পাতের ভাত সব ছড়িয়ে দিল। রাণীর দাদা হাঁ হাঁ করে বাধা দিতেই গিরীশ তার পিঠে লাথি মারল। রাণীর দাদা মুখ থুবড়িয়ে পড়ে গেল। রাণীর মা ঘরের ভেতর থেকে চীৎকার করতে করতে বেরিয়ে এসে ছেলেকে ধরতে যায়। পুলিশের লাথির ঘায়ে ছেলের মত তারও একই দশা হল।

নীলু এই পর্যন্ত দেখে শিউরিয়ে উঠে চোখ বন্ধ করে। পরক্ষনেই তার মনে হয় এখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। নীলু প্রাণপনে

দৌড়িয়ে টংঘরে এসে আশ্রয় নেয়। এখানে এসে আশ্চর্য হয়ে দেখে নগেনকাকা লোকজনেরা যারা ঘরের কাজ করছিল সকলে এসে ঐ ঘরে লুকিয়েছে।

নগেন কাকা ধমক দিয়ে নীলুকে বলে—ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অতক্ষন কি দেখছিলে? বলতে বলতে দরজা বন্ধ করে দেয় নগেন কাকা। দিয়ে বলে—তোমাকে আমরা ডাকতেও পারছি না পুলিশের ভয়ে। পুলিশ দেখলে কক্ষনো সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে না।

সবাই ভয়ে কাঁপছে। নীলুরও তাই। কিছু পরে যখন রাণীদের বাড়ী থেকে রাণীর মার আকাশ ফাটানো কান্নাছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না তখন সকলে দরজা খুলে বাইরে এল। সবাই ছুটে রাণী-দের বাড়ী গেল। পাশাপাশি প্রতিবেশীরাও ছুটে এল। জানা গেল রাণীর দাদাকে পুলিশ বেঁধে নিয়ে গেছে।

রাণীর মা কেঁদে চলেছে। কাঁদতে কাঁদতে বলছে—আবাগীর বেটারা বাছাকে খেতেও দিল না। লাথি মারতে মারতে বেঁধে নিয়ে গেল। চালের বস্তাটাও নিয়ে পালাল। ও মাগো, কি হবে গো—ও—ও।

সে এক শোকাবহ দৃশ্য। সবাই স্তম্ভিত হয়ে যায় ঘটনার আকস্মিকতায়। রাণীর মা কাঁদতে কাঁদতে আরো জানায়—ঐ গিরীশ, ও-ই পুলিশকে খবর দিয়েছে আমার বাড়ীতে চাল আছে। আমি যদি সতীমায়ের সতীকন্যা হই তবে সাতদিনের মধ্যে তোর বৌ বিধবা হবে রে। ভগবান এত অনাচার সইবে নারে।

নীলু পুলিশী অত্যাচারের ঘটনা এই প্রথম নিজের চোখে দেখল। পরে অনুরূপ আরোও অনেকগুলো ঘটনাই সে শুনল। পুলিশ তার কৌশল পালটিয়েছিল। রাতের বেলায় যখন কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না তখন দুপুরে খাওয়ার সময় অতর্কিত আক্রমন চালাতে লাগল। কেউ খবর দিয়ে রাখত কার বাড়ী গেলে ধান, চাল বা মেয়েছেলে পাওয়া যাবে।

কিন্তু সকল অত্যাচারীর অত্যাচারের সীমা আছে। নিশ্চয়ই

আছে। তেমনি রয়েছে মানুষের সহ্যেরও সীমা। পৌরানিক দৃষ্টান্ত যেমন রয়েছে মহিষাসুর, নরকাসুর, রাবন, হিরন্যকশিপুদের মধ্যে তেমনি বর্তমান কালের দৃষ্টান্ত রয়েছে হিটলার, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী, ইয়াহিয়া এইসব আধুনিক অসুরদের মধ্যে। সেই ১৯৪৩-এ শাপলা গ্রামে পুলিশ ও গিরীশ—এই অসুরের দল যেমন অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল তেমনি সেদিন সেই গাঁয়ের মানুষদেরও সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল।

মানুষের মহাজীবনের গানে শুধু যে সুললিত রাগিনী বেজে ওঠে তাই নয়, সে গানে দীপক রাগিনীও বাজে। বঞ্চিত অসহায় নিপীড়িত মানুষ যখন রুদ্ররোষে জ্বলে ওঠে তখনই ঘটে মানুষের মহাজীবনের মাঝে রুদ্রের আবির্ভাব। শিবই সেই রুদ্র। শিবই সংগীত স্রষ্টা আবার সেই শিবের তৃতীয় নয়ন থেকে যখন রোষবহ্নি জ্বলে ওঠে তখন অত্যাচারীর দল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মহাজীবনের আবর্জনা ছড়িয়ে ফেলে শিবই আবার পৃথিবীকে শিবোময় করে তোলে। সেদিনও শাপলা গাঁয়ে মহাজীবনের মাঝে বুঝি সেই রুদ্রেরই পদধ্বনি শোনা গেল। শাপলা গাঁয়ের লোক সেদিন একমনে গায়ের আরাধ্য দেবতা শিবকে আকুল স্বরে সুমহান প্রার্থনা সংগীত শুনিয়েছিল। মহাজীবনের গানে সৃষ্টি দোলে, স্রষ্টাও দোলে। শিবের আসনও তাই সেদিন দুলে উঠেছিল।

অল্প কয়েকদিন পরেই শোনা গেল গিরীশের বৌ কেঁদে পাড়া মাথায় করছে। গিরীশকে ক'দিন পাওয়া যাচ্ছে না। গিরীশের বৌ পুলিশ ফাড়িতে গিয়েছিল। গিরীশের খোঁজে। কিন্তু তারাও তার কোন খবর রাখে না।

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। পাঁচ সাতদিনের মধ্যে পাশাপাশি গ্রামের আরো কয়েকজন পুলিশের ফেউ নিখোঁজ হল। অবস্থা শেষে এমন হয়ে দাঁড়াল যে পুলিশ আর ফেউ করার লোক পায় না।

ওদিকে শংকরীপ্রসাদ এবং গন্যমান্য ব্যক্তিরা কাঁথির মহকুমা শাসকের কাছে পুলিশের নির্যাতনের কাহিনী জানিয়ে প্রতিকারের

আবেদন জানিয়েছিলেন। পুলিশের উপর উপর থেকে নিশ্চয়ই কিছু চাপ এসেছিল।

শেষে একদিন নীলুদের পাশের গাঁয়ের পুলিশ ফাঁড়িটা উঠে গেল। পুলিশরা সব খেজুরী ফিরে গেল। পুলিশী বিভীষিকা আপাততঃ স্তব্ধ হল কিন্তু সেই দুঃস্বপ্নের রেশ নীলুর মন থেকে মুছে যেতে বহুদিন লেগেছিল। গিরীশের ব্যাপারটা সত্যিকারের কি হয়েছিল কয়েকদিন পরেই সব জানা গেল। পাপলা গ্রামের লোকেরা শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল গিরীশকে চিরতরে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে অর্থাৎ রাণীর মায়ের অভিশাপবাণীকে রূপদান করতে। কিন্তু গিরিশ অত্যন্ত চতুর। খবর সেও হয়ত কিছু পেয়ে থাকবে। তাই সে মোটেই বাড়ীর বাইরে একা আসত না। তার বাড়ী ঘিরে ফেলে তাকে মেরে ফেলা এমন কিছু কঠিন কাজ ছিল না কিন্তু তার বৌ ও ছেলেমেয়েরা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে থাকবে। অতএব তার গোটা পরিবারকেই শেষ করতে হয়। তা করতে কেউ চায় নি। অথবা ছিল আর এক জিনিস— তার ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া। এ হেন কাজেও কেউ সায় দেয় নি।

শেষে যুবকেরা গিরীশের চরিত্রের দুর্বলতার সুযোগ নিল। মোক্ষদার জন্যই সম্ভব হল ব্যাপারটা। গিরীশ যেদিন তার পুলিশ প্রভুরা আসত না সেদিন রাতে প্রায়ই মোক্ষদার ঘরে আসত। সকলের ভয়ে অবশ্য আসা কমিয়ে দিয়েছিল তবু মাঝে মাঝে আসত।

যুবকদের কথামত মোক্ষদা ফাঁদ পাতার ব্যবস্থা করল। মোক্ষদা গিরীশকে এক সুন্দরী মেয়ের খোঁজ দেয় এবং বলে যে মোটা বকশিশ পেলে সে ঐ মেয়েকে নিজের বাড়ীতে এনে রাখবে। পুলিশ যে রাতে আসবে না সে রাতেই সে ব্যবস্থা করতে পারে।

গিরীশ মোক্ষদার চালটা ধরতে পারে নি। দীর্ঘদিনের যাতায়াতে মোক্ষদা গিরীশের আস্থাভাজন হয়ে উঠেছিল। গিরীশের তখন ধ্যান-জ্ঞান হল সেই মেয়েটি। সে কোনরূপ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে বলে দিল কোন রাতে গাঁয়ে পুলিশেরা আসবে না। সে খবরও

গ্রামের ছেলেরা যথাসময়ে মোক্ষদার কাছ থেকে পেয়ে গেল। তারা ঐ দিন রাতে মোক্ষদার বাড়ীর সামনে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকল।

এলো সেই ক্ষণ যখন গিরীশ চুপি চুপি এসে মোক্ষদার দরজায় টোকা দিল। অচিরেই দরজা খুলে গেল। গিরীশ মোক্ষদার ঘরে ঢুকল আর সেই মুহূর্তে খোলা দরজা দিয়ে আটদশজন যুবকও ঢুকে গেল।

গিরীশ তাদের দেখে ভয় পাবারও অবকাশ বুঝি পায় নি। দুজন তাকে মাটিতে ফেলে দুপাশ থেকে তার গলায় একটা বাঁশ চেপে ধরল। গিরীশের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। সে প্রাণপনে উঠতে চেয়েছিল কিন্তু পারল না, বাঁশের চাপে অল্প পরেই জ্ঞান হারাল। তখন তার অচৈতন্য দেহটা চটে ভরে সেলাই করা হয়।

গ্রামের শেষ প্রান্তে যে খাল রয়েছে, সেই খাল পার করে যুবকেরা ঐ রাতে তার মৃতদেহ নিয়ে এল গির্জাবাড়ীর জঙ্গলে যেটা নীলুর কাছে মনে হত রামায়নের দেশ। সেখানে গিরীশের দেহ খণ্ড খণ্ড করে মাটির নীচে পুঁতে ফেলা হয়।

এভাবে অত্যাচারীকে শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাণ দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। আর সেই বহুজনবন্দিনী মোক্ষদা? তার শত কলংক ছাপিয়ে সকলের কাছে সে হয়ে দাঁড়াল এক মহিমময়ী ত্রাণকর্ত্রী। নিজের প্রাণরক্ষার তাগিদে নিজের দেহকে যে অশুচি করেছিল সেই অশুচি দেহ দিয়েই সে শুধু অনেকের প্রাণই নয়, ধন, মান আর ইজ্জত রক্ষা করেছিল। দেহের দেউলে যদি দেবতার বাস হয় তবে কলঙ্কিনী মোক্ষদাও সেদিন নিশ্চয়ই হয়ে উঠেছিল দেবী। সে সত্যই সার্থকনাম্নী মোক্ষদা—যথার্থ মুক্তিদায়িনী। নীলাদ্রি আজো এই রমনীকে নমস্কার করে মনে মনে।

চৈত্রমাস এসে গেল। মাঝে মাঝে দু এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে। সবাই চাষের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু বীজধান কোথায়? সেই মহাপ্রলয়ের পর পাঁচ-ছ' মাস হয়ে গেল। এতদিন পরে শোনা গেল সদাশয় সরকার নাকি দুর্গত দেশের লোকদের খাওয়াবে। রান্নাকরা খাওয়ারই

নাকি পরিবেশিত হবে। ভাত, ডাল, তরকারী নয়, একেবারে খিঁচুড়ি ভোগ। সুখবর সন্দেহ নেই।

শাপলা গাঁয়ে ক্যানেলের এপারে একটা আর ওপারে একটা পাকশালা খোলা হল। এগুলোকে লোকে লঙ্গরখানা বলত। নীলু একদিন রাসুর সঙ্গে গিয়েছিল এক লঙ্গরখানা দেখতে। সারাদিন ধরে অসংখ্য মানুষ কলাপাতা, ভাঙ্গা বাটি হাতে ঠায় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেলা চারটের সময় প্রত্যেককে মাত্র এক হাতা করে খিঁচুড়ি দেওয়া হচ্ছে।

কি অখাদ্য সেই খাদ্যের চেহারা। কিন্তু তাই নেবার জন্য সকলের কি বিপুল আগ্রহ। লোকে বলাবলি করছে মিলিটারীদের জন্য গুদামে যে চাল ছিল সেগুলোর যা পচে গিয়েছিল সেগুলিই লঙ্গরখানায় বিলি করা হচ্ছে। লোকের কাছে তাই-ই পরমান্ন। ভিক্ষার চাল, তায় কাঁড়া আকাঁড়া। অভিযোগ কিন্তু খাদ্যের গুনের জন্য ছিল না লোকের, ছিল পরিমাণের জন্য।

যারা লঙ্গরখানায় রান্নাবান্না ও পরিবেশনের কাজ করত তারা তো এক একজন লাটসাহেব। ক্ষুধার্ত মানুষগুলো যখন লাইন ভেঙ্গে আগে ঐ একহাতা পরমান্ন পাওয়ার জন্য মারামারি করত তখন পরিবেশকদের কেউ কেউ অশ্রাব্য ভাষায় তাদের গালাগালি করত। ছোট লাঠি দিয়ে পিটাত বা তাড়াত।

কোন কোন দিন লঙ্গরখানায় রান্না করা খাওয়ার দেওয়া হত না। তার পরিবর্তে দেওয়া হত শুক্‌নো চিড়া আর ঝোলা গুড়,—লোকে বলত ভেলী গুড়।

এই চিড়া গুড় নীলুরাও খেয়েছে। এগুলো খেতে তত খারাপ ছিল না। অন্নদা মাইতি ছিল ক্যানেলের এপারের লঙ্গরখানা পরিচালনার কর্তাব্যক্তি। চাল, ডাল, চিড়া গুড় সব তাঁরই বাড়ীতে এনে রাখা হত। হরিপুর থেকে আসত সে গুলো। এখান থেকে আবার ওগুলো লঙ্গরখানায় বিলি হত।

মানুষের সংখ্যার অনুপাতে এই আহার্য বস্তু ছিল অকিঞ্চিৎকর।

তারপর সবটা যে বিলি হত এমন নয়। যারা লঙ্গরখানার সঙ্গে জড়িত ছিল তারা তলে তলে বেশ যে সরাত তাও বোঝা যেত।

মাঝে মাঝে লঙ্গরখানা বন্ধও থাকত সরবরাহের অভাবে। কোনদিন তাই দেখা যেত বহুলোক খালি হাতে লঙ্গরখানা থেকে ফিরে আসছে। একে তো সামান্য খাদ্যবস্তু, তাও যদি সারাদিন আশায় আশায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে কপালে না জোটে তবে ক্ষুধার্ত মানুষের সে বিড়ম্বনা অকল্পনীয়।

খুব বেশীদিন চলে নি এই সরকারী দানসত্র। সরকার বোধ হয় কোন চাপে পড়ে বদান্যতাটুকু দেখিয়েছিল এবং সেটুকু দেখিয়েছিল—ততদিন, যতদিন তাদের গুদামের পচা চাল ছিল। ওগুলো জন্তুদের দেওয়া যায় কিন্তু মিলিটারীদের দেওয়া যায় না। ভালো খাওয়ার দিয়ে মানুষের অধম সেই জন্তুগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার কোন দায় দায়িত্ব বা মমত্ববোধ তাদের থাকার কথা নয়। তবু এ কথা সত্যি যে ঐ অখাদ্য খেয়েও সেই ১৯৪৩-এ মুমূর্ষ মানুষগুলো প্রাণ পাখীগুলোকে আরো কিছুদিন খাঁচায় ধরে রাখতে পেরেছিল।

নীলুদের নতুন ঘরের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। পয়লা বৈশাখ তারা গৃহে প্রবেশ করবে। তারা তাদের নিজেদের ঘরে যাবে এ কথা ভেবে নীলুর খুব আনন্দ হয় আবার দুর্দিনের এই আশ্রয়দাতার বাড়ী ছেড়ে চলে যেতেও যেন কষ্ট হচ্ছিল তার, অন্নদা মাইতি এবং তার স্ত্রীকে নীলুর এখন নিজের দাদামশাই ও দিদিমা বলে মনে হয়।

এলো বাংলা ১৩৫০-এর পয়লা বৈশাখ। ইং ১৯৪৩ এর এপ্রিল মাস সেটি। নীলুরা গেল তাদের নতুন ঘরে। গৃহপ্রবেশের দিন ঈশ্বর আচার্য তাদের বাস্তুতে ঘি পুড়িয়ে হোম করেছিলেন। সামান্য তিরিশ-চল্লিশজন লোককে কিছু ভুরিভোজন করে খাওয়ালেন শংকরীপ্রসাদ।

এর কিছুদিন পরে বসন্ত আবার মহামরীরূপে দেখা দিল। তবে আশার কথা এখন গাঁয়ে দু একজন টিকাদারকে দেখা গেল। হরিপুরে নাকি এদের এক অস্থায়ী ক্যাম্প পড়েছিল। নীলুরা সকলে টিকা

নিয়েছিল। সরকারের কিছু সদিচ্ছা দেখা গেলেও গ্রামের অশিক্ষিত লোকদের টিকা নিতে প্রবল অনিচ্ছা দেখা গেল। সেটা অবশ্যই শিক্ষার অভাব এবং সংস্কারের ফলে। নীলু প্রায়ই দেখত লোকে টিকাদারদের দেখলে দৌড়িয়ে পালাচ্ছে, অবিকল যেমন তারা মিলিটারী বা পুলিশ-দেখলে পালাত।

আসলে জীবনের সবদিক থেকেই সেই ১৯৪৩-এর মানুষগুলোর পলায়ন সুরু হয়েছিল। আর সেই পালাতে পালাতে দেখা গেল সাত-আট মাসে গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে। দু একটা পাড়া প্রায় শেষ। বহু পরিবার এমন হয়েছিল যে তাদের বংশে বাতি দেবার মত আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

বেশ মনে আছে, ক্যানেলের জল তখন মানুষের মৃতদেহে ভর্তি। জল তখন কমে এসেছিল, তাই বিষাক্ত ও দুগন্ধযুক্ত হয়ে উঠল। আজকাল মড়া ভেসে যেতে দেখলে নীলুর মনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। মৃতদেহ দেখা তখন অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেকদিন তারা ক্যানেলের পাড়ে দাঁড়িয়ে গুণত কে কতগুলো মড়া দেখল। এটা শেষকালে তাদের মধ্যে এক খেলা হয়ে দাঁড়াল যেন। মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়িয়ে সেদিন তারা মৃতদেহ গোনার খেলায়ও মজা পেত। এ কথা ভেবে নীলাদ্রি আজো মজা পায়।

বৈশাখ মাসে বেশ কয়েক পশলা সুবৃষ্টি হয়ে গেল। মাটি নরম হয়েছে। তবু মাঠে যেন চাষ লাগছে না। তার অনেক কারণও ছিল। অনেক চাষীই মরে গিয়েছিল। যারা বেঁচেছিল তাদের অধিকাংশের গায়ে এমন সামর্থ্য ছিল না যে লাঙ্গলখানা কাঁধে করে নিয়ে যায়। আর সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোতে মানুষ যেমন মরেছিল তেমনি গরু, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুও মরেছিল। হালের জন্য একজোড়া বলদ পাওয়াই সমস্যা সেদিনে। এর উপর বীজধান কোথায়? কারোর ঘরে তখনও কিছু রয়ে থাকলে তখন সে পেটে দেবে, না মাঠে ছড়াবে?

কিছুটা আশার কথা শোনা গেল, সরকার নাকি আবার সদাশয়

হয়ে উঠেছেন। কিছু কিছু বীজধানও নাকি সরকার বিতরণ করবেন। কিছু কিছু হলও। কিন্তু তার বেশীরভাগ চলে গেল বিতরণকারীদের হাতে। অল্পই গেল গরীব চাষীদের ঘরে। যাও বা গেল, তার সিংহভাগ তারাই খেয়ে ফেলল পেটের দায়ে। লঙ্গরখানা তখন প্রায় লালবাতি জ্বেলেছে।

খাদ্য আর বীজধান যদি একসঙ্গে দেওয়া চলত তাহলে লোকে মরণপন করেও হয়ত কিছুটা চাষ করতে পারত। অতএব শেষ পর্যন্ত অতি সামান্য বীজধানই মাঠে গেল। সে বছর মাঠের অর্দ্ধেক জমিই এইসব নানা কারণে পতিত পড়ে রইল। দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে মানুষের ন্যায়নীতি ও অর্থহীন হয়ে যায়। তখন মনে হয়, আপনি বাঁচলে 'বাপের নাম বা অভ্যভক্ষ্যধ'নুগুনঃ বা বাঁচার জন্য কোন নীতি নেই।

নীলুরা নতুন বাড়ীতে আসার দিন পনেরোর মধ্যে নীলুর জীবনে দুটো ঘটনা ঘটে। একটা হলো তাদের জন্য শংকরীপ্রসাদ নতুন একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন। আর দ্বিতীয়টি হলো রাণী বিধবা হয়ে ফিরে এল। রাণীর স্বামী কলেরায় মারা গিয়েছিল। রাণীর শ্বশুর বাড়ীতে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। তাই শেষ পর্যন্ত সে বাপের বাড়ীতেই ফিরে আসে। তখনও রাণীর দাদা পুলিশের হাত থেকে ছাড়া নি। রাণীর মা এমনিতেই মরতে বসেছিল। এবার মেয়ে বিধবা হয়ে ফিরে এসে তার মরার বিড়ম্বনাকেও বুঝি বাড়িয়ে দিল।

রাণীর দাদা ঘরে থাকলে খেটেখুটে কিছুটা আহার্যের সংস্থান হয়ত করতে পারত। লঙ্গরখানায় খাবার কোনদিন মেলে কোনদিন মেলে না। নীলু রাণীর এ হেন বিপদে পূর্বপ্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে একদিন দেখা করতে গেল রাণীর সঙ্গে।

রাণী নীলুকে দেখে মাথায় ঘোমটা টেনে নিয়েছিল। ঘোমটার আড়ালে শুধু কেঁদেছিল—অনেকক্ষন কেঁদেছিল। তার মুখটা নীলু দেখতে পাচ্ছিল না। রাণীর চোখের জল টপ্ টপ্ করে মাটিতে পড়ে ভিজিয়ে দিচ্ছিল। নীলু চেয়ে চেয়ে দেখছিল।

সে বোবা হয়ে অপরাধীর মত রাণীর সামনে শুধু দাঁড়িয়েছিল।

তার মনে ছিল না কোন অভিমানের লেশমাত্র। জমে উঠেছিল শুধু দুঃখবোধ। এ দুঃখের স্বাদ আলাদা। এক সর্বহারা, নিরাশ্রয়, নিরন্ন মেয়ের দুঃখের স্বাদ উপলব্ধি নীলুর জীবনে সেই প্রথম। কিন্তু সে বুঝতে পারে নি কি ভাষায়ই বা সেই দুঃখিনীকে সান্ত্বনা দেওয়া যায়। আজো ঐ রকম দুঃখিনীকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা কি সে জানতে পেরেছে ? অন্তরের ভাষার কোন দৃশ্যমান বর্ণমালা নেই।

অনেকক্ষন পরে চোখের জল মুছে ঘোম্‌টা ঈষৎ সরিয়ে রাণী বলেছিল—কি দেখতে এসেছিস রে ? দ্যাখ, মরিনি, এখনও বেঁচে আছি। তবে মরবো।

নীলু তখনও কোন কথা বলতে পারেনি। শুধু দৃষ্টিটা মাটির দিকে নামিয়েছিল। আর মনে মনে ভাবছিল, রাণী কিছুটা শীর্ণ হয়েছে তবু যেন সে এই অল্প ক'দিনে অনেক বড় হয়ে গেছে। ঐ মুখে সে স্পষ্ট দেখেছিল ক্ষুধা ও দুঃখের ছায়া শীর্ণ তবু যেন ঐ মুখে কোথায় কি যেন এক লাবন্য ছড়িয়ে ছিল। রাণীর কষ্ট না থাকলে সে আরো লাবণ্যময়ী হয়ে উঠত নিশ্চয়ই।

তারপর রাণী ঘোমটা একেবারে সরিয়ে দিয়ে সহজ হয়ে নীলুকে বসতে বলেছিল। কিছু কথাবার্তাও হয়েছিল তাদের মধ্যে।

রাণীর দাদার কথা উঠতে নীলু বলেছিল—বাবা তোর দাদাকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করছে, নগেন কাকা বলেছে আমায়। তুই চিন্তা করিস না রাণী, তোর দাদা শীগগিরই এসে যাবে।

সেদিন নীলু লুকিয়ে কিছু চাল দিয়ে গিয়েছিল রাণীকে। পরে আরও কয়েকবার সে দিয়েছে। একবার ধরা পড়ে রমলার কাছে প্রচুর ধমকও সে খেয়েছিল। আজকাল রাণীর সঙ্গে নীলু অনেক সহজভাবে কথাবার্তা বলে। কিন্তু রাণীর বিয়ের আগের সেই মরমী সম্পর্কটুকু যেন চিরদিনের জন্যই হারিয়ে গেছে। এ যেন কাছে দাঁড়িয়ে থেকে দূর থেকে দেখা, পর্দার আড়ালে থেকে কথা বলা। রাণীকে এখন তার ভাল লাগে কি মন্দ লাগে বুঝে উঠতে পারে না নীলু। শুধু মনে হয় রাণী আর তার সঙ্গিনী নয়।

এরমধ্যে একদিন শংকরীপ্রসাদ চক্রবর্তীদের কাছ থেকে একটা লাল রং-এর বক্না কিনলেন। সেটা গর্ভবতী ছিল। লাল রং-এর জন্য তার নাম রাখা হল লালী। ত্রিশ সের চালের বিনিময়ে এটি কিনেছিলেন তিনি। ভাল জাতের গরু বলে আগ্রহ করে রমলা কিনিয়েছিলেন। বন্যায় দেওয়াল চাপা পড়ে তাদের গাই-বাছুর সব মারা গিয়েছিল। বেড়ালটাও গেছে। শুধু কুকুর আর ভেঁড়াটা আজো বেঁচে আছে। এখন নীলু ও রাসু পড়ার ফাঁকে যখনই অবসর পায় তখনই গরুর পরিচর্যা করে, ঘাস এনে খাওয়ায়।

এই গরু নিয়ে একটু অসুবিধাও হচ্ছিল। পুরানো চাকর হরি কলেরায় মারা যাবার পর সর্বক্ষনের আর কোন চাকর ছিল না। মানদা বুড়ী ছুটি নিয়ে বাড়ী গিয়ে আর ফিরে আসে নি। সে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেছে। কাজ করার জন্য বাড়তি লোক রাখা মানে বাড়তি চালের খরচ। মাইনে কেউ চায় না আজকাল, চায় পেটের ভাত। পেটভরে না হোক, আধপেট হলেও চলে। অতএব রমলা গাই নিয়ে আজকাল হিমশিম খান।

দুপুরে খাওয়ার সময় ভিক্ষারীরা আসে। সকলের মুখে এক কথা —মা একটু ফ্যান দাও। চারদিন খাই নি।

কেউ কেউ সাতদিন খায় নিও বলে। রমলা ভাতের ফ্যান ফেলতেন না। নিজেদের খাবার থেকে দু'এক মুঠো ভাত তুলে ফ্যানের সঙ্গে মিশিয়ে ওদের দিতেন। ভিখিরীগুলো মুহূর্তে ফ্যানসুদ্ধ ভাতের দানাগুলো নিঃশেষ করে বাটি বা হাত চাটত আর লোলুপ নয়নে তাকিয়ে থাকত। সে দৃশ্য বেশীক্ষন দেখতে পারত না নীলু। ঐ দৃশ্য দেখে খেতে বসলে নিজেকে তার কিরকম যেন অপরাধী বলে মনে হত। একদিন রমলা ওদের দেখে খেতে পারতেন না। থালাসুদ্ধ ভাত ওদের দিয়ে দিতেন। আর ভিখারীর দল ঠিক যেন লুব্ধ শকুনের মৃতদেহের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ার মত কাড়াকাড়ি করে খেত।

একদিন এক জীর্ণশীর্ণ কংকালসার বৃদ্ধ ভিখারী এল। চলতে পারে না। এক পা চলে, বসে পড়ে, ধুঁকতে থাকে কিছুক্ষন তারপর

আবার লাঠি ভর দিয়ে চলে! নীলু খেতে বসেছিল। ভিখারীটা চিঁ চিঁ করে ফ্যানের আবদার করল। নীলুর কি রকম যেন গাটা ঘুলিয়ে উঠল। ভাত তরকারী সমেত থালাটা সে ভিখারীর সামনে মেলে ধরল। খাবার দেখে লোকটার চোখ সেদিন যেভাবে জ্বলে উঠতে দেখেছিল তা সে আজো ভুলতে পারে না। মনে হয় যেন জন্ম-জন্মান্তর ধরে অনন্ত ক্ষুধার জ্বালা বয়ে বেড়িয়েছে লোকটা। আজ খাদ্য দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছে। শীর্ণহাতে গোগ্রাসে ভাতগুলো গিলতে থাকে লোকটা।

নীলু দেখে লোকটার গলায় ভাত আটটিয়ে গেছে, সে খাবি খাচ্ছে। নীলু তাড়াতাড়ি একটা এ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে জল এনে তার মুখের সামনে ধরে। লোকটা একটু জল খেয়েই শুয়ে পড়ল। তখনও সব ভাত তার খাওয়া হয় নি। সে আর উঠতে পারল না। বুকটা যেন তার হাপরের মত ওঠানামা করতে থাকে। তার গলায় ঘড়্‌ঘড়্‌ আওয়াজ করতে থাকে। নীলু ভয় পেয়ে চীৎকার করে মাকে ডাকে।

রমলা রান্নাঘর থেকে দৌড়িয়ে বেরিয়ে আসেন। লোকটার দেহ এতক্ষণে স্থির হয়ে গেল। লোকটা মারা গেছে। বড় কষ্ট হল নীলুর। জন্ম-জন্মান্তরের অনন্ত ক্ষুধা না মিটিয়ে চলে গেল লোকটা।

রমলা বলে ওঠেন—বহুদিন খায় নি তো। না খেয়ে খেয়ে ওর নাড়ী শুকিয়ে গিয়েছিল। ওকে ফ্যানভাত বা পান্তাভাত দিলে এরকম হত না রে। গলায় শুকনো ভাত আটকিয়ে গিয়ে ওর দম বন্ধ হয়ে গেছে।

মানুষ প্রতিনিয়তই মরছে। জন্মালে মরতেই হয়, এই-ই সংসারের নিয়ম। অনেকে রোগে, শোকে অসহ্য যন্ত্রনা পেয়েও মরে কিন্তু তবু সান্ত্বনা থাকে। মানুষ মরবেই। কিন্তু মানুষ যখন জন্তুর পর্যায়ে এসে মরে তখন কোন সান্ত্বনাই খুঁজে পাওয়া যায়'না। মৃত লোকটার জন্য নীলুর বুকটা টন্‌টন্‌ করে ওঠে। একটু পরে নগেন কাকারা মৃতদেহটা টেনে ক্যানেলের জলে ভাসিয়ে দেয়।

একদিন সূর্যডোবার কিছু আগে নীলু আচার্য পাড়ায় প্রানেশ ও রাখালদের সঙ্গে খেলতে গিয়েছিল। তখন গদাধর মাষ্টার তাদের পড়ান। তাঁর বড় কড়া শাসন। ঠিক সময়ে পড়তে না বসলে শাস্তি ভীষণ। একটু খেলতে না খেলতেই সূর্য ডুবে গেল। খেলা শেষ না হতেই সন্ধ্যের আলো ঘরে ঘরে জ্বলে উঠল। নীলু গদাধর মাষ্টারের শাসনের কথা মনে করে তাড়াতাড়ি ফেরার জন্য সোজা পথে বাড়ীর পিছনের দিকে দৌড়াতে লাগল।

তেতুলগাছের কাছে এসে তার মনে হল কি যেন সাদা একটা দেখা যাচ্ছে তেতুলগাছের তলায় সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে। তেতুলগাছটা রাণীদের আর তাদের বাস্তুর সীমানার মাঝে দাঁড়িয়ে। ভয় পেল সে। তবে বাড়ী কাছে এই যা ভরসা। দরকার পড়লে দৌড় দিতে পারবে সে। সেই ভেবে একটু থমকে দাঁড়াল সে। মনে হল, সাদাটা যেন কোন মেয়েছেলে। মেয়েটি যেন তেতুলগাছের ডাল দু'হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

সহসা তার মনে হল, রাণী নয় তো ? রাণীর সঙ্গে ক'দিন তার দেখা হয় নি। রাণীর বসন্ত হয়েছিল। সেজন্য ওদের বাড়ী যাওয়া তার বারন ছিল। রাণীর বসন্ত অবশ্য ভাল হয়েছে, সে জানে। সকালেই দূর থেকে সে দেখেছে রাণীর মুখে বসন্তের দাগ-আর কংকালসার শরীর।

কথাটা মনে হতেই ভয় কেটে যায় তার। এক প্রবল উত্তেজনায় তার বুকের ভেতর যেন হাতুড়ীর শব্দ হতে থাকে। সে সাহস করে এগিয়ে যায়। কাছে গিয়ে দেখে রাণীই তো। তেতুলগাছের ডালে দড়ির ফাঁস ঝুলছে। সেই ফাঁস রাণী গলায় পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বোধ হয় ঝুলতে যাচ্ছিল, নীলুকে দেখে একটু থমকে গেছে। পরনে তার ছিল বৈধব্যের সাদা পোষাক।

নীলু রাণীকে দেখামাত্র সভয়ে চীৎকার করে ওঠে—রাণী।

ঘরের ভেতর থেকে রাণীর মা কম্পিত স্বরে ডেকে ওঠে—কে এলো রে রাণী ? ও রাণী —।

নীলু চীৎকার করে আবার বলে—রাণী গলায় দড়ি দিচ্ছে। কে কোথায় আছ ছুটে এসো।

নীলুর চীৎকারে রাণীর মা আর্ত্ত চীৎকার করে ওঠে। তাদের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে বিশ ত্রিশজন ছুটে আসে। নীলুর গলা পেয়ে রমলা, রাসু নগেনকাকা, শংকরীপ্রসাদেরাও আলো হাতে ছুটে আসে।

রাণীর আর মরা হল না। তার দুঃখের কাহিনী শোনা গেল।

দুদিন ধরে তাদের পেটে একটা দানাও পড়ে নি। রাণীর মার আবার তার উপর জ্বর। সে উঠতেও পারে না। রোগে, অনাহারে রাণীর শরীরের অবস্থাও কাহিল। লঙ্গরখানা গেলে হয়ত কিছু খাবার মিলতেও পারত কিন্তু যাবেটা কে? দুঃখকষ্ট সহ্য করতে না পেরে রাণী এভাবে সন্ধ্যার অন্ধকারে চিরতরে পৃথিবী থেকে নীরবে বিদায় নিতে চেয়েছিল। কিন্তু তার যাওয়া হল না।

নীলুর জীবন থেকে রাণী অনেক আগেই সরে গেছে। কিন্তু আজ নীলু রাণীকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরিয়ে আনল।

সে রাতে শংকরীপ্রসাদ ওদের কিছু চাল দিলেন। পরের দিনও রমলা ওদের জন্য কিছু ভাত পাঠালেন কয়েকদিন এভাবে সাহায্য করার ফলে রাণীর মা একটু সুস্থ হল। তখন রমলা শংকরীপ্রসাদকে বলে রাণীর মাকে ঘর-গেরস্থালীর কাজে ও গরুর দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করলেন। রাণীর মা খাবারটা বাড়ী নিয়ে যেত। সেই খাবার ভাগ করে মা ও মেয়ে খেত। এভাবে কয়েকদিন যাবার পর রাণীর দাদা ছাড়া পেয়ে বাড়ীতে এল।

এবার শোনা যেতে লাগল ক্যানেল নাকি খোঁড়া হবে। সেই পঞ্চাশ-যাট বছর আগে ক্যানেল খোঁড়া হয়েছিল। তারপর তার খাদে অনেক পলি জমেছে। সেগুলো সরানো দরকার। সরকার কিছু লোককে সেই কাজে লাগাতে চায়। সরকারের বদান্যতা দেরীতে হলেও প্রকাশ পাচ্ছিল, সন্দেহ নেই।

সরকারের ইরিগেশান ডিপার্টমেন্ট মাটির কাজ করাবেন। শংকরী-প্রসাদের হাতে তখনও কিছু ক্যাশটাকা ছিল। তিনি সেই টাকা

মূলধন করে মাটির কাজের জন্য টেণ্ডার দিলেন। তাঁরই বাড়ীর সামনে বেশ কয়েকটা বড় কাজও পেলেন। তিনি নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেন।

নতুন করে বাঁচার একটা সাড়াও পড়ে যায় গ্রামে। দলে দলে তারা শংকরীপ্রসাদের কাছে আসেন কাজের জন্য। শংকরীপ্রসাদ কিছু লেখাপড়া জানা লোককে, যারা মাটির হিসাব বোঝে, 'মেট' হিসাবে নিযুক্ত করলেন। তিনি আবার তাদের কাজ ভাগ করে আলাদা ঠিকা দিলেন। তারাই শ্রমিক খাটাবে। দিনের শেষে তারা মাটির খাদ মেপে শ্রমিকদের মজুরী দেবে। শংকরীপ্রসাদের প্রধান দায়িত্ব হল মেটদের টাকা যুগিয়ে যাওয়া আর বিল করিয়ে সরকারের কাছ থেকে কৃত কাজের জন্য টাকা আদায় করা।

ইরিগেশানের এক ওভারসিয়ার ভদ্রলোক এসেছিলেন ঐ সময় কাজকর্ম দেখাশোনা করার জন্য। তিনি শংকরীপ্রসাদের বাড়ীতেই খেতেন এবং থাকতেন। শংকরীপ্রসাদের আনুকূল্যে রাণীর দাদাও কাজ পেল।

রাণীর শরীর একটু ভাল হল পরে। কিছুদিন পরে সেও দাদার সঙ্গে মাটি কাটার কাজে লেগে গেল। মেয়েদের দৈনিক মজুরী ছিল ছেলেদের অর্দ্ধেক। মেয়েরা কোদাল চালাত না। তারা মাটি মাথায় করে বইত। রাণীর মা তো নীলুদের বাড়ীতে কাজ করে। মোটামুটি অর্দ্ধাহারেও ওদের দিন চলে যেতে লাগল।

তখন চালের সের এক টাকা আবার খাঁটি ছানার রসগোল্লার সেরও একটাকা। রসগোল্লা পাওয়া যায় কিন্তু চাল সহজে পাওয়া যায় না। নীলু কতদিন দেখেছে, শ্রমিকেরা দিনের শেষে মজুরী পেয়ে পুলিনের বাবার দোকানে রসগোল্লা কিনে খাচ্ছে। পুলিনের বাবা ঐ সময় ক্যানেলের পাড়ে একটা মিষ্টির দোকান খুলেছিল। প্রচুর কাটতি হত দোকানটায়। পুলিনের বাবাও সে সময় ভাল পয়সা করেছিল।

আর পয়সা করেছিলেন শংকরীপ্রসাদ। তিনি বলতেন, মাটির কাজ তো নয়; সোনার খনি। মাছ খেতে খেতে সে সময় নীলুদের

বিরক্তি এসেছিল। বাবা মাংস খেতে ভালবাসতেন। সপ্তাহে দুদিন করে খাসীর মাংস হত। দাম ছিল ন' আনা সের। কিছুদিন আগে ছিল সাত আনা। লোকের হাতে কিছু কাঁচা পয়সা আসার জন্যই এই দরবৃদ্ধি।

শংকরীপ্রসাদ এই সময় দেশে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বিঘার মত ধানজমি কেনেন। লোকে সে সময় অভাবে, পেটের দায়ে খুব কমদামে জমি বিক্রী করে দিত। শংকরীপ্রসাদ ঠিকাদারীর লাভে একের পর এক জমিগুলি খুব সস্তাদরে কিনতে থাকেন। আগের মত জাঁকিয়ে ব্যবসা করার মত বয়স ও ক্ষমতা আর তাঁর ছিল না। তবু বছরের ভাত, কাপড় ও অন্যান্য খরচ হয়েও যাতে কিছু পয়সা জমে সেজন্য দেশে বেশ কিছু জমি কিনে বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিলেন তিনি।

নীলু জানত তার বাবার সুন্দরবনেও আরো কিছু জমি রয়েছে। এই গ্রামেই থাকেন সীতেশ মান্না। তিনি শংকরীপ্রসাদের আবাল্যের সহপাঠী ও বন্ধু। বয়সে কিছু ছোটই হবেন তিনি শংকরীপ্রসাদের চেয়ে। সীতেশ মান্না শংকরীপ্রসাদকে কাকাবাবু বলে ডাকতেন। নীলুরা তাকে ডাকত সীতেশ দা বলে। সীতেশ দা তেতুলবাড়িয়ার ব্রাহ্মণ জমিদারের সুন্দরবনের নায়েব ছিলেন। বছরের বেশীর ভাগ সময়ই তিনি সুন্দরবনে থাকতেন। মাঝে মাঝে দেশে আসতেন। শংকরীপ্রসাদ বছর চারেক আগে এই সীতেশ মান্নার সঙ্গে মিলে একসঙ্গে সুন্দরবনের ভাসাদ্বীপে মোট আড়াইশ' বিঘার এক প্লট কেনেন। নীলু শুনেছে সেগুলো নাকি এখনও জঙ্গল এবং জন্তুজানোয়ারও রয়েছে সেখানে। খুব সস্তাদামে জায়গাগুলো তাঁরা কিনেছিলেন। পরে জঙ্গল কেটে জমি তৈরী করে আবাদ করবেন তাঁরা এই পরিকল্পনা করেই সে সময় জমিগুলো কিনেছিলেন।

এর আগে শংকরীপ্রসাদ দেশে বিশেষ জমি করেন নি। যা ছিল তাতে তাঁর বছরে দুমাসের খোরাকীও হত না। সুন্দরবনের জমি তৈরী করতে এখন অনেক খরচ। আগের সে ব্যবসাও নেই। তাই সব দিক ভেবে তিনি দেশেই জমি কিনে রাখলেন।

আজকাল নীলুর পড়াশোনার চাপ বেড়েছে। খেলার সময় গেছে কমে। বাড়ীতে চব্বিশঘণ্টার জন্য মাষ্টারমশাই রয়েছেন। রাণীর সঙ্গে তাই আজকাল দেখাসাক্ষাৎ হয় খুব কম। আর দেখা হলে রাণী কেমন যেন তাকে এড়িয়ে যায় আজকাল। রাণীর চেহারায় সে লাবন্য আর নেই রং অনেক ময়লা হয়েছে। তবে স্বাস্থ্য আগের চেয়েও ভাল হয়েছে। দেহ অনেক বাড়ন্তও হয়েছে।

গ্রামের এক ছেলে, নাম নিমাই, আজকাল রাণীদের বাড়ীতে খুব যাতায়াত করে। নিমাই রাণীর দাদারই বয়সী। নীলু লক্ষ্য করে রাণী আজকাল যেন তাকে নিতান্ত বালক বলে উপেক্ষা করে। রাণীর কথাবার্তায় বয়সের সুর, বেশ পাকা পাকা তার কথা। কিন্তু নিমাই-এর সঙ্গে রাণীর খুব ভাব। তার সঙ্গে সে বেশ হেসে হেসেই কথা বলে।

নিমাই আর রাণী একসঙ্গে মাটি কাটে। নিমাই কোদালে মাটি কাটে আর ঝুড়ি ভর্তি করে রাণীর মাথায় চাপিয়ে দেয়। রাণী সেগুলো পাড়ের উপর ফেলে আসে।

ওদের দেখলে নীলুর চোখে অকারনে জ্বালা ধরে। আজকাল রাণীর উপর তার অভিমান না হয়ে রাগ হয়। রাণী বিধবা হয়ে একটা ছেলের সঙ্গে এত ভাব করে কেন? তার মা আর দাদাই বা কেমন?

একদিন রাণীর মা রমলাকে বলেন যে রানীর সঙ্গে নিমাই-এর বিয়ে দেবে তারা। রমলা শুনে খুশী হন। নীলুর ঠিক কি মনে হয় তা যেন সে বুঝে উঠতে পারে না। আস্তে আস্তে নীলু রাণীর দিক থেকে মনকে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করে। একটা অহেতুক গাম্ভীর্য আর বিশুষ্ক কারুণ্য নীলুকে আচ্ছন্ন করে রাখে সর্বক্ষন। এদের দেখলে নীলু মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

ক্যানেল খোঁড়ার কাজ শেষ হয়ে আসছে। ভাল বৃষ্টি হচ্ছে। মাঠে অনেকে নেমে পড়েছে। এমন সময় সীতেশ মান্না এলেন গাঁয়ে। তিনি শংকরীপ্রসাদকে বললেন, সুন্দরবনেও প্রচুর লোক অনাহারে, রোগে মারা গেছে। জমিদারদের জমি চাষ করার লোকের অভাব। তিনি তাই দেশে এসেছেন দেশ থেকে কিছু লোক নিয়ে যাওয়ার জন্য।

বেশ কিছু গ্রামের লোক সীতেশ মান্নার সঙ্গে গদামথুরা দ্বীপে যাওয়ার জন্য তৈরী হল। এদিকে শংকরীপ্রসাদ ও সীতেশ মান্না মিলে ঠিক করলেন তাঁদের ভাসাদ্বীপের কিছু জমির জঙ্গল পরিষ্কার করে জমি তৈরীর কাজে হাত দেবেন। ওখানে সস্তায় মজুর পাওয়া যাচ্ছে। আপাততঃ শৈলমামাকে কিছুদিনের জন্য ভাসাদ্বীপে পাঠানো ঠিক হল। তাঁকে সাহায্য করার জন্য নগেন কাকাও ওখানে যাবে। মাঝে মাঝে সীতেশ দাও এসে কাজকর্ম দেখে যাবে। শংকরীপ্রসাদ দেশে থেকে নতুন করে কিছু ব্যবসা গড়ার দিকে মন দেবেন। আগের মত অত বড় ব্যবসা হয়তো হবে না তবু একটা কিছু তাকে করতেই হবে।

একদিন সকালে নীলু জানল, ভোর রাতে শাপলা গ্রামের কিছু পঁচিশজন লোক সীতেশদার সঙ্গে সুন্দরবনে রওনা হয়ে গেছে। নৌকায় গেছে তারা। রাণী ও নিমাই তাদের সঙ্গে গেছে।

রাণীর মা বমলাকে জানাল, সেখানে তাদের বিয়ে হবে। ওরা ওখানে ঘর বেঁধে সুন্দরবনের বসিন্দা হয়ে যাবে।

নীলুর মন থেকে রাণীর ছবিটা মুছে মুছে যাচ্ছে। তবু রাণী সুখী হবে জেনে তার আনন্দ হয়।

আনন্দ হয় তার চারদিকে নবজীবনের আভাস দেখে। মানুষের মহাজীবন মৃত্যুর কাছে হার মানে নি। মহাজীবন আবার জাগছে। মহাজীবনের সমবেত সংগীত আবার বাজছে।

কিছুদিন পরে রাণীর দাদা নীলুদের সর্বক্ষণের জন্য গৃহভৃত্য নিযুক্ত হল আর রাণীর মা রমলার ঠিকা ঝি-এর কাজে বহাল হয়ে গেল।

॥ ২০ ॥

শংকরীপ্রসাদ তাঁর নতুন ঘরে সপরিবারে ফিরে আসার পর পরই নীলু ও রাসুর পড়াশোনার বিষয়ে মনোযোগী হলেন। গতবছর বন্যার জন্য ইসকুলে বছরের শেষের দিকে আর পড়াশোনা হয় নি। পরীক্ষাও হয় নি। নাহলে নীলু চতুর্থ শ্রেণীতে এবং রাসু তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ত। অন্নদা মাইতির বাড়ীতে যেটুকু পড়াশোনা হয়েছিল

রজনী মাষ্টারের কাছে তাতে ওদের অগ্রগতি কিছু হয়নি। যেগুলো ভুলে গিয়েছিল, সেগুলোই শুধু আর একবার পড়া হয়েছে মাত্র। তাই ওরা কেউ চতুর্থ এবং তৃতীয় শ্রেণীর উপযুক্ত হয় নি। আর পাঁচ-ছ' মাস পরে নীলুর ইউ, পি পরীক্ষা যেটায় পাশ করলে নীলু অন্য ইসকুলে পড়তে যাবে।

অতএব পাঁচ-ছ মাসে সারা বছরের পড়াশোনা না করিয়ে দিতে পারলে ওদের দুজনেরই এক এক বছর করে নষ্ট হবে। তার উপর নীলু ইংরাজীতে কিছুটা কাঁচা রয়ে গেছে। তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী পড়ানো সুরু হয়েছিল নীলুদের। সুরেশ পণ্ডিত বাড়ীতে পড়াতে এলেও তিনি ইংরাজী জানতেন না বলে নীলুকে ইংরাজী পড়াতে পাড়তেন না। তাই বলতে গেলে ইংরাজী ও একরকম ভুলেই গেছে। রজনী মাষ্টারও ইংরাজী জানতেন না। তাই তাঁর কাছেও নীলুর ইংরাজীর পুরানো পড়াগুলো পড়া সম্ভব হয়নি।

তাই শংকরীপ্রসাদ এমন একজন চৌকস মাষ্টারের খোঁজ করছিলেন যিনি একাধারে ইংরাজী, অংক, বাংলা ইত্যাদি সবই পড়াতে পারবেন। নীলুদের ইসকুলের একমাত্র ইংরাজী মাষ্টারই এ বিষয়ে কিছুটা উপযুক্ত লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি এখন কোলকাতায় বসবাস করছেন। তাঁর দাদা আগে থেকেই কোলকাতায় থাকতেন। ওখানকার কোন এক ইসকুলের মাষ্টার ছিলেন তিনি। ইংরাজী মাষ্টার তাঁর সেই দাদার কাছে থাকছেন এখন। সেখানে তিনি রাতে হোমিওপ্যাথী কলেজে ডাক্তারী পড়বেন আর দিনের বেলায় ডাক্তারী করবেন।

অতএব উপযুক্ত মাষ্টারমশাই-এর অভাবে নীলুদের আরো কিছুদিন পড়াশোনা বন্ধ রইল। তাদের ইসকুল এখন সুরু হয়েছে কিন্তু সেখানে ইংরাজী পড়াবার মত কোন মাষ্টারমশাই নেই। তাই বাড়ীতে পড়াবার জন্য সর্বক্ষনের এক গৃহশিক্ষক দরকার। অবশেষে সেইরকম মাষ্টারের সন্ধান পাওয়া গেল। তাঁর নাম গদাধর পাল। শাপলা গ্রামের পাশের গ্রামেই তাঁর বাড়ী। তিনি আগে খেজুরীর দিকে

কোন এক ইউ, পি ইসকুলে মাষ্টারী করতেন। সে ইসকুল ঝড়ে ও বন্যায় একবারে নষ্ট হয়ে গেছে। আপাতত তিনি ঘরেই বসেছিলেন।

নীলুরা শুনল সেই মাষ্টারই তাদের পড়াবার জন্য আসছেন। তিনি থাকবেন তাদের বাড়ীতে। মাঝে মাঝে বাড়ী যাবেন। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে যে গল্পটি তারা শুনল তাতেই তাদের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম হ'ল। তিনি হরিপুর হাই ইসকুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে ছিলেন। ম্যাট্রিক পাশ করেন নি। করেন নি মানে পরীক্ষাই দেওয়া হয় নি তাঁর। সে এক বিচিত্র কাহিনী।

গদাধর পাল ছাত্র হিসাবে ভালই ছিলেন। তবু তিনি দশম শ্রেণীতে হাফ্-ইয়ারলি পরীক্ষায় কোলের উপর ইতিহাসের বই রেখে নকল করছিলেন। হেডমাষ্টারমশাই ছিলেন অত্যন্ত কড়া লোক। কথায় কথায় তিনি ফার্ষ্ট ক্লাশের বড় বড় ছেলেদের বেত চালাতে কসুর করতেন না। হেডমাষ্টারমশাই গদাধরের কাণ্ড দেখে যষ্ঠিধর হলেন। গদাধর হেডমাষ্টারমশাই এর উদ্যত বেত দেখে শংকিত হলেন। কিন্তু সে কেবল মুহূর্তমাত্র। সঙ্গে সঙ্গেই আপন কর্তব্য স্থির করে নিলেন তিনি। তখন তাঁর বয়স একটু বেশীই হয়েছিল। বেশ দশাশই চেহারা ছিল তাঁর।

তিনি চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে এক হাত দিয়ে হেডমাষ্টারমশাই-এর বেতটা ধরে ফেললেন। হেডমাষ্টারমশাই গদাধরের স্পর্ধা দেখে বিস্মিত হলেন কিনা তা দেখার গরজ গদাধরের ছিল না। তিনি হাইবেঞ্চ সরিয়ে হেডমাষ্টারমশাইকে দুহাতে চেপে ধরে সবলে তাঁকে অবলীলায় হাইবেঞ্চের তলায় ঢুকিয়ে দিলেন।

হেডমাষ্টারমশাই তখন মিনমিনে গলায় বলে চলেছেন—আরে গদাই, কি করিস, কি করিস! ছেড়ে দে বাপ, ঘাট হয়েছে আমার।

কিন্তু গদাধর তাঁর ঘাড় চেপে ধরে রেখে বলেন—না স্যার, আজ আপনার একদিন কি আমার একদিন।

হেডমাষ্টারমশাই কাঁদো কাঁদো স্বরে বলেন—আজ তোরই দিন রে গদাধর। ছাড় ছাড়, না হলে আমার আর কোনদিনই হবে না রে। তোর হাতেই বোধ হয় আমার শেষদিন হয়ে যাবে।

গদাধর হেডমাষ্টারমশাইকে ছেড়ে দিয়ে শাসনের ভঙ্গিতে তর্জনী উঁচিয়ে বললেন—মনে থাকে যেন, স্যার আজকের এই দিনটার কথা। আর কখনও ফার্ষ্ট ক্লাশের ছাত্রদের গায়ে যেন হাত তুলবেন না। আমি অন্যায় করেছিলাম, আপনি আমায় ফেল করাতে পারতেন কি ইসকুল থেকে তাড়িয়ে দিতেন। কিন্তু তাই বলে গায়ে হাত? আমার বাপও পর্যন্ত এখন আমার গায়ে হাত তোলার সাহস পায় না, তা জানেন?

সেদিন হেডমাষ্টারমশাই-এর আর শেষদিন হয়নি। কিন্তু বলাই বাহুল্য গদাধরের ছাত্রজীবনের সেইটাই ছিল শেষ দিন। হেডমাষ্টার-মশাই সেদিনই গদাধরকে ইসকুল থেকে তাড়িয়ে দেন—গায়ের জোরে নয়, কলমের জোরে। গদাধরের তার জন্য কোন দুঃখ ছিল না। তিনি জেনেশুনেই কাজটা করেছিলেন। উচিত বিবেচনা করেই করে-ছিলেন। হেডমাষ্টারমশাই পরে তার ব্যাপারে কি উচিত কাজটা করবেন তা তার বিলক্ষণ জানাই ছিল।

অতএব অর্দ্ধশতাব্দী আগে নীলুর সেই মাষ্টারমশাই একদা তাঁর ছাত্রজীবনে ফার্ষ্ট ক্লাশের ছাত্রদের উপর মাষ্টারমশাই-এর বেত্রাঘাত করাকে অন্যায় বিবেচনা করে এককভাবেই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর পৃথিবীর ন্যানান উত্থানপতন ঘটে গেছে। ছাত্রসমাজ ইতিমধ্যে নানা প্রতিবাদের ভিতর দিয়ে গদাধর মাষ্টারের দৃষ্টিভঙ্গীকে যথার্থ বলে দাঁড় করাতে পেরেছে। আজকাল ফার্ষ্ট ক্লাশ তো দূরের কথা, মাষ্টারমশাই-এরা ইসকুলের জিরো ক্লাশের ছাত্রছাত্রীদের গায়ে হাত তোলার কথা কল্পনাও করতে পারেন না।

অবশ্য সেদিন সেই বাল-গদাধরের দৃষ্টিভঙ্গীতে পরীক্ষা হলে নকল করাটা অন্যায়ই ছিল। আজ বালখিল্যের দল সেটাকে ন্যায় বলে চালাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারা হামেশাই নকল করতে না দিলে পরীক্ষাবর্জন করে মা সরস্বতীর সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন চালাবার ডাক দেয়। কিন্তু মাষ্টারমশাই তথা সকলের দৃষ্টিভঙ্গী অদূর ভবিষ্যতে পাল্টাতে বাধ্য। আরো কয়েক বছর পরে ছাত্রদের এ দাবী নিশ্চিত ন্যায্য বলে গৃহীত হবে।

কালের প্রবাহে মুল্যবোধ পাল্‌টিয়ে যায়। অতএব এখন যে উন্নাসিকেরা ছাত্রদের অন্যায় দাবী দেখে হাসছেন তাঁরা অর্দ্ধশতাব্দী আগে গদাধর মাষ্টারের কাহিনী জানার পর দয়া করে যেন নাসিকা কুঞ্চিত না করেন, শুধু চুপচাপ দেখে যান, কি হয়।

যাই হোক, এ হেন প্রবল প্রতাপান্বিত গদাধর মাষ্টারমশাই যে নীলুদের চব্বিশ ঘণ্টা আগলিয়ে বেড়াবেন এটা সুখপ্রদ তো নয়ই, রীতিমত ভীতিপ্রদ। গদাধরের হাতে শুধু মুদ্‌গর থাকে, না শেল শূল মুদগর তিনটাই থাকে সেটাই দেখার জন্য তারা রুদ্ধশ্বাসে দিন গুনতে লাগল।

তিনি নীলুদের বাড়ীতে যেদিন প্রথম এলেন সেদিন তারা তাঁকে দেখামাত্রেই চম্‌কিয়ে উঠল। ইনি ইংরাজী মাষ্টারের মত নন কিন্তু সন্দেহ নেই এক জাঁদরেল পুরুষ। বেশ মোটাসোটা বিশাল বপু তাঁর। চোয়ালের গড়নটা ঠিক শিবাজীর মত। কিছুদিন পরে তার ঐ নামটা ভেতরে ভেতরে চালু হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম দিন তিনি পড়ালেন না, তার ছাত্রদের সামান্য একটু পরীক্ষা করলেন মাত্র। পরীক্ষা করে তাদের দিকে চেয়ে বললেন—তুই (রাসুকে) একেবারে অপদার্থ, তোর কিছু হবে না আর তুই (নীলুকে) অতটা না হলেও, না পড়ে শুনে একেবারে বখে গেছিস। তোদের তৈরী করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।

এই পর্যন্ত বলে কিছুক্ষণ থামলেন তিনি। তারপর মেঘগর্জনের স্বরে বললেন—শোন, আমি ছ'মাসেই সারা বছরের পড়া তৈরী করিয়ে দিতে পারব। আমার নাম গদাধর মাষ্টার. সে ক্ষমতা আমার আছে। আমি তোদের আগের মাষ্টারগুলোর মত মোটেই না। ওরা জানতটা কি যে তোদের পড়াবে, অ্যাঁ?

নীলু আশ্চর্য হয়। দুঃখও পায় নতুন মাষ্টারের কথায়। কেউ বেশী জানলেও তার বড়াই করা যে অনুচিত এ বোধ তার হয়েছে। লোকটা শুধু ভয়ঙ্কর নয়, ভীষণ রকমের দাম্ভিক, এটা বুঝতে নীলুর বাকী রইল না।

গদাধর মাষ্টার আবার বলেন—আমার বেত যার পিঠে পড়েছে তার চামড়া আর আস্ত থাকে নি ঠিকই কিন্তু বেতের গুণে গাধারাও পণ্ডিত হয়ে গেছে. বুঝলি ?

মাষ্টারমশাই-এর কথাগুলো যেন বেতের মতই তাদের মনের চামড়ায় আছড়িয়ে পড়ে ! তারা দুজনে দুজনের মুখের দিকে ভীতি বিহ্বল চোখে তাকায়।

মাষ্টারমশাই তা লক্ষ্য করে সকৌতুকে বলে ওঠেন – শুধু কথাতেই ভয় পাচ্ছিস, পিঠে পড়লে কি হবে, সে তো বুঝতেই পাচ্ছি। লোকে আমাকে কি বলে জানিস তো ?

· নীলুর ইচ্ছা হয় সে বলে—হ্যাঁ জানি, শিবাজী মাষ্টার বলে। কিন্তু ওকথা বললে যে সে আর বেঁচে থাকবে না তাও বিলক্ষন জানে।

গদাধর মাষ্টার একটু থেমে আবার বলেন—দ্যাখ্ এখন যে ইসকুল ইন্‌সপেকটার রয়েছে তার নাম হল আতংকভঞ্জন রায় কিন্তু লোকে আমাকে বলে আতংকবর্দ্ধন পাল। সেই আতংকভঞ্জনের আতংকবর্দ্ধন করেছিলাম এই আমি। তাকে একবার আমার ইসকুলে ঢুকতেই দিই নি। ব্যাটা কিচ্ছুটি জানে না। একটা মুর্খ আমার ইসকুল পরিদর্শন করুক আমি চাই নি। তাই তাকে ইসকুলে ঢুকতেই দিই নি। বুঝলি তো আমি কেমন মাষ্টার ? অতএব পড়াশোনা ঠিকমত না করলে তোদের অবস্থা কি হবে বুঝতেই পারিস।

নীলুর মনে হয়, সে বুঝি মুর্চ্ছা যাবে। তার নাকে এক তীব্র বিষাক্ত গন্ধ এসে লাগে।

গদাধর মাষ্টার আবার বলেন – ঐ টংঘরেই পড়াশোনা হবে, ঠিক ইসকুলেরই মত। তোরা বেঞ্চে বসে পড়বি, আমি চেয়ার টেবিলে বসব। ঠিক সূর্য ওঠার সাথে সাথেই ইসকুলে ঢুকতে হবে। ঘরে চেয়ার টেবিল আছে কিন্তু বেঞ্চ নেই দেখছি। এক কাজ করা যাক। মেঝেতে খুঁটি পুঁতে তার উপর তক্তা এঁটে বেঞ্চগুলো আজ তৈরী করে ফেলি। কাল থেকে একেবারে নিয়মমত পড়াশোনা সুরু হবে। এখন চল, ঐরকম বেঞ্চ তৈরী করি। আমিও তোদের সঙ্গে হাত লাগাচ্ছি।

হ্যাঁ ছাত্রদের হাতে কলমে কাজ শেখানো আমার শিক্ষাদানের এক বৈশিষ্ট্য। এ জিনিস কোন ব্যাটা মাষ্টার তোদের শেখাতে পারবে না। তোদের অনেক ভাগ্য যে আমার মত মাষ্টারের হাতে পড়লি।

একটু থেমে নীলুর দিকে চেয়ে বলেন—দেখি তোকে কতটা মানুষ করা যায়।

নীলু চোখ নামায়। গদাধর মাষ্টার এবার রাসুর দিকে চেয়ে বলে—তোর কিচ্ছু হবে না। তুই তো পরগাছা—পরের ওপর খাস্।

নীলু পরিষ্কার বুঝল তারা যাঁতাকলে ধরা পড়েছে। আর মুক্তি নেই তাদের! আর এও মনে হল, মাষ্টারমশাই রাসুকে একদম পছন্দ করছেন না। রাসুকে পরগাছা বলায় নীলুর ভারী খারাপ লাগে। তাকে সে নিজের ভাই ছাড়া অন্য কিছু ভাবে না।

কিন্তু কোন প্রতিবাদ তো করা যায় না। তখন মাষ্টারমশাই তাকেই আগাছা বলে বসবেন। আর আগাছা পরিষ্কারের কাজে যদি হাত দেন তবে আর রক্ষে নেই। নীলু বেশ বোঝে, এখন তারা মরা বাঁচার অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

সারাদিন মাষ্টার আর ছাত্রেরা মিলে টংঘরে ইসকুলের মত চেয়ার টেবিল বেঞ্চ সব সাজাল। মাষ্টারমশাই সব কিছু বেশ নিপুনভাবে করলেন এবং করালেন। এখন টংঘরই হল ইসকুল ঘর। ওর ভেতরে কিছু বস্তা, কাঠ ও অন্যান্য জিনিস ছিল। সেগুলোকে এক কোনে সরিয়ে রাখা হল।

কাজ শেষ হলে পর গদাধর মাষ্টার তাঁদের বললেন—ঠিক সূর্য ওঠার সাথে সাথেই ইসকুলে আসা চাই কিন্তু।

বন্যার আগে পর্যন্ত নীলু বাবার কাছে শুত। রোজ ভোরে উঠে তার সঙ্গে স্তোত্রপাঠ করতে হত। তখন ভোরে ওঠাটা অভ্যাসের মত হয়ে গিয়েছিল। নিজেই উঠে পড়ত। যদি কোনদিন তার ঘুম না ভাঙ্গত তবে শংকরীপ্রসাদই তাকে তুলে দিতেন। অন্নদা মাইতির বাড়ীতে থাকার সময় এই অভ্যাস আর নিয়মে ছেদ পড়ে যায়। আজকাল নীলু ও রাসু একসঙ্গে শোয়। সকলে ওঠার কোন নির্দিষ্ট সময় থাকে না তাদের।

তাই স্বভাবতঃই পরদিন উঠতে ওদের দেরী হল, তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে না খেয়ে তারা যখন ইসকুল ঘরে পড়তে এল তখন দেখে মাষ্টারমশাই চেয়ারে গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। দেরী হয়েছিল বলে তারা খেয়ে আসে নি।

তারা ঘরে ঢুকতেই গদাধর মাষ্টার গম্ভীর স্বরের বলে ওঠেন—যা, এক ঘটি জল নিয়ে আয়।

কোন স্বাভাবিক প্রয়োজনে গদাধর মাষ্টার যে জল চাইছেন না, এ তারা বুঝতে পারে। খাবার জল চাইলে তো তিনি এক ঘটি জল না বলে এক গেলাস জলই বলতেন। আর মুখহাত ধোয়ার জন্য একঘটি জল চাইছে বলে তো মনে হয় না কারণ তিনি যে মুখহাত ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে বসেছেন তা তো দেখলেই বোঝা যায়। অতএব একঘটি জল কেন ?

এইসব সাত-পাঁচ যখন তারা চুপ করে ভাবছে তখন গদাধর মাষ্টার টেবিলের উপর ছড়ির প্রচণ্ড আঘাত করে বললেন—কি শুনতে পেলি না ? এক ঘটি জল আনতে বললাম না ?

ছড়ির শব্দে দুজনেই চম্‌কিয়ে লাফিয়ে ওঠে। তা দেখে মাষ্টার-মশাই-এর মুখে এক সূক্ষ্ম হাসির রেখা খেলে যায়। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। নীলু সভয়ে ভাবে, এ জিনিস আবার কখন এল ? কিন্তু তাও ভাবার সময় পায় না।

মাষ্টারমশাই বলেন—কাল বলেছিলাম না, ঠিক সূর্য ওঠার সাথে সাথে আসতে হবে ! দেরী হল কেন ? দেরী যখন করেছিস তখন শাস্তি পেতেও দেরী হবে না। আর বড় কঠিন সে শাস্তি যাতে আর কোনদিন ভুল না হয়। এই ছড়ি দিয়ে মারতে মারতে তোদের মুর্চ্ছা লাগিয়ে দেব। তার পর ঘটির জল দিয়ে মুর্চ্ছা ছাড়াব। তারপর আবার মার, আবার মুর্চ্ছা—।

মাষ্টারমশাই কথা শেষ না করে ঘুর্ণায়মান চোখে তাদের দিকে তাকান। নীলু ঠিক বুঝতে পারে না সে মুর্চ্ছিত কিনা। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

একটু পরে মাষ্টারমশাই বলেন—আচ্ছা থাক। আজ প্রথম দিন, আজ আর মারব না। কিন্তু আর কোনদিন হলে আর রক্ষা নেই। বোস এবার।

এরপর তিনি নীলুকে ইংরাজী পড়াতে সুরু করলেন। সুন্দর করে পড়ালেন তিনি। পড়ানোটা নীলুর বেশ ভাল লাগল। কিন্তু অনেক খানি পড়া দিলেন।

একটু বেলা হতেই প্রচণ্ড ক্ষুধায় কাহিল হল নীলু। ভয়ে মাষ্টার-মশাইকে বলতে পারছে না সে কথা। একটু পরে রাণীর দাদা এলো মাষ্টারমশাই-এর জন্য জল খাবার নিয়ে। বিশেষ কিছু নয়—দুধ, মুড়ি আর গুড়। রাণীর দাদা নীলুদের দিকে চেয়ে বলে—তোমাদের খেতে ডেকেছে।

অমনি গদাধর মাষ্টার গর্জ্জে ওঠেন—তোরা খেয়েও আসিস্ নি ? তাহলে কত দেরী করে উঠেছিলি রে ? তোরা যে একেবারে কুম্ভকর্ণের ঠাকুর্দা লম্বকর্ণ রে। আর যদি দেরী হয় উঠতে তবে আমার হাতে লম্বকর্ণ সব হ্রস্বকর্ণ হয়ে যাবি বুঝলি ? সকালে পড়তে আসার আগে একেবারে খেয়ে দেয়ে আসতে হবে। আর নীলু, তুই আজ থেকে আমার কাছে শুবি কি রকম তোর ভোরবেলায় ঘুম ভাঙ্গে না দেখি একবার। যা, এখন খেয়ে আয়।

সেদিন থেকে মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে রাতে নীলুকে শু'তে হল। রাসু আলাদা বিছানায় একা মাষ্টারমশাই-এর পাশে শুতে লাগল : আলাদা বিছানায় পাশে শুতে লাগলেন। সকলেরই বিছানা বাইরে বারান্দায়।

শোবার সময় নীলুর পা প্রায়ই মাষ্টারমশাই-এর গায়ে লাগে। জেগে থাকলে বার বার উঠে একবারে প্রণাম করতে হয়। মাষ্টার মশাই তখন নিয়ম করে দিলেন যে, সকালে উঠে একবার প্রণাম করলেই চলবে, রাতে পা লাগলেও আর প্রণাম কর্‌বার দরকার নেই। তার ফলে বিছানায় মাষ্টারমশাই-এর গায়ে পা লাগলে প্রণাম করতে আর হত না ঠিকই কিন্তু তাই বলে অস্বস্তিও কম হত না।

কিছুদিন যেতে না যেতেই নীলুরা পড়াশোনার জালে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেল। অত পড়ার চাপ তাদের সহ্য হত না। আর সে কি পড়ার বহর! রোজ অত ভোরে উঠে পড়তে বসতে হত। সে পড়া চলত সকালে প্রায় এগারোটা পর্যন্ত। কোন কোনদিন আরও বেশী। এমন ও হত, বাড়ীর ভেতর থেকে স্নান করতে যাওয়ার নির্দেশ এলে তবে সকালের পড়া শেষ হত।

দুপুরে যে তারা একটু শোবে তার উপায় নেই। মাষ্টারমশাই অবশ্য বেশ আয়েস করে ঘুমাবেন কিন্তু তাদের জন্য থাকবে একগাদা ইংরাজী ও বাংলা হাতের লেখা ইত্যাদি। যেগুলো লেখা শেষ হতে না হতেই মাষ্টারমশাই দিবা নিদ্রা সাঙ্গ করে ফের পড়াতে বসবেন। ঘরের মধ্যে যতক্ষন আলো থাকবে ততক্ষণ পড়া চলবে। তারপর হয়ত একটু খেলতে যাওয়ার অবসর মিলবে। কিন্তু তখন সূর্য প্রায় অস্তাচলে। আচার্যপাড়ার সাথীদের সঙ্গে একটু খেলতে না খেলতেই দূর থেকে গদাধর মাষ্টারের ডাক ভেসে আসবে—নীলু, রাসু এবারে আয় পড়তে বোস।

অমনি প্রাণেশ টিপ্পনী কাটবে—যা এবার শিবাজী ডাকছে।

চলল সন্ধ্যার পড়া। সে যে কতক্ষন চলবে তার ঠিক নেই। শংকরীপ্রসাদ খেতে যাবার আগে পড়া শেষ হবে মোটামুটি এই ছিল সময়। কিন্তু তাঁর কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। বন্ধু-বান্ধবেরা এলে রাত দশটাও পার হয়ে যেত। রাতে পড়তে বসে ঘুমে ঢলে পড়লেও নিস্তার নেই। অমনি গদাধর মাষ্টার কান টেনে বলবেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাই কত কষ্ট করে পড়েছেন। ঘুম পেলে চোখে সরষে তেল দিয়ে ঘুম ছাড়িয়ে পড়তেন। তোদের চোখে আমি লঙ্কা বেটে মাখাব। দেখি ঘুম কেমন না ছাড়ে? অতএব প্রাণপন প্রচেষ্টায় চোখ তাদের খোলা রাখতেই হত।

রাতে ভাত খাওয়ার আগে পড়া শেষ হলেও বিছানার মধ্যে তার রেশ রয়ে যেত। মাষ্টারমশাই শুয়ে শুয়ে নীলুকে এটা সেটা জিজ্ঞেস করতেন। নীলু ঘুমে বেহুশ না হওয়া পর্যন্ত চলত প্রশ্নোত্তর পর্ব।

বিছানার মধ্যে ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদের অর্থ হল অভিভাবকদের জানানো, মাষ্টারমশাই কেমন ছাত্র পড়াচ্ছেন।

ইসকুলে পড়লে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন ছুটি মেলে। বাড়ীতে মাষ্টারমশাই পড়াতে এলেও একদিন পড়ার হাত থেকে রেহাই মেলে। কিন্তু মাষ্টার যদি চব্বিশ ঘণ্টাই বাড়ীতে থাকেন তবে পড়ার হাত থেকে ছাত্রের মুক্তি নেই। নীলুর সে সময় মনে হত, সে যেন দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে।

মাষ্টার মশাই প্রায়ই তাদের বলেন—এক বছরের পড়া সব ছ'মাসে শেষ করাতে হবে।

নীলু মনে মনে বলে—কিন্তু তার আগে আমারাই বোধ হয় শেষ হয়ে যাব।

মাসে এক আধবার মাষ্টারমশাই বাড়ী যেতেন। কিন্তু সকালে গেলে বিকালেই চলে আসতেন। কদাচিৎ কোন কোনবারে তিনি নিজের বাড়ীতে এক রাত কাটিয়েছেন। কিন্তু বাড়ী যাওয়ার আগে এত বেশী পড়া দিয়ে যেতেন যে ওগুলো তৈরী করতেই সময় চলে যেত নীলুদের। মাষ্টারমশাই নেই বলে যে খেলবে তার উপায় ছিল না। কারন তিনি না থাকলে তার ছড়িগুলো রয়ে যেত। আর সেই ছড়িগুলোর দিকে চেয়ে নীলুর মনে হত—মাষ্টারমশাই আবার আসবেন। এলেই পড়া ধরবেন। অতএব······।

আর, কত রকমের ছড়ি আমদানি করেছিলেন তিনি। মোটা, মাঝারি, সরু—নানা দৈর্ঘের ও নানা প্রস্থের গোটা কয়েক ছড়ি ছিল তাঁর। শাস্তির গুরুত্ব অনুযায়ী ছড়ির ব্যবহার হত। গুরু দোষে সরু ছড়ি আর লঘু দোষে মোটা ছড়ি। নীলুর তখন নিজেকে মনে হত সে যেন একটা কলুর বলদ—ঘানিঘরের মধ্যে শুধু ঘানি টেনেই মরছে। বাইরে নীল আকাশ, উন্মুক্ত প্রান্তর তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সে বলদের মত ঘানি টানতে টানতে মুখ তুলে সেদিকে একটু চায় আর মাথা নেড়ে নেড়ে মনে মনে যেন বলে—উপায় নেই, ঘানিকাটে বাঁধা পড়ে আছি।

একদিন সকালে মাষ্টারমশাই বললেন—এই সব পড়া করে রাখ্‌। আমি এ বেলা বাড়ী যাচ্ছি। বিকালে এসে পড়া ধরব।

যা পড়া তিনি দিয়ে গেলেন তা একবেলা কেন, একদিনেও করা সম্ভব নয়। নীলুরা হতাশ হয়ে পড়ে। মাষ্টারমশাই চলে গেলে নীলুরা ঠিক করে, এত পড়া সম্ভব নয়। ভাগ্যে শাস্তি আছেই। আর তা যখন আছেই তখন আর মিছে পড়া করা কেন? বরং একটু খেলাই যাক্‌।

তারা বইপত্র গুটিয়ে খেলতে যাবার জন্য উঠে পড়ে বাড়ী ছেড়ে যেতেও হয় নি, মাষ্টারমশাই এসে হাজির। তার পরনে গামছা। নীলুরা তো অবাক। একটু পরেই মাষ্টারমশাই-এর কৌতুকটা ধরা পড়ল। তিনি প্রাকৃতিক কাজ সারতে গিয়েছিলেন মাত্র, বাড়ী যান নি।

সেদিন অবশ্য বিশেষ কোন শাস্তি জোটে নি তাদের ভাগ্যে কিন্তু ধরা পড়ে যথেষ্ট বিড়ম্বনায় পড়েছিল তারা। পড়াশোনার ব্যাপারে এমনি সব দিকেই নজর ছিল তার। কিন্তু তাতে যে ছাত্রদের নাভিশ্বাস ওঠার যোগাড়, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র নজর ছিল না তাঁর।

আজ নীলাদ্রি ভাবে, গদাধর মাষ্টারমশাই একটু বেশী বেশী পড়াতেন কিন্তু পড়ানোতে আন্তরিকতার বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না তাঁর শাস্তিদানের নানারকমের সাজ-সরঞ্জাম ছিল তাঁর কিন্তু প্রয়োগ বিশেষ হতো না। প্রয়োজনও হত না। কারণ এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন অতি নিপুন অভিনেতা। মারের যে ভাবভঙ্গী তিনি দেখাতেন তাতেই ছাত্রেরা কাহিল হত। সত্যিকারের প্রহার করলে বোধ হয় অত কাহিল তারা হত না। কল্পনায় প্রচণ্ড মারটার কথা ভেবে প্রাণপনে পড়াশোনা না করে তাদের উপায় ছিল না।

তখন তাঁকে কিছুটা নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন বলে মনে হত। আজ ভেবে দেখলে মনে হয়, তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি নিরুপায় কারণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁকে অতি গুরু দায়িত্ব পালন করার ভার দেওয়া হয়েছিল। সে দায়িত্ব তিনি সার্থকভাবেই পালন

করেছিলেন। আর তাই নীলু তার গোড়ার দিকের দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে পড়াশুনার বনিয়াদটাকে পাকাপোক্ত করতে পেরেছিল যার সুফল সে সারা জীবন ধরেই ভোগ করেছে।

তাঁর মারের চেয়ে মারের ভঙ্গীটাই যে সার ছিল তার আরো পরিচয় পাওয়া গেছে। পার্বতী তখন বছর চারেকের ছিল বোধ হয় তাকেও পড়ানোর ভার দিলেন শংকরীপ্রসাদ মাষ্টারমশাই-এর উপর। অতটুকু মেয়ে, অ, আ লিখতে চায় না। পড়তে বসতেই চায় না। তার জন্য আলাদা দাওয়াই তৈরী করলেন তিনি। সেটি হল একটি দড়ির ফাঁস। সেটি দুহাতে চক্রাকারে ঘুরাতে ঘুরাতে তিনি পার্বতীকে ভয় দেখাতেন ও বলতেন—পড়তে না বসলে তার গলায় তিনি ফাঁস লাগিয়ে কড়িকাঠে ঝুলিয়ে দেবেন। ঐ কথাতেই কাজ হত। এই দড়ির নাম তিনি দিয়েছিলেন 'যোগদড়ি'।

বাইরে তাকে বজ্রকঠোর মনে হলেও মনটা তার ছিল খুবই নরম। নীলু কখনও অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি নিজের হাতে যে সেবা করতেন তার তুলনা হয় না। দুষ্টামি করার জন্য রাসুকে একবার তিনি বেশ বেশীই মেরেছিলেন কিন্তু পরের দিনই ধানগোলার হাট থেকে 'গজা' কিনে এনে খাইয়েছিলেন তাকে। নীলুরও ভাগ জুটেছিল।

মাঝে মাঝে নানারকমের রসিকতাও করতেন তিনি কখনও কখন নীলুকে বলতেন—ওঃ, একেবারে স্যার আশু মুখুজ্জে এসে গেছেন। শুধু যা গোঁফটা নেই। তুই বাংলার বাঘ না হোস্, নির্ঘাত বাংলার বিড়াল হবি।

একবার বুঝি রাসুকে তীব্র শ্লেষে বলেছিলেন—একেবারে নবাব সিরাজদ্দৌলার পোষ্যপুত্রের নাতি আমার।

রাসু অনেকটা শংকরীপ্রসাদের পোষ্যপুত্র। তাই এ হেন মন্তব্য।

সে সময় তো দেশে দারুন মন্বন্তর। গদাধর মাষ্টার দুপুরে কোনদিন পেট ভরে খেতেন না। কিছু পাতের ভাত তিনি বাইরে কোন ভিখারীদের দিতেনই। রমলার তো চোখ এড়াত না। তিনি তাই বলতেন—মাষ্টার, তুমি খাও। আমি ভিখারীকে দিচ্ছি।

কিন্তু তিনি রমলার কথা শুনতেনই না। বলতেন—আমি একটু কম খেলে মরব না বা শরীরের কোন ক্ষতিও হবে না আমার। কিন্তু ছমুঠো তুলে কাউকে দিলে সে বাঁচতে পারে। আমি কারোর কোন অসুবিধা করতে চাই না। কোন পুণ্যের জন্য নয়, ওদের দেখলে কেমন যেন আমার গলা দিয়ে ভাত নামতে চায় না।

এমনি নরম মনের মানুষ ছিলেন তিনি।

নীলুর পড়াশোনা বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে চলল। সে বছর নীলুর ইউ, পি পরীক্ষা দেবার কথা। পরীক্ষার কেন্দ্র হত হরিপুর হাই ইসকুলে। নীলু গাঁয়ের ইসকুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াশোনা না করলেও যাতে ইসকুলের ছাত্র হিসাবে পরীক্ষা দিতে পারে সে ব্যবস্থা করছিলেন শংকরীপ্রসাদ। যথারীতি পরীক্ষার ফীজও জমা দেওয়া হয়েছিল। ফীজ ছিল বুঝি একটাকা চার আনা।

গদাধর মাষ্টারমশাই বড়াই করে বলতেন—নীলু নিশ্চিত প্রথম বিভাগে পাশ করবে।

কিন্তু সে বছর শেষ পর্যন্ত নীলুর পরীক্ষাই দেওয়া হল না। তার রোলনাম্বারই আসে নি। কারণটা পরে জানা গেল। শংকরীপ্রসাদ ইসকুলের কোন মাষ্টারমশাই-এর হাতে ফীজের টাকা দিয়েছিলেন। সে টাকা জমা দেওয়া হয় নি। সেই দুর্ভিক্ষের দিনে ওটি নিছক প্রাণ বাঁচানোর প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছিল। অবশ্য তার জন্য নীলুর কিছু মাত্র ক্ষতি হয় নি।

গদাধর মাষ্টারমশাই বললেন—পরীক্ষায় পাশ না করল তো কি হয়েছে? নীলু এমনিতেই পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার উপযুক্ত। পাশ করা ছেলেরাও এর ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবে না। গদাধর মাষ্টারের ছাত্র যেখানেই যাবে সেখানেই মাষ্টারের নাম রাখবে।

ঐ বছরের শেষে নীলুর এক ভাই হয়। তার নাম রাখা হয় হিমু বা হিমাদ্রি।

এরপর নীলু পড়বে কোথায় সে নিয়ে কথাবার্তা হল। হরিপুর হাই ইসকুলেই সুবিধা। বাড়ীর কাছেই—মাইল খানেকের কিছু বেশী।

দূর। সেখানে পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। নীলুও জানত যে গাঁয়ের ইসকুলে পড়া শেষ করে তাকে হরিপুর হাই ইসকুলে পড়তে হবে।

কিন্তু বাদ সাধলেন গদাধর মাষ্টার। তিনি শংকরীপ্রসাদকে বললেন—হাই ইসকুলে নীচের ক্লাশে পড়াশোনা ভাল হয় না। ওকে বরং কেষ্টপুরের এম, ই ইসকুলে ভর্তি করা হোক্। ওখানে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত আছে। রাসুও ঐ ইসকুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে।

কিন্তু কেষ্টপুরের ইসকুল তিন মাইলের পথ। যাই হোক্, নানা জল্পনাকল্পনার পর গদাধর মাষ্টারমশাই নিজে একদিন রাসু ও নীলুকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন কেষ্টপুরের এম, ই ইসকুলে ভর্তি করাতে।

সেখানে মাষ্টারমশায়েরা নানা প্রশ্ন করেছিলেন তাদের। অবশেষে সেই ইসকুলে নীলু ও রাসু যথাক্রমে পঞ্চম ও চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে গেল। নিয়মিত ইসকুল হতে তখনও প্রায় মাসখানেকের মত দেরী।

গদাধর মাষ্টার কিন্তু ঐ এক মাসের মধ্যে বিদায় নিলেন। বিদায়ের ঘটনাটা বেশ দুঃখজনক। এম, ই ইসকুলে পড়ানো সুরু না হলেও গদাধর মাষ্টার কিন্তু বাড়ীতে তাদের ঐ ইসকুলের পড়াগুলো এগিয়ে দিতে লাগলেন। নীলুরা তখন সত্যিই হাঁফিয়ে উঠেছিল। পড়াশোনার ঘোড়দৌড়ের সঙ্গে তারা আর দৌড়তে পারছিল না। নীলু ও রাসু যেন দুটি খাঁচায় পোরা পাখী। তারা নীলাকাশ শুধু দেখে কিন্তু সেখান থেকে তাদের জন্য ভেসে আসে না কোন মুক্তির বাতাস। তারা মুক্তির পথ খোঁজে। কিন্তু কে দেখাবে সে পথ তাদের? দুটি কচি প্রাণ বুঝি ঈশ্বরের কাছে মুক্তির জন্য আকুল মিনতি জানায়।

ঈশ্বর বুঝি শুনেছিলেন। শংকরীপ্রসাদ তখন পাটের ব্যবসায় নেমেছেন। ভালই চলছিল তাঁর ব্যবসা। তিনি গদাধর মাষ্টারের হাতে ছেলেদের সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। ছেলেদের মনের খবর রাখারও সময় তাঁর ছিল না।

এই সময় একদিন কি কারনে মাষ্টারমশাই রাসুকে ছড়ি দিয়ে প্রহার করেন। প্রহারের ফলে রাসুর আঙ্গুলের চামড়া ফেটে রক্ত পড়ে। রাসুর আর্ত চীৎকারে রমলা বেরিয়ে আসেন। রক্ত দেখে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যায়। তিনি ছেলেদের সামনেই মাষ্টারমশাইকে তীব্রভাবে ভৎর্সনা করেন। গদাধর মাষ্টার লজ্জিত হয়ে রমলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

নীলু এবারে মায়ের আশ্রয় নিল। কিছুটা বিদ্রোহী হল সে। মার কাছে দাবী জানাল আর গদাধর মাষ্টারের কাছে পড়বে না বলে। গদাধর মাষ্টার ঐ ঘটনার পর কিছুটা মনমরা হয়ে যান। সেদিন রাতের বেলায় আর তিনি পড়াতে বসলেন না। বাবার সঙ্গে অনেক কি কথাবার্তা হল। পরের দিন নীলুরা জানতে পারল, মাষ্টারমশাই আর তাদের পড়াবেন না। তারা খুশী হতে গিয়েও যেন খুশী হতে পারল না। তাদের জন্যই যে মাষ্টারমশাই বিদায় নিচ্ছেন একথা ভেবে তারা রীতিমত লজ্জিত হয়।

কিছুদিন পর থেকে নীলু ও রাসু কেষ্টপুরের এম, ই, ইসকুলে যেতে লাগল। তাদের গাঁয়ের আর এক ছেলে, তার নাম সুহাস— সেও ঐ ইসকুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। তিনজনে তারা এক সঙ্গে যেতে লাগল। ক্যানেলের পাড় ধরেই সোজা পথ। রোজ তিনটি ছেলে— কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, তিনমাইল দূরের ঐ ইসকুলে যেতে আসতে লাগল। পথের এক ধারে ক্যানেল আর এক ধারে শুধু ধানের মাঠ। কোথাও মানুষের বসতি নেই।

এই ইসকুলের হেডপণ্ডিতমশাইকে দেখে নীলু অবাক হয়েছিল। তাঁর একটি মুদীর দোকানও ছিল। নীলুরা তাঁর দোকানে বিস্কুট, লজেন্স কিনে খেত। তাঁর ছেলেই দোকানে বসত। পণ্ডিতমশাইও বসতেন। তাঁকে দোকানে দেখলে একেবারে অথর্ব বুড়ো বলে মনে হত কিন্তু ইসকুলে এলে যুবক যুবক মনে হত। ব্যাপারটা প্রথমে মোটেই ধরতে পারে নি নীলু। কিছুদিন পরে সে বুঝতে পারল, যখন একদিন গিয়ে ইসকুলে শুনল যে, হেডপণ্ডিতমশাই সেদিন পড়াতে

আসবেন না কারণ কাকে তাঁর দাঁত নিয়ে পালিয়েছে। বৃদ্ধের যুবক হবার রহস্য সেদিন নীলুর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল।

এতদূর পথ যেতে আসতে কষ্ট ছিল কিন্তু আনন্দও ছিল প্রচুর। উদার, উন্মুক্ত আকাশের নীচে যে মহামুক্তির স্বাদ তাদের মিলত তার কাছে পথের শ্রান্তি অতি তুচ্ছ ছিল। খাঁচার পাখীরা যেন নীল আকাশের নীচে লাফিয়ে লাফিয়ে ওড়ে বা উড়ে উড়ে লাফায়।

সে বছর মাঠে সামান্য কিছু ফসল হল। কিছুটা দুর্যোগ কাটিয়ে উঠেছে লোকে। কিন্তু এলো আর এক রোগ যাতে সেদিন বাংলাদেশে ভোগে নি এমন লোক বোধ হয় একজনও ছিল না। তার নাম ম্যালেরিয়া।

কম্প, শিহরণ ও স্বেদ—এই তিন হলো ম্যালেরিয়ার আদি, মধ্য ও অন্তলীলা। এ রোগে ধরলে প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে কম্প দিয়ে গায়ে জ্বর আসত। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শীতবোধ আর কাঁপুনি। সেই শিহরিত অবস্থায় লেপের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে থাকতে বেশ মজা লাগে! ঘণ্টাখানেক বাদে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যেত। তখন মনেই থাকত না যে একটু আগে ম্যালেরিয়া শরীরে খেলা করে গেছে। আর মনে থাকত না যে ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি কমে যাচ্ছে।

এর ওষুধ ছিল হলুদ রঙের বড়ি—কুইনাইন। সিংকোনা গাছ থেকে এ ওষুধ হয় তা হেডপণ্ডিত মশাই একদিন ক্লাশে বলেছিলেন। তখন কুইনাইন বড়ি পোষ্টঅফিসে কিনতে পাওয়া যেত। যেখানে সেখানে টাঙ্গানো থাকত মশাদের ছবি। ম্যালেরিয়া হলে কি কি করতে হয়, মশা যাতে জন্মাতে না পারে তারজন্য কি করা উচিত সে ব্যাপারে নানা সচিত্র উপদেশ। বহু লোকের মশারী কেনার সামর্থ ছিল না। অতএব মশার হাত থেকে রেহাইও ছিল না, যমের হাত থেকেও না।

ম্যালেরিয়া সে সময় কম প্রাণ নেয় নি। নীলুর মনে আছে প্রায় বছর দুয়েক ধরে দফায় দফায় তার ম্যালেরিয়া হয়েছে আর প্রচুর কুইনাইন তাকে খেতে হয়েছে। আজ সে সব দিনের কথা মনে এলে

নীলাদ্রি ভাবে সৃষ্টি যেমন অজস্র, মৃত্যুর ফাঁদও তেমনি সহস্র।

কান্তি জেঠার মুখে নানা নতুন খবর শোনা যায়। যুদ্ধ নাকি এবার থেমে যাবে।

শংকরীপ্রসাদকে ঐ সময় একবার তিনি বলেছিলেন—ভারতের স্বাধীনতা পিছিয়ে গেল। নেতাজী ব্রিটিশকে সিঙ্গাপুরে যে ধাক্কা দিলেন তা দেশের লোক জানতেই পারে নি। কোলকাতায়ও সকলে জেনেছিল জাপানীরা সিঙ্গাপুর আক্রমন করেছিল বলে। এই বিশ্ব-যুদ্ধই ছিল ভারতের স্বাধীনতালাভের মস্ত বড় সুযোগ। এখন যুদ্ধ থেমে গেলে ব্রিটিশ তো ও নিয়ে কোন কথাই বলবে না। দেখছো না আন্দোলনও কেমন যেন ঝিমিয়ে গেছে।

সত্যিই তখন আন্দোলন যেন কতকটা ঝিমিয়ে পড়েছিল। হবে না কেন? মানুষ মৃত্যুর সাথে লড়াই করতে গিয়ে জীবনীশক্তি নিঃশেষিত করেছিল। বন্যা, ঝড়, মন্বন্তর, কলেরা, বসন্ত—এদের হাত এড়িয়ে তখনও যারা বেঁচেছিল, তারা তখন ম্যালেরিয়ায় ধুঁকছে।

কান্তি জেঠার কথা থেকে নীলু বুঝতে পারত, কোলকাতাতেও নাকি একই অবস্থা খাদ্যের। সেখানে নাকি এক সের আলুর দাম পাঁচ সিকা। কাতারে কাতারে ভিখারী সব গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে এবং আসছেও। পথেই থাকছে, পথেই মরছে। মানুষের ভীড়ে, মৃতদেহের ভীড়ে পথ চলা দায়।

নীলু ভাবত এখানেই বা সে কমটা কি দেখেছে। দেখার এখনও তো শেষ হয় নি।

নাঃ, দেখার শেষ আজো হয় নি, কোনকালেও হবে না। জীবনের মিছিলের সমান্তরালে চলেছে মৃত্যুর মিছিল। জীবন ও মৃত্যুর নীট্ যোগফল হল স্থিতি। দুটোর ভারসাম্যেই সৃষ্টির স্থিতি সম্ভব। আর এই ভারসাম্যটা বজায় রাখতে গিয়ে সৃষ্টির দেবতাকে মাঝে মাঝে রুদ্র সেজে মৃত্যুর দেবতার বেশে সংহার চালাতে হয়।

কিন্তু সেই রুদ্রের মাত্রাজ্ঞান আছে। কখনই তা মাত্রা ছাড়িয়ে যায় না। রুদ্রের নৃত্য ছন্দোবদ্ধ। সেই নৃত্যের তালে তালে ঝড়

বয়, সাগর কেঁপে ওঠে, মা ধরিত্রী কেঁপে ওঠে, কলেরা, বসন্ত ম্যালেরিয়া দলও তালে তালে মানুষকে নাচাতে নাচাতে মৃত্যুর পথে নিয়ে যায়। তবু জীবনের প্রবাহ স্তব্ধ হয় না। আর তাই অনেক মৃত্যুর সোপান বেয়ে আসে মহাজীবনের বিজয় তোরন।

যে ভারসাম্যের খেলা বিধাতা খেলে, আজ মানুষও সেই ভারসাম্যের খেলা খেলছে। সেটা সৃষ্টির ভারসাম্য যদি নাও হয় তবে শক্তির ভারসাম্য তো বটেই। তাই আজ ভিয়েতনামে স্বাধীনতা আন্দোলন চললে হোয়াইট হাউস কেঁপে ওঠে, ভারতমহাসাগরে মার্কিন নৌবহর হাওয়া খেতে বার হলে রাশিয়ার নৌবহরও হাওয়া খাওয়ার মহড়া দিতে বার হয়। এই ভারসাম্যের খেলা খেলতে গিয়ে অজস্র মৃত্যুর আনাগোনা বেড়েই চলেছে। কিন্তু মানুষ বিধাতার মত ভারসাম্য আনতে পারছে কই? সৃষ্টির ভারে পৃথিবী যে টলমল!

আর তাই মানুষ ব্যাধিকে আয়ত্ত্বে আনতে পারলেও খাদ্যাভাবকে জয় করতে পারে নি! পৃথিবীর সাড়ে তিনশ কোটি লোকের একশ' কোটি নিরন্ন, আরও একশ কোটি অর্দ্ধভুক্ত। আর এ সংখ্যাগুলো ক্রমে বেড়েই চলেছে। জন্ম মৃত্যুর অসম অনুপাতে বিষম উল্কাপাত ঘটছে পৃথিবীতে। ভারসাম্য আনতে গেলে প্রচণ্ড একটা ধ্বংসের দরকার। সেটাই কি হবে কলির শেষ? এ্যাটম্ বোম, হাইড্রোজেন বোম কি সেই শেষের ইঙ্গিত করছে?

আর তারপর? তারপরও মহাজীবনের ধারা বয়ে চলবে। সৃষ্টি থেমে থাকবে না, মৃত্যুও থেমে থাকবে না, থেমে থাকবে না মহাজীবনের ধারা। মহাজীবনের ধারা যখন স্বাভাবিক নিয়মে বইতে বইতে আবর্জনায় ভরে ওঠে তখন এমন একটা সময় আসে যখন আবর্জনার ভারে তার গতিপথ রুদ্ধ হয়। তখন মানুষের মহাজীবন থেকে কোন সুমহান শাশ্বত ঐক্যতান বেজে ওঠে না। সেই সময়টাকে কি কান্তি জেঠারা বলেন কলির শেষ, যখন পৃথিবী পাপের ভারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে? হবে হয়ত।

মানুষের বিশ্বাস, যুগে যুগে অমন অনেক অনেক বার পৃথিবীতে স্বয়ং ভগবান এসে আবর্জনা পরিষ্কার করে গেছেন। সে কথাই তো শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন অর্জুনকে—

'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রানায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'

তারপর আবার নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে। মহাজীবনের ধারা আবার সেখান থেকে গড়ে উঠেছে, আবার নবীন খাতে বইতে সুরু করেছে সেই মহাজীবন! অতএব সব মিলিয়ে অনন্তকাল ধরে সেই মহাজীবনের ধারা বয়ে চলেছে, মহাজীবনের গান গীত হয়েছে। সেই কথাই তো আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে।

সারা পৃথিবীর লোকেরও বুঝি সেই একই বিশ্বাস। তাই সেই চরম ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে মানুষ তার আপন প্রতিভার স্বাক্ষরগুলি পরিচয় রেখে যেতে ব্যগ্র উত্তরকালের নবীন পৃথিবীর জন্য। তাই তো সারা পৃথিবী জুড়ে আজ ভূগর্ভে 'টাইম ক্যাপসিউল' সযত্নে রক্ষিত করার আয়োজন চলেছে। মানুষের আশা; নবীন বংশধরেরা জানবে একদিন পুর্বসূরীদের মনীষার কথা।

নীলু ভাবে, সেই সঙ্গে জানবে তাদের অবিমৃষ্যকারিতার কথাও। কিন্তু এ ও জানবে, মহাজীবনের ধারা বয়ে চলেছে, তার গান চিরকালই মানুষ গাইছে।

নীলু ভাবে, তার এই 'মহাজীবনের গানও' এমনিভাবে কোনদিন কোন উত্তরপুরুষ পড়ে দেখবে আর বুঝবে তাদের পুর্বপুরুষেরা একদিন কিভাবে সহস্র মৃত্যুর বিভীষিকার মাঝেও মহাজীবনের গান গেয়ে গেছে। মৃত্যুর কাছে তারা হার স্বীকার করে নি। মৃত্যু তাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে পারে নি।

তারা বুঝবে, মানুষ মৃত্যুঞ্জয়, তার মহাজীবন অক্ষয়।

নীলুর মনে হয়, মানুষকে দোষ দিয়ে বোধ হয় লাভ নেই। মানুষের মহাজীবনেই মহাশক্তিধরের প্রকাশ। তাই মানুষের মাঝে ব্রহ্মা- বিষ্ণু, মহেশ্বরের আবির্ভাব। তাই ধ্বংস যেমন অনিবার্য, তেমনি ধ্বংসের পর সৃষ্টি তথা মহাজীবনের অবিরাম ধারাও অপ্রতিরোধ্য।

তাই মানুষের মহাজীবনের গানে গানে পৃথিবী অনন্তকাল মুখরিত।

॥ ২১ ॥

কেষ্টপুর হাই ইসকুলে নীলুর সঙ্গে একই ক্লাশে পড়ত পরিমল আর শান্তিপদ। ওরা ঐ ইসকুলেই চতুর্থ শ্রেণী থেকে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পঞ্চম শ্রেণীতে উঠেছে। তাদের রোল নাম্বার তাই যথাক্রমে এক এবং দুই। নীলুর রোল নাম্বার ছিল উনচল্লিশ তাদের পঞ্চম শ্রেণীতে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল চুয়াল্লিশ। এত দিন পরেও নীলুর একথা মনে থাকার কারণ সেটিও ছিল ১৯৪৪ সাল। এ বছরটা বিশেষ করে মনে থাকার কারণ ঐ বছর পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হয়েছিল। তৃতীয় আর এক কারণে এ বছর নীলুর জীবনের অতি গুরুত্বপুর্ণ বছর। তার মধ্যে যে কিছু সম্ভাবনা রয়েছে তা সে এ বছরই আবিষ্কার করেছিল। সে কথা আরো একটু পরে আসছে।

পরিমল আর শান্তিপদ নীলুকে কিছুটা কৃপার চোখে দেখত। নীলু যেহেতু চতুর্থ শ্রেণীতে পরীক্ষা না দিয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে এসেছে তাই তাদের ধারণা নীলু ছাত্র হিসাবে ভাল নয়। নীলু নিজেও বুঝতে পারত না ছাত্রহিসাবে সে কেমন ছিল। এতদিন সে বাড়ীতে মাষ্টার-মশাইদের নির্দেশেই পড়েছে, নিজে দায়িত্ব নিয়ে পড়ে নি। বড় ইসকুলে এসে তাই সে খেই হারিয়ে ভাবতে লাগল ঠিক কি ভাবে পড়া-শোনা করলে ভাল ছেলে হওয়া যায় বা পরিমল শান্তিপদদের সমকক্ষ হওয়া যায়।

বাড়ীতে এখন আর পড়াবার জন্য কোন মাষ্টারমশাই নেই। কোন কিছু বুঝতে না পারলে চট করে কারোর কাছে সে বুঝে নেবে সে উপায় নেই। আজকাল বাবা তাঁর জমিজমা ও ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। তার জেঠতুতো দাদারা কেউ কেউ তার চেয়ে উঁচু ক্লাশে পড়লেও হাতের কাছে সবসময় তাদের পাওয়া যায় না। তাই মাষ্টারনির্ভর ছাত্র নিজেকে এখন বেশ অসহায় বোধ করতে লাগল।

শান্তিপদ ছিল গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে। ঐ বয়সেই সে নানারকমের অং বং চং সংস্কৃত শ্লোক আওড়াত। দুরূহ ও শুদ্ধ বাংলা

প্রতিশব্দ বলে সে বাংলার মাষ্টার হেডপণ্ডিতমশাইকে তাক লাগিয়ে দিত। পরিমলের দখল ছিল বেশী ভূগোল আর ড্রইং-এ।

নীলুর দখল যে কোন বিষয়ে তা সে বুঝে উঠতে পারে না। তবে ইংরাজী আর অংকের ক্লাশ এলে সে বেশ খুশী হয়। মাষ্টারমশায়েরা যা জিজ্ঞেস করেন মোটামুটি সেগুলোর সে ভাল উত্তর দিতে পারে। মাষ্টারমশাই ক্লাশেই ছেলেদের বোর্ডে অংক কষতে দিতেন। পরিমল ও শান্তিপদ যে অংক পারত না, তা নীলু কষে দিতে পারত। তবে লম্বায় সে এতই ছোট ছিল যে, বোর্ড পর্যন্ত তার হাত বিশেষ পৌঁছাত না। সে নিয়ে সকলে হাসাহাসি করত।

আর ইংরাজীতে মোটামুটি দখল ছিল। বানান ভুল তার বিশেষ হত না। সাধারণ ছেলেদের অজ্ঞাত অনেক ইংরাজী শব্দের অর্থ সে জানত। একবার ইসকুল ইন্‌সপেক্টার পরিদর্শনে এসে তাদের শ্রেণীতে ছাত্রদের discipline শব্দটার মানে জিজ্ঞেস করেন। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে যথেষ্ঠ শক্ত প্রশ্ন বৈকি!

একমাত্র নীলুই বলেছিল অর্থটা আর সেই সঙ্গে নির্ভুল বানানটাও পরিদর্শক মহাশয় অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে নীলুকে বলেন—তুমি ডিক্‌সনারী দেখতে জানো?

নীলু ঘাড় নেড়েছিল। সে ডিক্‌সনারী খুলে ঐ শব্দটা ধরে দিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। শান্তিপদ ও পরিমলকে সেদিন লজ্জায় ঘাড় হেট করতে হয়েছিল। তারা ডিক্‌সনারী দেখা তখনও পর্যন্ত শেখে নি।

পরিদর্শক তখন নীলুকে প্রশ্ন করেছিলেন—Who is the first boy of your class?

নীলুকে বাধ্য হয়ে বলতে হয়েছিল—Sri Parimal Chandra Jana is the first boy of our class.

পরিদর্শক তখন জানতে চাইলেন পরিমল কার নাম। মাষ্টার-মশাইএরা দেখিয়ে দিলেন পরিমলকে। তিনি তারপর পরিমলকে মৃদু তিরস্কার করেছিলেন।

সেদিন নীলুর ধারনা হয়েছিল, সে ইংরাজীটা ওদের চেয়ে ভালোই জানে। কিন্তু বাংলায় সে মোটেই শান্তিপদের ধারে কাছে নয়। আর ড্রইং-এ তো তার হাতই নেই। সে যা আঁকে ড্রইং-এর মাষ্টারমশাই তার উপর ক্রশ চিহ্ন এঁকে দেন আর বলেন—কিচ্ছু হয় নি। কি আঁকলি নীচে লিখে রাখবি। না হলে বুঝব কি করে কি আঁকলি। এটা কি তোর গরু হয়েছে, হ্যাঁ রে গরু? এ যে গাধা হয়েছে বরং। কানটা একটু ছোট হলে তোরই মত দেখতে হত গাধাটা। তাই নীচে লিখে রাখবি। বুঝলি, হতভাগা গাধা?

এই বলে তিনি নীলুর চুলের মুঠি ধরে নাড়া দিতেন আর পরিমল আড়চোখে তাকিয়ে দেখত তাকে।

ড্রইং-এ তবু হয়ত কিছুটা করা যায় একটু সময় দিয়ে করলে। কিন্তু ভূগোল? হায়, হায় যত গণ্ডগোল তো ঐখানে। ও জিনিস কিছুতেই তার মনে থাকত না। ইতিহাস, বিজ্ঞানের পড়া মুখস্থ করলে তার বেশ মনে থাকে। কিন্তু ভূগোল যতই পড়ুক সে ক্লাসে পড়া দেবার সময় কিছুতেই তার মনে আসে না। এই ক্লাশে সে মার খেত না এমন দিন খুব কম গেছে। ভূগোলের মাষ্টারমশাই বেশ কড়া ছিলেন। পড়া না পারলেই মার দিতেন।

কোন জায়গা কিসের জন্য বিখ্যাত এতসব কি মনে রাখা যায় কখনও? নীলু মাঝে মাঝে বানিয়ে বানিয়ে বলত। কখনও লেগে যেত কখনও বা লাগত না। লাগত না বেশীর ভাগই।

একবার বুঝি ভূগোলের মাষ্টারমশাই ক্লাশে নীলুকে জিজ্ঞেস করলেন—বলতো লিভারপুল কিসের জন্য বিখ্যাত।

কোন কিছু মনে এল না নীলুর। যা থাকে কপালে, এই ভেবে চোখ বুজে নীলু বলে—ওখানে সকলের লিভার হয় বেশী। তাই—

ব্যস, আর বলতে হয়নি নীলুকে। ক্লাসসুদ্ধ সকসে প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ে আর ভূগোলের মাষ্টার মশাই বেত হাতে উঠে এসে খুব জোরে নীলুর পিঠে এক ঘা কষিয়ে দিয়ে বলেন—আর পুলটা?

নীলুর পিঠ জ্বলে যাচ্ছে কিন্তু তার চেয়ে বেশী সে লজ্জায় মরে

যাচ্ছে। ঐ অবস্থায় মাষ্টারমশাই তার চুলের মুঠি ধরে টেনে তার মুখটা তুলে ধরে বলেন—সেটা কি কেষ্টপুরের খাল পেরিয়ে তোর লিভারপুলে যাওয়ার জন্যে ?

তারপর থেকে নীলু ঠিক করে নিয়েছিল, না মনে থাকলে ক্লাশে আর মনগড়া কিছু বলে সকলের হাস্যাস্পদ হবে না। আরো অসুবিধা হত যে কোন্ জায়গা কোথায় তা দেওয়ালে টাঙ্গান ম্যাপে দেখিয়ে বলতে হবে। ম্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে সে অন্ধকার দেখত। তার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম দিকগুলো পর্যন্ত গুলিয়ে যেত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে শুধু ঘামত আর তখনই তার সেই চালু ছড়াটা মনে পড়ত :

'ইতিহাসে ইতিগজ ভূগোলেতে গোল,
বিজ্ঞানে অজ্ঞান আমি অংকে হরিবোল।'

কিন্তু পরিমল ও শান্তিপদ বেশ চট্‌পট্ দেখিয়ে দেয় কোন জায়গা কোথায়। সব মিলিয়ে ছবিটা দাঁড়াল এই যে ভূগোল আর ড্রইং-এ ওদের কাছে হারটা নীলু অংক ও ইংরাজীতে পুষিয়ে নিত।

ক্লাশের হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষায় নীলু ড্রইং-এ কোনরকমে পাশ করল, ভূগোলে ফেল। বাংলায় চল্লিশ। শান্তিপদ পেয়েছিল পঁচাত্তর ইংরাজীতে সব চেয়ে বেশী মার্ক অবশ্য সে-ই পেয়েছে। অংকে কিন্তু আশানুরূপ হয়নি। বেশী চঞ্চলতার জন্য যোগবিয়োগে ভুল করে অনেক প্রশ্নের উত্তরে ভুল করে এসেছিল। নম্বরগুলো দেখে শান্তিপদ ও পরিমলদের সমকক্ষ হবার ব্যাপারটা নীলুর কাছে যেন সুদূরপরাহত মনে হতে লাগল।

নীলু প্রায় হাল ছেড়ে দিল। তার রোল নাম্বার প্রথম তিনজনের মধ্যে কোনদিন হবে এ আশা আর তার রইল না। দুর্গাপুজার ছুটিতে সে মোটেই পড়াশোনা করল না। ঘরে তাগাদা মেরে পড়াবার মত কেউ ছিল না। আর পড়ে কি লাভ ? পাশ করলেই তো হল।

কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষা যতই কাছে আসতে লাগল ততই সে যেন ভয় পেল। না পড়লে পাশও করতে পারবে না, এ সন্দেহও মনে এল তার। পরীক্ষার দিন কুড়ি আগে থেকে নীলু ও রাসু খুব রাত জেগে

পড়াশুনা সুরু করে দিল। রোজই রাত দুটো আড়াইটা থেকে ভোর রাত পর্যন্ত তারা পরীক্ষার পড়া পড়তে লাগল। ভূগোলের কোন্ জায়গা কোথায়, কিসের জন্য বিখ্যাত, কোন জায়গার জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি কিরকম এসবের উপর জোর বেশী না দিয়ে সে ঋতু পরিবর্তন, ভূমিকম্পের কারণ এই সব প্রাকৃতিক অংশগুলো বেশী করে পড়তে লাগল যাতে ভূগোলে অন্ততঃ পাশটা হয়ে যায়। তাহলে কোনক্রমে প্রমোশন পেয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠতে পারবে। না হলে নির্ঘাত ফেল।

বার্ষিক পরীক্ষার তৃতীয় দিনে ছিল গণিত। নীলু পুরো উত্তরই করেছিল। কিন্তু সরল করার প্রশ্নের একেবারে শেষধাপে ভগ্নাংশের ভাগের জায়গায় লব, হর উল্টাতে ভুল করে উত্তরে ভুল করে ফেলল। তাতে বার মার্ক কাটা গেলেও অষ্টাশী মার্ক যে সে পাবেই, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ তার ছিল না। এতটা যে সে করতে পারবে তা ছিল তার ধারণার বাইরে।

সে বাড়ীতে এসে সানন্দে সে কথা বাবাকে বলায় বাবা তাকে অবাক করে দিয়ে ভৎ'সনার সুরে বললেন—বাকী বার মার্ক হল না কেন ? আমি তো কোনদিন নিরানব্বই-এর নীচে মার্ক পাই নি। প্রশ্ন যা সোজা এসেছে তাতে তোর ক্লাশের অনেকেই একশ' পাবে।

নীলু বেশ দমে যায়। ভূগোল পরীক্ষা দিয়ে আরো দমে যায় সে। ভূগোলে সে নির্ঘাত ফেল করবে বলে তার ধারণা হল। বাড়ী ফেরার পথে সে কাঁদতে লাগল। পরের দিন আবার ড্রইং পরীক্ষা। তাতে যে কি হবে সে তো জানেই।

সুহাস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—কোন চিন্তা নেই তোর। দু' সাবজেক্টে ফেল করলেও উপরের ক্লাশে তুলে দেয়। আমিও তো দু সাবজেক্টে ফেল করে ক্লাশ ফাইভ থেকে সিক্স-এ উঠেছি।

পরীক্ষার শেষে সুহাসের কথা মনে করে কিছুটা আশার আলো দেখতে পায় নীলু। ড্রইং আর ভূগোল ছাড়া আর কোন বিষয়ে সে ফেল করবে না। অতএব সে যে উপরের ক্লাশে উঠতে পারবে, এ আশা তার হল। পাশ ফেলের মাঝামাঝি একটা জায়গায় সে যেন

ঝুলতে রইল। তবু প্রমোশন পাওয়ার ক্ষীন আশা তার মনে জেগে রইল।

পরীক্ষার পর তারা বসন্তের টীকা নিয়েছিল। ডিসেম্বরের মধ্যেই পরীক্ষার ফল বেরুবে। যেদিন বেরুল সেদিন নীলুর জ্বরমত হয়েছিল ঐ টীকা নেবার জন্যই। তার বাম হাতটা ফুলে গিয়েছিল রাসু ও সুহাসের শরীরও ভাল ছিল না। তাই তিনজনের কেউ-ই সেদিন ইসকুলে যায় নি। দুদিন পরে নীলু, রাসু ও সুহাস তিনজনে বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে ইসকুলে গেল।

সেদিন ইসকুলে কোন ছাত্র আসে নি। মাষ্টারমশাই-এরা সকলে অবশ্য হাজির ছিলেন। ইসকুল ঘরের খড়ের চাল সারানো হচ্ছিল। বারান্দায় বসে হেডমাষ্টারমশাই মিস্ত্রিদের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

নীলু শুকনো মুখে হেড মাষ্টারমশাই-এর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি বলে উঠলেন—তুই তো ফেল করেছিস।

নীলুর মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরে উঠল। মুহুর্তের মধ্যে তার মনে হল, সে নির্ঘাত বাংলায়ও ফেল করেছে। আর উপায় নেই। স্থান কাল পাত্র ভুলে নীলু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

হেড মাষ্টারমশাই হাসিমুখে বলতে লাগলেন—আচ্ছা যা, দীঘি থেকে এক ঘটি জল নিয়ে আয় দেখি। তারপর বলছি তুই পরীক্ষায় কি করেছিস।

ইসকুল ঘরটা একটা প্রকাণ্ড দীঘির পাড়েই ছিল। দীঘি না বলে তাকে কৃত্রিম হ্রদও বলা যেতে পারত—এতই বড় ছিল দীঘিটা। দীঘির জলে নেমে নীলুর মনে হল, ফেল করলে সে এই দীঘির জলেই আবার ফিরে আসবে ঘটি নিয়ে নয়, কলসী নিয়ে। গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবে মরবে সে।

যাই হোক দুরুদুরুবক্ষে নীলু জলের ঘটি এনে হেডমাষ্টারমশাই-এর সামনে নামিয়ে রাখল। তারপর বলির পাঁঠার মত কাঁপতে লাগল।

নীলুর তখনও আশা, মাষ্টারমশাই হয়ত শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর ঘণ্টা বাজাবেন না। তাহলে সে তাঁর পায়ে পড়ে একবার শেষ চেষ্টা করে

দেখবে।

হেডমাষ্টারমশাই একটা পান মুখে পুরে সহাস্যে বলেন—তুই ফার্ষ্ট হয়েছিস।

নীলু তখন মাত্র দুটি শব্দের মধ্যে কোন একটি শোনার জন্য কান খাড়া করে আছে। সে শব্দ দুটি হল পাশ আর ফেল। তাই ফার্ষ্ট শব্দটার অর্থ সে মুহূর্তের মধ্যে যেন ধরতে পারল না। শুধু আকুল আগ্রহে জিজ্ঞেস করল—স্যার, আমি পাশ করেছি তো?

হেডমাষ্টারমশাই প্রচণ্ড শব্দে হাসেন। হাসি থামিয়ে বলেন—পাশ না করে কি তুই ফার্ষ্ট হয়েছিস? কি বোকা রে! এবার তোর রোল নাম্বার হবে এক।

এতক্ষণে নীলু যেন চেতনা ফিরে পায়। কিন্তু এই অভাবিত ঘটনার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তাব উত্তেজনা তখনও কমে নি। বুকের ভেতর সমান তালে তখন হাতুড়ি বেজে চলেছে। আনন্দের উত্তেজনায় সে হেডমাষ্টারমশাই-এর পা জড়িয়ে ধরে।

হেডমাষ্টারমশাই সস্নেহে বলেন—আরো ভালো করতে হবে। এম, ই-তে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে হবে তোকে। ভূগোল আর ড্রইং-এ একটু কাঁচা আছিস। ড্রইং-এ পাশ মার্কের চেয়ে মাত্র তিন মার্ক বেশী পেয়েছিস আর ভূগোলে কোনক্রমে পাশ। বৃত্তি পেতে হলে ও দুটোতেও ভাল করতে হবে।

নীলু তারপর আনন্দের আতিশয্যে ছোট্ট একটা গোশাবকের মত লাফাতে লাগল। রাস্থ তার ক্লাশে তৃতীয় হয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে উঠেছে। আর সুহাস ফেল করেছে। সে মাত্র দুটো বিষয়ে পাশ করেছিল। দুটোতে ফেল করলে তবু তার আশা ছিল। কিন্তু ও নিয়ে তার মনে বিন্দুমাত্র দুঃখ ছিল না। পাশ করে গেলে এ ইসকুলে সে আর আসতে পারবে না। যাওয়া-আসার পথের অমন মজা সে হারাত। তা আর হচ্ছে না। তাতেই সে খুশী। নীলু আর সুহাস এখন সহপাঠী।

ক্লাশের প্রথম ছাত্রটি হবার পর নীলুর মনে এক প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস এল। এই আত্মবিশ্বাসই তার ভবিষ্যতের অনেক সাফল্যের সোপান

রচনা করেছিল। সে যে পরিমল ও শান্তিপদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, এ দৃঢ় ধারণা তার মনে জন্মাল। সেই ধারণার ফলে সে ভাবতে লাগল, তাকে আরো ভাল হতে হবে, সব বিষয়েই ভাল হতে হবে। বৃত্তি পরীক্ষাতে তাকে আরো অনেক ভালো ভালো ছেলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে।

মনে পড়ল মলিন সেনের কথা। তিনি এই ইসকুলেরই ছাত্র ছিলেন। মাষ্টারমশায়েরা আজও গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে তাঁর কথা বলেন। নীলুর আশা, সে যখন এই ইসকুল ছেড়ে চলে যাবে তখনও যেন মাষ্টারমশায়েরা তার কথা এমনিভাবে মনে রাখেন। সে নিশ্চয়ই পারবে। সে তার আদর্শকে এখন পরিমল ও শান্তিপদের অনেক উর্দ্ধে মলিন সেনের পর্যায়ে তুলে ধরল, যিনি এম, ই-তে বৃত্তি পরীক্ষায় সারা বর্দ্ধমান বিভাগের মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন।

নীলুও বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছিল। সব বিষয়েই ভাল দিয়েছিল। কিন্তু ড্রইং-এ সে বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি! আঁকতে দেওয়া হয়েছিল একটা ফুলসমেত কচুরীপানা। মোটেই ভাল আঁকতে পারেনি সে। তখন ম্যালেরিয়া যে কতখানি মানুষকে গ্রাস করেছিল তার একটা স্বীকৃতি ছিল বৃত্তি পরীক্ষার ঐ প্রশ্নপত্রে।

নীলু বৃত্তি পায় নি। কিন্তু তার প্রস্তুতি ব্যর্থ হয় নি মোটেই। ষষ্ঠ শ্রেণীতেই সে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রদের চেয়ে উঁচু পর্যায়ে উঠে যেতে পেরেছিল। গোড়া থেকে এমন উঁচু মান বজায় থাকার জন্য উত্তর জীবনে সে ভারতের এক অতি প্রখ্যাত মহাবিদ্যালয়ে পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছিল।

আজ পুরানো কথা মনে এলেই নীলুর মনে পড়ে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের শ্রদ্ধেয় বাংলার মাষ্টারমশাই-এর কথা। নীলু তখন বাংলা সাবজেক্টে উজ্জ্বল ছাত্র। কলেজে বরাবরই সে এ বিষয়ে প্রথম হয়েছে। ইন্‌টারমিডিয়েটেও বাংলায় সে শতকরা পয়ষট্টি নম্বর পেয়েছিল। তখন তার মনে একবার চিন্তা এসেছিল, সে ইঞ্জিনিয়ারিং ডাক্তারী পড়বে না বাংলা নিয়ে এম, এ, পর্যন্ত পড়বে।

কলেজে পড়াবার সময় একবার বাংলার মাষ্টারমশাই একটা মুল্যবান কথা বলেছিলেন যার পরিপ্রেক্ষিতে নীলু তার পঞ্চম শ্রেণীতে প্রথম হবার ছোট ঘটনাটির সঠিক মুল্যায়ণ আজ করতে পারে। মাষ্টার মশাই ক্লাশে আদর্শ আর বাস্তবের মধ্যে পার্থক্যটা বুঝাচ্ছিলেন। তিনি বলেছিলেন—আদর্শ হল তাই যা মানুষ পেতে চায় আর বাস্তব হল, মানুষ যা পেয়েছে যা পাচ্ছে।

নীলু উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিল—স্যার, তাহলে মানুষ যদি সেই আদর্শকে সাধনার বলে করায়ত্ত করে তখন সেই আদর্শকে কি বলা যেতে পারে?

বাংলার মাষ্টারমশাই নীলাদ্রির প্রশ্নে খুশী হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন তখন সেটাই হবে বাস্তব। সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তখন তার আদর্শকে আরো উঁচুতে স্থাপন করবে এবং তাকেই আবার পেতে চাইবে। এই ভাবে আদর্শ যত উঁচুতে স্থাপন করবে এবং তাকেই আবার পেতে চাইবে। এইভাবে আদর্শ যত উঁচুতে উঠবে, মানুষের মনীষাও ততই উর্দ্ধে উঠবে। তাই আদর্শকে সব সময় অনেক বেশী উঁচুতে স্থাপন করতে হয়। মানুষের সাধনা হবে তাই নাগালের বাইরে-কে নাগালের মধ্যে আনা, সাধ্যাতীতকে করায়ত্ত করার সাধ্যমত সাধনা।

নীলু সেদিন তাই তার আদর্শকে উঁচুতে স্থাপিত করে অনেক উঁচুতে উঠে যাবার মত পথ পেয়েছিল। সে যুগে দু চারখানা গ্রামের মধ্যে দু'একজন বি, এ, পাশকরা লোকের দেখা পাওয়া যেখানে দুসাধ্য ছিল তখন প্রতিযোগিতামুলক পরীক্ষায় বসার প্রস্তুতি গড়ে তোলা বড় সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না।

অবশ্য এই শীর্ষগামী সোপানশ্রেণীগুলো বেয়ে ওঠার জন্য নীলুকে তার মাষ্টারমশায়েরা যথেষ্ট সাহায্যও করেছিলেন। সে যুগে শিক্ষকছাত্রের সম্পর্ক পিতাপুত্রেরও অধিক। তাঁদের সশ্রদ্ধ স্মৃতিচারণা আরো পরে এবং যথাস্থানে।

কিন্তু সোপানশ্রেণীর অনেক ধাপ অতিক্রমের দুরূহ কাজটা যে গদাধর মাষ্টার মশাই করিয়ে দিয়েছিলেন সে বিষয়ে নীলুর আজ কোন

সন্দেহ নেই। তিনি সব বিষয়ই জোর দিয়ে পড়িয়েছিলেন। বিশেষ জোর অবশ্য ইংরাজী ও অংকের উপরেই দিয়েছিলেন। এবং সেই বিশেষ জোরের কারণেই নীলু পঞ্চম শ্রেণীতে প্রথম হতে পেরেছিল। সে ঐ দুই বিষয়ে এত বেশী নম্বর পেয়েছিল যে সব মিলিয়ে সে-ই বেশী নম্বর পেয়েছিল। শ্রেণীতে প্রথম হওয়াটা বড় কথা নয়, বড় কথা নিজের সামনে আদর্শকে প্রথম মেলে ধরাটা। আর সেটা সম্ভব হয়েছিল গদাধর মাষ্টারমশাই-এর জন্য। নীলুর জীবনে তাঁর অসামান্য দানের তুলনা নেই।

একটা মেধাবী ছেলেকে গড়ে তুলতে সেকালে মাষ্টারমশাইদের প্রচেষ্টা আজ কল্পনাও করা যায় না। সেখানে ছিল না কোন অর্থের প্রশ্ন। ছিল শুধু টান, শুধু দরদ যা মানুষ শুধু জৈবিক কারণে আপন সন্তানের প্রতি অনুভব করে।

মনে আছে, বৃত্তি পরীক্ষায় বসার দুমাস আগে থেকে নীলু, পরিমল ও শান্তিপদকে বোর্ডিং-এ এসে থাকতে হয়েছিল। হেডমাষ্টারমশাইও তাদের সঙ্গে থাকতেন। চাকরীর বাইরে এই যে অতিরিক্ত পরিশ্রম, একি দরদ ছাড়া সম্ভব? তাঁদের কাছে নীলুর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

সমস্ত দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে ১৯৪৪ সালটা নীলুর জীবনে এক উল্লেখযোগ্য বছর।

পরের বছর—১৯৪৫-এ নীলু বৃত্তি পরীক্ষা দিল। পরীক্ষা দিতে কাঁথি যেতে হয়েছিল। হেডমাষ্টারমশাইও সঙ্গে ছিলেন তাদের। রসুলপুর নদী পেরিয়ে বাসে কাঁথি যেতে হয়েছিল। নীলুর জীবনে সেই প্রথম নদী ও শহর দর্শন।

যুদ্ধটা গত বছরই থেমে গেছে। ব্রিটিশ কতটা রাজত্ব করছে তার সব খবর শাপলা গাঁয়ে এসে পৌঁছায় না। তবে মশার রাজত্বে যে তারা দিনরাত্রি, মাস, বছর বাস করে যাচ্ছে এতে আর অস্বীকার করার কিছুই নেই। ঘরে ঘরে মশা, ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া। নগ্ন বালক বালিকাদের দিকে চাইলে বোঝা যায় ম্যালেরিয়ার কি দাপট। পেট গুলো যেন সব প্লীহার ভারে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় আর মাথাগুলোকে তারী বেমানান লাগে।

নীলু তখন ষষ্ঠ শ্রেণীতেই পড়ে। একবার কান্তি জেঠার কাছে নীলু শুনে অবাক হল যে কোলকাতায় নাকি মশা নেই। কিন্তু সারা কোলকাতাতে তখনও নাকি নিরন্ন মানুষের ভীড় লেগে রয়েছে।

কান্তি জেঠা মন্তব্য করতেন—মানুষগুলো সব কোলকাতায় গেছে আর মশাগুলো সব গাঁয়ে এসেছে!

মশার বড় আস্তানা ছিল কচুরীপানায় ভর্তি পুকুর ও ডোবাগুলোয়। নীলুদের গ্রামের এক ছেলে—প্রবোধ দা তখন হরিপুর হাই ইসকুলে পড়েন। তিনি গ্রামের সকলকে নিয়ে একবার কচুরীপানা পরিষ্কার করার কাজে মেতে উঠলেন। নীলুরাও স্বেচ্ছায় কয়েকদিন শ্রমদান করে এল। কিছুদিন আগে হরিপুরের এক মেলায় রমেন জেঠা এসে বায়স্কোপ দেখিয়েছিলেন। কিভাবে মশা তাড়াতে হবে তার অনেক ছবিই লোকে দেখেছিল। প্রথম কাজ হল পুকুরগুলোকে পরিষ্কার করা আর কচুরীপানাগুলোকে সার হিসাবে কাজে লাগান।

সবুজ সার কথাটা নীলু তখনই জেনেছিল। লোকে চেষ্টা তো করছেই মশা তাড়াবার। কিন্তু যাচ্ছে কই? মশাগুলো ব্রিটিশের মতই শক্ত ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। মশা আর ব্রিটিশ তখন সমানে রাজত্ব করে গেছে। প্রবোধ দা একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন—নীলু, ব্রিটিশ না গেলে মশা যাবে না। ব্রিটিশও যাবে, মশাও যাবে।

কিন্তু তখন কান্তি জেঠার কথা শুনে নীলুর মনে হত, কোলকাতার লোকেরা বেশ সুখে আছে। লোকে তো সব জায়গাতেই অনাহারে, অর্দ্ধাহারে থাকছে। অনাহারে থেকেও খালি পেটে চুপচাপ একটু শুয়ে থাকতে চাইলে মশা দেবে কেন? কোলকাতার লোকের অন্ততঃ সে কষ্টটুকু নেই।

যুদ্ধ থেমে গেছে। সাধারণ লোকে ভাবে স্বাধীনতা না আসুক খেয়ে পরে বাঁচার মত একটু সুখ আসবে। দেশে চাষবাস হচ্ছে। মানুষ ম্যালেরিয়ায় ভুগেভুগেও চাষ করছে। গ্রামের অর্দ্ধেক লোক শেষ। অতএব অর্দ্ধেক খাওয়ার লোকও নেই। ধান চাল পাওয়া যাচ্ছে কিছু কিছু। চালের দাম কমে গেলেও এখনও আকাশ ছোঁয়াই

রয়েছে। দাম বুঝি আট-দশ টাকা মন। কিন্তু আস্তে আস্তে বাজার থেকে কাপড়, চিনি, কেরোসিন উধাও হচ্ছে কেন? যুদ্ধ তো নেই। তবে যাচ্ছেটা কোথায়? কেউ বুঝতে পারে না।

যুদ্ধ নেই ঠিকই কিন্তু তার ফল বর্তমান। উৎপাদন যা হয়েছে সব শেষ হয়ে গেছে। মজুত কিছুই নেই। দেশের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে। উৎপাদন, যোগান আর সরবরাহের মধ্যে গুরুতর ফারাক্ ঘটে গেছে। এ সব সকলের জানার কথা নয়।

নীলুর মনে হয়, অনেক রোগে তারা ভুগেছে—কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, কত কি! কিন্তু সে সব রোগ আজ মহামারীরূপে দেখা দেয় না বা দেশের সকল মানুষকে একসঙ্গে বা সর্বক্ষন গ্রাস করে না। কিন্তু যুদ্ধের পর দেশে যে নতুন রোগের আমদানি হয়েছিল তা আজো যায় নি। এ শতাব্দীতে যাবে না। কোন শতাব্দীতে আদৌ যাবে কিনা সন্দেহ। সেই রোগটির নাম 'কণ্ট্রোল'। 'কণ্ট্রোল,-কে কণ্ট্রোল করে কোন ডাক্তারের সাধ্যি।

এ এমনই রোগ যা জাতির মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দিয়েছে। এই কণ্ট্রোলের দৌলতে সব কিছুই 'আন-কণ্টোলড, হয়ে গেছে। এই কণ্ট্রোলের গা বেয়ে আস্তে আস্তে সমাজ জীবনে ঢুকেছে কালোবাজারী দুর্নিতি ও মুনাফাবাজী। ক্রমে ক্রমে এই রোগগুলি আজ শতরূপে এবং নিত্যনূতন অভিনবরূপে পল্লবিত। যেমন, এই রোগ এনেছে কালোটাকা আর মজুতদারদের। আর মজুতদারীর চোরা গলিপথ বেয়ে এসেছে অতি মারাত্মক জিনিস—ভেজাল।

ভেজাল সম্বন্ধে আজ একটা কথাই প্রযোজ্য। তা হল, সব কিছুতে এত ভেজাল যে খাঁটিকে আমরা ভুলে গেছি। খাঁটি দেখলে আমরা এখন চিনতে পারব না. ভাবব এ বুঝি বড় রকমের ভেজাল। যুদ্ধোত্তর বছরের সেই কণ্ট্রোল রোগের দৌলতে আজ সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র সব জায়গাই ভেজালের বিষে বিষময়। এর হাত থেকে উদ্ধারের পথ বোধ হয় আর নেই। এখন যারা উদ্ধারের স্বপ্ন দেখেন তাদের বোধ হয় আক্ষেপ করা ছাড়া পথ নেই—

'দোষ কারো নয় গো, মা—
আমি স্বখাতসলিলে ডুবে মরি শ্যামা।'

মুলনীতিটা ছিল. বাজারে যদি কোন জিনিসের যোগানের স্বল্পতা দেখা যায় তবে জিনিসের দাম বাড়ে যদি চাহিদা একই থাকে। তাই ধনীলোকেরা ছাড়া ভোগ্যপণ্যের নাগাল সাধারণ লোক পায় না! সরকার তাই বাজার থেকে আইনের জোরে বাঁধা দরে জিনিস কিনে গুদামে মজুত করে। তারপর একটা বাঁধা দরে নির্দিষ্ট পরিমাণে সকলের মধ্যে বিতরণ করে।

সকলে প্রয়োজনের তুলনায় হয়ত কিছু কম পায় কিন্তু যেটা পায় সেটা অল্পদামেই পায়। আর লোকে যদি ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার কমিয়ে আনতে পারে বা বিকল্প ব্যবহারে অভ্যস্ত হয় তাহলে কারোরই বিশেষ অসুবিধা হবার কথা নয়।

সবচেয়ে বড় কথা হল, কণ্ট্রোলের নীতিটা হল দুর্ভিক্ষের নীতি। যা পাওয়া যাচ্ছে তাকে সকলকে ভাগ করে খেতে হবে। খেয়ে সকলকে বাঁচতে হবে। বাঁচার অধিকার সকলেরই আছে। এ অবশ্য সাদা-বাজারের নীতি।

কিন্তু সব কিছু যে কালোবাজারে চলে যাবে গোড়াতে অতটা বোধ হয় কেউ ভাবে নি। কালোবাজারীরা মুলতঃ ছিল মজুতদার। তারা ছিল সরকারী নীতিটার বেসরকারী রূপকার কিন্তু সরকারের মত শক্তিমান নয়। সরকার প্রয়োজনের সময় বাজার থেকে মাল কিনে নির্দিষ্ট দামে ছাড়ে।

মজুতদারেরা বাজার থেকে মাল কিনে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে তাদের খুশীমত দামে বাজারে মাল ছাড়ে। তফাত শুধু এই যে তাদের ক্ষেত্রে অভাবটা নিতান্তই কৃত্রিম।

এখন সকলে চিন্তা করে দেখুন সমস্ত রকমের ভোগ্য ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ক্ষেত্রে এই বেসরকারী কণ্ট্রোল চলছে কিনা। এখন প্রায় প্রতিটি জিনিসের ক্ষেত্রেই তিনটি জিনিস চক্রাকারে বছরের পর বছর ঘটে চলেছে —কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি, মুল্যবৃদ্ধি এবং স্থিতাবস্থা...।

গোড়ায় কিন্তু মজুতদারেরা সব জিনিসের উপর এমন কণ্ট্রোল চালাতে পারত না। বাজার থেকে সব মাল কিনে মজুত করে রাখার মত অত টাকাও তাদের ছিল না। সরকার কোন জিনিসের কণ্ট্রোল হাতে নিলে তাই প্রথম প্রথম ঐ জিনিসের দাম বাজারে মোটামুটি স্থির থাকত।

মজুতদারেরা তখন অন্য জিনিসে হাত দিত। এখন তাদের হাতে এত কালো টাকা যে সরকার বাজার থেকে জিনিস কেনার আগেই তারা কিনে নেয়। সরকারকেই তারা এক হাটে কিনছে, অপর হাটে বেচছে। দেশে তাই এখন ভোগ্যপণ্যের ব্যাপারে কতগুলো দৃশ্যমান সরকার আর কতগুলো অদৃশ্য সরকার তা বলা শক্ত।

১৯৪৫-এর সেই রোগ বাড়তে বাড়তে আজ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে? এখন খোদ সরকারই এ রোগের শিকার। সরকার কালো বাজারীদের মত বাজার থেকে মাল কিনতে ওস্তাদ না হলেও কালো-বাজারীদের মত দাম বাড়াতে ওস্তাদের উপরেই যান। আগে ব্যবসায়ীরা গমের দাম শতকরা তিন পয়সা বাড়ালে সরকার হৈ চৈ করতেন। কিন্তু সরকার নিজে যখনই যতবার দাম বাড়িয়েছেন তা প্রায় দশ থেকে কুড়ি শতাংশ করে। শুধু গমের ব্যাপারে নয় অন্য ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

তাই সুচতুর কালোবাজারীরা এখন অন্যপথ ধরেছে। তারা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে জিনিসের দাম বাড়ায় শতকরা একশ ভাগ। তারপর দেশের লোক এবং সরকার হৈ চৈ করলে তারা ভদ্রলোকের চুক্তি করে দাম শতকরা পঁচিশ ভাগ কমিয়ে আনে কিন্তু শতকরা পঁচাত্তর ভাগ দাম বাড়ানোই থাকে।

লোকে ভাবে—দাম কমল, আঃ! কি আরাম। সরকার ভাবেন বাব্বাঃ, বাঁচা গেল, দাম কমাতে পারা গেছে। আর কালোবাজারীরা গোঁফে তা দিতে দিতে আর ভুঁড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে ভাবে—অহো, কি মজাই না হল। বুদ্ধুলোগোঁকো মেওয়া মিল গয়া। সব চুপচাপ হ্যায়।

সরষে তেলের দামটাই ধরুন। ছ'টাকা কিলো থেকে বার টাকা হয়ে গেল। তারপর নয় থেকে দশের মধ্যে স্পিডোমিটারের কাঁটা ঘুরছে। ১৯৭৪ সালে কাঁটা তাই-ই আছে। ভবিষ্যতে কি আছে তা ভগবান জানেন না, 'কুতো বয়স্' ?

আমরা এই দাম বাড়ানো আর কমানোর খেলায় কি রকম বুদ্ধু বনে যাই, তার এক চমৎকার উদাহরণ দিই। পাহাড়িয়ারা সমতলে এসে তেল, নুন ও লকড়ি যোগাড় করে বিরাট বোঝা করে পিঠে বেঁধে উপরে ওঠে। একটা সময় আসে যখন উঠতে উঠতে তাদের মনে হয়, ফেলে দিই বোঝা। তখন তারা এক বিচিত্র পদ্ধতি অবলম্বন করে। ঐ ভারী বোঝার উপরে এক বিরাট পাথরখণ্ড চাপিয়ে নেয়। ফলে তারা আর প্রায় চলতে পারে না। ঐ অবস্থায় বেশ কিছুদূর হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে উপরে উঠতে থাকে। শেষে ফেলে দেয় পাথরটাকে। তখন বেশ হালকা বোধ হয়। আর তখন নবোদ্যমে উঠতে সুরু করে। আমাদের অবস্থা ঐ পাহাড়িয়াদের মত। তফাত শুধু এই যে, ভারী পাথরগুলো তারা নিজেরাই পিঠে চাপায় আবার পিঠ থেকে ফেলে দেয়। আমাদের ক্ষেত্রে চাপানো আর সবটা নয় কিছুটা তুলে নেওয়া হয়।

তাই বলতে হয়, রোগটা এখন অতি ব্যাপক আর সর্বগ্রাসী। এ রোগে এখন সবাই ভুগছে। আর তাই ক্রমে সরকার আর মজুমদারদের মধ্যে পার্থক্যটা ঘুঁচে আসছে। এর আরো কি চূড়ান্ত পরিণতি হতে পারে তা এখন ভাবাই যায় না।

পরের কথা থাক। আগের কথায়—সেই ১৯৪৫ এর কথায় ফিরে আসা যাক। তখন যুদ্ধ থেমে গেছে। দেশ স্বাধীন হয়নি। কিন্তু দেশে কর্ডোল চালু হয়েছে। প্রত্যেকটা ইউনিয়নে একটা করে ফুড কমিটি গঠিত হয়েছে। সরকারী গুদাম থেকে মাল কিনে এনে যারা সরকার নির্দিষ্ট দরে বেচবেন তাঁরা হলেন 'ডীলার'। রেশন কার্ডের কথা তারা সেই প্রথম জানল। কিন্তু রেশন কার্ডের মাধ্যমে এত নগণ্য পরিমান জিনিস মেলে যে তাতে কারোর অভাব মেটে না।

চিনির জন্য লোকের তত হাহাকার ছিল না। গ্রামের শতকরা এক ভাগ লোকও চা খেত না। অতএব ওটা না হলেও চলত। শংকরীপ্রসাদ তখন ছিলেন ফুড কমিটির সেক্রেটারী। তাঁর হাতেই ছিল চিনি, কেরোসিন ও কাপড় বিলি বণ্টনের ভার। মাঝে মাঝে নীলুদের বাড়ীতে মিটিং বসত কমিটির। নীলু দেখত এই বিলি ব্যবস্থা নিয়ে সদস্যদের মধ্যে প্রচুর ঝগড়া ও কথা কাটাকাটি হত।

শংকরীপ্রসাদ চা খেতেন। উপস্থিত সকলকে ভদ্রতার খাতিরে চা দিতে হত। তাই ফুড কমিটির সেক্রেটারী হলেও প্রায়ই তাঁর বাড়ীতে চিনি বাড়ন্ত হত। তখন মাঝে মাঝে গুড় দিয়ে চা খেতে হত।

অনেক কষ্টে কেরোসিন তেল যোগাড় করতে হত। গরীবদের বাড়ীতে এখন বিকালেই রাতের রান্নাবান্না সেরে ফেলা হত। আর সন্ধ্যের আগেই রাতের খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলা হত রাতে কেরোসিন বাঁচাবার জন্য। নীলু দেখেছে, অনেকে সে সময় রাতে চাঁদের আলোতে ভাত খাচ্ছে।

সব চেয়ে খারাপ অবস্থা গেছে কাপড়ের। বাজারে দাম দিলেও কাপড় মেলে না। রেশন কার্ডে যে কাপড় দেওয়া হত তা ছিল কিছু থান কোরা কাপড় আর মেয়েদের ফ্রক বা জামার মত কাপড়। সধবা মেয়েদের পরার মত কাপড় পাওয়াই যেত না। রমলা ঐ থান কাপড়ের নীচে পুরান শাড়ীর পাড় সেলাই করে পড়তেন। অনেক মেয়েই সে সময় তাই করেছে। আশেপাশে কোন কোন মেয়ে লজ্জা নিবারণ করতে না পেরে আত্মহত্যাও করেছে বলে শোনা গেছে।

নীলু রাসুরা ঐ কন্ট্রোলে পাওয়া মেয়েদের ফ্রকের ছিট দিয়ে জামা বানিয়ে সেগুলো পরে ইসকুলে গেছে, মনে আছে।

সর্বত্রই হাহাকারে ভরে গেছে। নীলু আপন গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে চারিদিকে শুধু কষ্ট আর হাহাকারই দেখে গেছে। শহরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে খবর তার কাছে পৌছায় নি।

অবশেষে সে খবরও একদিন পৌছাল তার কাছে। কিছু পরেই এল সে খবর। ঐ বছর কোন এক সময় সুন্দরবন থেকে সীতেশ দা

এলেন। তাঁর সঙ্গে এলেন সুন্দরবনের এক ভদ্রলোক। তিনি ভালো গানবাজনা জানতেন। নীলু তাঁকে বলত তারক দা।

তারক দা একদিন নীলুদের বাড়ীতে এসে কোলকাতার সেই হাহা-কারের গান গেয়ে শোনালেন—

'ক্যালকাটা নাইন্‌টিন ফর্টি থ্রি অক্টোবা'—

*   *   *

খানিকটা নীল আর খানিকটা ছাই
চলে A R.P
খাঁকি হ্যাট্, কোট, প্যাণ্ট নেকটাই
ছোটে মিলটারী।
লাখে লাখে লোক জমেছে কলিকাতায়,
ভিখিরীরা নোংরা করে রাস্তা চলা দায়।
'একটি পয়সা দাও গো বাবু'.
যখন তারা বলে,
বাবুরা দেয় মুখঝাম্‌টা,
পঁক্ পঁক্ পঁক্ মোটরগাড়ী
যখন জোরে চলে
কত লোকে হলো ব্যাং-চ্যাপ্টা ॥'

সুন্দর গাইছে তারকদা. নীলু তন্ময় হয়ে শোনে। অবাক হয়ে ভাবে, অভাব, অনটন অসুন্দর সব জায়গাতেই ছড়িয়ে গেছে—গাঁয়ে গঞ্জে শহরে—সর্বত্র।

তবু মহাজীবন থেমে নেই. মহাজীবন বইছে। কিন্তু বড় ধীর গতিতে যেন বইছে। স্বাধীনতার রঙীন আলোর বন্যা এসে কি তাদের কোনদিন ভাসিয়ে দেবে না? অন্ধকারেই কি তাদের জীবনও শেষ হয়ে যাবে? জাতির জীবনের মহাউত্তরণ লগ্ন কি এখনও অনেক দূরে? কত দূরে?

কে জানে!

॥ ২২ ॥

এলো ১৯৪৬ সাল। নীলু হরিপুরের হাই ইসকুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হল। রাসু ভর্তি হল ষষ্ঠ শ্রেণীতে। পরিমল ও শান্তিপদও এই ইসকুলে এসে নীলুর সংঙ্গে ভর্তি হল। তিনজনের কেউই এম, ই-তে বৃত্তি পায় নি।

হরিপুর ইসকুল অনেক বড়। ইসকুল ঘরটার দেওয়াল ইটের কিন্তু সব নোনাধরা। চাল কিন্তু খড়ের। এককালে কোনসময় মেঝেটা পাকার ছিল কিন্তু এখন আর তা বোঝার উপায় নেই। ইসকুলের পরিসীমার মধ্যে একটা ছোট অথচ সুন্দর পুকুর রয়েছে। সেই পুকুরে রয়েছে একটা বাধান ঘাট। পুকুরের ওপারে বোর্ডিং। সেটা মাটির ঘরই।

এ ইসকুলের ছাত্রসংখ্যা অনেক বেশী। মাষ্টারমশায়েরাও সংখ্যায় অনেক বেশী। এ ইসকুলে মোট ছটা শ্রেণী। এটি বহু পুরান ইসকুল পাঁচ মাইলের মধ্যে হাই ইসকুল বলতে হরিপুরের এই হাই ইসকুলটি। এই ইসকুলে শংকরীপ্রসাদও পড়েছেন। আগে এ ইসকুলে কত কত বার নীলু এসেছে। কিন্তু সে আসা আর এ আসা এক নয়।

নীলু জানে তাদের গাঁয়ের পূর্ণেন্দু কাকার দাদা রবীন কাকা এই ইসকুলে পড়ান। তিনিই শাপলা গাঁয়ের মধ্যে একমাত্র বি, এ, পাশ। আর একজনের নাম সে খুব শুনেছে। তিনি হলেন সুবীর মান্না। হরিপুরেই বাড়ী তাঁর। এই ইসকুলেরই প্রাক্তন ছাত্র তিনি। নানা অভাব অনটনের মধ্যে তাঁকে পড়াশুনা করতে হয়েছে। সে সময় শংকরীপ্রসাদ সুবীর বাবুকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। সুবীর বাবু সেজন্য শংকরীপ্রসাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন। নীলু তাঁর নামটাই শুনেছে কিন্তু তিনি কি পড়ান বা দেখতে কি রকম তা নীলু তখনও পর্যন্ত জানত না।

নীলুর জেঠতুতো দাদারাও এই ইসকুলে পড়ে। নীলুর মেজজেঠার ছেলে চিত্তরঞ্জন আর সেজ জেঠার ছেলে শ্রীকান্ত এই ইসকুলের অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। বড়দা চিত্তরঞ্জন নীলুর চেয়ে অন্ততঃ ছ' বছরের বড় আর শ্রীকান্তদা পাঁচ বছরের বড়। তাহলেও তারা নীলুর চেয়ে মাত্র এক ক্লাশ উপরে পড়ত। এর কারণ বোধ হয়, তারা দেরী করে পড়া-শোনা সুরু করেছিল আর বন্যা ও মহামারীর জন্য তাদের দু' এক বছর নষ্ট হয়ে থাকবে।

নীলু শুনেছে, সপ্তম শ্রেণী থেকে তার বড়দা ও শ্রীকান্ত দা যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় হয়ে অষ্টম শ্রেণীতে উঠেছে। নীলুর আরো দু'তিন জন জেঠতুতো দাদা মনোরঞ্জন, কালীরঞ্জন ও রমাকান্ত বোধ হয় ঐ একই কারণে নীলুর চেয়ে এক দু ক্লাশ নীচে পড়ত। এ ছাড়া প্রবোধ দা আরো অনেকে চেনাজানার মধ্যে এখানে রয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও নীলু প্রথম দিনে যেন বিশেষ কোথায়ও পাত্তা পাচ্ছে না। ঘনিষ্ঠ পরিচিতের মধ্যে একমাত্র সুহাসই যা রয়েছে। সেও কেষ্টপুরের এম, ই, ইসকুল থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাশ করে এখানে এসেছে। সুহাস কয়েকদিন আগেই ভর্তি হয়েছে।

শংকরীপ্রসাদ ছিলেন এই ইসকুকের পরিচালক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। ইসকুলে ভর্ত্তি করার দিন তিনি নীলু ও রাসুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে ক্লাশে ঢুকিয়ে দিয়ে গেলেন। সপ্তম শ্রেণীতে তখন পড়াচ্ছিলেন পূর্ণেন্দু কাকার ভাই রবীন কাকা। শংকরীপ্রসাদ ক্লাশে ঢোকার দরজায় দাঁড়াতেই রবীনকাকা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

শংকরীপ্রসাদ বললেন—রবীন, ভাই, নীলু আজ ভর্তি হল। দেখো ওকে।

রবীনকাকা ঘাড় নেড়ে সহাস্যে বলেন—হ্যাঁ দাদা, কোন চিন্তা নেই।

শংকরীপ্রসাদ তারপর অফিস ঘরের দিকে চলে গেলেন নীলুকে অসহায় অবস্থায় রেখে। ক্লাশ একেবারে ভর্তি। তিনি চারদিন হল সুরু হয়েছে।

রবীনকাকা ক্লাশের ভেতর চোখ বুলিয়ে বলেন—সামনে তো জায়গা নেই। তুই ঐ পেছনের দিকে গিয়ে বোস। তুই যা বেঁটে-রে দেখতে পাবি তো? আচ্ছা এখন তো যা পেছনে।

ক্লাশসুদ্ধ সকলে রবীনকাকার কথায় হেছে ওঠে। নীলুর তখন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করে।

ঐ অবস্থায় চেয়ে দেখে সামনের বেঞ্চিতে এক গৌরকান্তি সুন্দর চেহারার লম্বা ছেলে তাকে উদ্দেশ্য করে বলে—নীলাদ্রি তুই আমার পাশে বোস। একটু চেপে বসলে ঠিক হয়ে যাবে।

নীলু ছেলেটির কথায় অবাক হয়। সে একে কোনদিন দেখেছে বলে মনে হয় না। কিন্তু ছেলেটির তার নাম জানল কেমন করে? মুহর্তের জন্য তার দ্বিধা জাগে মনে। এমন সময় পেছনের বেঞ্চিতে বসা সুহাসের দিকে তার চোখ পড়ে। সুহাস তাকে চোখ টেপে। নীলু আর কোনদিকে না তাকিয়ে আস্তে আস্তে সুহাসের দিকে এগিয়ে যায়। রবীনকাকা বোর্ডের দিকে মুখ ঘুরিয়ে পড়াতে সুরু করেন। বোর্ডের উপর লিখে তিনি বলে যান—

$2a+3a=5a$ বুঝলে তো?

কিন্তু $2a+3b=2a+3b$ ই হবে।

নীলু অবাক হয়ে ভাবে, এ কেমনতর যোগ আবার? 'a, আর b'তো অক্ষরে যোগ হবে কি করে? ওগুলো তো আর সংখ্যা নয়। নীলু নিদারুন ঘাবড়িয়ে যায়। ঐ পিরিয়ডের বাকী পড়াগুলো তার মাথায় ঢুকল না।

ক্লাশ শেষ হতেই তার মন খারাপ হয়ে যায়। বীজগণিত বুঝতে না পেরে অবুঝের মত তার কান্না পায়। সহসা তার খেয়াল হয়, দাদাদের কাছে জেনে নিলে হবে। কথাটা ভেবে সে মনে বল পায়। কিছুটা শান্ত হয় সে।

পরের পিরিয়ডে ছিল সংস্কৃত। সংস্কৃতের সেদিন প্রথম ক্লাশই হচ্ছে। ক্লাশে পড়াতে যে মাষ্টারমশাই ঢুকলেন তাকে মোটেই মাষ্টারমশাই বলে মনে হচ্ছে না। বরং একজন পুরোহিত ব্রাহ্মাণ

বলেই মনে হচ্ছে। তার পরনে হাঁটুর উপর তোলা মোটা কাপড় ঊর্ধাঙ্গে একটা উত্তরীয়। কিন্তু সেটি দিয়ে তার ঊর্ধাঙ্গের অল্পই ঢাকা পড়েছে। গলায় শুভ্র উপবীত দৃশ্যমান। শিখায় বাঁধা ফুল আর কপালে চন্দন। নগ্ন পদ দুখানি। গায়ের রং সোনার মত উজ্জ্বল। বয়স বোধ হয় পঞ্চাশের কাছাকাছি।

রোলকলের সময় ছাত্রেরা সকলে Yes Sir বা Present Sir বলে নিজেদের উপস্থিতি ঘোষণা করছে। নীলুর হাসি পেল। সে সে ভাবে, একে Sir না বলে ভটচায় মশায় বললেই যেন মানায়।

নীলু সুহাসকে ফিসফিস করে প্রশ্ন করে—তুই একে চিনিস?

—হ্যাঁ খুব চিনি, সুহাস বলে—ওর নাম তো ভুবন মিশ্র। কাব্য তীর্থ পাশ; ইংরাজী জানে না। দাদার শ্বশুরবাড়ীতে তো পূজো করে।

নীলুর এতক্ষনে ধারণা হয় ব্যাপারটার। উনি পুরোহিত ব্রাহ্মণ হলেও ক্লাশে তো মাষ্টারমশাই-ই। অতএব এখানে Sir বলাই বিধেয়।

ভুবন মাষ্টারমশাই সুন্দর করে প্রত্যয় ও বিভক্তি বুঝালেন। তার-পর বুঝালেন, শব্দের অন্তে বিভক্তি যুক্ত হলে কিভাবে শব্দের চেহারা আর অর্থও বদলিয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন, বিভক্তি যুক্ত পদগুলো একেবারে মুখস্ত না রাখলে সংস্কৃত শেখার উপায় নেই। তিনি 'নর' শব্দের রূপ বলে গেলেন। পরের ক্লাশের জন্য ওটিই পড়া রইল।

নীলুর বেশ ভাল লাগল পড়ানোটা। সে মন দিয়ে এই দেব-ভাষাটিকে রপ্ত করবে বলে মনে মনে ঠিক করে। নিশ্চয়ই পারবে। তার মেজজেঠা সংস্কৃতে পণ্ডিত। দাদারাও সংস্কৃতে শতকরা ৮০ থেকে ৯০ এর মধ্যে নম্বর পায় বলে শুনেছে।

আরো গোটা দুয়েক কি ক্লাশ হল যেন। তারপর টিফিনের ঘণ্টা বাজল। টিফিনের বিরতিতে টিফিনের কোন ব্যবস্থা নেই। শুধু একটু ক্লাশঘর ছেড়ে বাইরে ঘুরে বেড়ানো। নীলু সুহাসের সঙ্গে ক্লাশঘর ছেড়ে বেড়াতে যাবে এমন সময় সামনের বেঞ্চির সেই সুন্দর চেহারার ছেলেটি সামনে এসে বলল—আয় আমার সাথে, কথা আছে।

নীলু আরও অবাক হয়। ছেলেটা বলে কি? কৌতূহলী হয়ে সে ছেলেটার পেছনে যায়। পুকুরের পাড়ে এসে তারা দাঁড়াল। ছেলের দল তখন দূরে হৈ-হল্লা করছে। নীলু সেদিকে চেয়ে মনে বলে—বাপরে, কত ছেলে! সেই ছেলেটি বলে—তুই আমাকে চিনিস না, আমি তোকে খুব চিনি।

—কি করে? নীলুর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

—বাঃ, তোর গদাধব মাষ্টার তোর কথা কত বলেছে আমাদের, উজ্জ্বল হাস্যে ছেলেটি বলে—গদাধর মাষ্টারের বাড়ী তো আমাদের বাড়ীর পাশেই। তুই তো বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছিস। ক্লাশ ফাইভে ফাষ্ট' হয়েছিলি, তাই না?

নীলু নতমুখে জলের দিকে চেয়ে শুধু ঘাড় নাড়ে। সহসা তার খেয়াল হয় ছেলেটির পরিচয়ও তার জানা দরকার।

সে তাই প্রশ্ন করে—তোর নাম কি? তুই কি ক্লাশ ফাইভ থেকেই এই ইসকুলে পড়াশুনা করে আসছিস?

ছেলেটি বলে—আমার নাম হরিনারায়ন পণ্ডা। আমাকে নারা'ন বলে সকলে। তুইও তাই বলতে পারিস। আমি গোড়া থেকেই এ ইসকুলে।

নীলু উজ্জ্বল চোখ মেলে নারানের দিকে তাকিয়ে বলে—ও, তুই-ই নারায়ন? তোর কথাও আমি দাদাদের কাছে কত শুনেছি। তুই তো বরাবর ফাষ্ট' হচ্ছিস।

চোখে কৌতুক ফুটিয়ে নারায়ন বলে—এবারে আর হতে পারব না।

—কেন?

—তুই এলি। এবারে তুই-ই ফাষ্ট' হবি।

নীলু লজ্জা পায়। প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলে—না, না, তুই-ই হবি।

—না রে না, তা হবে না! তুই যে কত ভাল ছেলে সে তো তোর গদাধর মাষ্টারই কতবার বলেছে আমাদের। কি বলেছে জানিস? আমরা তোর পায়ের নখেরও যোগ্য নই।

নারায়ন কথা শেষ করে হাসতে থাকে। নীলু লজ্জায় তার দিকে

চোখ তুলে তাকাতে পারে না। গদাধর মাষ্টারমশাইয়ের উপর তার কেমন এক রাগ হয়। তিনি নীলুকে আজও ভালোবাসেন, সত্যি কথা। কিন্তু এসব বলে তিনি নিজে তো ছোট হয়েছেনই আর নীলুকে কিরকম বিড়ম্বনায় ফেলেছেন।

কথা আর বেশী এগোয় না। বিরতি অবসানের ঘণ্টা বেজে ওঠে। নারায়ন সহজ সুরে বলে – তুই রাগ করলি না তো আমার কথায় ?:

নীলু তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—না, না, রাগ করবো কেন ? আমি তো কি কিছু বলি নি তোকে। এসব বাজে কথা। আমি তোর কথা অনেক শুনেছি। তুই-ই ফার্ষ্ট হবি।

ক্লাশে ফিরে আসতে নীলু ভাবে, এটি হল গদাধর মাষ্টারমশাই-এর পরোক্ষ শাসন। আর সে শাসন না মেনে উপায় নেই। পঞ্চম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার পর থেকে সে মনে গদাধর মাষ্টারমশাই-এর কাছে কৃতজ্ঞ। প্রথম তার আশা পূর্ণ করতে না পারলে নিজেকে না হোক, তাকে ছোট করা হবে।

সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, মাষ্টারমশাই-এর আশা পূর্ণ করার আপ্রান চেষ্টা করে যাবে। সেইসঙ্গে এক নিদারুন অপরাধজনিত লজ্জাবোধও এলো তার মনে এই ভেবে যে, এই মাষ্টারমশাইকে একদিন যে বিদ্রোহী হয়ে তাড়াতে চেয়েছিল। অনুশোচনায় জ্বলতে জ্বলতে নীলু ক্লাশে ফিরে আসে।

কিছুদিন পরে ইসকুল নীলুর বেশ ভাল লেগে গেল। বাড়ী থেকে বেশী দূর নয়। এখন বরং শান্তিপদ ও পরিমলদের কেষ্টপুর থেকে রোজ মাইল তিনেক পথ হেঁটে হরিপুরের ইসকুলে আসতে হচ্ছে।

তারপর এই ইসকুলে আসার পথটা ঘন ছায়ায় ঢাকা। রাস্তার ধারে লোকবসতিব অভাব নেই। বৃষ্টি এলে পথের পাশের কোন ঘরে আশ্রয় নেওয়া যায়। কিন্তু কেষ্টপুরের ইসকুলে যাবার পথে যে উপায় তাদের ছিল না! বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস বইলে ছাতাও মেলান যেত না। সারাপথ অসহায় কাকেব মত ভিজতে ভিজতে পথ চলতে হত।

তাদের গ্রাম ছাড়িয়ে কিছুটা পথ ফাঁকা মাঠের মাঝ দিয়ে।

তারপরেই পড়ে হরিপুর গ্রাম। রাস্তা তখন মাটিরই ছিল। হরিপুরে ঢুকে একটু গেলেই পড়ত খাসমাহাল। তার আগে পড়ত ঘন বাঁশবন পথের দু-পাশে প্রায় দু ফার্লিং জুড়ে। এ জায়গাটা বছরের সব সময় ছায়াঢাকা থাকত।

এখানটা পার হবার সময় নীলুর ভারী আনন্দ হত। মনে হত যে যেন ছোটবেলায় করবীগাছের ঝোপের নীচে বসে কল্পনার চোখে দেখা সুদূর আফ্রিকার অরণ্যের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছে। পথের একপাশে ছিল একটা পুকুর। তার জল গহণ কালো। বাঁশবনের কালো কালো ছায়ার রং পুকুরের জলে মিশে গিয়ে জলের রংটাকেই কালো করে দিত। পুকুরের অপরপারে দাঁড়িয়ে আদ্যিকালের সেই শিরীষ গাছটা যেটাতে হনুমান ভূত থাকে বলে ঘাটমাঝি পদ্মলোচন কতবার তাদের কাছে গল্প বলেছে।

ভূত যে ঐ গাছে কোনদিন দেখে নি। পদ্মদার সে সব গল্প এখন সে বিশ্বাসও করে না। ওগুলো যে সব বানিয়ে বলা এটা বুঝতে এখন তার কষ্ট হয় না। তবু কোনদিন ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেলে কেন যে বাঁশবনটা দ্রুত পার হবার জন্য পায়ের গতিকে সে ক্ষিপ্র করে তা বুঝে উঠতে পারে না। দিনের বেলায় যে পথ দিয়ে যাবার সময় যে পদ তার মন্থরগতিতে চলে, সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে কেন সেই পদ তার চঞ্চল হয়ে ওঠে, কে জানে ?

আসলে ওটা ছিল এক সংস্কার। যুক্তি দিয়ে সংস্কারকে তাড়ানো বড় কঠিন কাজ। নীলু বোঝে সে কথা। তবু এটা সে স্বীকার করে এ শিরীষ গাছের সোজাসুজি এলে রক্তে তার চঞ্চলতা বাড়ে। আর এখন আপন পায়ের গতি নিয়ন্ত্রণ করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। তবু সে স্বীকার করে, এ ভয়ের মধ্যেই আনন্দ মিশে রয়েছে।

সে তার অনুভব শক্তিকে তীব্র করে বুঝতে পারে, উন্মুক্ত আকাশের নীচে ফাঁকা মাঠেব উপর দিয়ে যেতে রয়েছে আনন্দ, আবার যে বন-পথে যেতে হলে আকাশ দেখা যায় না সেখানেও রয়েছে আনন্দ। আবার দিনের আলোয় নির্ভয়ে যেখানে যেতে রয়েছে আনন্দ, ঠিক

সেই পথে জোনাকজ্বলা সন্ধ্যার নরম অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে না গেলে আনন্দ থেকে বঞ্চিতই হতে হয়।

যে বয়সটা শুধু আনন্দই পেতে জানে সে বয়সে সব কিছুতেই আনন্দ জাগে। নীলুর ডাগর তন্দ্রালু চোখে আনন্দের বন্যা খেলে বেড়ায় দিনরাত।

এই পথে যেতে যেতে সে নিজের কবি ও প্রেমিক সত্বাকে খুঁজে পায়। সে উপলব্ধি করে ভালোবাসাতে যেমন আনন্দ তেমনি আনন্দ রয়েছে বিচ্ছেদের বেদনা সইতে। তার এই তেরো বছরের কিশোর কবি প্রাণ এই পথ দিয়ে যাবার সময় বিরহ মিলনের দোলায় দুলতে থাকে। বাঁশের ছায়া যখন পুকুরের জলে হেলে দুলে খেলে বেড়ায়, নীলু ক্ষনিকের তরে নিজেকে ভুলে সেদিকে তাকাবেই। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে কেমন করে জলের উপরে ছায়াগুলো আলো-আঁধারির খেলা খেলে চলেছে। বাঁশের ডগাগুলো যখন বাতাসে নীচু হয়ে পড়ে তখন তাদের ছায়াগুলো ঘন হয়ে পড়ে জলের উপর। আর তাই তখন জলটা আঁধার-কালো বলে মনে হয়। আবার যখন একই বাতাসে ডগাগুলো উপরে উঠে যায় তখন ছায়াগুলো সরে যায়। জলের উপর তখন আলোর বন্যা বয়ে যায়।

নীলু তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে, তার মনের মধ্যেও বইছে একই প্রাণের বাতাস। সেখানেও চলেছে নিত্যদিন বিরহ-মিলনের আলো-আঁধারি খেলা। মনে হয়, কাকে যেন ভালোবেসেছিলাম, সে আনন্দ প্রাণে আজো বাজে। সে আজ কাছে নেই, কোনকালেও থাকবে না। তবু তার বিরহে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আনন্দও বেজে ওঠে। নীলু এখানে এলে তাই কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক হয়ে যায়। এ পথকে সে তাই ভালো না বেসে পারে না। আর তাই, এ পথ দিয়ে যে ইসকুলে সে যায়, তাকেও সে ভালো না বেসে পারে না।

ভূত সে এখানে না দেখুক, কিন্তু দেখেছে শেয়াল, নেউল আর মাঝে মাঝে বিষধর কেউটে সাপ। এগুলো দেখতেই বা আনন্দ কম কিসে? এগুলো তার কাছে এক ভয়াল আনন্দ!

পুকুরটা ছাড়িয়ে পথের ধারে হিজল গাছটার কাছে এলে তার মনে ভাসে সুন্দরবনের ছবি। অদেখা সে ছবি, কিন্তু অস্পষ্ট নয় মোটে। যে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে জানে, সে কল্পনার চোখেও সার্থকভাবেই দেখতে পায়। যে জানে না প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ অনুভব করতে, সে চোখে দেখেও দেখতে পায় না। নীলু সুন্দরবনের ছবিটা স্পষ্ট দেখতে পায়। সেখানেও রয়েছে হিজল গাছের ছড়াছড়ি, সেখানে রয়েছে এমনি ভয়াল আনন্দ। হিজল গাছটার পাশ দিয়ে যাবার সময় তার সুন্দরবনের কথাই মনে হয় তাই।

একটু পরেই খাসমাহাল ও তারপর কিছুটা পথ আবার ফাঁকা মাঠের মাঝ দিয়ে। ফাঁকাপথে এলে তার মনে হয় সে বুঝি বনভূমি ছাড়িয়ে জনপদে এল বা সুন্দরবন ছেড়ে দেশে এল।

এই হিজলগাছের কাছে এলে তার মনের পর্দায় অনিবার্যভাবে ভেসে ওঠে একটা মুখ সে মুখ রাধার। মনে পড়ে যায়, রাণী এখন সুন্দরবনে। সেও হয়ত এমনিই এক হিজল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রয়েছে যেখানে আকাশটা ভালোবেসে গাছ-পালা, ঘরবাড়ীকে জড়িয়ে ধরেছে। সেদিকে চেয়ে সে হয়ত নীলুর কথা ভাবে। ভাবে তার ফেলে আসা গ্রাম, সাথী আর মধুর দিনগুলোর কথা। অকারনে হয়ত তার চোখে জল আসে। হয়ত বা আসে না। হয়ত বা সে মোটেই ভাবে না। হয়ত সে এখন মাঠে তার কর্মরত স্বামীর জন্য পান্তাভাত নিয়ে যাচ্ছে কিংবা অবাধ্য পলাতক গরুটাকে ধরার জন্য বনের ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে। এমন অনেক কিছু হতে পারে।

কিন্তু নীলু এখানে এলে তো রাণীর কথাই ভাবে। ভাবে রাণীর সঙ্গে তার সেই ফেলে আসা দিনগুলোর কথা—সেই ছোট পণ্ডিত মশায়ের বাড়ীর সামনের সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটার কাছ দিয়ে শীতের সন্ধ্যায় রাণীর দেহের সঙ্গে দেহ মিশিয়ে আসার সময় রাণীকে নিয়ে চীনের তুষারগলা পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার স্বপ্নের কথা বা ঝড়ের রাতে রাণীর দেহের সেই সৌগন্ধের কথা। নীলু ভাবে আর কি এক আনন্দে তার সারা শরীর চনমন করে ওঠে।

পরক্ষনেই আবার মনে হয় সে সব ছিল অনেক অবাস্তব, আকাশ কুসুম কল্পনা। রাণীর দেখা আর পাওয়া যাবে না কোনদিন। রাণী চিরদিনের জন্য তার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে।

আবার ভাবে, তাও তো নয়। তাকে চোখের নাগালে দেখা বা পাওয়াই কি সব ? এই যে এখানে এলে সে তার কথা এত ভাবে, তার মুখটা এত স্পষ্ট সে দেখতে পায় এ সব কি কিছু নয় ? এই যে তার কথা ভেবে তার দেহে মনে এত আনন্দের বন্যা এতো মিথ্যে হতে পারে না।

নীলু স্থির হয়ে কান পেতে নিজের হৃৎপিণ্ডের দ্রুত শব্দ শোনার চেষ্টা করে। শব্দ শুনে নিশ্চিন্ত হয়, এ মিথ্যে হতে পারে না। বিরহেও রয়েছে আনন্দ। প্রকৃতিতে যেমন রয়েছে মেঘ ও রৌদ্র, ফুল ও কাঁটা, দিন ও রাত, তেমনি জীবনেও রয়েছে সুখ ও দুঃখ, হাসি ও কান্না, মিলন ও বিরহ। কোনটাকে বাদ দিয়ে জীবন নয়।

আবার মানুষের জীবন থেকে যা হারিয়ে গিয়ে ক্ষনিক বিরহের দুঃখ দেয় তাই-ই আবার তার মহাজীবনের মাঝে ফিরে ফিরে আসে। ফিরে ফিরে এসে বারে বারে চিরদিন মিলনের আনন্দ রাগিনী গেয়ে গেয়ে যায়। মানুষের এ মহাজীবনের রূপরেখা আলাদা। নীলুর চোখে সে রূপরেখাটুকু মূর্ত্ত হয়ে ওঠে।

সে ভাবে, জীবন ধরেই মানুষের জীবনে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি ঘটে চলে জীবনের স্থায়িত্ব বেশী হলে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির পরিমানও ভারী হয়। আজ এই মুহূর্তে যদি তার জীবন শেষ হয়ে যায় তবে রইবে না আর কোম প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। কিন্তু যদি আরো অনেককাল তাকে বাঁচতে হয় তবে আরো অনেক কিছুই তাকে পেতে হবে, হারাতে হবে। একই মানুষের পুরো জীবনটাকে যদি এমনতর প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির এককে ভাগ করা যায় তবে অনেক ছোট ছোট জীবনের সৃষ্টি হবে। আর সেই ছোট ছোট জীবনের সমষ্টি নিয়ে মানুষের সমগ্র জীবনকালটাকে বলা যেতে পারে মহাজীবন।

জীবনের কোন ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে বা এককে যে প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি ঘটে তা আবার জীবনের অপর কোন ভগ্নাংশে বা অপর কোন এককে

একই রূপে কি বিভিন্নরূপে ফিরে ফিরে ঘটে যায়—অপ্রাপ্তি-প্রাপ্তি, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি,·····রূপে। এভাবে জীবনটাকে দেখলে মনে হবে মানুষের জীবনে যা ক্ষনেকের জন্য হারিয়ে যায় তাই-ই আবার তার মহাজীবনের মধ্যে ফিরে ফিরে, বারে বারে আসে।

তাই ফিরে ফিরে চক্রাকারে আসে বিরহ ও মিলন। আর তাই বিরহের মাঝে হারায় না মিলনের রেশ বা মিলনের মাঝেও ঘনিয়ে আসে বিরহের আবেশ। বিরহও তাই ভরে যায় মিলন-আনন্দের আবেশে নব নব বেশে। তবু বিরহই মহৎ কারণ বিরহের মাঝে থাকে না কোন হারানোর ভয়, যে ভয় মিলন মুহূর্তে জেগে ওঠে। মিলনে যে আনন্দ-রাগিনী ঝংকৃত হয় তাই বিরহের মাঝে নির্ঝ'-রিণীর মত ঝরে ঝরে পড়ে। সব মিলিয়ে মানবের মহাজীবনে গীত হয় একটি নিটোল গান—মহাজীবনের গান !

রাণীর কথা আজ ভাবলে নীলুর চোখ ছল ছল করে ওঠে। তবু হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিতও হয়ে ওঠে। সে ভাবে, মানুষের মহাজীবনে কিছুই হারায় না—ফিরে ফিরে আসে নব নবরূপে, নিত্যনূতন। রাণী আর কোনদিন ফিরে আসবে না ঠিক কিন্তু হৃদয়ের যে সিংহাসনটিতে এসে সে একদা বসত সেখানে অন্য কেউ এসে হয়ত আবার দেখা দেবে। সেই-ই তখন হবে হৃদয়ের রাণী, রাণীর প্রতিচ্ছবি হয়ে। রাণীর সত্ত্বা তাই নীলুর চিরকালের। সে হারিয়ে যায় নি, শুধু একটু দূরে, আড়ালে চলে গেছে। সে অন্য কোন রূপে ফিরে এসে ঠিক তার নির্দিষ্ট আসনটিতে বসবে।

কিন্তু সে কবে ? কোথায় সে ? তার হঠাৎ প্রচণ্ড ভালবাসাতে ইচ্ছে করে। সেই হৃদয়ের রাণী যতদূরেই থাক যবেই হোক, সে যে আসবে, সে বিষয়ে নীলুর কোন সংশয় নেই। তার মহাজীবনের দ্বার-প্রান্তে সে নিশ্চয়ই আসবে। তার আগমনী সুরও যেন সে শুনতে পাচ্ছে যদিও সেটা এখন তত স্পষ্ট নয়। নীলুর জীবনে মহাজীবনের গান ধ্বনিত হচ্ছে। সে পরম নিশ্চিন্তে বাকী পথ দৃঢ় পদক্ষেপে—এগিয়ে যায়। পথের প্রান্তে তার সকল সংশয় মুছে যায়।

নীলুর সঙ্গে পড়ত কান্তি জেঠার দুই ছেলে—নিমাই ও প্রাণেশ। নিমাই যদিও বড় তবু সে ক্লাশ ফাইভে ফেল করেছিল বলে ছোট ভাই এর সঙ্গে একই ক্লাশে এখন পড়ছে। প্রবোধ দা তাদের ইসকুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। নীলুর এখন অনেকেরই সাথে জানাশোনা হয়েছে। সে পড়াশুনায় ভাল বলে ইতিমধ্যে কিছু নামও করেছে। অনেকেরই সে এখন প্রিয়।

উঁচু ক্লাশের ছেলেদের দাদা বলাই ছিল নিয়ম। প্রানেশের এক মামা তখন নবম শ্রেণীতে পড়ত। তার নাম মুক্তিভূষণ। নীলু আগে তাকে মামা বলে ডেকেছে কিন্তু এখন ডাকে মুক্তি দা বলে ঐ নিয়ম অনুযায়ী।

প্রথম প্রথম বীজগণিত ও সংস্কৃত বোঝার একটু অসুবিধা হয়েছিল তার। একেবারে নতুন বিষয়গুলি তো। দাদাদের কাছ থেকে প্রথমটায় একটু জেনে নিয়েছিল সে। এখন আর তার কোন অসুবিধা হয় না।

ভালো ছেলেরা চিরকাল সামনের বেঞ্চে বসে। যারা পড়াশোনায় কাঁচা বা ফাঁকি দেয় তারা ভালো ছেলেদের থেকে একটু তফাতে বসে। এ চিরকালেরই নিয়ম। ফাঁকিবাজদের পেছনের দিকে বসার অন্যতম কারণ হল, মাষ্টারমশায়েরা প্রথমে চোখের নজরে যাদের দেখতে পান তাদেরই পড়া জিজ্ঞেস করেন। পেছনের ছেলেদের দিকে সব সময় তাদের নজর থাকে না। দ্বিতীয় কারণ হল, যদি কোন বিষয় নীরস লাগে তবে সেদিকে অনর্থক কান না দিয়ে মাথা নীচু করে পেছনে বসে সহপাঠীদের সঙ্গে সরস আলোচনা বরং ভালো। সে কারণে পেছনের আসনগুলোই উপযুক্ত।

আবার ভালো ছেলে হয়ে সামনে বসার ঝামেলাও কম নয়। মাষ্টারমশায়েরা তাদেরই বেশীর ভাগ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেনই। চোখের সামনে বসে থাকা ছাড়া এর আরও কারণ আছে। সে কারণটা হল, ফাঁকিবাজ ছেলেদের পড়িয়ে মাষ্টারমশায়েরা আনন্দ পান না বলে তাদের নজর থেকে আড়াল করেই রাখেন। ওরাও পড়ায় আনন্দ কম

পায় আর ক্রমে স্বেচ্ছায় মাষ্টারমশাইদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। তাই তখন পড়ায় আনন্দ আর পড়ানোতে আনন্দ শুধু চেয়ারে বসা মাষ্টারমশাই আর সামনের দিকে বসা কিছু মনোযোগী ছাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। অন্যান্যেরা তখন অনিবার্য কারণে ইচ্ছুক বা অনিচ্ছুক দর্শকদের মত হয়ে পড়ে কতকটা।

তখন ভালো ছেলেদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলে। কেউ কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারলে মাষ্টারমশাই যদি তার তারিফ করেন তবে সেদিন জিত্ যেন তার। এই সুস্থ প্রতিযোগিতা প্রতি-যোগীদের অনেক উর্ধে নিয়ে যায়। ভালোরা তাতে আরো ভালো হয়।

কিন্তু কোনদিন কোন কারণে যদি সেই ভালো ছেলেদের কেউ ঠিক মত পড়া তৈরী করে না আসতে না পারে তবে মাষ্টারমশাইদের প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলে তাকে ক্লাশের মধ্যে বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়। সামনের বেঞ্চে বসার এ ঝামেলাটুকু ভালো ছেলেদের মাঝে মাঝে পোহাতে হয়।

নীলু কি রকম ছেলে তখনও মাষ্টারমশায়েরা ঠিক জানেন না। কিছুদিন সে যথারীতি সুহাসের সঙ্গে পেছনে বসেছে। পেছনের ছেলেরা বড় গোলমাল করে। মাষ্টারমশাইদের প্রতি অনুচ্চস্বরে নানা রকমের মন্তব্য করে। নীলুর তাতে অসুবিধা হয়। কিন্তু সে তাদের কিছু বলতে পারে না। প্রথম থেকে সামনে বসে নি বলে এখন গিয়ে বসতে কোথায় যেন তার বাধে।

পেছনের ছেলেরা সব চেয়ে বেশী গোলমাল করে সংস্কৃতের ক্লাশে। বেশীর ভাগ ছাত্রের কাছে ওটা যেন গ্রীক, হিব্রু বা এরকম বিদেশী ভাষার মত এক দুর্বোধ্য ভাষা। নীলুর অবশ্য কোন অসুবিধা হয় না।

ভুবন পণ্ডিতমশাইয়ের সংস্কৃত পড়াবার একটা বিশেষত্ব ছিল। তিনি প্রথমে কয়েকজনকে আগের দিনের দেওয়া পড়া জিজ্ঞেস করবেন। তারপর নতুন পড়া বুঝিয়ে দেবেন। পরের ক্লাশে সেটির আবার পড়া নেবেন। পিরিয়ডের শেষের দিকে অন্তত: দশ-পনেরো

মিনিট তিনি কিছু শব্দ বা বাক্য সংস্কৃতে অনুবাদ করতে দেবেন। অধীত শব্দরূপ বা ধাতুরূপগুলো ভালো করে না পড়লে সেই অনুবাদগুলি করা মুশকিলের ছিল। তাই .আট-দশজন মাত্র অনুবাদ করে পণ্ডিতমশাইকে দেখাবার জন্য উঠে যেত। বাদবাকী ছাত্রেরা তখন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় এত মশগুল থাকত যে তারা ভুলেই যেত তারা ক্লাশে কথা বলছে, না হাটে দাঁড়িয়ে গল্প করছে।

নীলু পেছনে বসলেও ভুবন পণ্ডিতমশাই-এর দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে তাকে গিয়ে দেখিয়ে আনত। বেশীর ভাগ উত্তরই তার নির্ভুল হত। একদিন পণ্ডিতমশাই লক্ষ্য করলেন, নীলু পেছনে বসে। তাই একদিন তার খাতা দেখে খুশী হয়ে বললেন—তুমি পেছনে বস কেন? এরপর সামনেই বসবে।

ভুবনপণ্ডিতের আদেশবলে নীলু অতঃপর নীলু সামনের বেঞ্চিতে আসীন হতে লাগল। কয়েক দিন পরে সে দেখল, পরিমল ও শান্তিপদও সামনের বেঞ্চিতে বসতে সুরু করেছে।

সব বিষয়েই তাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা ছিল। কিন্তু সকলে প্রতিযোগিতার তাৎক্ষণিক উত্তেজনা বোধ করত সংস্কৃতের ক্লাশে ভুবন পণ্ডিতমশায়ের প্রশ্নর উত্তর করে দেখাবার সময়।

শেষের দিকে এমন হল পণ্ডিতমশাই রোলকল করেন সকলের বটে কিন্তু পড়ান যেন সামনে বসা ঐ আট দশটি আগ্রহী ছাত্রদের। তাদেরই পড়া ধরেন, তাদেরই যেন বুঝিয়ে দেন আর তাদের প্রশ্নোত্তর দেখে দিয়ে পিরিয়ড শেষ করেন।

নীলু একদিন ভুবন পণ্ডিতের কাছ থেকে যে পুরস্কার লাভ করেছিল, তা ভাবলে আজো সে অপার আনন্দে ভেসে যায়।

একদিন নীলুব পড়ায় খুশী হয়ে ক্লাশের মধ্যে পণ্ডিতমশাই মন্তব্য করলেন—আমার তো বয়স হয়েছে। এবারে অবসর নিতে হবে। এরপর থেকে নীলাদ্রিই তোমাদের পড়াবে আমার জায়গায়।

গোটা ক্লাশের দৃষ্টি তখন নীলুর দিকে আর নীলুর দৃষ্টি ছিল মাটির দিকে।

নারায়ণও ভাল সংস্কৃত জানত। ইসকুল জীবনে নারায়ণ ও নীলু সব সময়ই কাছাকাছি নম্বর পেয়েছে। কখনও নীলু দু এক নম্বর বেশী কখনও বা নারায়ণ। কিন্তু শান্তিপদ সব সময়ই ঐ বিষয়ে প্রথম হত। নীলুদের সংস্কৃত হত ব্যাকরণ শুদ্ধ আর শান্তিপদের সংস্কৃত হত তা সত্ত্বেও কাব্যিক ব্যঞ্জনা মণ্ডিত।

নীলুর পড়াশুনা ভালোই চলতে থাকে। সেইসাথে খেলাধূলাও। খেলাধুলার নেতা হল মুক্তি দা। সে সকলের বড় আর সব খেলাতেই দড়। ইসকুলের পর তারা হা-ড-ড়, গাদি এমনই অনেক খেলা খেলত। ওপার থেকে নীলুর জেঠতুতো দাদারা এবং ভায়েরাও খেলতে আসত। খেলা হত ক্যানেলের ধারে একটা ফাঁকা খেলার মাঠে। সে মাঠে চাষ হত না।

বেশ হেসেখেলে আনন্দের মধ্য দিয়ে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল, যেন জীবনতরী মৃদুমন্দ বাতাসে হালকা চালে মসৃণ গতিতে পথ কেটে চলছিল। কিন্তু সহসা ঈশান কোনের কুটিল ঝড়ে তরী দুলে উঠল। জেঠাদের সঙ্গে নীলুর বাবার লাগল বিবাদ। শীঘ্রই সে বিবাদটা গৃহবিবাদের রূপ নিল।

নীলু হরিপুর ইসকুলে ভর্তি হবার কিছুদিন পরে শংকরীপ্রসাদ সীতেশ মান্নার সঙ্গে সুন্দরবনে যান তিনি মাসখানেক থাকেন সেখানে। ওখানে জমির জঙ্গল পরিষ্কার ও চারিদিকে মাটির উচু বাঁধ দেওয়ার কাজ ছিল যাতে জমি আবাদ যোগ্য হয় এবং জমিতে জোয়ারের জল না ঢুকতে পারে।

তিনি ফিরবেন মাসখানেক পরে। তখনও তাঁর দেশের সব জমির ধান মাড়াই-এর কাজ শেষ হয় নি।

ঘরে বাবা থাকা মানেই শাসনে থাকা। বাবার সুন্দরবন যাওয়ায় তাই নীলুর অখুশী হবার কথা নয়। তাই বলে পড়াশুনায় সে ফাঁকি মারে না, মারতে পারে না, কারণ ক্লাশে ঐ প্রতিযোগিতা। যাই হোক, বাবা মাসখানেক পরে ফিরে এলেন। নীলু শুনল, তাদের

সুন্দরবনের একশ' বিঘা জমিতে জঙ্গল কাটা হয়ে গেছে। বাঁধের কাজ তখনও চলছে।

এক রবিবারে ঘটল ঘটনাটা। সেদিন ছিল ধানগোলার হাট। ঐ হাটের পাশেই মালতী ধোপানী আর বেদে বেদেনীরা থাকে। হাট বসে সপ্তাহে দুদিন—বুধবার আর রবিবার। বিকালের দিকে বসে। হাটফেরৎ বড় জেঠা ভবানীপ্রসাদ এলেন সন্ধ্যার ঝোঁকে নীলুদের বাড়ী।

শংকরীপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর কি সব কথাকাটাকাটি হচ্ছে। দুজনে বেশ জোরে জোরে কথা বলছেন। তাদের তর্কাতর্কিতে আকৃষ্ট হয়ে হাটফেরৎ অনেক লোকও জমে গেছে। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড়কর্তা আর ছোটকর্তার ঝগড়া শুনছে।

নীলুর মনে আছে, বাবা একসময় রেগে বড়জেঠাকে বলে উঠলেন তুমি দুনিয়াসুদ্ধু সকলের বিচার করে বেড়াচ্ছ আর নিজের বিচার নিজে করতে পারো না?

কি কারণে বাবা ঐ কথা বড়জেঠাকে বললেন তা নীলু সঠিক বুঝতে পারছে না। তবে এটা বুঝেছে, ধান ঝাড়ানো নিয়ে কোন এক চাষী কিছু গোলমাল করেছে! বড়জেঠা তারক কিছু হয়ত বলেন নি। গ্রামে বা গ্রামের বাইরে যেখানে কোন বিচার-আচার হোক, ভবানীপ্রসাদের ডাক পড়েই। শংকরীপ্রসাদ সেজন্য তাঁকে ঐরূপ কটাক্ষ করলেন।

তারপর বড়জেঠাও উত্তেজিত হয়ে অনেক গরম গরম কথা বললেন। সব নীলুর মনে পড়ে না। বাবা একসময় বড়জেঠাকে বললেন—আর তুমি বুঝি জেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠির। বড় মোহন্ত হয়ে বসে ঠাকুরের সব চাল-কলা আত্মসাৎ করে চলেছ। তোমার মুখে ধর্মের বুলি ছাড়া আর কার মুখে মানাবে? তোমাকে আমি সেই ছোটবেলা থেকে তো চিনি। সাধে কি আর ভগবান তোমায় আঁটকুড়ো করেছে?

বাবার চোখা চোখা বাক্যবানে বড় জেঠা বিদ্ধ হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠলেন—কি, অতবড় কথা তুই আমায় বললি?' আমাকে আঁটকুড়ো বলে অপমান করলি? তোর নির্বংশ হোক।

ব্যস, আর যায় কোথায়? শংকরীপ্রসাদ অমনি মারমুখো হয়ে

বলে উঠলেন – বেরোও বেরোও আমার বাড়ী থেকে। তোমার মুখ দেখাও পাপ। বেরোও।

ঘটনার আকস্মিকতায় নীলু বিহ্বল হয়ে যায়। বড়জেঠা নানারকম কট কথা বলতে বলতে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চলে যান। নীলু ঘরে বসেই দেখছে, বড়জেঠা খেয়াপার হতে হতে হাটফেরত লোকদের কাছে বলছেন শংকরীর দুর্ব্যবহারের কথা।

নীলু শুনতে পায় জেঠাকে বলতে—শংকরী আমাকে বাড়ী থেকে শেয়াল কুকুরের মত তাড়িয়ে দিল। ওর ভাল হবে না।

নির্বংশ কথাটার অর্থ নীলু বোঝে। কিন্তু তার মনে হয়, বড় জেঠা কখনই সে অর্থে কথাটা বলেন নি। রাগের বশে তাঁর মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেছে। শংকরীপ্রসাদের নির্বংশ কামনা করতে গেলে নীলুরও মৃত্যুকামনা তাঁকে করতে হয়। তা তিনি কখনই পারেনা বলেই নীলুর বিশ্বাস। রাগের মাথায় মানুষ অমন অনেক কুকথা বলে ফেলে। নীলু তাই ভাবে।

কিন্তু শংকরীপ্রসাদ কিছুতেই ভুলতে পারলেন না ভবানীপ্রসাদের এই অভিশাপভরা উক্তি। বিবাদ আরো ঘনিয়ে এল, ফেনিয়ে উঠল। আসল ব্যাপারটা কি ছিল নীলু সেদিনই রাসুর কাছে জানল।

একজন চাষী শংকরীপ্রসাদ ও ভবানীপ্রসাদ, উভয়েরই জমি ভাগ-চাষ করত। শংকরীপ্রসাদ সুন্দরবনে থাকাকালে ঐ চাষী তাঁর জমির ধান শিবের মন্দিরের সামনের চাতালের খামারে এনে তোলে। সেখানেই সে ধান ঝাড়ায়। ভাগ করেন ভবানীপ্রসাদ শংকরীপ্রসাদের হয়ে। সেই ভাগটায় শংকরীপ্রসাদের বিশ্বাস হয় নি। তাঁর ধারনা চাষী ও ভবানীপ্রসাদ মিলে এ কাজ করেছে। ভবানীপ্রসাদ অস্বীকার করেছেন সে কথা। তিনি চাষীকেই সম্পূর্ণভাবে দায়ী করেছেন। কিন্তু শংকরীপ্রসাদের বক্তব্য হল, ধানের গাদা আস্ত রাখলেই হত, তিনি এলে ঝাড়ানো হতো। তাঁর অবর্তমানে কি দরকার ছিল ঝাড়ানোর? শংকরীপ্রসাদের মতে খামারে ধান তোলাটার ব্যাপারে চাষীর দোষ ছিল কিন্তু ঝাড়ানোর ব্যাপারে ভবানীপ্রসাদই দায়ী।

ভবানীপ্রসাদ বলতে চেয়েছেন, তিনি ঝাড়াতে কখনই বলেননি চাষীকে। চাষী জোর করে ঝাড়িয়েছে। তখন বাধ্য হয়ে তিনি ভাগটা করেছেন। এবং সে ধান তিনি শংকরীপ্রসাদের বাড়ীতে পাঠিয়েও দিয়েছেন।

শংকরীপ্রসাদের ধারণা, ভবানীপ্রসাদও কিছু সরিয়েছেন। না হলে চাষীকে তিনি বারন করেছিলেন আর চাষী তাঁর কথা শোনে নি, তার মতে বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ পাঁচ গায়ের লোক বিচারে বসে যার কথা শোনেন তার নির্দেশ অমান্য করার সাহস এক চাষীর হয় কি করে? আসলে সে রকম নির্দেশ তিনি আদৌ দেন নি বলেই শংকরীপ্রসাদের ধারণা।

বিবাদ সুরু হল। দীর্ঘ পাঁচ-সাত বছর ধরে গোস্বামীদের মধ্যে নানা মামলা চলেছিল। পরিনতি হয়েছিল ভয়াবহ। সকলেরই অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছিল, মুখ দেখাদেখিও বহুকাল বন্ধ ছিল নিজেদের মধ্যে।

আজ সে সব কথা ভাবলে নীলুর মনে হয়, মামলার আসল কারণ এ সামান্য কিছু ধান হতে পারে না। যে লোক বন্যার পর কয়েকশ' মন ধান-চাল বিলিয়ে দিয়েছেন, যার সঙ্গে বা যাদের সঙ্গে বিবাদ, তাদেরও ধান-চাল সাহায্য করেছেন, সেই লোক সামান্য কিছু ধানের কমবেশীর জন্য অত মরীয়া হয়ে মামলা লড়তে পারে না। আসল কারন ছিল অন্য।

সেটি ছিল এই যে তিনি ছোটবেলায় দাদাদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছিলেন তা জীবনে কোনদিন ভুলতে পারেন নি। নরম কাদার ইটে যে ছাপ পড়ে তা পুড়ে ঝামা হলে মুছে তো যায় না বরং আরো পাকাপোক্ত হয়। তবে তার দাদাদের প্রতি যা-ই মনোভাব তার থাক না কেন, তা নিয়ে তার কর্মজীবনে কোন বিস্ফোরণ ঘটেনি। ঘটার কোন কারণও ছিল না। তিনি তো ভাইদের কাছ থেকে একেবারেই সরে এসেছিলেন। জীবিকার কোন ব্যাপারেই ভাইদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কও ছিল না।

তাই তাদের সঙ্গে কথাবার্তা হত মাত্র কিন্তু ছিল না সুখদুঃখের আলোচনা বা ওঠাবসা। আর যেটুকু কথাবার্তা হত, তা বোধ হয়, নীলুর ও বাড়ীর যাওয়ার জন্য বা ও বাড়ীর ছেলেমেয়েদের এ বাড়ী আসার জন্য। বয়স্কের গাম্ভীর্য কিশোরের চাঞ্চল্যের সংস্পর্শে এসে প্রায়ই হালকা হয়ে যায়। এখানেও ছিল তাই।

শংকরীপ্রসাদের আগে দেশে বলতে গেলে কোন ধানজমি ছিল না। সবেমাত্র বেশ কিছু ধানজমি তিনি দেশে করেছেন। সেই জমির সূত্র ধরেই আজ দাদাদের সঙ্গে জীবিকার ক্ষেত্রে তার সংঘাতের কারন উপস্থিত হল। না হলে হবার কোন কথাই ছিল না। বাইরের কারণ ছিল এই-ই।

কিন্তু বাইরের কারণ যাই-ই থাক, ভেতরের কারণটা ছিল তার মনে যা তিনি আবাল্য পোষন করে এসেছিলেন। এ ছাড়া আরও এক কারন ছিল যা নীলু অনেক পরে বুঝেছে। শংকরীপ্রসাদের আগে কোন জমিজমা ছিল না। তাই জমির উপর আগে মমত্ববোধও জাগে নি তার। জমি থাকলেই জমিদার সুলভ মনোবৃত্তি জাগে। শুধু জমিদার হলেই যে এ মনোবৃত্তি জাগবে এমন নয়। এই মনোবৃত্তির মুল কথা হল—জমি কারোর বাপের নয়, জমি হল দাপের। দাপ মানে দাপট।

সদ্যোজাত সেই জমিদারসুলভ মনোবৃত্তির জন্য শংকরীপ্রসাদ চাষীর বেয়াদপিটা সহ্য করতে পারেন নি। কিন্তু তাকে শায়েস্তাও করতে পারছিলেন না, কারন ভবানীপ্রসাদ ছিলেন ওর মধ্যে জড়িত। তাই সব রাগ গিয়ে পড়ে ভবানীপ্রসাদের উপর।

সেই রাগের আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল তখন সেই আগুনের আলোতে তিনি আপন মনের কোনে দেখতে পেলেন ভবানী প্রসাদের আর এক রূপ। সে রূপটা হল লোভী মোহন্তের, যে শুধু ঠাকুরের নৈবেদ্যের উপর সবটা অধিকার বসায় না, ভাই ও প্রতিবেশীর অধিকারের উপরেও লোভের হাত বাড়ায়। সত্য হোক. মিথ্যে হোক বিবাদের অন্যতম কারন যে শংকরীপ্রসাদের এই ধারনাটা, সে বিষয়ে নীলুর আজ আর কোন সন্দেহ নেই।

যাই হোক, ঘটনা আরও ঘটল। অবশ্য প্রথম এ ঘটনার পরে অভিভাবকদের কঠোর নিষেধে দুই পরিবারের ছেলেদের মধ্যে প্রকাশ্যে মেলামেশা বা খেলাধুলা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু আড়ালে আড়ালে ইসকুলে তাদের মেলামেশার লুকোচুরি তখনও বন্ধ হয় নি। তাদের মনে তো কোন বিদ্বেষ দানা বাঁধে নি। অভিভাবকদের মধ্যে বিবাদটাকে তখন নীলুর মনে হত বুড়োদের ছেলেমী। :

এলো গাজনের সময়। রমলা একদিন শিবের মন্দিরে গেলেন পূজো দিতে. বোধ হয়, কোন মানসিক শোধ করার জন্য। ভবানী-প্রসাদ এবং হরপ্রসাদ তাঁকে মন্দিরে ঢুকতেই দিলেন না। অপমানিত হয়ে রাগে ফুসতে ফুসতে তিনি পূজা না দিয়ে ফিরে এলেন অবশ্য মেজকর্তা রামপ্রসাদ ভবানীপ্রসাদদের এই অন্যায় এবং অসঙ্গত আচরনের প্রতিবাদ করেছিলেন

তিনি বলেছিলেন—ভায়ে ভায়ে বিবাদ যাই-ই থাক না কেন, ভ্রাতৃবধূকে দেবতার মন্দিরে পূজো দিতে দেওয়া হবে না, এ কোন কথা ?

কিন্তু তার প্রতিবাদ টেকে নি। তার কারন তার লোকবল, বাহুবল এবং অর্থবল কম ছিল। তা ছাড়া সে সময় ভবানীপ্রসাদের পালা চলছিল। সত্যিকারের মোহন্ত তখন হওয়া উচিত ছিল শংকরী-প্রসাদ, ভবানীপ্রসাদ ও হরপ্রসাদ একদিকে আর রমাপ্রসাদ একা একদিকে। রমাপ্রসাদ তার বাপের একমাত্র ছেলে বলে মোহন্তগিরির অর্দ্ধেক অধিকার তার আর ভবানীপ্রসাদদের তিন ভায়ের মিলে হওয়া উচিত ছিল অর্দ্ধেক। কিন্তু যেহেতু শংকরীপ্রসাদ তার অধিকার ফলাতে যান নি এতদিন তাই ভবানীপ্রসাদ ও হরপ্রসাদ ছিলেন মোহন্তগিরির অর্ধেক অংশীদার আর রমাপ্রসাদ একা অর্ধেক অংশীদার

ভবানীপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ ছিলেন এক পরিবারভুক্ত। তাই তাদের পালা চলত মিলিতভাবেই। তাই বছরের প্রথম ছ' মাস পালা চালাতেন রমাপ্রসাদ আর শেষের ছ' মাস ভবানীপ্রসাদ ও হরপ্রসাদ মিলিতভাবে কিন্তু কার্যত ভবানীপ্রসাদ প্রায় এককভাবে।

যেহেতু এ সময় রমাপ্রসাদ পালা চালাচ্ছিলেন না তাই তার প্রতিবাদ শেষ পর্যন্ত টেকে নি।

এতখানি অন্যায় বলা বাহুল্য, শংকরীপ্রসাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয় নি। মেনে নেওয়া কোন মানুষের পক্ষে, বোধ করি বড় সহজ ব্যাপার নয়, বিশেষ করে শংকরীপ্রসাদের যখন শিবের সেবাপূজা করার আইনত অধিকার রয়েছে। তিনি সে অধিকার না খাটালেও, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সেই অধিকার কখনই চলে যেতে পারে না।

পরদিন শংকরীপ্রসাদ নিজেই গেলেন শিবমন্দিরে সকালবেলায়। নীলুরা তখনও ইস্কুলে যায় নি। কিছু পরে ওপার থেকে সাংঘাতিক এক কোলাহল ভেসে আসে। নীলু ও রাসু ছুটে যায় শিবের মন্দিরে দিকে। রমলাও তাদের পেছনে আসেন। শিবের মন্দিরের কাছাকাছি আসতেই তারা দেখতে পায় রাসুর পিসে বাড়ীতে তখন অনেক লোক। নীলু শংকরীপ্রসাদকে সেখানে দেখে হতভম্ব হয়ে যায়। দেখে, বাবার মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে! নীলু কেঁদে ফেলে দৃশ্য দেখে।

ঘটনা কি হয়েছিল তা একটু পরেই বোঝা গেল। শংকরীপ্রসাদ সকালে এসে সোজা ভবানীপ্রসাদের কাছে কৈফিয়ৎ চান, কেন গতকাল রমলাকে তাঁরা মন্দিরে পুজো দিতে দেন নি।

ভবানীপ্রসাদ অম্লানবদনে বলেছিলেন—তোমাদের পুজো দেবার কোন অধিকার নেই।

শংকরীপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিলেন—অধিকার তোমার যতটা, আমারও ঠিক ততটাই। দেখি তুমি কেমন করে আমার সে অধিকার খর্ব করতে পার? আমি আজই তোমাদের বাড়ীতে রাখা শিবের পুজায় ব্যবহারের থালাবাসনের ভাগ নিচ্ছি। আমিও পুজা চালাব।

এই নিয়ে তিনি ভাই-এর মধ্যে হাতাহাতি হতে যায়! একেবারে প্রায় দেওয়ালে দেওয়াল লাগিয়ে বাস করেন রামপ্রসাদ। দৃশ্য দেখে তার পক্ষে বেশীক্ষন নীরব দর্শক হয়ে থাকা সম্ভব হয় না। তিনি এসে

শংকরীপ্রসাদের পক্ষ নেন এবং শংকরীপ্রসাদের দাবীকে জোর গলায় সমর্থন করেন।

ভায়েদের মধ্যে হরপ্রসাদ ছিলেন অত্যন্ত ক্রোধী। শংকরীপ্রসাদ যখন মরীয়া হয়ে থালাবাসনের ভাগ নেবার জন্য বাড়ীর ভেতরে যেতে উদ্যত তখন হরপ্রসাদ চট করে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে গেলেন। যেই শংকরীপ্রসাদ বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢোকার দরজায় পা দিলেন অমনি হরপ্রসাদ ঘরের ভেতর থেকেই তার মাথায় লাঠি মারেন। রমাপ্রসাদ ছিলেন শংকরীপ্রসাদের পেছনে। তিনি হরপ্রসাদের লাঠি কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার আগেই হরপ্রসাদের লাঠি তার মাথায়ও পড়ে। মুহূর্তের মধ্যেই দুজনের মাথা ফাটে।

আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকান্ত, রমাকান্তেরা বেরিয়ে আসে তাদের বাবা ও কাকার সাহায্যের জন্য। ওদিক থেকে হরপ্রসাদের তিনপুত্র চিত্তরঞ্জন, মনোরঞ্জন ও কালীরঞ্জন লাঠি হাতে বেরিয়ে আসে। স্পষ্টতঃই দুটো বিবদমান পক্ষ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়।

তবে শ্রীকান্তেরা নিরস্ত্র আর মনোরঞ্জনেরা সশস্ত্র। শ্রীকান্তের মাথায় খুব সম্ভব মনোরঞ্জনই লাঠি মারে। তিনজনের মাথা ফাটে। ইতিমধ্যে লোকজন এসে পড়ায় ঘটনা আর বেশীদূর গড়ায় নি। মারামারিটা আপাততঃ থেমে গেল কিন্তু বিবাদ একেবারে ঘনিয়ে এলো ঘনঘোর হয়ে। শিবের মন্দিরে তখন গাজনের চল্লিশ-পঞ্চাশজন শিবের ভক্ত ছিল। তারা মারামারি থামাতে আসার আগেই এত কাণ্ড হয়ে গেল। এ ধরনের লাঠি যুদ্ধ যে হতে পারে তা কেউ আগে ভাবতেও পারেনি।

আসলে, ভবানীপ্রসাদের সপরিবারে আজকের এই ঘটনার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। গতকাল রমলাকে ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারটা যে শংকরীপ্রসাদ নির্বিচারে আদৌ মেনে নেবেন না এটা তাঁরা বিলক্ষন অনুমান করেছিলেন। আর তাই সকলে লাঠিসোটা নিয়েই প্রস্তুত ছিল।

নীলু ভেবে পেল না, কিভাবে কালীরঞ্জন শ্রীকান্তের মাথায় লাঠি মারতে পারল। তারা ক্লাশে ফার্ষ্ট, সেকেণ্ড হয়। কত ভাব তাদের

মধ্যে! তবু এই অকল্পনীয় ব্যাপারটা ঘটে গেল! অভিভাবকেরা বিষয়ের বিষ যে ছেলেদের মধ্যে কিভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন তা দেখে নীলু সেদিন বিস্ময়ে পাথর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাবার এহেন শারীরিক নির্যাতন লক্ষ্য করে মনটা সেদিন জেঠতুতো দাদাদের প্রতি ঘৃনায় রি রি করে উঠেছিল।

ঐ ঘটনার পর স্বভাবতঃই দাদাদের সঙ্গে নীলুর মুখ দেখাদেখি সম্পূর্ণভাবেই বন্ধ হয়ে গেল। পরের দিন নীলু যখন ইসকুলে গেল, তার বেশ মনে আছে, সে সেদিন ভাল করে কারোর সঙ্গে মুখ তুলে কথা বলতে পারে নি। নিজেদের বাড়ীতে এরকম একটা জঘন্য ঘটনা যে ঘটে গেছে তার জন্য নিজেকে অপরের কাছে হীন বোধ হতে লাগল, কি লজ্জা, কি লজ্জা। সে যেন একটা ডাকাতে বাড়ীর ছেলে। লোকে নিশ্চয়ই তাই ভাবছে বলে নীলুর ধারণা হয়।

শংকরীপ্রসাদ কিছুদিন শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন। অনেক বন্ধু-বান্ধব এলেন তার সঙ্গে দেখা করতে। দেখা করতে এলেন ওপার থেকে শ্রীপতি দাস। শ্রীপতি দাসকে নীলু শ্রীপতি কাকা বলে ডাকে শ্রীপতি কাকা, নির্মাল্য দাস ও বাবা একসঙ্গে হরিপুর হাই ইসকুলে পড়েছেন, এ কথা নীলু জানে।

শ্রীপতি কাকা খুব বিচক্ষন ও বিদগ্ধ ব্যক্তি বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন তেতুলবাড়িয়ার জমিদারদের কোন এক শরীকের এস্টেটের ম্যানেজার। তার কথার উপর লোকে গুরুত্ব দিত খুব। তিনি জমিদারী এস্টেটে কাজ করার জন্য বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে আইন-কানুন বুঝতেন ভালো।

সেদিন শংকরীপ্রসাদ সুস্থ হয়ে বিছানায় বসেছেন। মাথার ঘা-টা প্রায় শুকিয়ে এসেছে। তবে তাকে বেশ কাহিল দেখাচ্ছে। এমন সময় সন্ধ্যেবেলায় শ্রীপতি কাকা এলেন। তিনি এ কয়দিন গাঁয়ে ছিলেন না। সেইদিনই কর্মস্থল থেকে ফিরছেন।

শংকরীপ্রসাদের কাছে মন দিয়ে ঘটনাটা সব শুনলেন। কথা শেষ করে শংকরীপ্রসাদ বললেন—শ্রীপতি, এতবড় অন্যায়, অবিচার

আমি নির্বিচারে মেনে নিই কি করে বলো ? ছোটবেলায় ভাইদের অকথ্য নির্যাতন সয়েছি। বড় হয়ে ওদের সংসারে থেকে ওদের অনেক নীচতা দেখেছি। তুমি বাল্যবন্ধু, সহপাঠি—সবইতো জানো, দেখেছোও। এখন কি পথ ?

মৃদু হেসে শ্রীপতি কাকা বলেন—পথ আছে। কিন্তু তুমি কি ঠিক করেছ, বল আগে।

—বলছি, শংকরীপ্রসাদ বললেন—কিন্তু তার আগে আমার আরো বক্তব্য রয়েছে, সেগুলো শোন।

—বল, ধীর স্বরে শ্রীপতি কাকা বলেন।

শংকরীপ্রসাদ বলেন—আমি পৈত্রিক বিষয়সম্পত্তির, সে যত কমই হোক অংশীদার। কুলদেবতার সেবাপুজা করার আইনতঃ অধিকারও আমার আছে। কিন্তু তবু আমি সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে এসেছি। এসে দূরে ঘর বেঁধেছি। কোন অধিকারের জন্য আমি লাঠালাঠি করতে যাই নি। যাই নি, নিজের শান্তির জন্যই। তাছাড়া আরো এক কারণ, নীলুরা যাতে গোড়া থেকে বিষয়ের বিষে বিষাক্ত না হয়। কিন্তু আজ কুলদেবতার মন্দিরে প্রনাম জানাবার অধিকার কি আমার নেই ?

শ্রীপতি কাকা বলেন—নিশ্চয়ই আছে।

শংকরীপ্রসাদ আবার বলেন—আর সব চেয়ে ভয়ের কথা, ওরা এখন থেকেই নিজের ছেলেদের রক্তে বিষয় বিষ ঢুকিয়ে দিল। আমার ছেলেরাও বিষাক্ত হয়ে যাবে। তবু সব ভেবেও আমি আমার অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনের দ্বারস্থ হব বলে স্থির করেছি। এ কদিন শুয়ে শুয়ে মাথার যন্ত্রণা অনেক সহ্য করেছি। তার চেয়েও অসহ্য লেগেছে ওদের এই ব্যবহার। তুমি তো জানো, ঐ বড়কর্তাকে আমি প্রচুর টাকা খরচ করে কোলকাতার মেডিক্যাল কলেজে রেখে বাঁচিয়েছিলাম। তার কি এই প্রতিদান ? বলো ? বলো কিছু।

শংকরীপ্রসাদ শেষের দিকে ভাবের আতিশয্যে কেঁদে ফেলেন।

শ্রীপতি কাকা কিন্তু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধীর অনুচ্চস্বরে বলেন—

উত্তেজিত হয়ো না শংকরী। আইনের সাহায্য তোমাকে অবশ্য নিতেই হবে। আমি হলে নিতাম, যে কেউ হলে নিত। কিন্তু তার আগে একটা কথা বিশেষভাবে চিন্তা করা দরকার। তোমাদের উত্তর পুরুষেরা যেন মানুষ হয়। তারা যেন মারামারি না করে। যে ঘটনা আজ তোমাদের জীবনে ঘটে গেল তার পুনরাবৃত্তি যেন তাদের জীবনে না হয়।

শংকরীপ্রসাদ আক্ষেপ করে বলেন—ভয় তো আমার সেখানেই। ওরা ছেলেদের দিয়ে যে জিনিস আজ সুরু করল, তা উত্তরপুরুষদের কোথায় নিয়ে যাবে, কে জানে! আমি তো নীলুকে সর্বরকমে ঐ বিষয়ের বিষ থেকে দূরে রেখেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হবে?

শ্রীপতি দাস বলেন —সে চেষ্টাই করতে হবে। আমি তার কথাই আগে চিন্তা করতে বলছি তোমাকে।

শংকরীপ্রসাদ বলেন—বলো, কি করতে হবে।

শ্রীপতি দাস বলেন – ভবিষ্যতে এ জিনিস ঘটবে না যদি ওদের মনের অন্ধকারে শিক্ষার আলো প্রবেশ করে। নীলুর শিক্ষার ত্রুটি তো রাখছই না, রাখবেও না, আমি জানি। এবং এও জানি, নীলুকে তুমি বিষয়ের মধ্যে টেনে আনবে না। এ ছাড়াও তোমাকে দেখতে হবে ওবাড়ীর ছেলেরা যাতে ঠিকমত পড়াশুনা করতে পারে। মানে, আমি বলছি, দরকার হলে ওদের পড়ার জন্য অর্থসাহায্যও করো। সেক্ষেত্রে তোমাদের ভায়ে ভায়ের বিবাদের কথা যেন তোমার মনে না আসে। তোমার নীলুদের জন্যই এ কাজ তোমার করা দরকার। এ চিন্তা মনে রেখে আইনের পথে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাও। মার খেয়ে কুকুরের মত পিছিয়ে এস, এ আমিও চাই না। মনে করো দুর্যোধনও একদিন পঞ্চপাণ্ডবদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলেন। তোমার ক্ষেত্রে ভবানীপ্রসাদ একই জিনিস করেছে। সেদিনে পঞ্চপাণ্ডবের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধ করা যদি কোন দোষের না হয়. তবে আজ তোমার ক্ষেত্রে ভিন্নতর পন্থায় ন্যায়যুদ্ধ করাটাও দোষের হবে না। শ্রীভগবান যা বলেছেন তাও মনে করে দেখো:—

'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বলং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥'

অতএব এ ছাড়া পথ নেই। তবে তার আগে আমি যা বললাম—

শ্রীপতি দাসের কথা বলা শেষ হয় নি, তারই মধ্যে রমাপ্রসাদ হাঁউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে এসে উপস্থিত হলেন। দুজনে কথা থামিয়ে জানতে চাইলেন, কি ব্যাপার। ব্যাপারটা বোঝা গেল রমাপ্রসাদের বক্তব্যে।

রমাপ্রসাদ সেদিন শংকরীপ্রসাদের হয়ে লড়েছিলেন বলে তাঁর উপর ভবানীপ্রসাদ এবং হরপ্রসাদ যারপর নাই ক্ষুব্ধ। তাঁরা রমাপ্রসাদকে ক্রমাগত ভয় দেখাচ্ছেন, শাসাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত বলেছেন বাস্তু ছেড়ে চলে যেতে। না হলে বিপদ আছে।

এ সমস্তই গায়ের জোরের কথা। গায়ের জোর আর অর্থের জোর রমাপ্রসাদের চেয়ে ওদের বেশীই আছে। আজ রমাপ্রসাদ যখন মাঠে লাঙ্গল চালাচ্ছিলেন তখন হরপ্রসাদ লোকজন নিয়ে জোর করে তাঁর লাঙ্গল কেড়ে নিয়েছেন। আগামীকাল থেকে রমাপ্রসাদের শিবপুজার পালা সুরু হবার কথা। কিন্তু ওপক্ষ বলছে, রমাপ্রসাদ শিবের মন্দিরে গেলে তার ঠ্যাং ভেঙ্গে দেওয়া হবে।

রমাপ্রসাদ কাঁদতে কাঁদতে বলেন—আমার কি দোষ, শংকরী? ওদের সঙ্গে কেন জোরে পারব বলো? এখন ছেলে পরিবার নিয়ে কোথায় যাই? তুমি আমাকে না দেখলে কে দেখবে আর?

শংকরীপ্রসাদ সেদিন পুর্ণ আশ্বাস দিয়েছিলেন রমাপ্রসাদকে। রমাপ্রসাদ আশ্বস্ত হয়ে চলে যাবার পর দুই বন্ধুতে দীর্ঘ সময় ধরে অনেক রাত অবধি অনেক আলোচনা হয়েছিল। আলোচনার বিষয়বস্তু নীলু জানতে পারে নি।

কয়েকদিন পরে শংকরীপ্রসাদ মেদিনীপুরে গিয়ে কোর্টে ভবানীপ্রসাদ ও হরপ্রসাদের বিরুদ্ধে মামলা রজু করে এলেন। মামলার আর্জি হল মোটামুটি:— শংকরীপ্রসাদ তাঁর কুলদেবতার সেবাপুজা করার ন্যায্য অধিকার ফিরে পেতে চান এবং সেই সঙ্গে পৈত্রিক সম্পত্তির

ভাগও। আর চান পৈত্রিক বাস্তুতে ঘর তোলার অধিকার যাতে তিনি দেবতার সেবাপূজার কাজ চালাতে পারেন। ইত্যাদি···।

মেদিনীপুর থেকে ফিরে এসে শংকরীপ্রসাদ একদিন রমলাকে বলেছিলেন—এই মামলার নিষ্পত্তি হলেই সেজদা, রমাপ্রসাদের আইনগত অধিকারও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। সেজদাকে আর আলাদা করে মামলা করতে হবে না।

তিনি আরো বলেছিলেন—বড়কর্তা আরো এক জায়গায় মোক্ষমভাবে ধরা পড়বে জানো? বাবা বেঁচে থাকার সময় বড়কর্তা বাবার নামে বিঘা দশেক জায়গা কিনেছিলেন নিজের আয়ে। অবশ্য ওর নিজের আয় বলতে আর কি? সবই তো দেবতার মেরে খাওয়া। তখন আমি তো খুব ছোট। এখন আপনা থেকে সে জমির ভাগও পাব। কারণ পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি তো এখনও ভাগ হয় নি। জমির পরিমাণ বেশী কি কম, সেকথা বড় নয়। বড় কথা হলো এতে ওদের গায়ে জ্বালা ধরবে খুব।

দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে চলেছিল সে মামলা। নিম্ন আদালতের রায়ের সবটা শংকরীপ্রসাদের অনুকূলে যায় নি। তাই তিনি আবার আপীল করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত যা যা তিনি চেয়েছিলেন সবই আদায় করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেজন্য কম অর্থ ব্যায় তাঁকে করতে হয় নি। এক এই মামলাতেই তাঁকে প্রায় তিরিশ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়েছিল। এ বাদে ঐ পাঁচ বছর ধরে তাঁকে রমাপ্রসাদের সংসারের বহু খরচ চালাতে হয়েছিল। শ্রীকান্ত, রমাকান্ত ও শ্যামাকান্তদের পড়াশোনার যাবতীয় খরচ তিনি দিয়ে গেছেন। সে সব খরচের পরিমানও বড় কম নয়। যা তিনি খরচ করেছিলেন তার বিনিময়ে যা তিনি পেয়েছিলেন তা অতি অকিঞ্চিৎকর। তবু তাঁর কিছুটা সান্ত্বনা বোধ হয় হয়েছিল এই যে প্রাপ্তিটা পকেটে না হলেও মনে তো হয়েছিল। তিনি তো আর ঠিক পকেটের প্রাপ্তির আশায় মামলা করতে যান নি।

আবার ও পক্ষেরও কমপক্ষে পনের কুড়ি হাজার তো খরচ

হয়েছিলই। মামলা চলাকালে শংকরীপ্রসাদের ব্যবসা আবার জমে উঠেছিল। যে বছর তিনি মামলা সুরু করলেন সেই বছরই পাটের ব্যবসায় তিনি প্রায় হাজার দশেক টাকা লাভ করেছিলেন। তিনি কোনক্রমে সামলিয়ে উঠেছিলেন কিন্তু ভবানীপ্রসাদ ও হরপ্রসাদের এই মামলায় নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম হয়েছিল।

মাঝে কয়েকবারই ও বাড়ীর ছেলেদের পড়াশুনা বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে অর্থের অভাবে। হয় ইসকুলের মাইনে বাকী পড়েছে আর নয় তো বই কিনতে পারে নি। শংকরীপ্রসাদ তার প্রতি ওদের সকলের দুর্ব্যবহার ও নির্যাতনের কথা ভুলে মনোরঞ্জন, চিত্তরঞ্জন ও কালীরঞ্জনের পড়ার জন্য মাঝে মাঝে অর্থসাহায্য করে গেছেন। রঞ্জনের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফি তিনি না দিলে তার পরীক্ষাই দেওয়া হত না।

যাদের বিরুদ্ধে তিনি মামলা চালাচ্ছিলেন তাদের বাড়ীর ছেলেদের পড়ার খরচও তিনি দিয়ে গেছেন। এই আপাতঃ বিরুদ্ধ কাজগুলো তিনি করতে পেরেছিলেন তার কারণ তিনি মামলাবাজ লোক ছিলেন না। তিনি মুলতঃ একটা নীতির জন্য আইনের আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর নীতির জন্যই ঐ বিরুদ্ধ কাজগুলো করতে পেরেছিলেন।

কিন্তু বানরের পিঠে ভাগের সেই গল্পের মত নীট লাভ যা হবার তা হয়েছিল রমাপ্রসাদ এবং তার পরিবারের। মামলায় তাঁদের বলতে গেলে এক আধলাও খরচ হয় নি। ছেলেদের পড়ার জন্যও ঐ সময়ে এক কপর্দ্দক খরচ হয় নি। আর সংসারে অভাব হলে প্রয়োজনমত সাহায্য অনায়াসেই তারা পেয়েছেন শংকরীপ্রসাদের কাছ থেকে। মামলার রায়ে প্রাপ্তির সিংহভাগ তারই হয়েছিল। তিনি মোহন্তগিরির অর্দ্ধেক অংশীদার বলে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। আপন বাস্তুর উপরও তার অধিকার স্বীকৃত হল। এত বা ক'জনের ভাগ্যে হয়?

অথচ ভাগ্যের ফেরে শংকরীপ্রসাদেরও একদিন দুর্দিন এলো। এমন সময়ও এসেছিল যখন নীলুর পড়াশুনাও বন্ধ হবার যোগাড়। ভাগ্য বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ব্যবসার মুলধন তার গেল, গেল অনেক বিষয় সম্পত্তি। সুন্দরবনের সম্পত্তিও সাঁতেশ মাম্না মেরে দিল।

দেশের অর্দ্ধেক জমি বিক্রী হল। প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়লেন তিনি। সেই দুর্দিনে ভাগ্যের মত রমাপ্রসাদেরাও তার সঙ্গে চরম বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিলেন। আর্থিক সাহায্য তো দূরের কথা বিন্দুমাত্র নৈতিক সাহায্যও তিনি তাদের কাছ থেকে পান নি।

উপরন্তু ভবানীপ্রসাদ কর্তৃক প্ররোচিত এক মিথ্যা টাকার মামলায় রমাপ্রসাদই ওপক্ষে গিয়ে শংকরীপ্রসাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে এল কোর্টে। ফলে শংকরীপ্রসাদকে প্রায় হাজার দশেক টাকার মত বিষয়-সম্পত্তি ও টাকা হারাতে হল। আর তখনই বুঝি ছিল নীলুর পড়ার শেষ বছর। শংকরীপ্রসাদ বসে পড়েছিলেন, এরপর ধরাশায়ী হয়ে অন্ধকার দেখলেন।

নীলুর মনে হয়, রমাপ্রসাদের চরিত্রের সঙ্গে একমাত্র মোহম্মদী বেগের চরিত্রের কিছুটা মিল আছে।

জীবন-সায়াহ্নে এসে শংকরীপ্রসাদ সমস্ত দুর্ভোগ এবং বিড়ম্বনাকে ভাগ্যের পরিহাস বা পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফলভোগ বলে মেনে নিয়ে-ছিলেন। তিনি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য রমাপ্রসাদ বা তার ছেলেদের কোন শাস্তি দিতে চান নি বা মুখে কখনও তাদের অমঙ্গল কামনাও করেন নি। নীরবে নিজেকে নিয়তির হাতে সঁপে দিয়েছিলেন।

ব্যর্থতার জ্বালা ইষ্টদেবতার পায়ে নিবেদন করে তিনি সার্থক ও ধন্য হয়েছিলেন। মনে কোন গ্লানি না রেখেই তিনি নীরবে পৃথিবী থেকে সরে গিয়েছিলেন ঠিক অভিমানি শিশুটিরই মত। সে অভিমান পৃথিবীর কারোর উপর নয়, তা ছিল বিশ্বপিতার উপর।

নীলু তখনও ভগীরথ হয় নি। আজ স্মৃতিচারণ করতে বসে মানুষের এই দীনতার কথা ভেবে মনে বড় কষ্ট পায়। মানুষের যেখানে যতটুকু ভাল, সে শুধু ততটুকুই দেখতে চায়। কিন্তু তবু মানুষের খারাপটাও তার দৃষ্টিপথে আসে। নীলু সেগুলো দেখে মানুষের ভালোর জন্য, যদি সেগুলো রূপায়িত করলে মানুষের উপকার হয়। তার মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস লিখেছিলেন মানুষকে অবৈধ প্রেমে উৎসাহিত করার জন্য নয়, বরং তা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য।

এসব অনেক পরের ঘটনা। আপাততঃ ১৯৪৬ সালে আবার ফিরে আসা থাক।

সে বছরের শেষে নীলু ক্লাশের বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে অষ্টম শ্রেণীতে উঠল। নারায়ণই প্রথম হয়েছিল আর শান্তিপদ তৃতীয়। দেখা গেল, বাংলা ও ইতিহাসে নীলু সর্বোচ্চ নম্বরগুলি পেয়েছে। সংস্কৃতে তৃতীয় কিন্তু ভূগোলে কোনক্রমে পাশ।

ভূগোলে পাশটা হত না, যদি না নবনী কিছু প্রশ্ন আগে থেকে তার কাছে ফাঁক করে দিত। নবনী ছিল ভূগোলের মাষ্টারমশাইয়ের ভাইপো। নবনীর গানের গলা খুব সুন্দর ছিল! নীলু নবনীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইত। তাদের মধ্যে ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। নবনী কাকার তৈরী প্রশ্নপত্র ছাপার আগে কোনক্রমে কিছু দেখে ফেলেছিল।

অংকের উত্তরে নীলু প্রচুর ভুল করেছিল। এই অংকে আর ভূগোলে নীলুকে নারায়ণ একেবারে ধরাশায়ী করে দিয়েছিল।

বলা বাহুল্য, নীলু শত চেষ্টাতেও হরিপুর হাই ইসকুলে নারায়ণকে তার প্রথম স্থান থেকে হটাতে পারে নি। তবে সুস্থ প্রতিযোগিতার গুণে সে নিজেও তার দ্বিতীয় স্থান ছেড়ে নীচে নামে নি।

এলো ১৯৪৭ সাল। ঘরে ঘরে কিশোর এবং যুবকদের মধ্যে একটা যেন সাজ-সাজ ভাব পড়ে গেল। সুরু হল লাঠিখেলা আর দেহচর্চা। দেশটা নাকি শেষ পর্যন্ত ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এক ভাগে থাকবে নাকি হিন্দু আর একভাগে মুসলমান। নীলু ভেবে পেত না, তার পাশের গায়ের মুসলমানগুলো তবে যাবে কোথায়? তাদের গাঁয়ে অবশ্য কোন মুসলমানদের বাস ছিল না।

শোনা যেতে লাগল, কোলকাতায় নাকি হিন্দু মুসলমানে মস্ত দাঙ্গা বেধেছে। উভয় সম্প্রদায়ই উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের যেখানে পাচ্ছে সুবিধামত নির্বিচারে খুন করছে। তাদের গাঁয়ে বা পাশাপাশি গাঁয়েও কোনদিন বিবাদ লেগে যেতে পারে। অতএব কিছুটা প্রস্তুতি থাকা দরকার। সকলের ভাব যেন এই, মরতে হলে অন্ততঃ লড়াই করে মরা ভাল।

মুক্তিদার পরিচালনায় নীলুদের গাঁয়ে কিশোরদের লাঠিখেলা ও শরীরচর্চার একটা দল তৈরী হল। ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে ওস্তাদেরা সপ্তাহে একদিন করে এসে তাদের লাঠিখেলা, ডন্, বৈঠক, কুস্তি, শূন্যে ডিগবাজীর কসরত এবং যোগাসন ইত্যাদি শিখিয়ে যেতে লাগলেন। মুক্তিভূষণের পরিচালনায় কিশোরদের দল সে সবের অনুশীলন করে যেতে লাগল।

হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা সেবার নীলুদের দেশে ঘরে বাধেনি। আজ পর্যন্ত কোনদিনই বাধে নি। তবু দাঙ্গার ভয়ে যে শরীরচর্চা তারা সেদিন সুরু করেছিল তার সুফল তারা পেয়েছিল। আর কিছু না হোক, সকলের শরীরটা তো ভাল হয়েছিল। শরীরচর্চার সেই রেওয়াজটা সেই থেকে আজও পর্যন্ত নীলুর অল্পবিস্তর রয়ে গেছে। এটা কম ভালো কথা নয়।

এই সময় সকলকে নিয়ে প্রবোধদা একটা ক্লাবঘর তৈরীর আহ্বান দিলেন। প্রবোধদা সেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন নি। টেষ্টে ফেল করে তিনি দশম শ্রেণীতেই আবার পড়ছিলেন। ছাত্র হিসাবে তিনি খুব ভাল না হলেও চরিত্রমাধুর্যে তিনি সকলের আদরণীয় ছিলেন। প্রচুর সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল তার।

কিছু চাঁদা তিনি তুলে ফেললেন। নীলুদের পাঠশালার সেই পুকুরের এক পাড়ে ক্লাবঘরের স্থান নির্বাচন করা হল। জায়গাটা ছিল পুর্ণেন্দু কাকাদের। তারা সানন্দে ছেলেদের ক্লাবঘরের জন্য জায়গাটা দিয়ে দিলেন। তারপর প্রবোধদা সকল ছেলেদের শ্রমদান করার আহ্বান দিলেন। চাঁদার অর্থে কিছু মালমশল্লা কিনলেন। লোকজনও কিছু লাগালেন। মাসদুয়েকের মধ্যে সুন্দর এক ছিমছাম ক্লাবঘর দাঁড়িয়ে গেল। তার নাম রাখা হল 'শাপলা পল্লীসেবক সংঘ'। প্রবোধদা হলেন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আর মুক্তিদা সেক্রেটারী।

মুক্তিদা একটু আদর্শবাদী ছিলেন। তিনি ভারত সেবাশ্রম সংঘে চাঁদা পাঠিয়ে নিয়মিত সংঘের 'প্রণব' পত্রিকাটি আনাতেন। ঐগুলো তিনি সকলকে পড়তে দিতেন, আর সকলকে ব্রহ্মচর্য পালনের নির্দেশ

দিতেন। নীলু আস্তে আস্তে কখন যেন মুক্তিদার একান্ত গুণগ্রাহী শিষ্য হয়ে গেল।

মুক্তিদার নির্দেশমত নীলু স্নান করে চুল আঁচড়াও না। রোজ মাটি দিয়ে দাঁত মাজতে লাগল। অবশ্য এ সব অভ্যাস খুব বেশীদিন চলে নি। কিন্তু ব্রহ্মচর্য কি এবং কেন সে সম্বন্ধে তার এক সম্যক ধারনা হয়েছিল। মুক্তিদাই শিখিয়ে ছিলেন সকল মেয়েকে মায়ের মত মনে করতে হবে, সব সময় মেয়েদের পায়ের দিকে তাকাতে হবে।

নীলু যে মুক্তিদার সব কিছু নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছে এতবড় কথা সে বলতে পারে না। কিন্তু মুক্তিদা অন্তত: ঐ বয়সে তাকে বিপথে যাওয়ার হাত থেকে অনেকখানি বাঁচিয়েছে, একথা ঠিক নীলুর সঙ্গীদের মধ্যে খারাপ প্রকৃতির ছেলেরও অভাব ছিল না। সেজন্য নীলু আজো মুক্তিদার কাছে কৃতজ্ঞ।

এখন খেলাধূলা যা কিছু হয়, তাই ক্লাবঘরের সামনের ফাঁকা মাঠে। ওপার থেকে জেঠতুতো দাদারাও আসে। কিন্তু নীলু তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। তবু খেলতে খেলতে মাঝে মাঝে দৈবাৎ দু'চারটে কথা হয়ে যায়। নীলুর ইচ্ছা যায়, ওদের সঙ্গে আগের মত প্রাণ খুলে কথা বলতে কিন্তু পারে না। মনে পড়ে যায় তার বাবার সেই রক্তাক্ত শরীরের কথা। মায়েরও নির্দেশ এবং কঠিন দিব্য ছিল, কোনদিন যেন সে বিপক্ষের দাদাদের সঙ্গে লাঠি না খেলে। বিশ্বাস কি, হয়ত খেলার ছলে মাথায় লাঠি বসিয়ে দিল, এই ছিল মায়ের সাবধান বাণী। একদিন খেলার মাঠে প্রানেশ এসে তার সদ্য শোনা একটা কোলকাতার ছড়া শোনাল সকলকে :—

'হাতমে বিড়ি, মুখমে পান।
লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান।।'

ছড়ার শেষে প্রানেশ স্বরচিত অংশও যোগ করে বলে—

'লাঠি খেল নও-জওয়ান।'

বলেই প্রানেশ নীলুর মাথা আক্রমন করে লাঠির আঘাত করতে

উদ্যত হয়। নীলু সঙ্গে সঙ্গে তার লাঠি দুহাতে ধরে প্রানেশের মার প্রতিহত করে। অবশ্য ঐ লাঠির ঘাত প্রতিঘাত খেলারই অঙ্গ।

পাকিস্থান কথাটার নাম নীলু ইদানিং শুনেছে বটে। বোধ হয়, কান্তিজেঠা এসে বলে থাকবেন। ওটা নাকি হবে মুসলমানদের দেশ। ভারত ভেঙ্গে ভাগ করে হিন্দু ও মুসলমানদের আলাদা আলাদা আস্তানা তৈরী হবে কেন? নীলু ভেবে পায় না, এতকাল যদি হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে বাস করে আসে তো আজ কি এমন অসুবিধা হল যে আলাদা আলাদা থাকতে হবে?

নীলুর ভাবনার মাঝে প্রাণেশ বলে চলেছে সোৎসাহে যে ছড়াটা আজ ইংরাজী মাষ্টার এসে তাদের বাড়ীতে শুনিয়ে গেছেন। ইংরাজী মাষ্টার এখন মস্ত ডাক্তার হয়েছেন। মাষ্টারী আর করেন না। তিনি নাকি দেখতে আরো সুন্দর হয়েছেন। কোলকাতায় ঠন্‌ঠনিয়া না কোথায় যেন তাঁর বাসা। ওখানে হিন্দুরা মুসলমানদের একেবারে কচুকাটা করে ছেড়েছে। আবার কলাবাগান ও হাতিবাগানে মুসলমানেরা হিন্দুদের উপর বদ্‌লা নিয়েছে। এখন অবস্থা কিছুটা শান্ত। দেশ ভাগ না হলে একেবারে শান্ত হবে না। আবার নাকি যে কোনদিন আগুন জ্বলে উঠতে পারে। কোলকাতায় এখন থমথমে ভাব। তাহলেও নাকি গঙ্গায় দু'চারটে লাশ রোজ ভাসছে। প্রানেশ নীলকে লাঠি খেলতে ডাকে। নীলু খেলবে না বলে। সে বলে, তার হাতে ব্যথা লেগেছে।

আসলে ব্যথা লেগেছে তার মনে। সে ভেবে পায় না, কি করে একজন আর একজনকে অকারনে খুন করতে পারে। নীলু ভাবতে থাকে ইংরাজী মাষ্টারদের গাঁয়ের হানিফ চাচা, যে তাদের খাসি কেটে মাংস দিয়ে যায়, যে বাবার কাছে অনেক রসের গল্প করে, সে কি কোনদিন তার খাসি কাটা ছুরিটা বাবার পেটে চালিয়ে দিতে পারে? অথবা তারই সহপাঠী বন্ধু উজীর শেখ? যার বাড়ীতে গিয়ে সে তার মায়ের দেওয়া শশা বা কলা খেয়ে আসে, পারে সে কি নীলুর মাথাটা লাঠি মেরে গুড়িয়ে দিতে? অসম্ভব, নীলু ভাবে, এ অসম্ভব।

রাসু লাঠি খেলছে বড়দার সঙ্গে। আজকাল বাবা-মার নির্দেশ অমান্য করে ও মাঝে মাঝে বড়দার সঙ্গে লাঠি খেলে। তাদের মধ্যে বহুকালের প্রনয়। সেই টানে ওবা মাঝে মাঝে কাছাকাছি সরে আসে। নীলুর সাহস হয় না ওদের সাথে খেলার। সহসা তার মনে হয়, অসম্ভব কিছুই নয়, সবই সম্ভব। তারই বংশে ভায়ে ভায়ে যদি স্বার্থের কারণে মারামারি, রক্তারক্তি ঘটতে পারে তবে হিন্দু মুসলমানে কাটাকাটি না হবার কি আছে ? উজীর শেখ তার যত বন্ধুই হোক্, জেঠতুতো ভাইদের চেয়ে আপন নয়। অতএব উজীর তাকে আঘাত করতে পারে বৈকি ?

কিন্তু পরক্ষনেই আবার নীলু ভাবে, ভায়ে ভায়ে আলাদা হয়ে বাস করলেই কি সব বিরোধ মিটে যায়, না নতুন করে কোন বিরোধ গজিয়ে ওঠে না ? তাহলে তার বাপ-জেঠাদের মধ্যেই বা কেন হল ? হিন্দু মুসলমানের আলাদা হয়ে বাস করলেও যে একজন গিয়ে আর এক-জনের মাথা ফাটিয়ে আসবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কি আছে ?

বরং পাশাপাশি থাকলে মুখ দেখাদেখি হতে হতে বিবাদটা মিটেও যেতে পারে। ঐ তো রাসু যেন কিছুটা মিটিয়ে নিয়েছে বলে. মনে হয়। নীলুরও ইচ্ছে হয়, সেও দাদাদের সঙ্গে খেলে, কথা বলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাবার মাথা ফেটে কপাল ও গালের উপর রক্ত ঝরে পড়ার দৃশ্যটা স্পষ্ট হয়ে মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। তার রক্ত গরম হয়ে ওঠে। হাতের লাঠিটা সে ছুড়ে ফেলে দেয় দূরে। নিজেকে যেন তার বিশ্বাস হয় না, সে হয়ত অতর্কিতে পেছন থেকে বড়দার মাথায় আঘাত করে বসতে পারে। বিষন্ন মনে সে ভাবে. এই বিশ্বাসের অভাবেই দেশটা ভাগ হতে চলেছে।

॥ ২৩ ॥

হিন্দু-মুসলমান ঠিক কিভাবে দেশটাকে ভাগ করতে চাইছে, কি হবে সেই খণ্ডিত দেশের চেহারা, সেই খণ্ডিত দেশ দুটিতে হিন্দু মুসলমান আবার একসঙ্গে মিলেমিশে থাকবে কিনা বা সব মুসলমান এক অংশে থাকবে আর সব হিন্দু অপর অংশে থাকবে কিনা এতসব খবর নীলু সঠিক জানে না। কিন্তু সেটা মোটামুটি কি রকম হতে যাচ্ছে তার একটা রূপরেখা নীলুর চোখের সামনে হঠাৎ একদিন প্রতিভাত হল এক অভাবিত ঘটনায়।

একদিন সকালে বাইরের বারান্দায় বসে নীলু ইসকুলের পড়া তৈরী করছে। প্রবোধ দা সকালবেলা তাদের পড়াতে আসেন। তিনি তখন দশম শ্রেণীতেই পড়েন। বাড়ীতে পড়াবার জন্য মাষ্টার পাওয়া যাচ্ছে না। ইংরাজী আর অংকের জন্য একজন মাষ্টার দরকার। তাই বাবা প্রবোধ দাদাকেই নীলুদের জন্য ঠিক করলেন। তিনি নীলুদের জটিল বিষয়গুলি বুঝিয়ে দিতেন আর ঐ ফাকে ফাকে নিজের পড়াও তৈরী করতেন। সেদিন প্রবোধ দাও রয়েছেন নীলুদের পড়ার কাছে। তারা বসেছে মাটির মেঝেতে মাদুর পেতে। আর শংকরীপ্রসাদ পাশে খাটের উপর বসে ব্যবসার খাতাপত্রে হিসাব-নিকাশ করছেন।

ঠিক এই সময়ে এল নীলুর মেজ জেঠার দুই ছেলে—চিত্তরঞ্জন ও মনোরঞ্জন। চিত্তরঞ্জনকে নীলু বড়দা আর মনোরঞ্জনকে মেজদা বলে ডাকে। নীলু অবাক হয় ওদের দেখে। ওদের আসার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে কিছু শংকিত হয় সে। প্রবোধদা ও রাসু অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকান। শংকরীপ্রসাদও হিসেব ভুলে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ওরা বারান্দায় উঠে পড়তেই তীব্রস্বরে শংকরীপ্রসাদ বলেন—কি ব্যাপার, তোমরা? লাঠি দিয়ে তোমাদের বাবা আমার মাথা ফাটিয়েছে এবার কি তোমরা ছুরি নিয়ে এসেছ আমার পেটে চালাবে বলে?

ওদের দুজন সে কথার কোন জবাব না দিয়ে সহসা শংকরীপ্রসাদের পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। কাকার পা ধরে চিত্তরঞ্জন কাঁদতে কাঁদতে বলে—কাকা আমরা পাপ করেছি, আমরা অনুতপ্ত। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন, আপনি আমাদের শাস্তি দিন। আপনার পায়ের চটি দিয়ে মারুন।

শংকরীপ্রসাদ এ দৃশ্যের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বিব্রত বোধ করেন। দুভাইকে হাত ধরে তুলে নিজের পাশে বসান তিনি। কিছু পরে তিনি তাদের দিকে চেয়ে বলেন—কি চাও তোমরা ঠিক করে বলো তো।

মনোরঞ্জন বলে—কিছু না কাকা, আপনি আমাদের শুধু ক্ষমা করুন। বাবা জেঠাদের প্ররোচনায় আমরা পশুর মত কাজ করেছি। আপনি ক্ষমা না করলে আমরা শান্তি পাচ্ছি না, কাকা।

শংকরীপ্রসাদ এবার সকৌতুকে বলেন—বাবা জেঠার প্ররোচনায় মাথা ফাটিয়েছ। অবশ্য তোমরা কেউ আমার মাথা ফাটাও নি, ফাটিয়েছেন তোমাদের বাপ—আমার পূজ্যপদ মেজদাদা। তোমরা তোমাদের বাপকেই অনুসরণ করে তোমাদের জ্ঞাতি ভাই-এর মাথা ফাটিয়েছ। তা সে কথা যাক, আজ যে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছ সেও কি বাবা জেঠাদের নির্দেশে?

চিত্তরঞ্জন প্রবলবেগে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে ওঠে—না,—না কাকা, না। মোটেই তা নয়। বরং উল্টোই। আমরা বাবা জেঠাকে অনেক করে বুঝিয়েছিলাম যে কাকার সঙ্গে বিবাদটা মিটিয়ে নিন। আপনার ন্যায়তঃ এবং আইনতঃ যা প্রাপ্য তাও দিয়ে দিতে বলেছি। জেঠা কিছুটা রাজী হলেও বাবার একেবারে দুর্যোধনের মত পন! তাই আপনাকেও বলতে পারছি না, আপনি বিবাদ মিটিয়ে নিন।

শংকরীপ্রসাদ গম্ভীর মুখে বলেন—বললেও করতাম না।

চিত্তরঞ্জন বলে—সে যাই হোক, আপনারা ভায়ে ভায়ে যা করার করুন। আমরা ভায়ে ভায়ে আপনাদের মধ্যে পড়ে গিয়ে কিছুটা বিবাদ করেছি। আমরা সে বিবাদটা মিটিয়ে নিতে চাই। নীলু

আমাদের সঙ্গে কথা বলে না। আমরাও বলতে পারি না। আমরা চাই না যে আমরাও বড় হয়ে এরকম বিবাদ করি। কিন্তু আমরা ভায়ে ভায়ে মিলতে পারছি না আপনি আমাদের না ক্ষমা করলে।

চিত্তরঞ্জন চুপ করে যায়। শংকরীপ্রসাদ কথা বলছেন না। তিনি এই মুহূর্তে কি ভেবে চলেছেন তা বোঝা যাচ্ছে না। তার নাসারন্ধ্র ফুলে ফুলে উঠছে। তা দেখে বোঝা কঠিন তার মনে রাগ জমেছে, না অভিমান।

তিনি কিছু বলছেন না দেখে মনোরঞ্জন কাকার পা আবার জড়িয়ে ধরে বলে—কাকা, আমরা আপনাদের কাছে নীলুরই মত। কাকীমা আমাদের পেটে ধরেন নি বলে কি আমরা নীলুর মত হতে পারি না?

ঠিক এই মুহূর্তে নীলুর চোখে জল এসে যায়। নীলু চোখের জল সন্তর্পনে মুছে বাবার দিকে তাকিয়ে দেখে সেখানেও জল জমেছে—গড়িয়ে পড়ার অপেক্ষা। সহসা শংকরীপ্রসাদ ওদের দুজনকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন এক বয়স্ক শিশুর মত। ওরা দুজন কাকার কোলে মুখ রেখে দিব্যি কাকার স্নেহস্পর্শ পেতে লাগল।

বড় হবার পর বাবা নীলুকে এভাবে আর আদর করেন নি। তাই সে এখন বড়দা ও মেজদার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে যেন। দরজার দিকে চেয়ে দেখে মাও কখন দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনিও চোখের জল মুছছেন। প্রবোধদা ও রাসুর চোখেও জল। নীলুর চোখে এবার অশ্রুর ঢল নামে।

দুঃখে মানুষ কাঁদে, এতো নীলু দেখেছে। কিন্তু ভালোবাসা যে এমন করে আত্মীয়, অনাত্মীয়, ছোটবড় সকলকে কাঁদাতে পারে সে উপলব্ধি নীলুর ছিল না। আজ প্রথম হল।

কাঁদায় যে এত সুখ তাই বা কে জানত? এর আগে নীলুর উপলব্ধি হয়েছিল বিরহের জ্বালা সইতে সুখ। কিন্তু কেন যে সুখ তার উপলব্ধির সবটা বুঝি তখনও হয় নি। আজ এই মুহূর্তে যেন বাকী উপলব্ধিটুকু তার হল।

নীলু বুঝতে পারে, তার ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল—এর

কারণ হল, ভালোবাসার লোক হারিয়ে গেলে বিরহ আসে কিন্তু ভালোবাসার লোক হারিয়ে যায় না, ভালোবাসাও মরে না। তাই বিরহ মানুষকে কাঁদায়—ভালোবাসার জ্বালায় কাঁদিয়ে যায়।

কিছু পরে শংকরীপ্রসাদ চোখের জল মুছে তার ভাবাবেগও বুঝি মুঝে ফেলেন। চিত্তরঞ্জন ও মনোরঞ্জন প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠে শান্ত হয়ে কাকার পাশে বসে থাকে। এক পশলা বৃষ্টির পর আকাশ যেন প্রশান্ত হয়।

শংকরীপ্রসাদ তখন শান্তস্বরে বলেন—দেখ, মামলা আমি করেছি, সে কথা ঠিক। কিন্তু তার জন্য আমি দায়ী নই, যদিও জানি তার ফলভাগী আমাকেও হতে হবে, হয়ত বেশী করে। মামলাটা বলতে গেলে আমাদের ভায়ে ভায়ে। কিন্তু তাই বলে তোমাদের ভাইদের সে মামলার ভেতর টেনে আনা আমার কখনই উদ্দেশ্য নয়। আমি চাই তোমরা প্রকৃত মানুষ হও। উত্তরকালে তোমাদের ভায়ে ভায়ে যেন এরকম কোন মামলা বা কোনরকম মনোমালিন্যের কারণও না ঘটে। তাই আমি চাই তোমরা পড়াশুনাটা কর। যা কিছু বিষয়ের বিষ ইতিমধ্যে তোমাদের মধ্যে ঢুকে গেছে তা আমার বিশ্বাস, প্রকৃত শিক্ষার আলোকে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। আমার দৃঢ় ধারনা সে শিক্ষা পেলে তোমাদের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব কোনদিন ঘটবে না।

শংকরীপ্রসাদ কিছুক্ষন থামলেন। পরে নতমুখ দুই ভাই এর দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন—তোমাকে পড়াশুনায় যদি কোনদিন অর্থাভাব ঘটে, অকপটে আমার কাছে এসো। আমি সব সময়েই সাহায্যের হাত বাড়াতে প্রস্তুত। নীলুকে আমি মানুষ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। ওকে এই বিষয়ের বিষ থেকে সর্বপ্রকারে মুক্ত রাখার চেষ্টা করে চলেছি। মেজদার ছেলেদেরও মানুষ করার ভার আমি নিয়েছি। তোমাদেরও কিছুটা ভার আমি নেব, কথা দিলাম। চিত্তরঞ্জন বলে ওঠে—কাকা এত বেশী আমরা আশা করি নি। আমরা সোনা চাইতে এসে মানিক পেলাম।

শংকরীপ্রসাদ বলেন—তোমরা ভাল হলে আমার কাছে সব পাবে।

জানি না, এভাবে একা আমি এত ভার কতদিন বইতে পারব। যতক্ষন পারব, নিশ্চয়ই চালিয়ে যাব। আমি তোমাদের এই মুহূর্তে ক্ষমা করছি, শুধু এই আশায় যে আজ তোমাদের মধ্যে যে প্রকৃত জ্ঞানের আলো জ্বলে উঠতে দেখলাম তা যেন চিরকাল ধরে এমনিভাবে জ্বলে। জানি না, কে তোমাদের মধ্যে এই আলোর শিখা জালালেন। কিন্তু তোমরা আমাকে কথা দাও, এই আলোকে তোমরা কিছুতেই নিভতে দেবে না, উত্তরোত্তর তাকে আরো উজ্জ্বল করে যাবে। কথা দাও।

তুই ভাই দৃঢ়স্বরে কাকার পা ছুঁয়ে বলে—কথা দিলাম কাকা। এই আপনার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম। পরে একটু থেমে চিত্তরঞ্জন বলে আপনাদের ভায়েদের কোন ব্যাপারে আমরা আর নাক গলাতে যাব না। বাবা জেঠারা বললেও না। কিন্তু আপনি যদি এতই দয়া করে আমাদের ক্ষমা করলেন তবে আর একটু দয়া করুন। নীলুকে আমাদের সঙ্গে মিশতে বারন করবেন না আর। আমরা ভায়ে ভায়ে এখন থেকেই সদ্ভাবে থাকি, আপনাদের ভায়ে ভায়ে যত অসদ্ভাবই থাকুক না কেন।

শংকরীপ্রসাদ মৃদু হেসে বলেন—বেশ, দিলাম কথা। তবে আরো এক কথা—নীলু তোমাদের বাড়ীতে যাবে না, তোমাদের বাড়ীতে কোন কিছু খাবে না। ওপারে গেলে শিবের মন্দিরের চাতালে তোমাদের সঙ্গে খেলতে পারে। অন্য সব জায়গায়ও তোমাদের সঙ্গে খেলতে পারে, মিশতে পারে। শুধু তোমাদের বাড়ীতে নয়।

মনোরঞ্জন বলে—বুঝেছি কাকা কেন আপনি একথা বলছেন। শংকরীপ্রসাদ বলেন—না বুঝতে পার নি। বলি কারণটা। সেটা অন্য কিছু নয়, যে বিষয়ের বিষকে আমি এত ভয় করি, তোমার বাবা জেঠাদের কাছে ও সেই বিষে প্রভাবিত হতে পারে। আমার বাড়ীতে তোমরা নির্ভয়ে এসো। আর যাই হোক, ও বিষ তোমাদের আমি দেব না। আমার মনের যে প্রসারতা আছে তা তোমার বাবা জেঠাদের নেই। ওদের কূপ-মণ্ডুকতা আমি ভালো করেই জানি। তোমাদের বাপ চিরকাব পণ্ডিতী-বিধান দিয়ে আর তোমাদের জেঠা লোকের

বিচার করে এমনই মাতব্বর সেজে বসে আছে যে, তাদের মাতব্বরী জগতের বাইরেও যে মানুষের বৃহত্তর জগৎ রয়েছে, তা ওদের আজো জানা নেই। তা যদি থাকত তবে কখনই ওরা তোমাদের হাতে লাঠি তুলে দিতে পারত না। আমি ওদের ভাল করেই চিনি। আমার ভাইদের আমি চিনব না? চিত্তরঞ্জন বলে ওঠে—ঠিক আছে, থাকা, আমরা আপনার আদেশ অমান্য করব না।

শংকরীপ্রসাদ আরো বলেন—আর আমাদের ভায়ে ভায়ে যা হচ্ছে হোক। সে নিয়ে তোমাদের যেন বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা না থাকে। আমি পিছিয়ে আসতে পারি না। মনে রেখো, পঞ্চপাণ্ডব বনবাসে, অজ্ঞাতবাসে গিয়ে এবং ইন্দ্রপ্রস্থে চলে গিয়েও, কোনক্রমেই দুর্যোধনের সঙ্গে বিরোধ এড়াতে পারেন নি। আজ কেউ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্য পাণ্ডবদের দায়ী করে না। কিন্তু যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়ে পঞ্চপাণ্ডব যদি কাপুরুষের মত আপন অধিকার বিসর্জন দিয়ে পিছিয়ে আসত তাহলে লোকে তাদের হীনবীর্য, কাপুরুষ ছাড়া কিছুই বলত না। বরং উল্টে দুর্যোধনের ক্ষাত্রতেজের জয়গান ভারতভূমি মুখরিত হত।

—যুদ্ধে জয়ী হয়ে পাণ্ডবেরাও কম হীনবল হয় নি, কম প্রিয়জন হারায় নি। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের অক্ষয় সম্মানলাভও তো পেয়েছেন—এতো সত্যি কথা। অতএব আমিও কাপুরুষের মত পিছিয়ে আসতে পারি না। তবে এক্ষেত্রে আমিও এগিয়ে যাই নি। মনে রেখো, পাণ্ডবেরা শেষে শুধুমাত্র পঞ্চগ্রাম চেয়েও পায় নি। আমিও শুধুমাত্র আমার কুলদেবতার পূজা করতে চেয়েছি, অন্য কিছু নয়। তাও পাই নি, একালের দুর্যোধন, দুঃশাসনদের কাছে। এ ক্ষেত্রে আমার পিছিয়ে আসার চেয়ে মৃত্যুও ভালো। আমি কোনদিন কাপুরুষ ছিলাম না। জীবনযুদ্ধে পিছিয়েও আসি নি। আজো আসতে আমি পারি না। যাক্ সে সব কথা, আমাদের যা হবার হবে কিন্তু তোমরা প্রকৃত মানুষ হও। ক্ষুদ্রস্বার্থবুদ্ধি যেন তোমাদের গ্রাস না করে।

সেই থেকে নীলুদের ভায়ে ভায়ে আগের মত ভাব হয়ে গেল। কোন বাধাই আর তাদের মধ্যে রইল না। শুধু একটিই বাধা, তা হলো

বড়জেঠাদের বাড়ীর ভেতরে নীলু যেতে পারবে না। কিন্তু সেজজেঠাদের বাড়ীতে যাবার কোন বাধা তার ছিল না বা শিবের মন্দিরের সামনের চাতালে একসঙ্গে খেলাধুলা করায়ও কোন বাধা ছিল না।

ক্রমে সম্প্রীতি আরো বাড়ল। নীলু পুরানো বাস্তুতে এলে আবার আগের মতই সাড়া পড়ে যেত, যেন সকলের কত প্রিয়জন এসেছে। দাদারা তার জন্য আগের মত ডাব পেড়ে দিত। বড়জেঠাইমা দুধ আর গুড়ের বাটি এনে নীলুকে বাড়ীর ভেতরে যেতে সাধাসাধি করত। নীলু কিছুতেই যেতে চাইত না। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়েই নিজের হাতে নীলুকে দুধ আর গুড়টুকু খাওয়াতেন।

আর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলতেন—তা তো আসবি না। তোর বাপ যে না করেছে। তুই তো তোর বাপের কথাই শুনবি। কিন্তু তোর বাপও যে আমার ছেলে, জানিস? না হয় ভগবান আমার পেটে ছেলে দেন নি। কিন্তু জানিস, আমি যখন এ সংসারে আসি তখন তোর বাপও জন্মায় নি। কত পরে ও হল। ওকে কতদিন কোলে নিয়ে শুয়েছি, কতদিন ও আমাকে মা ভেবে আমার বুকে মুখ দিয়েছে। এই রে, এই বুক, ছ্যাখ।

বলতে বলতে বৃদ্ধা জেঠাইমা আঁচল সরিয়ে আপন স্তন্য নীলুকে দেখাতেন। নীলু লজ্জা পেয়ে পালাতে চাইত।

বড় জেঠাইমা পালাতে দিতেন না। বলতেন—আমার সেই ছেলে আমার কাছে আসে না। তাদের ভায়ে ভায়ে বিবাদ হতে পারে। তোদের ভায়ে মিল। খুব ভালো। কিন্তু আমাদের মায়ে ছেলে মিল হতে দোষ কি ছিল? সব নেমকহারাম, সব শত্তুর। তবু ওকে দেওর বলে ভাবতে হাসি পায়। ওতো আমার ছেলেই। ও আমার কাছে আসে না, এলে ছোটবেলার মত ওর কান ধরে ঠাস ঠাস করে চড় কষাতাম—ওর নেমকহারামির শাস্তি দিতাম।

নীলু আর দাঁড়াত না। কোনরকমে বাকী দুধটুকু এক চুমুকে শেষ করে দিত দৌড়। বড় জেঠাইমা পেছন থেকে চীৎকার করে বলতেন—ও নীলু আজ পুকুরে মাছ ধরা হবে। খেয়ে যাস। লক্ষ্মী মানিক আমার বাবা আমার—।

বড় জেঠাদের পুকুরে জাল দেওয়া হচ্ছে। দেওয়া হচ্ছে সেজ জেঠাদের পুকুরেও। নীলুর মাছ ধরায় খুব নেশা। পারুক্ আর নাই পারুক, জলে সে নামবেই। সারা গায়ে কাদা সে মাখবেই। দেখে মনে হবে; সব মাছ বুঝি সে একাই ধরবে। নীলু জেঠতুতো দাদাদের সঙ্গে জেঠাদের পুকুর দাপিয়ে বেড়ায়।

মেজ-জেঠা কড়া লোক। মামলা সুরু হবার পর থেকে তিনি আর নীলুর সঙ্গে কথা বলেন না। তিনিও পর্যন্ত নীলুর জলে পড়ার বাড়াবাড়ি দেখে মেজ জেঠাইমাকে বলেন—ও মেজবৌ, তোমরা কেউ দেখছ না, নীলু কি রকম জলে মেতেছে। সর্দি হয়ে অসুখ-টসুক বাধাবে যে।

সোজাসুজি তিনি নীলুকে কিছু বলেন না। কিন্তু নীলু বোঝে মেজজেঠার তার প্রতি টান বিন্দুমাত্র কমে নি। মেজজেঠা বেশী বিরক্ত হবেন বলে ভয়ে ভয়ে সে জল থেকে উঠে শুকনো গামছা দিয়ে গা, হাত, মাথা মোছে। সেজজেঠার বাড়ীতে শ্রীকান্ত দারাও অনেক মাছ ধরেছে। সেজ জেঠাইমা রন্ধনে একেবারে দ্রৌপদী। কম তেলে অমন সুস্বাদু রান্না কি করে যে তিনি রাঁধতে পারতেন তা আজো নীলুর কাছে এক পরম বিস্ময়।

সেজজেঠার বাড়ীতে খেতে বসতেই ও বাড়ী থেকে বড় জেঠাইমা এলেন বাটিতে করে মাছের ঝোল নিয়ে। মস্তবড় রুই মাছের মুড়োর সঙ্গে আরো কয়েকটা মাছ। নীলুর পাতের সামনে নামিয়ে নামিয়ে রাখতে রাখতে তিনি বলেন—নে, খা। ও বাড়ীতে যখন খাবিই না, এ বাড়ীতে বসে ও বাড়ীর মাছের মুড়ো খা।

নীলু কিছুতেই রাজী হয় না। তখন বড় জেঠাইমা ব্যাকুল হয়ে বলে ওঠেন—ওরে হতভাগা খা', খেয়ে নে। তোর জেঠারা খাবে বলে সব বসে রয়েছে। আমি গিয়ে ওদের ভাত দেব। নীলু বলে—তুমি যাও না। এ বাটিও নিয়ে যাও।

বড় জেঠাইমা কৌতুকের হাসি হেসে বলেন—যাই কি করে? তুই মুড়ো না খেলে আজ কেউ ভাত খাবে ভেবেছিস? ওরে মুখ্যু, ছেলে না খেলে বাবারা কেউ খেতে পারে কখনও? পড়ে শুনে বিছের

জাহাজ, না হাতি হয়েছ। এই মুহূর্তে ও বাড়ির বারান্দা থেকে বড় জেঠার গলার আওয়াজ ভেসে আসে—ও বড় বৌ, নীলু মুড়ো খাচ্ছে ?

বড় জেঠাইমা মাথার চুল ছিঁড়তে থাকেন। কাতরস্বরে বলেন—এ্যাই ছাখ দেখি, কি আপদেই না ফেললি ! এখন কি বলি ? ওরে খা'। তুই না খেলে কর্তারা কেউ খাবে না। ছেলে না খেলে বাবারা খেতে পারে না। আর স্বামী না খেলে বৌয়েরা খেতে পারে বুঝি ? তোর বাঁদরামোর জন্য আজ আমাদের সকলকে এ বেলা নির্ঘাত উপোস করতে হবে। এমন সময় আবার বড়জেঠার গলা ভেসে আসে —কি হলো, বড়বৌ ? নীলু মুড়ো খাচ্ছে না ?

বড় জেঠাইমা ঢোঁক গিলে কোনমতে গলা পরিষ্কার করে বলেন—হ্যাঁ এই খাচ্ছে, তোমরা বস। আমি আসছি। ওখান থেকে বড় জেঠা আবার শাসিয়ে শাসিয়ে বলেন—হ্যাঁ, ওকে বলে দাও, ও মুড়ো না খেলে আমরা না খেয়ে শুয়ে পড়ছি।

—শুনলি তো তোর বড় জেঠার কথা ? বড় জেঠাইমা বলেন—এবারে তো বিশ্বাস হল ? এবার নিতে হয় নে, না হলে এক চড়ে তোর খাওয়া ঘুচাব হতভাগা বাঁদর। নীলু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কি করবে সে। সে স্নেহের আতিশয্যে মোমের মত গলতে থাকে। এমন সময় শ্রীকান্ত দা তাকে বাঁচিয়ে দিল। সে বেশ রসিয়ে রসিয়ে কথা বলতে পারে। শ্রীকান্ত দা বলে—বড়মা আমাদের একবার একটু বললেই নিয়ে নিতাম। তা যখন বললই না, নীলু তুই শুধু নিয়ে নে। তুই না খাস আমরা তো রয়েছি। তোকে খেতে হবে না। তুই শুধু নিয়ে নে। বড়মা বিদেয় হোক। তারপর আমরা দেখছি। নীলু হেসে ফেলে। বাটিটা কাছে টেনে নেয়। বড় জেঠাইমা যেতে যেতে হেসে ফিরে তর্জনী উঁচু করে শ্রীকান্তের দিকে চেয়ে বলেন—খবর্দার, তোরা ঐ মুড়োতে আজ ভাগ বসাবি না বলে দিলাম। তোদের অন্যদিন দেব।

একদিকে ভায়ে ভায়ে, মায়ে-ছেলে বা বাপে-ছেলে যখন এত মিল, এত ভাগাভাগি করে খাওয়ার ধুম তখন অন্যদিকে বড়দের ভায়ে ভায়ে

কথাবার্তা, মুখ দেখাদেখি বন্ধ। তাঁরা মামলা লড়ছেন বিষয়-সম্পত্তির ভাগাভাগির চুলচেরা হিসাব-নিকাশ নিয়ে আর তাদেরই উত্তরপুরুষেরা বিষয়-সম্পত্তির সব কিছু দিব্যি বিবাদ না করে ভাগ করে খেয়ে যাচ্ছে পরমানন্দে, দিনের পর দিন। বড়দের অভিযোগ, কে কত কম পেল তা নিয়ে কিন্তু ছোটদের অনুরাগ, কে কত বেশী দিতে পারল তাতেই। তাই বড়দের চিন্তা যেখানে কিভাবে গোটা মাছটাকেই খাওয়া যায়, সেখানে তাদেরই ছোটদের চিন্তা, কি করে মাছের ল্যাজার টুকরোটা নিয়ে আস্ত মুড়োটা অন্যের পাতে তুলে দিতে পেরে একটু মিষ্টি হাসি হাসতে পারে।

জেঠারা ধানগোলার হাঠে যেতে যেতে নীলুদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে যেতেন, পাছে শংকরী-প্রসাদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। দৈবাৎ চোখাচোখি হয়ে গেলে মুহূর্তে মুখ ঘুরিয়ে নিতেন। কিন্তু নীলুরা একজন আর একজনকে আধমাইল দূরে দেখতে পেলেও দৌড়িয়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে।

নীলু তার ছোটবেলায়—সেই ১৯৪৭-এ দেখেছে তাদের বংশের বিভিন্ন পরিবারের সকলের মধ্যে এই যোগ-বিয়োগ, মিলন-বিরহ বা অবিচ্ছেদ-বিচ্ছেদের কৌতুককর খেলা। আর সেই খেলাই সে যেন দেখতে পাচ্ছিল স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশ বিভাগের মধ্যে। দেশ বিভাগের মধ্যে। দেশ ভাগ হয়ে গেলেও দুই খণ্ডিত অংশে হিন্দু-মুসলমানেরা কিভাবে থাকবে তার রূপরেখা তখন তার কাছে অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

কবি, সাহিত্যিকেরা কালে কালে শিল্প-সাহিত্যে বলে আসছেন, হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই—তারা একই বৃন্তে ফোটা দুই ফুল। একই দেশজননী তাদের। একই জননীর স্তন্যধারায় তাদের দেহমন পুষ্ট। তাই যদি হয় তবে তারা শুধু পরস্পর পরস্পরকে ভালোই বেসে যাবে; এ অতি অবাস্তব চিত্র। ভায়ে ভায়ে কি শুধু ভালোবাসে? তারা মারামারি করে না? তারা একে অপরের মাথা ফাটায় না?

কিন্তু ওটাই তো শেষ কথা নয়। তারা আবার পরস্পর পরস্পরের

জন্য সম্প্রীতির হাতও বাড়ায়। দুটো মিলিয়ে এটাই তো স্বাভাবিক চিত্র। নীলু তো তাদের পরিবারে তাই-ই দেখেছে। ভায়ে ভায়ে ভাব আবার ভাবের অভাবও। কিন্তু সব মিলিয়ে সেই ভাবই। তা যদি না হত, তবে এক ভাই থাকত, আর এক ভাই থাকত না। শুধু বাদ করে থাকা যায় না। পাশাপাশি থাকতে গেলে নিজের জন্য সব জায়গা দখল করলে চলে না, অপরের জন্যও কিছু ছেড়ে দিতে হয়। অতএব নীলুর তখনই ধারণা হয়েছিল, আগামী দিনের সেই খণ্ডিত দেশেও ভায়ে ভায়ে দুই দেশেই পাশাপাশি বাস করবে।

রাগ করে যারা দেশ ভাগ করতে যাচ্ছেন তাদের মনে হত, তারা যেন সব বাবা জেঠাদের মত বয়স্ক মাতব্বর ব্যক্তি। তারা আলাদা হচ্ছে বলেই তাদের সন্তান-সন্ততিরা দূরে সরে যাচ্ছেন। কিন্তু দেহের দূরত্বে হৃদয়ের দূরত্ব সূচিত হয় না। অতএব আগামী দিনেও উভয় দেশের মধ্যে একটা অবশ্য যোগসূত্র থাকবেই। আর বড়রা আলাদা হয়ে গেলেও, ছোটরা সকলে যে আলাদা হয়ে থাকবে এমন কথা নেই তাহলে নীলুই বা ওপারে কেমন করে যেত, আর দাদারাই বা কেমন করে এপারে আসত ? অতএব খণ্ডিত সেই দুই অংশে ভায়ে ভায়ের মধ্যে যাতায়াত ও আদান প্রদান থাকবে। ক্যানেলের এপার ওপার যাতায়াতের মত তখনও দুই দেশের ভায়েরা সীমান্তের এপার ওপার করবে।

তবে এখন যেমন বড়রা নিজেদের দেখলে মুখটা ঘুরিয়ে চলে যান, তখনও দুই দেশের বড়রা মুখ ঘুরিয়েই থাকবেন। তাঁরা ছেলেদের বলে যাবেন একে যেন অপরের সঙ্গে না মেশে। কিন্তু ছেলের দল বা ভায়েরা বুড়োদের সে নির্দেশ প্রকাশ্যে কিছু মানতে বাধ্য হলেও অপ্রকাশ্যে 'থোড়াই কেয়ার' করবে। অতএব, নীলুর মনে হত, দেশ ভাগ হলেই যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এমন নয়।

সমস্যা থাকবে। দুই দেশেই আবার ভায়ে ভায়ে বিবাদ বাধবে আবার মেলবন্ধনও হবে। বা, দুই দেশের মধ্যেও বিরোধ ঘনিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তবু মিলেমিশে তারা পাশাপাশিই থাকবে। থাকতে

তারা বাধ্য। তা না হলে দুটো দেশই রসাতলে যাবে আর নয়তো যে কোন একটাকে যেতে হবে। নীলু ভাবে কে বলতে পারে, আজ তাদের ভায়ে ভায়ে যে ভাব, তা পরে বিবাদে পরিণত হবে না ? কিন্তু বিবাদ উপস্থিত হলেও তারা আবার বিবাদ মিটিয়ে নিতে পারবে, এ বিশ্বাস তার আছে। কারণ এটাই অতি বাস্তব চিত্র !

স্বাধীনতার প্রাক্কালে নীলুর ছোটবেলার সেই উপলব্ধির কথা ভাবলে আজ তার মনে হয়, আজ যাঁরা হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ ঘটলেই দেশটা রসাতলে গেল বলে সোরগোল তোলেন তাঁরা আসলে একচক্ষু হরিণ। তাঁরা চেঁচিয়ে মুখে বলেন হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই। কিন্তু কথাটা বলেন তাঁরা বাস্তব থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে। তারা দেখেও দেখেন না, ভায়ে ভায়ে বিবাদ হয় আবার মিলও হয়। অতএব হিন্দু-মুসলমানকে তারা ভাই ভাই বলবেন আবার সেই ভায়েরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করলে দেশ উচ্ছন্নে গেল বলে চীৎকার করে দেশ মাথায় করবেন, এটা বড় বাড়াবাড়ি। হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই হয়ে শুধু মিলেমিশে থাকবে, ঝগড়া বিবাদ, মারামারি করবে না, এই অবাস্তব, আকাশকুসুম কল্পনা করা অন্যায়।

আসলে যারা ভাই-ভাই বলে জোর গলায় বলেন তারা কেউই মনে প্রাণে চান না, ওরা ভাই ভাই হোক। এর কারণও আছে। যাঁরা ক্ষমতার আসন দখল করতে চান তাঁরা অনেক কৌশলেরই আশ্রয় নেন, সকলের তো আর বাহুবল থাকে না। যাঁদের প্রকৃত বাহুবল আছে আর সেই সঙ্গে কৌশলের আশ্রয় নেবার ইচ্ছাও নেই, তাদের কৌশলের আশ্রয় নিতে হয় না। তাদের পতাকার তলে সকলে আপনি এসে সমবেত হয়। তাই নেতাজী গড়তে পেরেছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনী। আর তাঁকে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির বুলি আউড়িয়ে বৃথা সময় নষ্ট করতে হয় নি।

বহুযুগ হতে এ পৃথিবীতে যতরকমের ক্ষমতা আয়ত্ত করার কৌশল প্রচলিত আছে তার মধ্যে ধর্মের ধুয়া তোলা এক চমৎকার কৌশলই বটে কয়েক শতাব্দী আগে ইউরোপে যে সব লুণ্ঠনকারী লুণ্ঠন, অত্যাচার

করে গেছে, 'বিধর্মী' শব্দটা তাদেরই সৃষ্টি। ধর্মের নামে দেবস্থান কলঙ্কিত তারাই করেছে।

সেই একই কৌশলের প্রয়োগ নানারূপে চলে আসছে আজও। কোথায় বা সাদা-কালো, ছুত-অচ্ছুত এইসব বলে কৌশলগুলি প্রয়োগ করা হয়। কোথায়ও বা আবার ধর্ম না বলে সুকৌশলে সাম্প্রদায়িকতা শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

নীলাদ্রির আজ দৃঢ় বিশ্বাস, যে বয়স্ক শিশুরা দেশবিভাগ করেছিলেন তাদের অনেকে মনে মনে হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই এ কথা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন নি। যদি করতেন, তাহলে বুঝতেন ভায়ে ভায়ে বিরোধ জাগলেও শেষ পর্যন্ত তা মিটে যেতে বাধ্য। তারা বাস্তব থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিলেন বলেই শেষ পর্যন্ত দেশটা ভাগ হল। না হলে দেশভাগ করার আদৌ প্রয়োজন হত না।

এটা যে অতি সত্যি কথা তার অনেক প্রমাণ আছে। বেশী না বলে এখানে একটাই বললে হবে। দেশ ভাগ হ'বার পরও এ দেশে বেশ কয়েকবারই হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হয়ে গেছে। কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের লোক তো সকলে মিলে একসঙ্গে এদেশ ছেড়ে পালায় নি। আবার যে কোনদিন দাঙ্গা লাগবে না এ কথা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু তাই বলে এখানে শুধু হিন্দু বা শুধু মুসলমানই থাকবে এ কথা যে সত্য নয় তা শিশুও বলে দিতে পারে।

নীলাদ্রি ভাবে, দাঙ্গা লাগে আবার লাগুক না, ভয় কিসের ? না লাগাটা তো বরং অবাস্তব। কিন্তু বাস্তব, অতি কঠিন বাস্তব সত্য হল, এ পৃথিবীতে বিবাদ করেও মিলেমিশে থাকা যায়।

দেশভাগের পর ক্ষমতাবাজদের কৌশল আজ আরো বদলিয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িকতার নীতিটা আজ প্রাদেশিকতায় বা ভাষাভাষীর বিবাদে রূপ নিয়েছে। আর তাই গোটা দেশটা প্রদেশে ভাগ হতে হতে কতটুকরা যে, শেষ পর্যন্ত হবে তা বলা শক্ত। শেষ পর্যন্ত স্বাধীনোত্তর খণ্ডিত ভারতবর্ষ আবার প্রাক স্বাধীনযুগের মত কতকগুলো করদ রাজ্যের সমষ্টির চেহারা নিলেও আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। হলে

অবশ্য ক্ষমতালোভীদেরই সুবর্ণ সুযোগ। তাঁরা তখন এক একজন দেশীয় করদ রাজার মত ঐ সব রাজ্যের সিংহাসনে আরোহন করতে পারবেন। রাজাদের রাজ্যপাট আবার ফিরে আসবে। কিছুই বিচিত্র নয়। নীলাদ্রী আবার ১৯৭৪ থেকে ১৯৪৭-এ ফিরে যায়। সে মনে মনে হাসে আর বলে—এই ২৮ বছরে অনেক কিছুই বদ্‌লিয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে খুব বেশী বোধ হয় বদ্‌লায় নি। বদ্‌লাবার দৌড় ঐ ৪৭ থেকে ৭৪ পর্যন্ত। সবই প্রায় ঠিক আছে। চেহারা-গুলোও এক। পরিবর্তন শুধু বিন্যাসে—পারস্পরিক অবস্থানে—চারের পিঠে সাতটা আজ সাতের পিঠে চার হয়েছে মাত্র।

সেই ১৯৪৭-এ নীলু তখন কিশোর মাত্র। সবে চোদ্দ। তবু সে কে অত বড় বড় ভাবনাগুলো ভাবতে পেরেছিল আর অতবড় সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছিল তার কারণ ছিল উন্নত চিন্তাধারা। আর সেই চিন্তাধারার উন্মেষটা করিয়েছিলেন হরিপুর ইসকুলের বাংলার মাষ্টার-মশাই, সুবীর মান্না। ক্লাশে পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে সুবীরবাবু তাদের মনে জাতীয়তাবোধের অনুভূতিটুকু তুলে ধরেছিলেন। তিনি ভারত-বর্ষের আগামী দিনের যে চিত্র এঁকে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন নীলুদের সামনে তা অনেকাংশে আজ ভবিষ্যৎ বাণীর মতই মিলেছে।

তিনি বলেছিলেন—ব্রিটিশ সিংহের আজ ভারত থেকে ল্যাজ গুটাবার পালা। স্বাধীনতার যে সূর্য দু'শতাব্দীরও আগে পলাশীর আমবাগানে অস্তমিত হয়েছিল, তা আবার পূর্ব-দিগন্তের ভালে উদিত হচ্ছে কিন্তু এবার খণ্ডিতরূপে প্রকাশ পাচ্ছে তার কিরনাভা। ব্রিটিশ সিংহ এতকাল ধরে তার দাঁত, নখ দিয়ে আমাদের খণ্ড-বিখণ্ড করেছে। কিন্তু যাবার বেলায় তার ল্যাজের আঘাতে আমাদের চিরকালের মত খণ্ডিত করে রেখে যাচ্ছে। অতএব স্বাধীনতার নতুন রবির চেহারাও খণ্ডিত হতে বাধ্য। যা সে দাঁত ও নখরের আঁচড়ে এতকাল করতে পারে নি, তাই-ই সে আজ ল্যাজের ঘায়ে করে যাচ্ছে।

কিছু থেমে তিনি আবার সুরু করেছিলেন—'Divide and Rule Policy'-টা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উর্বর মস্তিষ্কের এক সৃষ্টি, সন্দেহ

নেই। কিন্তু এ হীন সৃষ্টি। এ ব্রিটিশ কিন্তু সেক্‌স্‌পীয়ার, মিলটন বায়রনদের ব্রিটিশ নয়। এ ব্রিটিশ সাহিত্য সৃষ্টি করে না, শুধু মিরজাফরদেরই সৃষ্টি করে। মিরজাফরের জন্ম দিয়ে একদা তারা ভারতের স্বাধীনতা হরণ করেছিল আর আজ যাবার বেলায় নতুন এক-দল মিরজাফরের সৃষ্টি করে তাদেরই হাতে দেশের ধ্বংসাবশেষগুলো তুলে দিয়ে যাচ্ছে। তারা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে। দেশটা ভাগ করে নিতে চাইছে তারা।

সুবীর মাষ্টারমশাই এবারে কণ্ঠস্বরকে উচ্চগ্রামে তুলে বলেন—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র মায়ের এই খণ্ডিত চেহারা দেখলে কি আজ মেঘগর্জনে এই হীন বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদ করতেন না?

একটু থেমে তিনি যেন দম নেন। পরে শান্তসুরে বলেন—তোমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক হতে যাচ্ছে। তাই খুব সাবধান! এবারে সত্যিকারের সংগ্রাম সুরু হবে। এতদিন সংগ্রামের একটাই লক্ষ্য ছিল দেশের স্বাধীনতা—বিদেশী শাসনের নাগপাশ ছেদন। এখন যে ভাবেই হোক, স্বাধীনতা সমাগত। এখন থেকে তোমাদের সামনে সত্যিকারের কঠিন কাজ পড়ে আছে। তা হলো দেশকে গঠন করার কাজ। তোমাদের নব নব ভূমিকায় দেশ গড়ার কাজে নামতে হবে। তোমরা প্রস্তুত হও। বীর বিপ্লবীদের যোগ্য উত্তরসাধক হও। আজ কি নিদারুন বিশ্বাসঘাতকতা ঘটতে যাচ্ছে তার স্বরূপ গুরুত্ব উপলব্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন।

নীলু উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—স্যার, সেই বিশ্বাসঘাতক কারা?

সুবীরবাবু ঠোঁট টিপে হেসে হেসে বলেছিলেন—সব কি এখনই জানতে চাও? আরো পরে আপনিই জানতে পারবে। আমি শুধু জানার নির্দেশটুকু আজ দিলাম। পিরিয়ড শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর আলোচনা হয় নি সেদিন। সেদিনের আলোচনাটা তিনি করেছিলেন মাইকেলের মেঘনাদকাব্য আলোচনা কালে বিভীষণের চরিত্র চিত্রনের প্রসঙ্গে—প্রসঙ্গক্রমে বা প্রসঙ্গান্তরে।

সুবীরবাবু যা পড়াতেন তা ছাত্রদের একেবারে মর্মস্থলে গেঁথে যেত

পড়ানো তো নয় যেন ছাত্রদের উপলব্ধির দ্বারপ্রান্তে এনে ছেড়ে দেওয়া। তিনি নীলুদের পড়াতেন বাংলা আর ইতিহাস। দুটোই পড়াতেন সুললিত ভাষায় আর অনবদ্য ভঙ্গীতে। ভাষার উপর অসামান্য দখল ছিল তাঁর। ইতিহাস তিনি পড়াতেন বাংলার ষ্টাইলে। তিনিই প্রথম নীলুকে সাহিত্যের আঙ্গিনায় এনে ছেড়ে দেন। সাহিত্যের গোপন সুবর্ণভাণ্ডারের চাবিকাঠির সন্ধান তিনিই প্রথম দিয়েছিলেন নীলুকে।

মনে আছে, একবার 'বাংলা সাহিত্যের ধারা'—এই আলোচনা প্রসঙ্গে ক্লাশে তিনি বলেছিলেন—সাহিত্যে রসই হল প্রথম আর শেষ কথা। আর রস হল তাই, যা হৃদয়-মনকে অপ্লুত করে। কিন্তু এই রসের যথার্থ সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব। একমাত্র হৃদয়েই এর উপলব্ধি সম্ভব। এ ব্যাখ্যাতীত

নীলু উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—স্যার রসটা কি জিনিস পরিষ্কার হল না।

সুবীর মাষ্টারমশাই-এর চোখে কৌতুকের হাসি। তিনি রহস্যময় হাসি হাসতে হাসতে নীলুকে প্রশ্ন করেছিলেন—ঈশ্বর কি জিনিস জানিস। নীলু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—হ্যাঁ। নিরাকার, অবাঙ্-মনস্পোচর, সর্বব্যাপী—

—আরে থাম, থাম, আর না, সুবীর মাষ্টারমশাই বাধা দিয়ে বলেন সেটার চেহারাটা কি রকম হল তবে? হাতির মত না পিঁপড়ের মত? গাছ না গুড়ি রে?

নীলু লজ্জায় মুখ নীচু করে। সকলে হেসে ওঠে। নীলু বসে পড়ে।

সুবীর বাবু তখন বেশ রসিয়ে রসিয়ে রসটা কি জিনিস তা আবার বুঝাতে লাগলেন—ঈশ্বরকে দেখা যায় না। কোন ভাষায় তার রূপ প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু হৃদয়ে তাকে উপলব্ধি করতে হয়। রসও তাই। আচ্ছা একটা উদাহরণ দিই। সুবীর মাষ্টারমশাই একটু থেমে ক্লাশের সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নীলুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কৌতুকের সুরে বলেন—তুই তো শুনি খুব গুড় খেতে

ভালোবাসিস। তুই যদি ঘরে গুড়ের কলসী দেখতে পাস তবে জিভে তোর জল আসে নিশ্চয়ই। এটা হল রস। তবে এটা তোর জিভের জল ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু গুড় খাবার সময় গুড়ের স্বাদে তোর চোখে মুখে আনন্দ খেলে আনন্দের আতিশয্যে তোর চোখটা যেন মুদে আসতে চায়। কেন ? রস তখন ঝরছে। কোথায় ? মনে। এ হোল সেই সাহিত্যের রস। আবার তুই বারে বারে ঐ রসের লোভে ফিরে ফিরে গুড়ের কলসীর কাছে যাবি, গুড় খেতে চাইবি—ঠিক যেমন প্রজাপতি ফিরে ফিরে ফুলের কাছে আসে মধুর লোভে—এটা হল রসের উপলব্ধি। অতএব সাহিত্যের রস হল সেই বস্তু যার আস্বাদনে মনে বার বার চিরকাল সেই রসেরই সন্ধান করে উপলব্ধি না হলে এ জিনিস হয় না রে।

পিরিয়ড শেষ হবার ঘণ্টা পড়ে গিয়েছিল। টেবিলের উপর থেকে চক্, ডাষ্টার, হাজিরা খাতা ইত্যাদি নিতে নিতে সুবীর বাবু চোখে মুখে রসের ঝিলিক হেনে বলতে থাকেন—কদম্বতলে কালার বাঁশী বাজলেই শ্রীমতি ঘর সংসার ফেলে আলুথালু বেশে ছুটে যেতেন। কিসের জন্য ? সেও ঐ রসেরই জন্য। শ্রীমতির মত রসোপলব্ধি হোক। তবে না বুঝবি রস কি জিনিস। শুধু আমি বললেই বুঝে যাবি, এত সস্তায় ?

দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সুবীরবাবু অনতিউচ্চস্বরে গুণ গুণ করে সুর তুলে বলতে থাকেন—'শ্রীমতি বিনা কেবা করে রস আস্বাদন—

ছেলেরা আনন্দে ফেটে পড়ে সুবীর মাষ্টারমশাই-এর রসিকতায়। ঐ হৈ-চৈ, চীৎকারের মধ্যে নারায়ণের গলা শোনা যায়—স্যার, শ্রীমতির মত রসের আস্বাদন আপনি করেছেন ?

দরজা পার হতে গিয়ে পার হল না সুবীরবাবু। গম্ভীর মুখে নারায়ণের কাছে ফিরে আসেন। সকলে হকচকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। রুদ্ধশ্বাসে সকলে অপেক্ষা করে থাকে দেখার জন্য সুবীরবাবু নারায়ণের বেয়াদপির জন্য কি শাস্তি দেন তাকে। সুবীরবাবু চিরকুমার তার সম্বন্ধে এ কথা বলা নারায়ণের অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে, সন্দেহ নেই।

শাস্তি দিতে হলে সুবীরবাবু তার ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার প্রান্তভাগদ্বয় ব্যবহার করতেন। এবারে তিনি তাই-ই করলেন।

নারায়ণের কানের লতির অনুপরিমাণ ধরে নাড়া দিতে তাঁর চোখে মুখে কৌতুক উপছিয়ে পড়ল। সকৌতুকে তিনি বললেন—তোর তো খুব রস হয়েছে দেখি রে! বড় রসিক-রসিক লাগছে তোকে। তা হ্যারে তোর শ্রীমতিটি কে রে? দেখাবি একবার তাকে? পাজী, হতভাগা, বজ্জাত—।

কোনদিকে আর না তাকিয়ে সোজা দ্রুতপদে তিনি ক্লাশ ছেড়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান। ছেলেরা হাসিতে ফেটে পড়ে। ছেলেদের একেবারে মাতিয়ে ভাসিয়ে রসের সাগরে ডুবিয়ে দিয়ে তিনি চলে যান। হাসির চোটে অনেকে কাশতে সুরু করে দেয়।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে মূর্তিমান নীরসের মত ভূগোলের মাষ্টারমশাই ক্লাশে ঢোকেন। অনেক আগেই ঘণ্টা পড়ে গিয়েছিল। তিনি বোধ হয় সুবীরবাবু না বার হওয়া পর্যন্ত বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। তাই সুবীর বাবু বার হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঢুকছেন।

নীলুর ভ্রু কুঞ্চিত হয়, মুখটা বিরক্তিতে ভরে ওঠে। তার মনে হতে থাকে যেন আকাশে মেঘ এসে অন্ধকার করে দিল।

ভূগোলের মাষ্টারমশাই ছেলেদের এত হাসির অর্থ বুঝতে পারেন না। ঘূর্ণায়মান চোখে চারদিকে চেয়ে বলে ওঠেন—এ্যাও, গাধা, ষ্টুপিড······তাঁর পরের কথাগুলো আর শোনা যায় না। কোনদিনই যেত না।

ভূগোলের মাষ্টারমশাই রোলকল করে পড়াতে সুরু করেন। অত্যন্ত নীরস ভঙ্গিতে পৃথিবীর নানাস্থানের ঠিকুজী আউড়িয়ে চলেন তিনি। নীলু বোর্ডের দিকে চোখ রেখে সুবীরবাবুর বর্ণিত রসের কথা গুলির রোমন্থন করে চলে মনে মনে। তার হৃদয়ে যেন এক অপরূপ রসের জোয়ার খেলে যায়।

সুবীরবাবু সাহিত্যের সুবর্ণভাণ্ডারের যে সন্ধানটি নীলুকে একদা তুলে দিয়েছিলেন তারই দৌলতে নীলু একের পর এক সেই সোনার

কুঠির মধুচক্রের মত থরে থরে সাজানো রসের কোষগুলিতে রথের আস্বাদন করে চলেছে। এ আস্বাদনের আর শেষ নেই। কোনদিনই হবে না। নাই হোক। সাগরের জলের কি কোন পরিমাপ চলে কখনও? রসের সাগরেরও কোন পরিমাপ চলে না। কিন্তু সেই রসের সাগরে চিরদিন অবগাহনধন্য হয়ে আনন্দে আপ্লুত হয়ে যাওয়া যায়। আজও নীলাদ্রি যখন রসের সাগরে ডুব দেয় তখন তার মনের পর্দায় প্রথমেই যে মুখ ভেসে ওঠে সে মুখ সুবীর মাষ্টারমশাই-এর। তিনি যেন বলে ওঠেন সহাস্যে—কি নীলু. বলেছিলাম না, রস হল তাই-ই যা মনকে আনন্দে আপ্লুত করে?

নীলু বিনীত নম্রচিত্তে বলে ওঠে—হ্যাঁ স্যার, ঠিক তাই। তবে এর যে শেষ নেই তা তো আপনি বলেন নি। মাষ্টারমশাই যেন তাঁর অভ্যস্ত ভঙ্গীতে নীলুর কান ধরে বলেন—আরে তখন তো সুরুই করিস নি, শেষ নেই বলে কি হত?

সেই সুবীর মাষ্টারমশাই আজো হরিপুর হাই-ইসকুলে আছেন। তিনি এখন ইসকুলের হেডমাষ্টার। ইসকুলও মস্তবড় হয়েছে। তিনি অকৃতদারই রয়েছেন। তথাপি তিনি সুরসিক, ঠিক আগেরই মত। কিন্তু তাই বলে তার কোন শ্রীমতী ছিল বা আছে একথা কেউ বলে না। তার কারবার চিরদিন নীলুদের মত শ্রীমানদের নিয়ে।

এই সুবীর মাষ্টারমশাই যিনি নীলুর প্রথম সাহিত্য গুরু, তিনি হরিপুর হাই ইসকুলেরই ছাত্র। শংকরীপ্রসাদ অনেকদিন তার ছাত্রাবস্থায় পড়াশোনার ব্যয়ভার বহন করেছেন। সেই কৃতজ্ঞতায় তিনি নীলুর পেছনে অতিরিক্ত সময় ব্যয়ও করতেন। তিনি নীলুকে প্রায়ই বোর্ডিং-এ তার বাড়ীতে ডেকে এনে অতিরিক্ত পড়াতেন। ঐ পড়ানোর পিছনে শুধু কৃতজ্ঞতা ছিল এ কথা বলা অন্যায় হবে। ওর মধ্যে ছিল তার মরমী টান ও পুত্র স্নেহের পরশ।

তিনি হরিপুর ইসকুলে ম্যাট্রিক পাশ করে ঐ ইসকুলেই কেরানীর চাকরী নেন। প্রাইভেটে পড়াশোনাও চালিয়ে যান। এভাবে বি.এ. পাশ করেন। বি.এ. পাশ করে নীলুদের বাংলা, ইতিহাস পড়াতেন।

একইভাবে আরো পড়াশুনা করেন তিনি। পরে তিনি বাংলা ও ইতিহাসে এম.এ. পাশও করেছেন। এম. এড.ও পাশ করেছেন।

ভালো সরকারী চাকরী বা ভালো কলেজে অধ্যাপনার কাজ তিনি পেতে পারতেন কিন্তু তা না করে ঐ ইসকুলেই রয়েছেন আজও, তার কারণ, তিনি নীলুদের মত অপদার্থ ছাত্রদের কিছুটা মানুষ করতে চান কতটা মানুষ নীলু আজ হতে পেরেছে তা সে বলতে পারে না কিন্তু যতটুকুই হোক তার পেছনে রয়েছে সুবীর মাষ্টারমশাই-এর অসামান্য দান। তার চরণে নীলুর কৃতজ্ঞতার আর শেষ নেই।

শুধু পড়িয়ে আর উপদেশ দিয়ে যে তিনি ছাত্রদের গড়ে তুলতেন তাই নয়! বহু দরিদ্র ছাত্রকে তিনি অর্থ সাহায্য করতেন পড়ার জন্য। আজো করেন। মাইনের ক'টা টাকাই বা তিনি নিজের জন্য খরচ করেন? অধিকাংশ তো ঐভাবে সাহায্যের জন্য চলে যায়। নীলাদ্রি ভাবে, আজকাল দেখা যায় ছাত্রেরা মাষ্টারমশাইদের হামেশাই ঘেরাও করে। তারাও সেকালে সুবীরবাবুকে ক্লাশে আটকিয়ে রাখত। কিন্তু দুই জিনিসে কত প্রভেদ।

ইতিহাস পড়াতে পড়াতে সুবীর মাষ্টারমশাই প্রায়ই ভুলে যেতেন তিনি ইতিহাস পড়াচ্ছেন—বাংলা সাহিত্য নয়। তাই ইতিহাসের ক্লাশে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের জীবনকাহিনী পড়াবার সময় তিনি ডি. এল. রায়ের চন্দ্রগুপ্ত নাটকের অনেক অংশ বলে যেতেন। অথবা ঔরঙ্গজেব পড়াবার সময় 'রাজপুত জীবন প্রভাত' ও রাজপুত জীবন সন্ধ্যার অনেক অংশ গল্পচ্ছলে বলে যেতেন। বলার ভঙ্গীতে ছাত্রেরা মুগ্ধ হয়ে শুনত। পিরিয়ড শেষের ঘণ্টা পড়ে যেত কিন্তু গল্প শেষ হত না। ছাত্রেরা তখন কৌতূহলের উচ্চ শিখরে। তারা বাকীটা না শুনে ছাড়বে না, মাষ্টামশাইকে ক্লাশ ছেড়ে যেতেই দেবে না। হাইবেঞ্চ এনে দরজার সামনে বসিয়ে দিত। তখন সুবীর মাষ্টারমশাই ক্লাশে আটক হয়ে পড়তেন।

এমন সময় হয়ত পরের পিরিয়ডের মাষ্টারমশাই এসে দরজার সামনে দাঁড়ালেন। তিনি ছাত্রদের হাতে বন্দী অসহায় সুবীর মাষ্টারমশাই-এর

দুর্দশা দেখে হেসে উঠলেন। সুবীরবাবু তখন বন্দী অবস্থায় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা মাষ্টারমশাই-এর উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে নীরবে মিনতি জানালেন, যার অর্থ—আপনি এখন যান, দেখছেন না, এরা শেষ পর্যন্ত না শুনে ছাড়বে না।

বাইরের মাষ্টারমশাই মুচকী হেসে চলে যেতেন। ছেলেরা হাই-বেঞ্চ সরিয়ে এনে আবার সুস্থির হয়ে অধীর আগ্রহে সুবীরবাবুর দিকে চেয়ে থাকত। তিনি আবার বলে সুরু করতেন। এই ছিল সেদিনের সেইসব ঘেরাও-এর দৃশ্য।

আজ ছাত্রেরা গোলমাল করে বলে অনেকেই সব দোষ তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। কিন্তু মাষ্টারমশাই-এরা কি সেইরকম আছেন? পাল্টা প্রশ্ন হতে পারে। তখন জীবন অত দুর্বিষহ ছিল না। এর উত্তরেও বলা যায় তখনও মাষ্টারমশাইদের নানা অভাব অভিযোগ ছিল। তবু সে যুগে শিক্ষকতা ছিল ব্রত, এখন এটি অন্যান্য পেশার মত এক পেশামাত্র।

আর তাই আজ মাষ্টারমশায়েরা ছাত্রদের হৃদয়তন্ত্রীতে কোন সুর তুলতে পারেন না। ছাত্রেরাই বজায় রাখত আগামী দিনে মহা-জীবনের ধারা। তাদের কাছে তাই মাষ্টারমশাইদের শোনাতে হয় মহাজীবনের গান—যে গানে স্রষ্টা দোলে, সৃষ্টি দোলে, দোলে—তালে তালে, একই তালে। সব মিলিয়ে এক ঐকতানের সৃষ্টি হয়।

আজ সেই গান যাদের গা'বার কথা তারা গাইতে পারেন না ঠিকমত। তাই যাদের সে গান শুনে গা'বার কথা তারাও শুনেও শোনে না। তবু মানুষের মহাজীবন একেবারে থেমে নেই। একে-বারে থেমে সে থাকবে না কোনদিন, থাকেও নি কোনদিন। গতি তার কখনও কখনও স্তিমিত হয় মাত্র। মহাজীবনের গান হারিয়ে যায় না। এত শত কোলাহলের মধ্যেও একটু কান পাতলেই শোনা যাবে সেই গান—ঐক্যতান।

॥ ২৪ ॥

এসে গেল ১৯৪৭-এর আগষ্ট মাস। প্রবোধদা আজকাল নীলুদের সন্ধ্যাবেলাতেই পড়াতে আসেন। সেদিন বোধ হয় আগষ্টের এক কি তু' তারিখ হবে। প্রবোধদা সেদিন সন্ধ্যায় সোজা ইস্কুল থেকেই পড়াতে এসেছেন। আসার সময় হরিপুর পোষ্টঅফিস থেকে শংকরী প্রসাদের নামে ডাকে আসা খবরের কাগজটা নিয়ে এসেছেন হাতে করে। শংকরীপ্রসাদ তখন বাড়ীতে নেই। নীলু ও রাম্মু হারিকেন জ্বেলে সামনের বারান্দায় পড়তে বসেছে।

প্রবোধদা মাতুরে বসে পড়েই খবরের কাগজ খুলে উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন—নীলু, স্বাধীনতার দিনক্ষনও নির্দিষ্ট হয়েছে। পনেরই আগষ্ট ব্রিটিশ আমাদের হাতে শাসনভার ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। আজকের পেপারে সব খবর দিয়েছে।

বাড়ীতে খবরের কাগজ নিয়মিত এলেও নীলু নিয়মিত পড়ে না। প্রবোধদা বলে যাচ্ছেন—আমরা বেঁচে গেছি ভাই। বাংলাদেশটা ভেঙ্গে তু টুকরো হচ্ছে। পূর্ববঙ্গটা পড়ছে পাকিস্থানের ভাগে। আমরা ঠিকই আছি। আমরা ভারতেরই স্বাধীন নাগরিক হচ্ছি। ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে শেষে পাকিস্থানের নাগরিক হতে হলে আপশোষের আর শেষ হত না, কি বলো ? পাঞ্জাবও ভেঙ্গে তু টুকরো হচ্ছে। এ্যাই দোখো, একটা মোটামুটি মানচিত্রও দিয়েছে কাগজে পরিকল্পিত ভারত ও পাকিস্থানের।

প্রবোধদা তাদের বুঝিয়ে দিতে লাগলেন কতটুকু নিয়ে গঠিত হচ্ছে ভারত আর কতটুকু নিয়ে পাকিস্থান।

প্রবোধদা তারপর আরো খবর পড়ে শোনালেন। তাতে নীলু জানতে পারল, ভারতের শাসনভার হাতে নিচ্ছেন রাজাগোপালাচারী। তিনি হচ্ছেন ভারতের শেষ গভর্ণর জেনারেল। আর পাকিস্থানের শাসনভার হাতে নিচ্ছেন জিন্নাসাহেব।

নীলু এই সময় বলে ওঠে—প্রবোধ দা, আমার এত আনন্দ হচ্ছে না, কি বলি! আমরা তাহলে সত্যিসত্যিই স্বাধীন ভারতের লোক হচ্ছি। প্রবোধ দা বলেন—আর কোন সন্দেহ নেই। এবারে সত্য-সত্যই সিংহ লেজ গুটিয়ে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে ফিরে যাচ্ছে। এই তো মাঝে আর ক'টা দিন। তারপরেই তো স্বাধীনতা—

নীলু বাধা দিয়ে বলে—প্রবোধ দা, আমায় কিছু একটা করতে বড় ইচ্ছে করছে। প্রবোধ দা বলেন—দেশ স্বাধীন হলে আমরা একটা নৌকা করব নীলু। নৌকা বেয়ে আমরা তিনজন যেখানে খুশী চলে যাব। নৌকাটা তোমাদের বাড়ীর সামনে ক্যানেলেই বাঁধা থাকবে।

এরকম কিছু তরল উৎসাহ উদ্দীপনা ভরা আলোচনা চলল কিছুক্ষন তাদের মধ্যে। কিছু পরে প্রবোধদা গম্ভীর স্বরে বলেন—শোন, ঐ পনেরই আগষ্টের স্বাধীনতা উৎসবটা খুব ধুমধামের সঙ্গে আমাদের পালন করতে হবে। আমাদের ইসকুলেও উৎসবের আয়োজন হবে। তা হোক, আমরা কিন্তু আমাদের ক্লাবে আয়োজন করব। আমি কালই মুক্তিভূষণকে নিয়ে কর্মসূচী তৈরী করছি। তোমাদের সকলকেই উৎসাহী ও সক্রিয় সদস্য হতে হবে।

নীলু ও রাসু একবাক্যে বলে ওঠে—বলুন, আমাদের কি করতে হবে, নীলু আরো বলে—আপনি আদেশ করলে আমরা চাঁদেও যেতে পারি।

প্রবোধদা হেসে বলেন—তার চেয়েও শক্ত কাজ আমাদের করতে হবে নীলু। গোটা দেশটা ভেঙ্গে ছন্নছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তাকে গড়ে তোলা বড় সহজ কাজ নয়। সে আপাততঃ এখন নয়, পরে। এখন ক্লাবঘর সাজাতে হবে। নেতাজী, মহাত্মাজী, দেশবন্ধু এই সমস্ত দেশ বরেণ্য নেতাদের বড় বড় ছবি যোগাড় করতে হবে। ক্লাবের সামনে সভার আয়োজন করতে হবে। তারজন্য বাঁশ চাই, দড়ি চাই, সামিয়ানা ও ত্রিপল চাই। অনেকগুলো জাতীয় পতাকা চাই। বিকালে শোভাযাত্রা করে আমরা ইসকুলেও যাব। এরকম বহু কাজ রয়েছে। কিছু টাকারও যোগাড় করতে হবে। কিছু ভূরিভোজনের আয়োজন না করলে নয়, কি বলো?

নীলু সোৎসাহে বলে—হ্যাঁ, একটু খাওয়া দাওয়া না হলে কেমন দেখায় ?

প্রবোধদা বলেন—আমি আগামীকাল বিকালে বরং ক্লাবঘরে মিটিং ডাকি। ওখানে আলোচনার পর সকলকে আলাদা আলাদা কাজের ভার দিয়ে দেব। আর মনে রেখো, পনেরই আগষ্ট পর্যন্ত কেউ আত্মীয়বাড়ী বা অন্য কোথাও বেড়াতে যাবে না। তাহলে কাজের অসুবিধা হবে। অবশ্য নিতান্ত প্রয়োজন হলে ক্লাবের সভাপতি বা সম্পাদকের অনুমতি নিয়ে যেতে হবে। কাউকে ছাড়তে হলে তার কাজের ভার অন্য কাউকে দিতে হবে তো ?

নীলু বলে—আমরা কোথায় আর যাই ? কোথায় বা যাব ? আপনার আদেশ একচুলও অমান্য করব না।

প্রবোধদা হেসে বলেন—That's like a good boy. তোমার দরকার না হতে পারে, অন্য কারোর হতে পারে তো। সকলের কথা ভেবেই এ কথা বলা। আজ আর পড়াতে ভালো লাগছে না। মনটা আনন্দে ভরে গেছে। আমি যাই।

নীলু বলে—আমাদেরও আজ পড়তে ভালো লাগছে না, প্রবোধদা।

প্রবোধদা চলে গেলেন। রাসু বইপত্র গুটিয়ে রেখে কোথায় যেন ঘুরতে চলে গেল। বাবা তখনও ফেরে নি। নীলু চুপ করে হারিকেনের সামনে বসে থাকে।

হঠাৎ তার সারা হৃদয় যেন এক ভালোলাগার বন্যায় ভেসে যেতে থাকে। ভালোলাগাটা ক্রমে যেন ভালোবাসা হয়ে ফুটে উঠল। এ ভালোবাসারও কোন রূপ নেই, আছে শুধু অনুভূতি। আস্তে আস্তে সে বুঝতে পারে তার হৃদয় আপন দেশকে ভালোবাসতে চায়। সে দেশজননীর পায়ে তার ভালোবাসার অর্ঘ দেবার জন্য অস্থির-ব্যাকুল হতে থাকে।

আর সেই পরম শুভলগ্নে তার প্রাণে কাব্য সরস্বতীর প্রথম পদ ক্ষেপটি ঘটল। সে রাতে সে লিখল তার জীবনের প্রথম কবিতা। আর তা' বলা বাহুল্য দেশজননীর উদ্দেশ্যে, দেশবাসীর উদ্দেশ্যে।

কবিতায় অর্ঘদান সে যেন একা করছে না, করছে সকলে মিলে। কবিতাটির নাম দিল সে 'আহ্বান' :—

জাগোরে ভারতবাসী।
কোমল শয্যা ছাড়িয়া এবার ধরিতে হইবে অসি ॥
অগ্রে তোদের দাঁড়িয়ে যে যুগ—
ছাড়িয়া সকল সম্ভোগ সুখ
মুক্ত কৃপাণ ধর এইবার,
জড়তা সকল করি পরিহার।
প্রাণ যায়, তবু মুখে ফোটে যেন হাসি।
ওঠ এইবার, দেরী নাহি আর, জাগোরে ভারতবাসী ॥
জাগোরে ভারতবীর।
বন্ধনজাল হতেছে ছিন্ন উঠিবে উর্ধে শির ॥
ভীরুতা, ক্লীবতা পরিহার করি'
কর্মেতে সবে ঝাঁপ দাও পড়ি,
দেখাও আজিকে বিশ্ববাসীরে—
ভারত তো আর নাহি ঘুমঘোরে।
ভারত আজিকে জাগো !
ধ্বনিছে সংগ্রামরোল নব নব সাজে সাজো ॥'

কবিতা শেষ করে নীলু বুঝতে পারে, তার লেখার মধ্যে সুবীর মাষ্টারমশাই-এর প্রেরণা ও ছাপ সুস্পষ্ট। সে ভাবে, কবিতাটি একবার মাষ্টারমশাইকে দেখাতে হবে। সে পরে। আপাততঃ এটি পনেরই আগষ্টের দিন তাদের ক্লাবে আবৃত্তি করতে হবে স্বরচিত কবিতা বলে।

কিন্তু নীলু একটু যেন ভাবনায় পড়ে, কবিতার মধ্যে 'অসি' আর 'মুক্ত কৃপাণ' শব্দগুলি ব্যবহার করা কি ঠিক হল ? স্বাধীন ভারতে ইংরেজ তো থাকবে না। তবে অস্ত্রধারণ করা হবে কার বিরুদ্ধে ? কিন্তু পরক্ষণেই তার আবার মনে পড়ে সুধীর মাষ্টারমশাই-এর কথা।

তিনি বলেছিলেন, জীবনে যুদ্ধ আছেই। যে বীর, সাহসী সে যুদ্ধে ভয় পায় না। তবে ঢাল, তরোয়াল নিয়েই যে সবসময় যুদ্ধ করতে

হবে, এমন কথা নেই। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, অশিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও যুদ্ধ।

নীলুর মনে পড়ে, তিনি তাদের নবীন ভারতের রূপকার বলে আহ্বান জানিয়ে নতুন নতুন ভূমিকায় অগ্রণী হতে বলেছিলেন। অতএব 'অসি' আর 'কৃপানের' নিশ্চয়ই একটা ভাবগত অর্থ রয়েছে। সে নিঃসন্দেহ হয়! ঐ দুটি শব্দ কবিতায় ঠিকই রেখে দেয়।

নীলুর মন প্রথম সৃষ্টির আনন্দে ভরে যায়। আরো ভরে যায় এই ভেবে যে, সে হবে স্বাধীন ভারতের এক কবি। নীলুর চোখ দুটো উত্তেজনায় চক্‌চক্ করতে থাকে। পরেরদিন ইসকুল যাবার আগেই এল শেখরকাকা। তার বাড়ী রায়পুর গ্রামে যেখানে শৈলমামা ও রমেন জেঠাদের বাড়ী। রমেন জেঠা অবশ্য চাকরীর জন্য থাকেন তেতুলবাড়িয়া গ্রামে। মাঝে মাঝে রায়পুর যান। তিনি ডিস্‌ট্রিক্ট বোর্ডের স্যানিটারী ইনসপেক্টার। শৈলমামা আজকাল তেতুল-বাড়িয়ার জমিদারদের এসটেটে চাকরী করেন। তিনি কখনও তেতুল-বাড়িয়ায় থাকেন, কখনও বা জমিদারী দেখাশোনার কাজে সুন্দরবনে থাকেন। তেতুলবাড়িয়া যাওয়া আসার পথে তিনিও নীলুদের বাড়ী হয়ে যান।

শৈলমামা শেখর কাকার ভগ্নীপতি। আবার শেখর কাকা শংকরী-প্রসাদের মামাতো ভাইও বটে। আবার রমেন জেঠা ও শেখর কাকারা হলেন ভায়রা ভাই। শেখর কাকা যাচ্ছেন রমেন জেঠাদের তেতুল-বাড়িয়ার বাসায়। পথে শংকরীপ্রসাদের বাড়ীতে এসে উঠলেন।

শংকরীপ্রসাদ তখন বাড়ীতে। শেখরকাকা ও শংকরীপ্রসাদ বাইরে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন, নীলু তখন রাম্নুর সঙ্গে ভাত খাচ্ছে ইসকুলে যাবার আগে। শেখরকাকা বাইরে বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বাড়ীর ভেতরে এলেন।

রমলাকে বললেন—ছোড়দি, রমেনদার ওখানে যাচ্ছি। তরশু ওঁর ছেলের অন্নপ্রাশন। বহুদিন পরে রমেনদার ছেলে হয়েছে। মেয়েরা সব কত বড় হয়ে গেছে। তারপর শেষে এই ছেলে—প্রথম

পুত্রসন্তান। তাই বেশ ধুমধাম করে অন্নপ্রাশন হবে। আমাদের গিয়ে কাজে লাগতে হবে। বলতে গেলে, রমেনদা আপনার লোক একেবারে। ওবেলা যাব।

রমলা বলেন—ঠিক আছে, ভাত তো হয়ে গেছে! চাট্টি খেয়ে যাও। শেখরকাকা বলেন—হ্যাঁ তাই খেয়ে যাই। পরে নীলুর দিকে চেয়ে তিনি বলেন—নীলু, তোর তো খাওয়া হয়ে গেল। তুই ইসকুলে যাবি নাকি?

নীলু খাওয়া শেষ করে উঠতে উঠতে বলে—হ্যাঁ, কেন?

শেখরকাকা বলেন—না, না, তুই ইসকুলে যাস্ না। রমেনদার বাড়ী তোদেরও নেমন্তন্ন রয়েছে। রমেনদা আর তোর বাবা ছোটবেলায় একসঙ্গে পড়াশোনা করেছে। অতএব তোদের যাওয়া দরকার। শংকরীদা বললেন, তিনি কাজ ছেড়ে যেতে পারবেন না। তোকে আমার সঙ্গে যেতে বললেন। নীলু কিছুক্ষন চুপ করে থেমে শেখর কাকার মুখের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবতে থাকে।

শেখরকাকা ধমক মেরে বলেন—কিরে, হাঁ হয়ে গেলি যে রে। তুইও কি যাবি না, নাকি রে? তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা খুব খারাপ দেখায়। রমলা বলে ওঠেন—ভাই শেখর, তুমি চান্ করে এসো তো। ও আবার যাবে না কি? ও কি আবার কাজের লোক হয়েছে নাকি?

নীলু ঝাঁঝিয়ে বলে ওঠে—তুমি কি জান? জানো, পনেরো আগষ্টের স্বাধীনতা উৎসবের আগে আমাদের কত কাজ রয়েছে?

রমলা সকৌতুকে বলেন—কি কাজ শুনি?

—সেটা আজকের ক্লাবের মিটিং-এ ঠিক হবে, নীলু গম্ভীর মুখে বলে—আমাদের ক্লাবের প্রেসিডেন্ট বলে দিয়েছে, এ সময় কারোরই গ্রাম ছেড়ে যাওয়া চলবে না। শেখরকাকা উচ্চহাস্যে বলে ওঠেন—কে রে তোর প্রেসিডেন্ট? ধরে নিয়ে আয় তো দেখি তাকে একবার আমার কাছে, দেখি কতবড় হুকুম দেনেওয়ালা সে?

নীলু বাঁকাচোখে তাকিয়ে বলে—প্রেসিডেন্ট একটু নরম লোক।

কিন্তু সেক্রেটারী মুক্তিদাকে তো দেখ নি। তোমার বাপও তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সাহস পাবে না কিন্তু, শেখরকা।

শেখরকাকা ঘর কাঁপিয়ে হাঃ হাঃ করে হাসতে থাকেন। অনেকক্ষন ধরে হাসেন তিনি। দম্‌কা হাসির সঙ্গে থেমে থেমে বলেন—বেশ, সে না হয় বেশ জাদরেল লোকই। স্বীকার করছি তার সামনে আমার বাপ দাঁড়াতে পারবে না কিন্তু তোর বাপ তো পারবে রে!

নীলু প্রবলবেগে মাথা নেড়ে নেড়ে বলতে থাকে—না না, শেখরকা সে হবে না। তুমি আজ আমাদের বাড়ীতে থাক। আমি ক্লাবে গিয়ে প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারীর পারমিশান নিয়ে আসি। Without Permission, আমি আমার বাবা বললেও যেতে পারবো না।

শেখরকাকা বিরক্ত হয়ে বলে ওঠেন—আজকাল ছেলেগুলো কি রকম বাঁধর হয়েছে দেখ ছোড়দি, নিজের বাপকেও যেন গেরাহ্য করতে চায় না। আশ্চর্য!

কেউ খেয়াল করে নি, শংকরীপ্রসাদ কখন থেকে ভেতরে এসে ওদের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছেন। তিনি পরম পরিতৃপ্তির হাসি হাসতে হাসতে সস্নেহে নীলুর দিকে চেয়ে বলে ওঠেন—তুমি ভুল করছ, শেখর। ওরা আজকালকার ছেলে বলে ওদের ছোট করে দেখো না। ওরা হচ্ছে স্বাধীন দেশের সৈনিক। ওরা ওদের নেতাকে মানার শিক্ষা পাচ্ছে। শেখরকাকা বলেন—তাই বলে বাপকে মানবে না?

শংকরীপ্রসাদ দৃঢ়স্বরে বলেন—বাপের নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা থাকলে বাপকে মানবে। না হলে শুধু পিতা বলে সম্মান দিয়ে যাবে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে ওদের বাপকে মানার প্রশ্নই আসে না। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকেরা তো সেনাপতির কথাই শোনে। ওরা সুশৃঙ্খল সৈনিক হোক, এই-ই তো আমি চাই, শেখর!

বাবার কথাগুলো শেখরকাকার মনঃপুত হল না মোটেই। তিনি বলে ওঠেন—ছোড়দা, এত সব বলে কিন্তু তুমি ওকে মাথায় তুলেদিচ্ছ।

শংকরীপ্রসাদ প্রতিবাদ করে বলে ওঠেন—আবার, আবার ভুল করলে কিন্তু শেখর। ওদের মাথায় তুলছি না, ওদের মাথায় করে

রাখতে চাইছি। যা চাই, ওরা যদি তাই হয়, ওদের তবে মাথার মণি করে রাখব চিরকাল।

নীলু আর দাঁড়াতে পারে না। ছুটে চলে যায় পুকুরঘাটে মুখ ধুতে। মুখ ধুতে ধুতে ভাবে বাবার কথাগুলো। বাবার মনেও স্বাধীনতার সোনালী রং লেগেছে। বাবা স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক ছিলেন একদা। তিনি বোঝেন স্বাধীনতার অর্থ। তাই তার হৃদয় আজ আনন্দে উদ্বেলিত। কিন্তু শেখর কাকারা এখনও বুঝতে পারে নি মুক্তির আনন্দের উপলব্ধি। এরা যেমন ছিল, তেমনিই আছে, থাকতে চায়ও সেইভাবে চিরটাকাল।

নীলু ভাবে, এদের জাগিয়ে তোলার জন্যই তাদের যুদ্ধ করে যেতে হবে। সে যুদ্ধে অস্ত্র নিশ্চয়ই চাই। অচলায়তনের বন্ধ দরজা কখনই বিনাযুদ্ধে ভাঙ্গা যায় না। অতএব কবিতায় সে 'অসি' আর 'কৃপান' শব্দ বসিয়ে ভুল করেনি কোন। ইসকুল যাওয়ার আগে সে আর শেখরকাকার সঙ্গে দেখাও করল না, পাছে আবার কিছু বিরূপ কথা শুনতে হয়। পথে যেতে যেতে ভাবে, ফিরে এসে যদি দেখে শেখর কাকা তাদের বাড়ীতে রয়েছেন তাহলে আজ মিটিং-এ তেতুলবাড়িয়া যাবার অনুমতির কথা তুলবে। নচেৎ নয়।

আরো মনে হয়, কোথাও সে বিশেষ যেতে পায় না। এই সুযোগে নতুন জায়গায় গেলে তার ভালোই লাগবে। কিন্তু অনুমতি ছাড়া যাবার কথা সে কল্পনাও করতে পারে না।

হিজল গাছটার কাছে আসতেই তার মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। কেন সে জানে না, তার মনে হয়, তেতুলবাড়িয়া গেলে তার ভাল হবে। এ ধরনের ভাবনার অর্থ সে খুঁজে পায় না কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করে তার ভেতর থেকে কে যেন তাকে তেতুলবাড়িয়া যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে।

সেভাবে, যদি শেখরকাকা চলে না গিয়ে থাকে তবে যেমন করে হোক সে প্রবোধদা ও মুক্তিদার অনুমতি আদায় করবে। ক্রমে তার মনে দৃঢ় সংকল্প জাগে, তাকে যেতেই হবে, যেভাবেই হোক, মনে

মনে সে বলে—হে ভগবান, শেখরকাকা যেন চলে না যায়। ইসকুল থেকে ফিরে নীলু সানন্দে লক্ষ্য করে শেখরকাকা যান নি। তিনি নীলুকে দেখেই বেজারমুখে বলে উঠলেন—কি, অনুমতি নেওয়া হল বাবুর ? নাকি এখনও নেওয়া হয় নি ? ইস তোর জন্য একটা দিন শুধু শুধু নষ্ট হয়ে গেল। কি করলি বল দেখি তুই ! রমেনদার কাছে কত কথা শুনতে যে হবে তার ঠিক নেই।

নীলু কোন জবাব না দিয়ে মৃদু হেসে বাড়ীর ভেতরে যেতে থাকে। শেখরকাকা পেছন থেকে বিরক্তির সুরে বলেন—ওসব অনুমতি ফতি বুঝি না আমি। আমার সোজা কথা, কাল তোকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে। আমি তোর বাপের মত নই যে মাথায় তুলব। দরকার হলে ঘাড়ে ধরে নিয়ে যাব। ইস আস্পর্ধা ! ছেলে কথা শুনবে না ?

নীলু মিষ্টি হেসে চলে যায়। সে বুঝতে পারে শেখরকাকার এ হেন জেদের অর্থ। বাবা যদি সকালে নীলুকে সমর্থন করে অতগুলো কথা না বলতেন তাহলে শেখরকাকা হয়ত তাকে ফেলে চলে বিকালে চলে যেতেন। কিন্তু এখন তার রোখ চেপেছে। তিনি দেখতে চান, নীলু কিভাবে না গিয়ে থাকতে পারে। বাপের উপরে এই মহাবাপগিরির ব্যাপার দেখে নীলু শেখরকাকার কথায় কৌতুক বোধ করে।

সঙ্গে সঙ্গে সে খুশী হয়ও। শেখরকাকার এই জেদের জন্য নীলু হয়ত শেষ পর্যন্ত তেতুলবাড়িয়া যেতে পারবে। সে শেখর কাকাকে মনে মনে এ জন্য ধন্যবাদ দিতে গিয়েও থেমে যায়। তার মনে হয়, এর জন্য বাবারই ধন্যবাদ পাওয়া উচিত—বাবা অমন কথাগুলো না বললে শেখরকাকার জেদ চাপত না। আবার মনে হয় না এদের কাউকেই ধন্যবাদ দেওয়া যায় না। সে নিজে না যেতে চাইলে তো কাউকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রশ্নই আসত না।

সে তো প্রথমে যেতে চায় নি। তবে হিজল গাছের কাছে গিয়ে কে তার মনে যাবার ভাবনা জাগাল ? এসব চিন্তা করতে করতে নীলু খেতে বসে বিহ্বল হয়ে যায়। এমন সময় আবছাভাবে রাণীর মুখটা

ভেসে ওঠে। মুহূর্তের জন্য মাত্র। পরক্ষনেই আবার মিলিয়ে যায় রাণীর মুখ।

নীলুর মনে প্রশ্ন জাগে—তবে কি রাণীই তাকে যেতে বলছে? কেন? এসব ছাইপাঁশ মাথামুণ্ডুর কোন অর্থই যে খুঁজে পায় না। নীলুর মনে পড়ে আগে কোন কোন সময় এরকম নানা অর্থহীন চেতনা তার মাথায় এসেছে। কিন্তু পরে ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছে তার অর্থহীন ভাবনাগুলোর অনেক কিছুই মিলে গেছে। তবু এই মুহূর্তে সে এসব ভাবনার কোন অর্থ খুঁজে পায় না। নিজেই নিজের উপর বিরক্ত হয়। 'ধ্যেৎ' বলে উঠে পড়ে সে কিছু ভাত পাতে ফেলে রেখে।

রমলা বলে ওঠেন—কিরে, খেলি না যে আর? কি হলো?

নীলু তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—বাসি ভাত টক না হলে খেতে ভাল লাগে না। আর কোন কথা না বলে নীলু মুখ ধুতে বেরিয়ে যায়। মুখ ধুয়ে এসে ক্লাবে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। কি ভেবে গতকাল রাতের লেখা কবিতার কাগজটাও সে সঙ্গে নেয়। সুযোগ বুঝলে সে দেখাবে, নয়তো নয়।

মিটিং-এ প্রবোধদা কাজের ভার ও দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সকলকে খুঁটিনাটি নির্দেশ দিলেন। নীলুর উপরে ভার পড়ল তাদেরই বাঁশবাগানের পঞ্চাশটা বাঁশ কেটে এনে ক্লাবঘরের সামনে জড়া করা। শংকরীপ্রসাদ ক্লাবের ছেলেদের পঞ্চাশটা বাঁশ দিতে সম্মত হয়েছেন।

অবশ্য এ কাজ নীলুকে একা করতে হবে না। পাঁচজনের একটা দলের হবে সে দলপতি। রাসুও একজন দলপতি। তার কাজ হল, নিজেদের গ্রাম এবং আশেপাশের গ্রাম ঘুরে ঘুরে সামিয়ানা ও ত্রিপল যোগাড় করা। এভাবে সকলকে কাজ ভাগ করে দেওয়া হল।

প্রবোধদার কথা শেষ হয়ে যাবার পর মুক্তিদা কাজের নামগুলো খাতায় লিখে সকলকে দিয়ে সই করিয়ে নিলেন। তিনি কড়া লোক। কাজে ও দায়িত্বে একচুল ফাঁকি মারার কথা তার কাছে কেউ ভাবতেও পারে না।

এরপর নীলু ভয়ে ভয়ে প্রবোধদার কাছে তার তেতুলবাড়িয়া

যাবার বিষয়টি উত্থাপন করে কয়েকদিন বাইরে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করল। শেখরকাকা তাকে নিয়ে যাবার জন্য সে বসে আছেন সেকথাও বিনীতভাবে নিবেদন করতে সে ভুলল না। প্রবোধদা সব শুনে বললেন—তোমার কাজ হয়ে যাওয়া নিয়ে কথা। তুমি এসে সময়মত তোমার কাজ তুলে দেবে বললে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তোমাকে সেক্রেটারীর অনুমতিও নিতে হবে নীলু।

নীলু মুক্তিদার দিকে তাকিয়ে বলে—নিশ্চয়ই ! আমি মুক্তিদাকে বলব। তার আগে আপনার অনুমতি চাইলাম।

নীলু চেয়ে দেখে মুক্তিদার মুখটা বর্ষনোন্মুখ মেঘের মত কালো হয়ে উঠেছে। মুক্তিদা কিছু বলছে না। সে সভয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে প্রবোধ দার মুখের উপর রাখে। প্রবোধদা মুক্তিদার দিকে চেয়ে বলেন—মুক্তি, তুমি কি বল ? নীলু যাবে ? মুক্তিদা বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে বলে ওঠেন—না, কখনো না।

প্রবোধদা নীলুর পক্ষ নিয়ে বলেন—কেন, তোমার অসুবিধাটা কিসের ? ও তো তার কাজ এসে করে দেবে বলছে।

মুক্তিদা নীলুর দিকে দৃষ্টি হেনে বলেন—কাজ করে দেওয়াটা বড় কথা নয়। কাজের জন্য প্রস্তুত থাকাটা বড়। সকলের পক্ষে যা নিয়ম, তা ওকে মানতে হবে। আজ থেকে সকলে নিয়ম মেনে না চললে দেশ গঠন হবে কি করে ? প্রবোধদা নরমসুরে বলেন—আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। নীলুর কাজটা ততদিন রাসু দেখুক বরং। মুক্তি একটু বিবেচনা কর ভাই। নীলু আমার ছাত্র। আমি শিক্ষক হয়ে ছাত্রের জন্য—

মুক্তিদা জলদগম্ভীর স্বরে আবার নীলুর কানে মৃত্যুর ঘণ্টা বাজিয়ে বলেন—প্রবোধ তুমি ভুলে যাচ্ছ, ও যতটা তোমার ছাত্র, তার বেশী আমার। অতএব ওকে সুশৃঙ্খল করে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমারও কম নয়। তাই তোমার অনুরোধ রাখতে পারলাম না। তবে হ্যাঁ, ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হিসাবে তুমি যদি আমাকে আদেশ কর ওকে ছেড়ে দেবার জন্য, তা আমি যতক্ষন সেক্রেটারী আছি মানতে বাধ্য এবং

মানবও। আগে সে আদেশ তুমি দাও। তারপর ওকে অনুমতি দিচ্ছি আমি।

প্রবোধদা দুঃখিত হয়ে বলে ওঠেন—না ভাই, তা পারব না। কোন ক্ষমতার ছড়ি ঘোরান আমার দ্বারা সম্ভব নয়। সব কাজ সকলের জন্য নয়, ভাই। আমি প্রেসিডেন্ট হতে চাই নি, সাধারণ কর্মী হিসাবেই থাকতে চেয়েছিলাম। তোমরা ভালোবেসে আমাকে প্রেসিডেন্ট করেছ। আমি ভাই, প্রেসিডেন্ট হতে চাই না। আমি তোমাদের ভালোবাসার মানুষ হতে চাই।

মুক্তিদা এবার নরমস্বরেই বলেন—প্রবোধ, আমাকে ভুল বোঝ না, আমিও ক্ষমতার ছড়ি ঘুরাচ্ছি না। আমি শুধু চাই, আমার সদস্যরা সুশৃঙ্খল হোক্। তারা নেতাকে মানার শিক্ষালাভ করুক। বৃহৎ স্বার্থে ক্ষুদ্র লোভ ত্যাগ করার শিক্ষালাভ করুক। নীলু আমার প্রিয় ছাত্রও বটে। ওর নৈতিক চরিত্র গঠনের দিকে আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখি। প্রিয়ের মঙ্গলের জন্যই বাধ্য হয়ে প্রিয়ের উপর কঠোর হচ্ছি।

নীলু এক অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে পড়ে যায়। তাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যদি প্রবোধদা ও মুক্তিদার মধ্যে কোন মনোমালিন্য ঘটে যায় তবে তার আপশোষের শেষ থাকবে না। তাছাড়া মুক্তিদার কথাটা তার মনে লাগে—'বৃহৎ স্বার্থে ক্ষুদ্র লোভ ত্যাগ করার শিক্ষালাভ করুক'। সে লজ্জিত হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি যাব না। আমি নেতার নির্দেশ অমান্য করব না। কিন্তু আমার আর একটা কথা বলার ছিল।

মুক্তিদা সহজস্বরে বলেন—কি. বলে ফেল। নীলু বলে—একটা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা বা ওরকম কিছুর একটা ব্যবস্থা করলে হয় না পনেরোই আগষ্টের উৎসবের দিন

মুক্তিদা বলেন—হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা হচ্ছে। ওটা দশ তারিখের মিটিং-এর দিন ঠিক হবে। নীলু হৃষ্টচিত্তে বলে—তাহলে এখন থাক। সেদিনই বলব।

প্রবোধদা বলেন—কেন, কি বলার তোমার এখনই বল না?

আপত্তি কিসের ? নীলু ভয়ে ভয়ে মুক্তিদার দিকে তাকায়।

মুক্তিদা এতক্ষনে হেসে ফেলেন--বল না, বল না, আমি কি বাঘ না ভালুক রে ? বল, কি বলবি বল।

নীলু অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে পকেট থেকে কবিতার কাগজখানা বার করে বলে—আমি একটা কবিতা লিখেছি। যদি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয় তাহলে সেদিন আমি এ কবিতাটা পাঠ করব। মুক্তিদা তড়াক করে লাফ দিয়ে নীলুর কাছে এসে তার হাত থেকে ছোঁ মেরে কাগজ-খানা তুলে নিতে নিতে বলেন—দেখি, দেখি, কি কবিতা লিখেছিস।

মুক্তিদা কাগজের উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে যান। তিনি কবিতাটা মনে মনে পড়ে যাচ্ছেন, নীলু বুঝতে পারে। প্রবোধদার মুখে উৎসাহ-ভরা স্মিত হাসি, আর সকলের বিস্মিত দৃষ্টি নীলুর দিকে নিবদ্ধ। নীলু এতগুলো কৌতুহলী দৃষ্টির সামনে সহজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। লজ্জায় সে চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু ঘামতে থাকে। তার ভয় মুক্তিদা কিভাবে নেবেন তার লেখা কবিতাকে।

মুক্তিদা মনে মনে কবিতা পড়া শেষ করে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠেন—বড় চমৎকার হয়েছে। তারপর তিনি গাম্ভীর্য পরিত্যাগ করে লাফাতে লাফাতে প্রবোধদার কাছে এসে তার চোখের সামনে কবিতার কাগজখানা মেলে ধরে বুক চিতিয়ে বলেন—দেখ প্রবোধ, দেখ, আমার ছাত্র কি লিখেছে। প্রবোধদা আগ্রহের সাথে হাত বাড়িয়ে বললেন দাও মুক্তি, আমাকে দাও। আমি পড়ি।

কিন্তু মুক্তিদা কাগজখানা সরিয়ে নিয়ে বললেন—না, আমিই পড়ছি। আমাদের তরুণ কবির লেখা সকলে শুনুক। প্রবোধদা খুশী খুশী গলায় বলেন—পড় ভাই, তাই পড়।

মুক্তিদা গলা পরিষ্কার করে উদাত্তস্বরে আবেগ দিয়ে নীলুর রচিত কবিতাটি পড়ে গেলেন। পড়া শেষ হয়ে গেলে সকলে নীলুকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। প্রবোধদা আনন্দে নীলুকে জড়িয়ে ধরে বলেন—মুক্তি, আমাকেও বলতে দাও ভাই আমার ছাত্র লিখেছে।

মুক্তিদা এগিয়ে এসে নীলুর হাত ধরে টান মেরে হাসতে হাসতে

বলেন, কি তুমি প্রেসিডেন্ট বলে বেশী ক্ষমতা দেখাবে ভেবেছো? চালাকি? মুক্তিদার কণ্ঠে তরলসুর। তরলসুর প্রবোধদার কণ্ঠেও। তিনি হাসতে হাসতে বলেন, তুমি যদি স্বীকার কর আমার ছাত্র লিখেছে তবে এই মুহূর্তে আমি প্রেসিডেন্টের পদ থেকে স্বেচ্ছায়, আনন্দে পদত্যাগ করছি।

সকলে হৈ হৈ করে ওঠে। সারা ক্লাবঘরে হাসির ফোয়ারা ছোটে। সকলের অভিনন্দন ও আন্তরিকতায় নীলুর চোখে জল এসে যায়। এতখানি ভালোবাসা সে আশা করে নি। এ যেন তার কল্পনার চেয়েও বেশী পাওয়া। ভাবাবেগে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। সে হঠাৎ প্রবোধদাও মুক্তিদা দুজনকেই প্রণাম করে বসে।

মুক্তিদা আশ্চর্য হয়ে বলে—সে কিরে? প্রণাম করলি যে।

প্রবোধদাও মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ণ এঁকে নীলুর দিকে তাকিয়ে থাকেন। নীলু চোখ মুছতে মুছতে বলে—আপনারা দুজনেই আমার গুরু। আমার জীবনের প্রথম কবিতা আপনাদের সুখী করেছে। তাই আপনাদের প্রণাম করলাম।

প্রবোধদা নীলুর মাথায় হাত রেখে বলেন—আশীর্বাদ করি ভাই, কবির খ্যাতি তোমার হোক্। সাধনা করে যাও। তোমার মধ্যে সম্ভাবনা আছে।

প্রবোধদার দক্ষিণ হস্ত তখনও নীলুর মাথায়, ঐ সময় মুক্তিদা নীলুর কান ধরে বলেন—তলে তলে এত? কবে থেকে রে? কবিতা দেখে মনে তো হয় না, এ তোর প্রথম ফসল। মনে হচ্ছে, তুই আরো ফসল আগে ফলিয়েছিস।

নীলু লজ্জিত হয়ে বলে উঠে—না মুক্তিদা, বিশ্বাস করুন আপনি। প্রবোধদা এই সময় শ্লোগান দেন—Three Cheers for our কবি—Hip Hip Hurrah।

মুক্তিদা সমেত সকলে ধ্বনি দেয়—Hip Hip Hurrah।

কিছুপরে সভা শান্ত হয়। হঠাৎ মুক্তিদা সকলকে অবাক করে দিয়ে বলেন—প্রবোধ, আমি আমার আদেশ প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। নীলু

যাক তেতুলবাড়িয়া। আমি অনুমতি দিলাম ওকে। প্রবোধদা আশ্চর্য হয়ে বলেন—ও যাবে? বলছ? সত্যি বলছ?

মুক্তিদা হেসে বলেন—হ্যাঁ, সত্যিই বলছি। After all, ভেবে দেখলাম, কবিকে একটু বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিতে হয়। স্বাধীনোত্তর সংগ্রামে কবিকেও আমাদের চাই। কবিকে আমরা কোন শৃঙ্খলে বাঁধতে চাই না, কবি আপন ছন্দে চলুক। তাতে তার প্রতিভা:বিকশিত হবে।

পরে নীলুর দিকে চেয়ে তিনি বললেন—যাও কবি, তুমি স্বচ্ছন্দে যাও। আর আমি ঘোষণা করছি, তোমার উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তার থেকেও তোমাকে অব্যাহতি দেওয়া হল। তোমার কাজ রাসু করবে। রাসু হবে দুই-দলেরই দলপতি।

নীলু এতে ক্ষুন্ন হয়। ব্যথাভরা চোখ মেলে সে বলে—না, না মুক্তিদা আমি তো অব্যাহতি চাই নি। আমি ঠিক দশ তারিখের আগে ফিরে এসে আমার কাজ করে দেব। দায়িত্ব পালনে কোন ত্রুটি হবে না আমার। আমিও তো স্বাধীন ভারতের এক সৈনিক হতে চাই।

মুক্তিদা গম্ভীর হয়ে বলেন—কে বলেছে তোমায় দায়িত্ব দেওয়া হবে না। আগের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি তোমায় দেওয়া হল, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী গুরু দায়িত্ব তোমায় দেব।

নীলু হাসিমুখে বলে—বলুন। আমি প্রস্তুত। সৈনিকের মতই।

মুক্তিদা হেসে বলেন—স্বাধীন ভারতে যে যুদ্ধ হবে তার জন্য শুধু অসির'দরকার হবে মসীর দরকার হবে না, এ কথা কে তোমায় বলেছে কবি? তোমার কবিতায় যে তুমি বলেছ—'মুক্ত কৃপান ধর এইবার, সেই কৃপান কি সকলে ধরবে? তুমি কি তাই বলেছ? তোমার কৃপান হবে তোমার লেখনী। তুমি কি শোন নি, অসির চেয়ে মসী বেশী শক্তিশালী। অতএব হে বীর সৈনিক, তোমাকে সেই মসীরূপ অসি নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। দায়িত্ব এড়িয়ে যাবে কোথায়?

নীলু লজ্জিত হয়ে নতমুখে বলে—বেশ, আদেশ করুন কি আমাকে করতে হবে। মুক্তিদা বলেন—হ্যাঁ, সেটা বলি এবার। আবৃত্তি

প্রতিযোগিতার কর্মসূচী তোমাকেই তৈরী করতে হবে। সেই ভার তোমায় দিলাম। দশ তারিখের মধ্যে ফিরে আসা চাই কিন্তু।

আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় নীলুর চোখে জল এসে যায়। কবির সম্মান লাভের আনন্দও বড় নয়। সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, নিশ্চয়ই, মুক্তিদা

একটু পরে মুক্তিদা বললেন, প্রবোধ, নীলুর উপর যে নতুন কাজের ভার দেওয়া হল সে সম্বন্ধে তুমি কিছু বললে না? প্রবোধদা হেসে বলেন, কি বলবো? তোমার ছাত্রকে তুমি কাজের ভার দিচ্ছি। আমি কি বলব ওর মধ্যে?

মুক্তিদা হেসে বলেন, তাহলে স্বীকার করছ নীলু আমার ছাত্র?

প্রবোধদা উচ্চহাস্যে বলেন, করছি স্বীকার। ব্যাপার কি জানো, প্রিয়কে নিজের করে পেতে সকলে চায়। আমি প্রিয়কে তোমার হাতে তুলে দিয়ে আনন্দ পাচ্ছি। শুধু পেতে আনন্দ, দিতে আনন্দ নেই, এ আমি বিশ্বাস করি না।

মুক্তিদা এগিয়ে এসে প্রবোধদার কাঁদে হাত রেখে বলেন, তোমার এই চরিত্র মাধুর্যের জন্যই তুমি আমাদের প্রেসিডেন্ট। শুধু ক্লাবের প্রেসিডেন্ট নও, আমাদের হৃদয় রাজ্যের প্রেসিডেন্ট।

এরপর মুক্তিদা ধ্বনি দেন—Three cheers for our President, Hip Hip Hurrah!

সকলে ধ্বনি দে—Hip Hip Hurrah.

এরপর সেদিনের সভা ভঙ্গ হয়। নীলু ঘরে ফিরতে থাকে। এক সীমাহারা আনন্দে আজ সে যেন হাবুডুবু খেয়ে যায়।

যেতে যেত সে ভাবে, মুক্তিদাকে সে ঠিক কথা বলে নি। ঐ আহ্বান কবিতাটা তার জীবনের প্রথম কবিতা নয়। কবিতা সে আগেও লিখেছে। তবে সেগুলো কাগজের উপরে কালির আঁচড়ে নয়, হৃদয়ের নবীনপত্রে মিলন-বিরহ ও বিষাদ আনন্দের আখরে। যখনই কোন ভাবের অনুভূতি তীব্র হয়ে উপলব্ধিতে পরিণত হয়েছে তখন সে শুনেছে তার হৃদয় বীণার তন্ত্রীতে এক সুর। সেই সুর কবিতা হয়ে ঝরে পড়েছে তার হৃদয় পত্রে।

হয়ত সে কবিতার কোন বাণীমূর্তি সে রচনা করতে পারে নি এতকাল। কিন্তু তাই বলে কবিতার জন্ম সে দেয় নি, এ কথা তো ঠিক নয়। নীলু শুনেছে কবিতায় সুর দিলে গান হয়। কিন্তু সে অস্বীকার করে সে কথা। সে বলে, না গান থেকেই কবিতার জন্ম। তার মনে হতে থাকে এ গান হল মহাজীবনের গান—যে গানের সুরে বাঁধা পড়ে মানুষের জীবন, আবার সেই জীবন থেকে সৃষ্ট হয় গান।

নীলু যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, আসলে কি সেই গান? কে রচনা করে সেই গান? অনেককাল ভেবে ভেবে সে এর সঠিক এবং একমাত্র উত্তর পায় নি, আজো পেল না। সহসা তার অন্তরের অন্তস্থল থেকে কে যেন বলে ওঠে, যে পথে তুমি যাচ্ছ, সে পথ পরিক্রমা করে আবার যখন তুমি ফিরে আসবে, তখনই পাবে এর অভ্রান্ত উত্তর।

নীলু চমকিয়ে ওঠে বলে, কে? কিন্তু কেউ তার কথার উত্তর দেয় না।

॥ ২৫ ॥

পরেরদিন সকালেই চা খেয়ে যেতে চাইছিলেন শেখর কাকা। কিন্তু রমলা বললেন—পথে নীলুর ক্ষিধে পাবে। চাট্টি ভাত বসিয়ে দিচ্ছি। তোমরা খেয়ে যাও। আজ সন্ধ্যার আগে তোমাদের গিয়ে পৌঁছালেই তো হল।

তাই-ই হল। নীলু ভাত খেতে বসল বটে। কিন্তু ভাত যেন আর গলা দিয়ে নামছে না তার। নতুন জায়গা দেখার আনন্দে তার ক্ষুধা-তৃষ্ণার বোধটা বুঝি লোপ পেয়েছে।

বেলা বারোটা বাজল শেষ পর্যন্ত বেরুতে বেরুতে। বেরুবার মুখে আবার দেরী। শংকরীপ্রসাদ বললেন—দাঁড়াও শেখর, রমেনদাকে একটা চিঠি লিখে দিই, নিজে যেতে পারলাম না বলে।

চিঠি নিয়ে বেরুতে বেরুতে বেলা সাড়ে বারোটা বাজল। নীলু পড়েছে একটা নতুন ধোলাই করা ধুতি মালকোচা মেরে পড়ার আর পরিষ্কার করে কাচা এক হাফশার্ট। যেতে হবে সাইকেলে। সামনের রডের উপর বসে সাত-আট মাইল কাঁচা রাস্তায় যাওয়া নীলুর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই শেখর কাকা বললেন পিছনের ক্যারিয়ারে বসতে।

কিন্তু বসে থাকছে কই? প্রায়ই তো নামতে হচ্ছে। পথ খারাপ। ওঠানামায় তার নাভিশ্বাস ওঠার যোগাড়।

ডিসট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ধরে শাপলা থেকে হরিপুর হয়ে যেতে হবে তেতুলবাড়িয়া। বেশ চওড়া রাস্তা কিন্তু পায়ে চলার দাগে দাগে সাইকেল মাঝে মাঝে অচল হয়ে পড়ে। বর্ষাকাল তখনও শেষ হয় নি। সেদিন অবশ্য ছিল ঝকঝকে রোদ। আকাশ একেবারে নির্মেঘ ছিল।

বহু জায়গায় জলনিকাশের জন্য রাস্তা কেটে দেওয়া হয়েছে। সেই কাটার উপরে হয়ত একটা খেজুর গাছ বা দুটো বাঁশ পাতা রয়েছে যেগুলো পুলের কাজ করছে। এরকম জায়গায় নামতেই হয়।

জুতো পরার অভ্যেস নেই নীলুর। জুতো তার থাকলেও পরে কম। গ্রামের লোকদের খালিপায়ে চলা চিরকালের অভ্যাস। জুতো পায়ে ঐসব সরু পুল পার হতে নীলুর ভয় করে। তখন সে জুতো হাতে নিয়ে খালিপায়ে পুল পার হয়। আর শেখরকাকা একহাতে সাইকেল তুলে ধরে নানা কসরত করে পুল পার হল। এভাবে নানা ওঠানামার খেলা দেখাতে দেখাতে দুজনে এগিয়ে চলে। খেলছে দুজন, দর্শকও দুজন।

কিছুদূর এসে শেখর কাকা বলে ওঠেন ধুত্তোর সাইকেল! নিকুচি করেছে সাইকেলের! এর চেয়ে হেঁটে আসা ঢের সুখের ছিল।

এভাবে হরিপুর হাই ইসকুল ছাড়িয়ে আরও আধমাইল পশ্চিমের দিকে তারা এগিয়ে যায়। এবারে এল নীলুর সহপাঠী উজীর শেখের বাড়ী। এ পথে এ পর্যন্তই নীলু এসেছে। এটুকু তার চেনা। তার ওপারে রয়েছে বিস্ময়ভরা অচেনা রাজ্য।

অচেনা পথে এলেই নীলুর চিরকাল পথ হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। পথ হারনোতেই বুঝি আনন্দ! আবার ভয়ও—এ পথ ধরে ফিরতে হবে তো!

তাই সে পথের পাশের প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, মনে রাখার চেষ্টা করে। এসব চিহ্ন ধরে সে আবার শাপলা গাঁয়ে রমলার কোলে ফিরে আসবে। হঠাৎ রমলার কথা মনে হওয়ায় তার চোখে জল এসে যায়। মনে হয়, আবার কতদিন পরে বুঝি মায়ের সঙ্গে দেখা হবে তার। সে চোখের জল এড়াতে পথের দৃশ্যে মনোযোগী হয়।

সবই যেন নতুন লাগে। পথের পাশে কোন পুকুর পাড়ে এক নেউল হয়ত তাদের দেখে ভয়ে গর্তে ঢুকছে আর সন্দিগ্ধ চোখে ফিরে তাকাচ্ছে। নীলু ভাগর চোখের বিস্ময়ভরা চাহনী মেলে দেখে আর ভাবে, এমন নেউল তো আগে দেখে নি। হয়ত এক কাঠবিড়ালী তাদের দেখে ত্রস্তপদে জামগাছের পাতার ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায় তাদের চোখের সামনেই। নীলু অপার আনন্দে দেখে আর ভাবে, এত সুন্দর

কাঠবিড়াল তো তাদের গাঁয়ে নেই। একটু পরে এক বড় দীঘি চোখে পড়ল। সেখানে হাজার শাপলার মেলা। নীলু অবাক হয়েও স্বীকার করে এত সুন্দর সুন্দর শাপলা বুঝি তাদের শাপলা গাঁয়ে নেই।

আসলে সব কিছু নীলু নতুন চোখে দেখতে চাইছে। তাই সে দেখছেও, সব কিছু নতুন হয়ে তার চোখে এসে ধরা দিচ্ছে। সে ভাবে নতুন দেশে এসে পুরানো একঘেয়ে জিনিস দেখে সুখ কোথায়? নীলুর কবি মন একই ফুলকে শতরূপে, শতবার, শতরঙে দেখতে ভালবাসে।

সে ভালোবাসে, তাই দেখতে পায়, যাদের দেখতে চায় তারা ভালোবেসে তার চোখের অতল সাগরে এসে ধরা দেঁয়। নতুন জিনিস দেখার আনন্দে নীলু তার ওঠানামার কষ্টের কথা ভুলেই যায়। সময়ের জ্ঞানও হারিয়ে ফেলে।

একটা ছোট খাল পথকে অতিক্রম করে চলে গেছে। তার উপর রয়েছে একটা ছোট পাকার পুল। পুলটার জীর্ণদশা কিন্তু খালটা জলে ঢলঢল। শেখরকাকা বললেন, এ হলো নয়নতারার পুল। এ জায়গার নাম নয়নতারা।

নয়নতারা! নীলু পুলকিত হয়ে বলে, বাঃ! ভারী সুন্দর নাম তো। শেখরকাকা বলেন, তেতুলবাড়িয়া রমেনদাদের বাড়ী এখান থেকে আড়াই মাইলের মত হবে। এ খালটা চলে গেছে একেবারে জমিদারবাবুদের বাড়ী। নৌকা পথেও এখান থেকে যাওয়া যায়। ওখানেই তো রমেনদাদের অফিস আর বাসা।

নীলুর নাকে হঠাৎ যেন কি এক তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ এসে লাগে। এ গন্ধ আগে যেন সে কোথায় পেয়েছে কিন্তু মনে করতে পারল না। তার মনে সহসা এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি জাগে: মনে হয়, সে যেন কবে কোথায় এ খালটা দেখেছে। আর সেই খালের পাড়েই ছিল ধনীর প্রাসাদ। কিন্তু কবে, কোথায় দেখেছে, সে মনেও করতে পারে না ঠিকমত।

কিন্তু কি কি সে দেখেছিল তা স্পষ্ট মনে পড়ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই খালের এক পারে ছিল ধনীর প্রাসাদ অপর পারে তো ছিল ছোট্ট

একটা মাটির ঘর। খালে একটা ডিঙ্গি নৌকা বাঁধা ছিল। সেই নৌকা বেয়ে ওপারে সে চলে গিয়েছিল। স্পষ্ট মনে পড়েছে দৃশ্যটা।

সে আকুল হয়ে শেখরকাকাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, জমিদারবাবুদের বাড়ী খালের যে পাড়ে তার অন্য পাড়ে তো রমেন জেঠাদের বাড়ী, তাই না ?

শেখরকাকা মুখ ঘুরিয়ে বলেন, হ্যাঁ, কেন ?

তিনি মুখ ঘুরাতেই সাইকেলটা এঁকে বেঁকে যায়। নীলু টাল সামলাতে শেখরকাকার জামা ধরে ফেলে।

শেখরকাকাও টাল সামলিয়ে নিয়ে বলেন, শৈলেশ্বর বলেছে বুঝি। চল্ না, তোর শৈলমামার সঙ্গেও ওখানে দেখা হয়ে যাবে। সে তো এখন বাবুদের বাড়ীতে। ক'দিন আগে তো সুন্দরবন থেকে ফিরেছে। আমরা প্রথমে তার সাথে বাবুদের বাড়ীতে গিয়ে দেখা করব। তারপর রমেনদার বাড়ী যাব।

নীলু শেখরকাকার কথাগুলো যেন শুনেও শোনো না। কোন দূর থেকে নেশাগ্রস্তের মত সে বলে ওঠে, আচ্ছা, সেই খালে কি কোন ডিঙ্গি নৌকা বাঁধা থাকে ?

শেখরকাকা মুখ না ঘুরিয়েই বলেন, হ্যাঁ, থাকে। বাবুদের মেয়েরা সখ করে খালে ঐ নৌকা বায় মাঝে মধ্যে।

নীলুর তখন উত্তেজনায় যেন দমটা বন্ধ হয়ে যাবে, মনে হয়। তার মনে হয়, তবে সে ঐ সব দৃশ্য আগে ঠিকই দেখেছে। সবই মিলে যাচ্ছে। কিন্তু কবে, কোথায় যে সে দেখেছে সেটাই মনে করতে পারল না।

সে ব্যাকুল হয়ে আবার বলে, আচ্ছা, সে জায়গাটা, ঐ যে যেখানে ডিঙ্গিটা বাঁধা রয়েছে, সেখানে খুব ঘন গাছপালা, না ? অনেক অনেক পাখীর মেলা সেখানে। বেশ ছায়াঢাকা অন্ধকার সে জায়গায় তাই না ?

শেখরকাকা অবাকচোখে একবার ফিরে তাকান নীলুর দিকে। পরে সামনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে স্বাভাবিক সুরেই বলেই, হ্যাঁ, হ্যাঁ

সবই শুনেছিস দেখি। চল, দেখবি চল। কতবড় বাড়ী বাবুদের। একেবারে রাজবাড়ীর মত রে। ঐ জায়গাটা বাবুরা ইচ্ছে করে সাফ-সুফ করে নি। বাবুদের বাড়ীর মেয়েরা ঐ জায়গায় খালের উপর নৌকায় ঘুরে বেড়ায় তো? তাই।

নীলু চুপ করে যায়। সে এখন যেন একটা সুন্দর মেয়েকেও ঐ ডিঙ্গির উপর বসে থাকতে দেখতে পায়। অমন কোন মেয়ে সেখানে থাকে কিনা তা জিজ্ঞেস করতে তার ইচ্ছে হয় কিন্তু লজ্জায় সে বলতে পারে না। অথচ জানার জন্য তার প্রাণটা খাঁচায় ভরা পাখীটার মত ঝটপটিয়ে মরে।

নীলুকে কিছুক্ষন চুপ করে থাকতে দেখে শেখর কাকা প্রশ্ন করে শৈল বলেছে বুঝি এসব তোকে?

নীলু ছোট্ট করে জবাব দেয় কই, না তো।

শেখর কাকা অবাক হন। বলেন তাহলে? তুই যেভাবে জিজ্ঞেস করছিস, তাতে মনে হচ্ছে তুই যেন ওসব দেখেছিস। তুই দেখলি কবে? রমেনদাদের বাড়ী এলি কবে যে দেখবি?

নীলু আচ্ছন্নের মত মাথা নেড়ে নেড়ে বলে—দেখিনি তো।

শেখরকাকা হাঁ হয়ে যান। সন্দেহের দৃষ্টি বুলিয়ে বলেন দেখিসনি তা তো জানি। শৈলও বলে নি বলছিস। তা হলে এত সব না দেখে না শুনে ঠিক ঠিক বলে যাচ্ছিস কি করে?

নীলু ছলছল চোখে বলে জানিনা তো।

শেখর কাকা এবার বিরক্ত হন। বলেন তোর কি হয়েছে বল দেখি? সেই কাল থেকে তোর কথার ছিরি-ছাঁদ মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারি না বাপু। তোমার মাথায় কিছু পোকা ঢুকেছে।

শেখর কাকা গম্ভীর হয়ে যান। তিনি আর কোন কথা না বলে জোরে জোরে সাইকেল্ চালাতে থাকেন।

পেছনের ক্যারিয়ারের উপর বসে নীলু ভেবে চলে সবই যখন মিলে যাচ্ছে তখন সেই প্রজাপতির মত ছটপটে মেয়েটা নিশ্চয়ই সেখানে আছে। তার মুখটা যেন সে আরো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। মনে

পড়ছে, সে মেয়েটি তাকে কবে যেন কোথায় বলেছিল তার জন্যই সে বসে আছে। সেই অদেখা মেয়েটিকে নীলুর বড় আপনার মনে হয়। তার সঙ্গে নীলুর চেনাশোনা যেন কতকালের। মনে হয়, তার সঙ্গে বুঝি গতজন্মে তার দেখা হয়েছিল। এ জন্মে আজ পর্যন্ত হয় নি। আজই বুঝি হতে চলেছে।

তার বিরহী হৃদয় ভালোবাসার আবেগে থরথর করে কেঁপে ওঠে। ভালোবাসার জ্বালায় সে জ্বলে যেতে থাকে। সে জ্বালায় দাহ নেই, আছে স্নিগ্ধ চন্দনের প্রলেপ অথচ আগুনের মতই দাউদাউ করে জ্বলছে।

কিছু পরে আবেগ প্রশমিত হয়। স্থির হয়ে আবার নতুন করে সে ভাবতে থাকে, কোথায় দেখেছে সে মেয়েটিকে। নাঃ, কিছুই মনে আসছে না। তাহ'লে কি সে স্বপ্ন দেখেছিল কবে ? স্বপ্নে দেখা হলে সত্যি হবে, এ আশা, দুরাশা।

নীলু নিরাশার অতল সাগরে তলিয়ে যেতে থাকে। তবু সে ক্ষীণ আশার আলোকবর্তিকা দেখতে পায় অকূল সাগরের বালুতটে। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুরে মনে মনে সে বলে ওঠে এ পর্যন্ত যখন সব মিলেছে তখন বাকীটুকুও মিলবে। স্বপ্নে দেখা অলীক বস্তু হলে এতখানিই বা মেলে কি করে ? আশার আলোকবর্ত্তিকাটা আরো যেন উজ্জ্বল হচ্ছে। নীলু বুঝি কূলে এসে গেছে।

সহসা আলোটা অদৃশ্য হয়ে যায় আর পরক্ষনেই জেগে ওঠে সেই মুখ সেই অদেখা অথচ স্পষ্টদেখা সেই প্রজাপতি মেয়ের মুখ। সুন্দর সে মুখ। তার দৃঢ় বিশ্বাস জাগে তার দেখা মিলবেই।

কে যেন দূর থেকে বলে ওঠে এসে গেছি প্রায়।

নীলু চমকিয়ে ওঠে। তার মনে হয়, তার ভেতর থেকেই বুঝি কে বলল কথাটা। কিন্তু পরক্ষনেই বুঝতে পারে কথাগুলো বলেছেন শেখরকাকা।

শেখর কাকা বলে যাচ্ছেন এ জায়গার নাম নন্দপুর। ঐ ছাখ নন্দপুরের হাই ইসকুল। তোদের হরিপুরের হাই ইসকুলের মতই।

আর ঐ যে দূরে গ্রামটা ওটা হল তেতুলবাড়িয়া। এখান থেকে আর আধ মাইল পথও নয়।

নীলু তাকিয়ে তাকিয়ে দূরের গ্রামটাকে দেখে।

আরো কিছুদূর এসে শেখরকাকা বলেন ঐ যে গাছপালা ঘেরা জায়গা, ওর মধ্যে একটা তিনতলা সাদা পাকাবাড়ী দেখতে পাচ্ছিস?

নীলু তাকিয়ে বলে হ্যাঁ।

শেখরকাকা বলে যান ওটাই হলো বাবুদের বাড়ী। ওখানেই তোর শৈলমামার সঙ্গে দেখা হবে। ওর সামনে রয়েছে খাল--একই খাল, যা নয়নতারায় দেখে এলি। আর ঐ খালের ওপারেই রমেনদার বাড়ী। আমাদের এই পথের উপরে আবার খালটা পড়বে। একটা কাঠের পুল আছে তার উপর। রমেনদার বাড়ী যখন যাব তখন ঐ পুলের উপর দিয়েই যাব।

আশা-নিরাশার সন্ধিক্ষনে নীলু দুলতে থাকে, পাওয়া, না পাওয়ার ভাবনায় সে শিহরিত হয়। নীলু মনে মনে বলে—এ কি বিরহ মিলনের দোলা? না, তাও তো নয়। তবে এ কি?

ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন তার অন্তরের অন্তস্থল হতে বলে ওঠে—জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষন।

নীলু ভেবে পায় না, কে তার ভেতরে এত কথা বলে। যে-ই বলুক, নীলু তাকে ধন্যবাদ দেয় তার এই সঠিক সুন্দর উক্তিটির জন্য।

নীলু মনে মনে বলে—হ্যাঁ ঠিক, এ হোল জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষন। কিন্তু সে মেয়েটার দেখা না পেলে আমার বেঁচে লাভ নেই আর। ঐ খালের জলেই আমাকে ডুবে মরতে হবে।

পরক্ষনেই সে যেন আর্তচীৎকার করে ওঠে, বলে—না, না, আমি মরতে পারি না। আমি মহাজীবন গড়ে তুলতে চাই, অনেক সাধ আমার। আমার সে মহাজীবনে ঐ মেয়েটিকে আমি চাই।

—এই যে, এসে গেছি বাবুদের বাড়ী, শেখরকাকা বলে ওঠেন—চল্ শৈলর সঙ্গে আগে দেখা করি গে।

বাবুদের গেটে ঢুকতেই শৈলকাকার সঙ্গে দেখা। নীলুকে দেখে তিনি বলে ওঠেন, কিরে, কেমন আছিস?

নীলু শৈলমামাকে প্রণাম করে বলে, ভাল।

তারপর সে শেখরকাকাকেও প্রণাম করে।

শৈলমামা শেখরকাকাকে বলেন, গতকাল তোমার আসার কথা ছিল। এলে না কেন? রমেনদা রাগারাগি করছেন। বলছিলেন, বিদেশ-বিভূঁয়ে যে আত্মীয়-স্বজনের একটু ঠিকমত সাহায্য পাব তার উপায় নেই। খাওয়ার সময় সব আসবে—সব নেমন্তন্ন করা অতিথি হয়ে। শেখরকাকা জিভ কেটে বলেন, তাই বলেছেন বুঝি? সর্বনাশ। এই তো, নীলুর জন্য দেরী হয়ে গেল। না হলে কালই চলে আসতে পারতাম।

নীলু ততক্ষনে খালটা কোথায় তা খুঁজে দেখার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। সে না দেখে আর স্থির থাকতে পারছে না।

শেখরকাকা পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলেন—কোথায় যাস ওদিকে? ওদিকে তো খাল। আমাদের ঘুরে যেতে হবে পুলের উপর দিয়ে। শৈলর সাথে একটু কথা বলে নিই। একটু পরেই যাচ্ছি।

নীলুর যেতে যেতে বলে—ঠিক আছে, আমি একটু ঘুরে দেখি না। শৈলমামা বলে ওঠেন—এক কাজ করা যাক। রমেনদার মেয়ে তুলি একটু আগে খালে ডিঙ্গি বাইছিল। মেয়েটা বেশ ডানপিটে। দেখি, ও যদি থাকে, তবে তুলির সঙ্গে ওপারে রমেনদার বাড়ী চলে যাক। তুমি বস, অনেক কথা আছে। ছেলে মানুষ, এখানে বসে বসে আমাদের বৈষয়িক কথাবার্তা কি শুনবে? ও বরং তুলির সঙ্গে কথা বলুক।

নীলু এই মুহূর্তে আর্কিমিডিসের গল্পটা মনে পড়ে যায়। এই সময় তার 'ইউরেকা, ইউরেকা' বলে চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল। গুরুজনদের কথা ভেবে নিবৃত্ত হল।

সে তাকিয়ে দেখে, অবিকল সেই দৃশ্য। সেই প্রাসাদ, সেই খাল, সেইরকম গাছপালা, ছায়াঢাকা পথ, গাছে গাছে পাখী ডাকছে—একেবারে সব সেইরকমই। নীলু আরোও আনন্দে উদ্বেলিত হয় ওপারে মাটির বাড়িটা দেখে। একেবারে সেই রকমই বাড়ীটা।

কিন্তু মেয়েটি কোথায়? নীলু এদিক ওদিক তাকায়। তাকে

তো দেখা যাচ্ছে না। নীলু মুচ্‌কী হাসে এখন। সে ভাবে, এখন নাই সে দেখতে পাক্‌। মেয়েটি তাকে দেখা না দিয়ে যাবে কোথায় ? তার নাম যে তুলি, তাতো তার জানা হয়ে গেছে।

হঠাৎ শৈলমামায় চীৎকার কানে ভেসে আসে। শৈলমামা বলে যাচ্ছেন, তুলি, মা তোমার ডিঙ্গিটা এপারে নিয়ে এসো তো ! নীলুকে পার করে তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাও। তোমার বাবাকে বলো, তোমার মেসোমশাই এসেছে। একটু পরে যাচ্ছে।

এতক্ষনে নীলু দেখতে পায় ওপারের ঘাটে ছোট্ট ডিঙ্গির উপর একটা প্রজাপতির মত মেয়ে বসে আছে।

তুলি ওপার থেকে বলে ওঠে—কে ও ?

শৈলমামা বলে, তুমি এপারে এসে জেনে নাও ওর কাছ থেকে। একে নিয়ে যাও, কেমন ?

শৈলমামা ও শেখরকাকা চলে যান। নীলু তাকিয়ে দেখছে, তুলি কেমন নৌকা বেয়ে এপারে আসছে। যত কাছে আসছে তত সে তার মুখটা স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে।

অবিকল সেই চোখ, সেই নাক, সেই মুখ দুটো সেই রকম ডাগর-ডাগর। তায় লেগেছে কাজল রেখার স্নিগ্ধপ্রলেপ। তাতে চোখ দুটোকে বেশ নরম আর স্বপ্নালু মনে হচ্ছে। নীলুর মনে হতে থাকে, চোখ দুটো যেন ঠিক এক ছায়াঢাকা মেঠো পথ। এ পথে গেলে অচিন দেশের সন্ধান মেলে। পথ হারিয়ে ঘুরে মরতেও বাধা নেই।

আরো সে দেখে. সেই রকম একটু মোটা চাপা নাক। অভিমানী মেয়ের মত নাকের পাতা দুটো ঈষৎ ফুলে রয়েছে। আর সেই রকম পায়ের পাতাঝাপা ভোমরাকালো চুলের রাশির যেন ঢল নেমেছে।

সব চেয়ে আশ্চর্য লাগে, সেই কবে গতজন্মে দেখা অবিকল একই প্রজাপতি রংয়ের জামা। সব মিলিয়ে তার মনে হয়, মেয়ে তো তুলি নয়, যেন তুলি দিয়ে আঁকা এক রঙীন প্রজাপতি। তুলি এপারে নৌকা বেয়ে আসছে, নীলুর মনে হচ্ছে একটা রঙ্গীন প্রজাপতি বুঝি তার রামধনু রং পাখা মেলে জলের উপর দিয়ে বাতাসে ভেসে আসছে।

এই তো, আর একটু পরেই সে হাত বাড়িয়ে প্রজাপতিটাকে ধরে ফেলবে।

নীলু দাঁড়িয়েছিল এক নাম না জানা কাঁটা ঝোপের নীচে। কাঁটা গাছের একটা ডাল ঠিক তার মাথার উপরে। আর জলের উপর দাঁড়িয়েছিল আম, জাম, শিরীষ বকুলের নরম নরম কালো ছায়া। আর সেই কালো ছায়াগুলো কাঁপিয়ে পাখা মেলে উড়ে আসছে রঙীন প্রজাপতিটা। তারও ছায়া পড়েছে জলে। সব মিলিয়ে নীলু এক ইন্দ্রিয়াতীত জগতের দ্বারপ্রান্ত যেন দাঁড়িয়ে।

তুলি এপারে এসে তার ডিঙ্গি ভিড়িয়েছে কিন্তু ডাঙ্গায় নামে নি। নীলু তাকে চেয়ে দেখছে, শুধু দেখেই যাচ্ছে। দেখার আর দোষ নেই তার। কোনকালেই বুঝি শেষ হবে না আর।

কিন্তু তবু মনে পড়ে না, কোথায় দেখল সে মেয়েটিকে এর আগে। দেখেছে যে, সে বিষয়ে এখন আর তার কোন সন্দেহ নেই। আশ্চর্য এই স্মৃতিভ্রম।

সহসা তুলির কথায় তার চমক লাগে। তুলি বলছে তাকে—এস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

নীলু সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে, লাজুক লাজুক হাসি হেসে বলে বড়-ছোট নৌকা তোমার। যা-দুলছে, ভয় করে, পাছে উঠতে গিয়ে পড়ে যাই।

তুলি পাখীর মত নরম চোখ তুলে মিষ্টি হেসে বলে, ভয় কি, আমি তো পাশেই থাকব। ভয় নেই, নৌকা ডুববে না। এসো।

নীলু সাবধানে পা বাড়াতে চেষ্টা করে। কিন্তু কাঁটাগাছের ডাল তাকে জড়িয়ে ধরে। জামার একপ্রান্ত কাঁটাগাছের ডালে আটকিয়েছে সে পিছিয়ে আসে।

তুলি নীলুর দুর্দশা দেখে হেসে ফেলে। বলে—চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি জামা ছাড়িয়ে দিচ্ছি।

তুলি মাটিতে পা রাখে। সযত্নে নীলুকে কাঁটার বাহুবন্ধন থেকে

মুক্ত করে। তারপর নৌকার উপর উঠে নীলুর দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, আমার হাতে হাত দাও। যা ভয় তোমার।

নীলু তুলির হাতে হাত রাখে। সারা শরীরে তার এক বিদ্যুতের সুতীব্র শিহরণ খেলে যায়। তুলি নীলুর হাত ধরে আকর্ষন করে। নীলু তুলির টানে তার দেহের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। নৌকা দুলে ওঠে। ;তার দোলায় তুলি ও নীলুর মিলিত দেহও দোল খেয়ে যায়। খালের জলে ঢেউ-এর দোলা লাগে, দোলা লাগে কাঁপা-কাঁপা গাছের ছায়ায়।

আর ঠিক সেইক্ষনে নীলুর স্মৃতিও প্রবলভাবে দুলে ওঠে। স্মৃতির প্রবল দোলায় তার মনে হয় সে বুঝি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে। আকুল হয়ে সে তুলিকে জড়িয়ে ধরে।

আর ঠিক এই মুহূর্তে তার সব মনে পড়ে যায়—একের পর এক। মনে পড়ে, সে তুলিকে দেখেছে তার টাইফয়েড জ্বরের সময় জীবন-মৃত্যুর এক সন্ধিক্ষনে—বোধ হয় মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে। তার বিশ্বাস জাগে, তুলি তার গতজন্মের প্রিয়া। এ জন্মেও তারই প্রিয়া হবে। তুলি তার জন্ম-জন্মান্তরের প্রেয়সী। এই তুলির বিরহেই বুঝি এতকাল তার হৃদয়মন ভালোবাসার অসহ্য জ্বালায়, সুতীব্র সুখের দহনে জ্বলে যাচ্ছিল তাই ইসকুলে যাওয়া-আসার পথে সেই ছায়াঢাকা জায়গাটিতে এসে তার যুগপৎ মিলন-বিরহের, আনন্দ-বেদনার অনুভূতি জাগত। আশ্চর্য, এ জায়গাতেও সেইরকম ছায়াঢাকা পথ।

নীলু তুলিকে ছেড়ে দিয়ে তার দিকে চোখ তুলে তাকায়।

তুলি হেসে ফেলে। বলে—সামান্য একটু দোলায় তুমি ঘাবড়িয়ে গেছ। কি ভীতু তুমি! এবারে বসো! এই, আমার পাশে এসে বসো, না হলে আবার না উলটে পড়ে যাও।

কথা শেষ করে তুলি বসে পড়ে, নীলুর দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসে। নীলুর হাত ধরে তুলি তার পাশে বসায়।

তুলি নৌকা বাইছে। নীলু শুধু তুলির দিকে তাকিয়ে থাকে।

তা দেখে তুলি বলে—কি দেখছ? ঘাটে না গিয়ে সোজা যাচ্ছি

কেন, এই তো ? এমনি একটু ঘুরা যাক, না। বাড়ী যাব'খন। তোমার ভাল লাগছে ?

—হুঁম্, নীলু ছোট্ট করে জবাব দেয়। একটু পরে নীলু বলে—তুমি তো কই জানতে চাইলে না, আমি কে ?

তুলি সে কথার কোন জবাব দেয় না। মিষ্টি হেসে বলে—তুমি বাইবে একটু।

নীলু ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে—না, না আমি পারব না। তুমিই বাও। আমি তোমার পাশে বসে আছি বরং।

তুলি কৌতুকে বলে—আমি পাশে বসে থাকলে বুঝি তুমি বাইতে পারবে না। তাহলে আমি নেমে যাই, তুমি বাও।

—না, না তোমায় নামতে হবে না, আমি বাইছি, নীলু বলে ওঠে—কিন্তু তুমি যেমন পাশে বসে আছ, তেমনি বসে থাক, সরে যেও না। নৌকা দুলিয়ে ভয় দেখাবে না তো ?

তুলি হেসে বলে—না, না ভয় দেখাব না, তুমি বাও। দেখি কেমন বাও।

নীলুর তুলির দিকে তাকিয়ে দাঁড় হাতে তুলে নেয়। তুলি তখন হাসছে। নীলু তার দিকে তাকিয়ে সন্দেহের সুরে বলে—না, তুমি হাসছ, দুলিয়ে দেবে নৌকা। আমি বাইব না, যাও। তুমি পাশে বসে থাকবে না, মনে হচ্ছে।

তুলি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—বসে থাকব, থাকব, থাকব। হলো তো ? নাও বাও দেখি এবার। নৌকা কেমন চলে দেখি।

নীলু অনভ্যস্ত হাতে বাইতে থাকে। নৌকা সোজা চলে না, এঁকে বেঁকে যায়। তুলি নীলুর হাতের উপর হাত রেখে শিখিয়ে দেয়, কেমন করে বাইতে হয়।

হাতে হাত লাগে। পরশের শিহরণ নীলুর সারা শরীরে খেলে বেড়ায়। চোখ মুদে সে ভাবতে চেষ্টা করে, একটা রঙীন প্রজাপতি যেন তার সারা শরীরের উপর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। উড়তে উড়তে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে, ছুঁয়ে ছুয়ে উড়ে যাচ্ছে। তাই বুঝি এই শিহরণ!

তুলি হাত ছেড়ে দেয়। নীলু একা বাইতে থাকে। নৌকা মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলে।

একটু পরে নীলু জলের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বলে তোমার একটা রথ আছে, তাই না ?

—রথ ? তুলি অবাক হয়ে বলে—রথ আবার কোথায় থাকবে আমার ?

নীলুর কিন্তু দূরের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ। দৃঢ়তার সঙ্গে বলে—নিশ্চয়ই আছে রথ। আমি দেখেছি। কথা শেষ করে নীলু তুলির চোখে চোখ রাখে। তুলি নীলুর দিকে তাকিয়ে বলে—তুমি দেখেছ ? আশ্চর্য ! না, এ হতেই পারে না। তুমি তো কোনদিন আমাদের বাড়ী আসো নি। তবে তোমার কথা আমি বাবার কাছে শুনেছি কত।

নীলু তথাপি দৃঢ়স্বরে বলে যায়—তোমার সে রথের অনেকগুলো চাকা। তাতে দুজনের বসার মত জায়গা। তুমি আমাকে নিয়ে চালিয়েছিলে সে রথ। এত কি ভুল হবে আমার ? স্পষ্ট দেখেছি সে রথ

তুলি এবাব অবাক হতে গিয়েও যেন ভয় পেয়ে যায়। ভাবে এ ছেলের মাথায় গোলমাল কিছু নেই তো ? কিন্তু নিজের এই ভয়ের কথা সে প্রকাশ করে না। বলে চলো এবার ফেরা যাক্।

নীলু তুলির কথার কোন জবাব দেয় না। চুপ করে আনমনা হয়ে কি যেন ভেবে চলে সে। তুলি মুখ ঘুরিয়ে ঘরের দিকে নৌকা বাইতে থাকে।

সহসা তুলি চেঁচিয়ে বলে ওঠে—ও হোঃ হোঃ হোঃ, আমার তিন চাকার সাইকেলটাকে কি রথ বলছ তুমি ?

নীলুর মুখ এবার উজ্জ্বল প্রশান্তিতে ভরে যায়। সে চীৎকার করে বলে ওঠে—মিলে গেছে, মিলে গেছে। এবারে বিশ্বাস হলো তো আমার কথা, সে রথে তুমি আমায় চড়িয়েছ।

তুলি এবারে সত্যসত্যই ভীষণ ভয় পায়। তবু চেপে গিয়ে শুকনো মুখে বলে কি ব্যাপার বলো তো, তুমি এখানে কোনদিন আসো নি, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি তবু তুমি এত জানলে কি করে ? কি

করে বলছ আমার সাইকেলে তুমি চড়েছ আমার সাথে ?

নীলু ভীরু কাঁপা-কাঁপা চাহনী মেলে বলে—বিশ্বাস করবে সে কথা

—কেন করবো না ? তুলি বলে—বলো তুমি।

তুলি এবার নীলুর প্রতি সত্যই কৌতূহলী হয়। নীলু তখন পরম আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বলে যায় তার জীবনের পরপারে চলে যাওয়ার কথা। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে যা সে দেখেছিল, একে একে সব বলে যায়। আজ আসার পথে শেখর কাকা যে তাকে ভুল বুঝেছে সে কথাও অকপটে বলে নীলু।

তুলি মায়াভরা চোখ মেলে এই রূপবান, ভাবুক ছেলেটির মৃত্যু-লোকের আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা শুনতে শুনতে নৌকা বাইতে ভুলে যায়। নৌকা কখন এসে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে সে খেয়াল তার নেই। নীলুরও নেই।

তুলি নীলুর কথা কিছু বিশ্বাস করে, কিছু অবিশ্বাসও।

নীলু কথা শেষ করে আবেগ ভরে বলে আমি বিশ্বাস করি, নিশ্চয়ই আগের জন্মে তোমার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। আর এ জন্মেও তাই হলো। তোমাকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছি। কিন্তু মনে করতে পারি নি, তোমায় কোথায়, কবে দেখেছিলাম এর আগে। একমাত্র তোমার হাতে হাত দিতেই আমার মনে পড়ল কোথায় দেখে-ছিলাম তোমাকে। আমার কথা তুমি কি বিশ্বাস করলে তুলি ?

তুলি চোখ তুলে নীলুর দিকে তাকায়, আবার চোখ নামিয়ে নেয়, নীলু স্পষ্ট যেন সে চোখে দেখতে পায় তুলির সজল মিনতি। নীলুর দৃষ্টি ব্যথাহত হয়ে ফিরে আসে।

একটু পরে তুলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে তুমি কিছু মনে করো না, আমার যেন কেমন সব অদ্ভুত লাগছে তোমার কথাগুলো।

প্রবল অভিমানে নীলুর কণ্ঠরুদ্ধ হয়। মনে মনে সে বলে • তুলি, তুমি আমায় চিনতে পারলে না, আমায় অবিশ্বাস করলে ? অথচ তোমাকে দেখেই আমি চিনেছি।

কিন্তু মুখে সে একথা বলতে পারে না। কথা সে অনেক পরে

বলতে চেষ্টা করে, কিন্তু অভিমানে তার গলা রুদ্ধ হয়ে আসে। অনেক কষ্টে নিজেকে প্রাণপনে সংযত করে ধরাগলায় সে বলে আজ বিশ্বাস না করতে ইচ্ছে হয়, নাই করো; কিন্তু যেদিন তোমার বিশ্বাস হবে, বলো সে কথা।

তুলি নতমুখে ঘাড় নাড়ে। নীলু বুঝতে পারে না তুলি ঘাড় নেড়ে কি বলতে চায়। তবে সে দেখে আশ্বস্ত হয়, তুলির মুখে উপহাসের কোন চিহ্নমাত্র নেই। বরং সে মুখে রয়েছে এক দ্বিধা বিশ্বাস করতে পারলে যেন তুলি খুশী হত। নীলুর ইচ্ছা হয়, তুলিকে একেবারে আপন করে ভালোবাসতে। কিন্তু সে এখনও তাকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারে নি, তাকে কেমন করেই বা সে কথা বলা যায়? নীলু বিহবল হয়ে তুলির পানে চেয়ে থাকে।

সহসা তুলি সচকিত হয়ে বলে ওঠে—চলো, এবারে ফেরা যাক। দেরী হয়ে গেছে। মা বকবে। নীলু সহজ হয়। বলে হ্যাঁ চলো এবার।

তুলি তাড়াতাড়ি দাঁড় বেয়ে নৌকাকে ঘরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যেতে যেতে কোন কথা আর বলে না তারা। দুজনে দুদিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে। কিন্তু দুজনেই দুজনের কাছে ধরা পড়ে যায়। দুজনে হেসে ওঠে।

নীলু বলে—কি?

তুলি বলে—কিছু না।

দুজনে আবার হাসে। তুলি বলে, আমাকে ধরে থাকো। নৌকা এবার ঘাটে ভিড়াব। ধাক্কা লাগবে। তুমি আবার যা ভীতু।

নীলু তুলির একটা হাত ধরে থাকে। সে যেন অনেকটা আশ্বস্ত হয়। তার মনে হয় অবিশ্বাসের বয়স বুঝি গলতে সুরু করেছে।

ঘাটে নৌকা বেঁধে তুলি নীলুর হাত ধরে তাকে নামায়। দুজনে হাত ধরাধরি করে বাড়ীর ভেতরে এসে ঢোকে। তুলিই আগে ঢোকে।

তুলির মা তুলিকে দেখে ঝাঁঝিয়ে বলে ওঠেন, কোথায় ছিলি

এতক্ষন ? শুধু নৌকা বাইলে চলবে ? দিনকে দিন খুব ধিঙ্গি হয়েছিস, না ?

নীলু তখনও ঢোকে নি। তুলিকে তার মা বকছেন দেখে সে ঢুকবে কি ঢুকবে না ভাবছে। তুলি মার কথা আদৌ গায়ে মাখে না। পেছন ফিরে নীলুর দিকে চেয়ে হেসে বলে—ওকি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন। এসো।

নীলু ভেতরে ঢোকে। তাকে দেখে তুলির মা অবাক হয়ে বলেন এ কে ? সেই মুহূর্তে রমেনজেঠা আসেন সেখানে। তিনি নীলুকে দেখে বলে ওঠেন—আরে, এ তো শংকরীর ছেলে, নীলু। তুমি কার সঙ্গে এসেছ নীলু ? শংকরী এলো না কেন ?

নীলু জেঠা ও জেঠাইমাকে প্রণাম করে। তখন তুলি বলে চলেছে, ও শেখর মেসোমশাই-এর সঙ্গে এসেছে। শেখর মেসোমশাই শৈল মেসোমশাই-এর সঙ্গে কথা বলছেন। তোমাকে বলতে বলেছিলেন। আমি ওপার থেকে নিয়ে এসেছি।

রমেনজেঠা বলেন--বেশ। জেঠাইমা বললেন, তোমার বড়লোক বাপ এলো না কেন গরীবের বাড়ী ? নীলু কিছু বলতে পারে না। লজ্জা পায়। রমেনজেঠা তাকে বলেন, তোমাদের বাড়ীর সব ভালো ?

তুলি তখন তার হাত ধরে টানছে দোতলার সিঁড়ির দিকে। নীলু হ্যাঁ বলেই তুলির সঙ্গে দোতলার দিকে এগিয়ে যায়।

দোতলায় গিয়ে নীলু দেখে সেখানে অনেক ছেলেমেয়ের ভীড়। রমেন জেঠাদের বাসাটা মাটির হলেও সেটি দোতলা বাড়ী। তুলি নীলুর সঙ্গে অনেকের পরিচয় করিয়ে দেয়। নীলু সবিস্ময়ে, পুলকিত হয়ে দেখে, এক কোনে একটা তিন চাকার সাইকেল রয়েছে। এটি যে তুলির তা আর বুঝতে তার বাকী থাকে না। লাল আর সাদা রঙের সাইকেলটা দেখে নীলুর তখনই তার উপর চড়ে বসতে ইচ্ছে করে।

একটু পরেই নীচ থেকে শেখরকাকার গলা শোনা গেল—নীলু, নীলু। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুপদাপ করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসেন।

এসেই সগর্বে ঘোষণা করেন—তুলি, মা, নীলুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে তো? ও শংকরীদার ছেলে। পড়াশুনায় খুব ভালো। প্রত্যেক পরীক্ষায় ও ফার্স্ট-সেকেণ্ড হয়।

নীলুর ভীষণ লজ্জা পায়। শেখরকাকার উপর বিরক্ত হয়। কিন্তু নীলুর বিরক্তি দেখার মত সময় ব্যস্তবাগীশ শেখরকাকার নেই। তিনি যেমন ঝড়ের বেগে হুড়মুড়িয়ে উপরে এসেছিলেন তেমনি ঝড়ের বেগেই হুড়হুড়িয়ে নিচে নেমে গেলেন কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে।

একটু পরে ছেলেমেয়েরা সব হৈ হৈ করতে করতে নীচে চলে গেল। জেঠাইমা তাদের জলখাবার খেতে ডাকছেন নীচ থেকে।

তুলি বলল—তুমি এখানেই বস। আমি এই আসছি একটু।

নীলু একা বসে থাকে। তুলিও নীচে নেমে যায়। তিন চাকার সাইকেলটা তাকে দুর্নিবার বেগে আকর্ষণ করে। নীলু উঠে সাই-কেলেটার উপর চেপে বসে। দোতলার উপরেই সে চালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু ঠিকমত হয় না তার। হ্যাণ্ডেলটা বারে বারে বেঁকে যায়।

একটু পরে তুলি জলখাবারের থালা নিয়ে উপরে উঠে আসে। খাবারের থালা নামিয়ে রেখে বলে—খেয়ে নাও, তারপর যত ইচ্ছে চড়ো। আমি জল নিয়ে আসছি।

সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ায় তুলি। নীলুর দিকে ফিরে সকৌতুকে বলে—এটাই তো তুমি দেখেছিলে বললে। এই তো তোমার রথ, তাই না?

নীলু সাইকেল থেকে নামতে নামতে বলে—আমার নয়, তোমার হ্যাঁ এই রকমই অনেকটা। কিন্তু তোমার খাবার কোথায়?

—আমি নীচে খেয়ে নিচ্ছি। তুমি এখানেই খাও, তুলি বলে।

নীলু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলে—না তা হবে না। তুমি এখানে তোমার খাবার নিয়ে এসো। না হলে আমি আর খাব না বলছি। তুলি বিব্রত হয়ে বলে—আচ্ছা পাগল তো। এখানে খেলে ওরা কি ভাববে বলো তো?

নীলু আনাড়ীর মত জেদ ধরে। বলে—আমি না খেলে তুমি

কি ভাববে, তাই বলো শুনি। এ কথার জবাব দেয় না তুলি। হেসে নীচে নেমে যায়। নীলু চুপ করে বসে থাকে। একটু পরে জলের গেলাস হাতে উঠে আসে।

নীলু বলে—কই, তোমার খাবার কই ?

তুলি বলে—তুমি কিছু বোঝ না। তোমাকে নিয়ে আমার আচ্ছা মুশকিল হলো দেখছি।

নীলু সহাস্যে বলে—কেন ? বলছিলাম, এতক্ষন একসঙ্গে গল্প করলাম। একসঙ্গে খেলে ভালো লাগত। বেশ, তুমি যখন বিরক্ত হচ্ছ, তবে থাক।

তুলি চোখের তারা নাচিয়ে বলে—ও, বাবুর রাগ হয়ে গেল, আমি আমার খাবারের থালা এখানে নিয়ে এলে ওরা ঠাট্টা করবে। এক কাজ করো, দাও তোমার থালা থেকেই দুটো লুচি দাও।

নীলু বলে—উঁ হুঁ, আমি তোমায় খাইয়ে দেব।

তুলি কপট রাগ দেখিয়ে বলে—তোমাকে সাথে করে আনাই ঘাট হয়েছে। নীলু তাকে রাগিয়ে রাগিয়ে বলে, তুমি না আনলে আমি নিজেই আসতাম।

তুলি হেসে ফেলে। বলে, পারি না বাপু, তোমার সঙ্গে বক্ বক্ করতে। কই, এসো বসো। তোমার পাত থেকে তুলে তুলে খাচ্ছি। তোমার হাতে খেতে পারব না কিন্তু, বলে দিলাম।

নীলু আর আপত্তি করে না। দুজনে খেতে বসে। একজনের খাওয়া দুজনে খেতে আর কতক্ষন লাগে ? তখনই থালা খালি হয়ে যায়। তুলি বলে—তোমার পেট ভরলো না।

নীলু বলে—দিলে আর কই ?

—কেন ?

—তোমারটা নিয়ে এলে এরকম হতো না।

তুলি মুখ টিপে হাসে। বলে—নিজের থালা নিয়ে আসতে না পারি, তাই বলে ভেবেছো তোমার জন্য আনতে পারি না ?

নীলু চমৎকৃত হয়ে বলে—বাঃ. বেশ বুদ্ধি তো তোমার ! কিন্তু

সত্যি বলছি আমার আর খেতে ইচ্ছে নেই। পেট ভরে গেছে।

তুলি চোখ কপালে তুলে বলে ওমা, ঐটুকুতে। ওসব বাজে কথা। আমি নিয়ে আসছি আরো।

তুলি যেতে উদ্যত হয়। নীলু তার হাত ধরে ফেলে। বলে দরকার নেই আর, গল্প করি বরং এসো।

তুলি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—বেশ তো নিয়ে আসি খাবার। খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

নীলু আর বাধা দেয় না। হাসে শুধু। হাসে তুলিও। হেসে নীচে চলে যায়। একটু পরে আর একটা থালায় করে খাবার নিয়ে এসে বলে—এটা কিন্তু আমার।

নীলু অবাক হয়ে বলে—সে কি ?

তুলি বলে—হ্যাঁ। তবে তুমি এটা থেকে তুলে তুলে খেতে পার।

হো হো করে নীলু হেসে ওঠে। তুলিও সে হাসিতে যোগ দেয়। তুলির কৌতুকটা বেশ উপভোগ করে নীলু।

খেতে খেতে হাসি ঠাট্টায় তারা সমান আগ্রহী হয়ে পড়ে। মনে হয় যেন কতকালের চেনাজানা তাদের।

খাওয়া শেষ করে নীলু সাইকেলে চেপে বসে আবার। সাইকেল চালায় কিন্তু আগের মতই এঁকে বেঁকে যায়। নীলু ঠিকমত পারছে না দেখে তুলি চালিয়ে দেখায় তাকে।

নীলু বলে—তুলি এটাকে বাইরে নিয়ে যাবে ? এখানে ঠিক সুবিধা হচ্ছে না।

তুলি বলে আজ না। আমার কাজ রয়েছে যে খুব। এখন নীচে চল। আমি সুপারি কেটে রাখব। তুমি ওখানে বসে আমার সঙ্গে গল্প করবে।

কিন্তু নীলু চুপ করে থাকে, কথা বলে না। তুলি কাছে এসে তার চিবুক ধরে বলে—কি হলো ? রাগ হলো বুঝি ? রাগ করে না, লক্ষ্মীটি। কাল ঠিক তোমার কথা রাখবো দেখো। এসো আমার সাথে

নীলু বলে—না, না আমি রাগ করি নি। জেঠার সামনে যেতে কেমন যেন ভয় ভয় করে না লজ্জা করে।

তুলি হেসে বলে—ও, এই কথা ? এসো তো তুমি।

তুলি নীলুর হাত ধরে টানে। নীলু আর আপত্তি করে না। দুজনে হাত ধরাধরি করে নীচে নেমে আসে।

তুলি সুপারি কাটে। নীলু পাশে বসে গল্প করে। একটু দূরে রমেন জেঠা ও শেখর কাকা বসে চা খাচ্ছেন। জেঠাইমা সেখানে বসে তুলির ছোট ভাইকে স্তন্যপান করাচ্ছেন। তিনজনের হাসির শব্দ নীলুর কানে আসে।

নীলু সচকিত হয়ে তাঁদের দিকে ফিরে তাকায়। দেখে তাঁরা তিনজনেই তুলি ও নীলুর দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছেন। নীলু লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নেয়। কেন ওরা হাসছেন তা সেদিন নীলু বুঝে উঠতে পারে নি। অনেকদিন পরে বুঝেছিল সেকথা। আরো অনেক পরে। তুলিকে বলেছিল সে কথা।

তুলি সেদিন বলেছিল—তুমি না বুঝতে পার আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম। তবে তোমাকে বলি নি।

নীলু তুলির গাল টিপে আদর করে বলেছিল—কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়েদের বোধশক্তি পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী।

সে অনেক পরের কথা।

পরের দিন তুলিদের বাড়ীতে সারাদিন ধরে উৎসব। অনেক লোকজন খেল। মস্ত এক হৈ চৈ-এর মধ্যে সারাটা দিন কি করে যে কেটে গেল তা নীলু বুঝতেই পারল না। সাইকেল চড়ার কথা তার মনে এক আধবার এলেও তা যে আজ সম্ভব নয় সেকথা নীলু বুঝেছিল।

নীলুর কোন পরিচিত ছেলেমেয়ে ছিল না এখানে। তার শুধু পরিচয় তুলির সঙ্গে। তাও একদিনের নয়—জন্মজন্মান্তরের। তাই বিশ্বাস নীলুর। সে তাই সারাদিন তুলির পিছে পিছে ঘুরে কাটাল দুপুরে বাবুদের শান বাঁধানো ঘাটে স্নান করতে গিয়েছিল। তাও দুজনে একসঙ্গে।

উৎসব সেদিন শেষ হয়ে গেলেও পরের দিন অনেক আত্মীয়স্বজন ছিলেন। তাই সকালে আবার একটা ছোটখাট উৎসবের মতই হল। বিকালের দিকে ঘর প্রায় ফাঁকা হয়ে এল। শেখর কাকাও চলে গেলেন।

রমেন জেঠা বলেছিলেন—শেখর, নীলু বরং আর দু'একদিন থাক। কখনো আসেনি, এই প্রথম এলো। কয়েকদিন পরেই আমি রায়পুর গেলে ওকে শাপলা নিয়ে যাব।

বিকালে তুলিই নীলুকে বলল চল সাইকেল নিয়ে নীচে যাই।

তুলি সাইকেল তুলে নিতে গেল কিন্তু নীলু বাধা দিয়ে বলল আমি নিয়ে যাচ্ছি চল। তোমার কষ্ট হবে।

তুলি চোখে কৌতুকের ঝিলিক হেনে বলে—বা রে, তুমি বুঝি সব সময় আমার সাইকেল বয়ে দেবে? আমার সাইকেল আমাকে বইতে হবে না?

নীলু হেসে বলে—তা হোক। আজ আমিই বয়ে দিই।

নীলু দুহাতে সাইকেল তুলে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগল। আগে আগে তুলি। বাড়ীর বাইরের বারান্দায় ছিল কতকগুলো ঔষুধের প্যাকিং বাক্স। একটা বাক্সের গা থেকে আঁটা লোহার পাতের এক অংশ বেরিয়ে ছিল। নীলু খেয়াল করেনি, সাইকেল গড়িয়ে নিয়ে যাবার সময় তার ডান পায়ে হাঁটুর নীচের এক জায়গায় ঐ লোহার পাতের বেরিয়ে থাকা অংশটা লেগে খানিকটা বেশ লম্বা হয়ে কেটে রক্ত পড়তে লাগল। নীলু বলে ওঠে—ইস।

তুলি পিছন ফিরে রক্ত দেখে চমকে ওঠে বলে—কি হলো? ওমা কাটল কি করে? এইজন্যেই তোমায় আনতে বারণ করেছিলাম।

নীলু উজ্জ্বল হাস্যে বলে—তুমি আনলেও আমার পা কাটত, আমি জানতাম।

তুলি বলে—কি করে?

নীলু দৃঢ়স্বরে অথচ কোমল ভঙ্গীতে বলে—কেন, বলিনি তোমায় কি কি দেখেছিলাম। আমার পা কেটে যাওয়ার কথা বলি নি? এবারে তো বিশ্বাস হলো আমার কথা?

তুলি বোবা হয়ে যায়। নীলুর দিকে চেয়ে থাকে। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না। অনেক পরে বলে—আশ্চর্য তুমি কি দেবদূত? এরপর বিশ্বাস না করে পারে কেউ? কিন্তু আমি এ গল্প কারোর কাছে করলে সে কি বিশ্বাস করতে ভেবেছো?

নীলু বলে—কে বিশ্বাস করল, না করল তাতে আমার ভারী বয়ে গেল। তুমি বিশ্বাস করেছ কিনা তাই বল।

তুলি নতমুখে বলে—বললাম তো।

নীলু এগিয়ে এসে বলে, তাহলে তোমার ফ্রক দিয়ে আমার রক্ত মুছিয়ে দাও। আমার স্বপ্ন সফল হোক্।

কোন সংশয় নেই আর তুলির মনে। সে পরম স্নেহে আপন ফ্রকের প্রান্ত দিয়ে নীলুর রক্ত মুছিয়ে দেয়। রক্ত লাগে তুজনের দেহে। রক্তের লালিমা বুঝি তাদের মনেও।

এরপর তারা এক ছায়াঢাকা পথে। পথের উপর দিয়ে কখন একা একা, কখন বা তুজনে একসঙ্গে সাইকেল চড়ে মনের আনন্দে তারা কাটাল সারাটা বিকাল। সূর্যডোবার অনেক পরে তারা ঘরে ফিরে এল। যেন তুই মুক্ত বিহগ-বিহগী সারা দিনমান অন্তহীন আকাশে বাধাহীন ভ্রমণ শেষে কুলায় ফিরে সে লীন হল। ফিরে এল, কিন্তু কাকলীকূজনে উভয়ে উভয়ের মুগ্ধ হৃদয়কে ভরিয়ে যেতে লাগল।

রাতে তুলি নীলুকে বলে আগামীকাল সে তাকে তাদের ইসকুল দেখিয়ে আনবে। তাদের ইসকুলে স্বাধীনতা উৎসবের মস্ত আয়োজন চলেছে।

পরের দিন আরো এক মুগ্ধ সকাল কেটে গেল তাদের। নীলু ঘুরে ঘুরে তুলিদের ইসকুলের আসন্ন উৎসবের আয়োজন দেখল। সেইক্ষনে তার মনে পড়ে গেল, তারও রয়েছে অনেক কাজ তাদের ক্লাবে। তাকে আর বেশী দেরী না করে বাড়ী ফিরতে হবে। আজ ছ' তারিখ। আগামীকাল যেতে না পারলে সমুহ বিপদ। শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে মুক্তিদার হাতে শাস্তি তার অনিবার্য।

অথচ এত চট করে তুলির মধুর সান্নিধ্য ছেড়ে যেতে মন চায় না।

সে বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করে। একদিকে বিরহ অন্যদিকে কর্তব্য—এই উভয় সঙ্কটে পড়ে সে দিশেহারা হয়ে যায়। পরে মনস্থির করে কর্তব্যকেই অগ্রাধিকার দিতে দৃঢ়চিত্ত হয়। তুলিকে কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে না তার মনের দ্বন্দ্বের কথা।

ইসকুল থেকে ফেরার পথে তুলি নীলুকে বলে—তুমি আর ক'টা দিন থেকে যাও। আমাদের ইসকুলের উৎসবের দিনে তুমি থাকলে আমার ভারী আনন্দ লাগবে।

একাদশী কিশোরীর সানুনয় প্রার্থনা যেন ঝরে পড়ে মুগ্ধ এক চতুর্দ্দশবর্ষীয় কিশোরের তরুণ হৃদয়ে। নীলু অস্থির আবেগে কাঁপে।

কাঁপা কাঁপা গলায় সে তুলিকে বলে—তা হয় না তুলি। আমাকে কালই চলে যেতে হবে।

তুলি অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে—তোমার এখানে সময় নষ্ট করতে ভালো লাগছে না বুঝি। জানি, শেখর মেসোমশাই বলেছে, তুমি খুব ভালো ছেলে। পড়াশোনায় খুব মন তোমার। ক্লাশে ফার্ষ্ট হও। তুমি কি জানো, আমিও ফার্ষ্ট হই ?

নীলু শুনে খুশী হয়। খুশী হয়ে বলে—সে তো খুব ভালো কথা। ও সব শেখরকাকার বানানো কথা। আমি ফাঁকিও মারি। কিন্তু আমার অন্য বাধা আছে কিছু।

তুলি চোখ তুলে বলে, বল, কি অসুবিধা তোমার।

নীলু আবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি হেনে বলে, বিশ্বাস করবে সে কথা

—কেন, অবিশ্বাস করেছি কি তোমার কথা ?

—না, না। ও কথা বলা আমার ঠিক হয় নি, আমার অন্যায় হয়েছে তুলি।

এরপর নীলু এখানে আসার আগে তাদের ক্লাবে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল সব একের পর এক অকপটে বলে গেল। কেন তাকে ফিরে যেতে হবে, সে কথাও বলব আস্তে আস্তে। তার কবিতার কথাও সে বলল অতি সংকোচে। তুলি সপ্রশংস দৃষ্টি মেলে বলে—বাঃ। তুমি কবি। তোমার কবিতা আমায় শোনাবে না ?

নীলু দ্বিধাজড়িত স্বরে আস্তে আস্তে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনায় তুলিকে।

তুলি খুশীভরা কণ্ঠে কলকলিয়ে বলে ওঠে—আমায় নিয়ে কবিতা লিখতে পার ?

নীলু বলে—চেষ্টা করে দেখব।

—লিখলে, আমায় দেবে তো ?

নিশ্চয়ই দেব তুলি। আজ থেকে যা কিছু লিখব সব তোমায় পড়াব! না হলে শান্তি পাব না। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করলে তো ? কেন ফিরে যেতে চাই, যদিও মন চায় না যেতে, বিশ্বাস করলে তো ?

তুলি নীলুর দুই বাহুমূল দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে ব্যথাহত দৃষ্টি মেলে বলে, এর পরেও বিশ্বাস করেছি কিনা জানতে চাইছ ?

নীলু তুলির দুটো হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে চেপে ধরে বলে, আমার অন্যায় হয়ে গেছে তুলি। আমায় ক্ষমা করো তুলি। আর কোনদিন এ প্রশ্ন করবো।

তুলি হেসে বলে, মনে থাকে যেন।

নীলু হাসে। ঘাড় নাড়ে। কিছু পরে বলে, তাহলে কালই চলে যাই, কেমন ?

উঁহুঁম্, বেশ! কিন্তু আবার এসে কবিতা শুনিয়ে যেতে হবে কিন্তু। না হলে—

তুলি থেমে যায়। চোখের তারা নাচায়। গ্রীবা দুলায়।

নীলু মুগ্ধনয়নে তাকিয়ে বলে, না হলে কি ?

জানি নে. যাও। তুলি মিষ্টি করে হাসে।

নীলু হাসতে হাসতে বলে, আবার যখন আসব, কবিতার খাতা নিয়েই আসব। আর আসব স্বাধীন ভারতের এক নাগরিক হয়ে।

তুলি চোখ বন্ধ করে অস্ফুটস্বরে বলে, এসো। তোমার পথ চেয়ে বসে থাকব, তোমার কবিতা শোনার জন্য।

পরের দিন নীলুর বিদায় নেবার পালা। জেঠাইমাকে প্রণাম

করতে তিনি বললেন, পরে গেলে হত। বড়লোকের ছেলের গরীবের বাড়ী থাকতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি ?

তুলি সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—না, না, ওর না গেলে খুব অসুবিধা হবে, মা।

—তুই থাম তো পাকা মেয়ে, জেঠাইমা ঝাঁপিয়ে ওঠেন মেয়ের উপর। নীলু লজ্জায় ঘাড় হেট করে থাকে।

নীলু রমেন জেঠাকে প্রণাম করে। রমেনজেঠা বলেন, আবার এসো, বাবা। ঘরের ছেলের মতই আসবে যাবে, যখন খুশী আসবে, যখন খুশী যাবে। তবে আমার সঙ্গে গেলেই পারতে। অতটা পথ হেঁটে যাবে তুমি।

—ঠিক চলে যাব; নীলু মৃদুস্বরে বলে।

নীলু পথে নামে। তুলি পেছনে। পথে নেমে নীলু বলে, তুলি আর একবার সাইকেলটায় চড়লে হোত।

তুলি থেমে থেমে বলে, ও রথ তোমার। তুমি যতদিন না আসবে, তোলাই থাকবে। তুমি তো চালানো শিখে গেছ। এবারে এলে ওটা তুমি চালাবে, আমি তোমার পেছনে বসে থাকব।

নীলু তুলির গা ছুঁয়ে বলে—বেশ ! এবার এলে তোমায় নিয়ে রথে চড়ে কবিতা শোনাব। সে বেশ মজা হবে না তুলি ?

তুলি হেসে বলে—হ্যাঁ। আর নৌকা বাইবে না ? আর ভয় করবে না তো ?

নীলু পেছন ফিরে কিছুক্ষন তুলির দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকে। পরে খুব আস্তে আস্তে কিন্তু খুব জোর দিয়ে বলে—নাঃ, ভয় কিসের ? তুমি পাশে থাকলে আমার একটুও ভয় করবে না।

তুলি নিশ্চিন্ত হয়। নিশ্চিন্ত হয় নীলুও। নীলু ভাবে, জীবন সমুদ্রে যত ঝড়ই আসুক, তরণী যত ছোটই হোক, তুলি পাশে থাকলে সে অবলীলায় ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের উপর দিয়ে ঠিক নৌকা বাইতে পারবে। তুলি ভাবে, সে এতকাল নৌকা বেয়েছে অর্থহীনভাবে। না তাও নয়। নৌকা বেয়ে সে কাণ্ডারীর দেখা পেয়েছে। আজ কাণ্ডারী

এসে তার সকল দায় নেবার প্রতিশ্রুতি দিল। তার আর কোন ভাবনা নেই। এবার সে শুধু কাণ্ডারীর পাশে বসে থাকবে।

দুটি পথ বুঝি আজ একই রাজপথে এসে মেশে। দুটি ধারা মিশে বুঝি এক নদীর সৃষ্টি করে, দুই নদী এসে সাগরে মেশে, দুই সাগর বুঝি মহাসাগরে এসে লীন হয়। দুই জীবন সৃষ্টি করে এক মহাজীবন। আর সেই মহাজীবনে ধ্বনিত হয় একটি গান—মহাজীবনের গান।

নীলু দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যায়। নীলুর গমন পথের দিকে চেয়ে তুলি ভাবতে থাকে, অনন্তকাল ধরেই তাদের এই যে পথচলা, তা বুঝি কিছু বিরতির পর আবার সুরু হয়েছে, আবার চলবে অনন্তকাল ধরে। নীলুও এগিয়ে যায় ভাবতে ভাবতে—এ বিশ্বে তো কিছুই হারায় না। সবই ফিরে ফিরে আসে—দিন-রাত্রি, বারো মাস, ঋতুচক্র, সবই ঘুরে ঘুরে আসে, এসে ঘুরে যায়, গিয়ে ফিরে আসে। সবই ছন্দোবদ্ধ—কবিতার ছন্দের মত, গানের শমের মত।

খালের উপরে সেই কাঠের পুল পর্যন্ত একসঙ্গে এলো তারা। নীলু বোঝে, এবারে হবে তাদের মিলিত পথচলার ক্ষণিক বিরতি, ক্ষণিক বিচ্ছেদ। কিন্তু সে দুঃখিত হয় না। সে জানে, এ বিরতি মাত্র, সমাপ্তি নয়। সুরু কবে হয়েছিল যেমন সে জানে না, তেমনি জানে না শেষ কবে হবে। শুধু সে জানে নাটকের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরের বিরতির মত তাদের অনন্তকালের যাত্রার মাঝেও থাকবে অসংখ্য বিরতি। বিরতির প্রয়োজন আছে জীবনে, মহাজীবনেও। বিরতি পথের ক্লান্তি-মোচন করে, পরিক্রমাকে সুখবহ করে। নিরবচ্ছিন্ন মিলনের পুঞ্জীভূত অবসাদ ও ক্লান্তি-বিরহের বিরতির অবসরে অদৃশ্য হয়। তাই মিলনের প্রেম ও স্নেহ-বিরহে সঞ্চিত থাকে আর সেই সঞ্চিত প্রেম ও স্নেহরাশি মিলনকে সুখপ্রদ করে তোলে। বিরহ ই চিরকাল নিকষিত হেম করে তোলে।

পুলের উপর পা রেখে নীলুর তাই আবার মনে হয়—এ বিশ্বে কিছুই হারায় না, সঞ্চিত থাকে। উপলব্ধির অভাবে মানুষ ভাবে, বুঝি তার সব হারিয়ে গেল। কিন্তু হারায় না কিছুই।

নীলু ফিরে দাঁড়ায়। তুলির হাতে হাত রাখে। ছুজনে ছুজনের দিকে তাকায়। সে দৃষ্টি ছুটিতে নেই কোন বিষাদ, নেই কোন ছুঃখ, অবিশ্বাস, ভয়। মানুষ যখন বোঝে তার হারাবার কিছুই নেই তখন সে বোঝেও, তার ভয়েরও কিছু নেই।

কেউ কোন কথা বলে না। শুধু হাসে। স্মিত সে হাসি, মধুর সে হাসি। সে হাসিতে রাশি রাশি বিশ্বাসের মুক্তোকণা ঝরে পড়ে।

হাত ছাড়িয়ে নীলু দ্রুত পুল পার হয়ে যায়। তুলি আর এগোয় না।

এপার থেকেই চেঁচিয়ে বলে—মনে থাকে যেন, কবিতার খাতা নিয়ে তুমি আবার শীগগিরই আসবে।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই আসব, নীলু মুখ ঘুরিয়ে বলেই জোরে জোরে হাঁটতে থাকে। পথের বাঁকে তুলি অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু সারাটা পথ তবু সে তুলিকে দেখতে দেখতে চলে।

গর্বে আনন্দে তার বুক আজ ভরে গেছে। তুলি তাকে শুধু বিশ্বাসই করে নি, কবি বলে সম্মান দিয়েছে। এর বেশী তার আর চাওয়ার কিছুই নেই। তুলিকে নিয়ে সে কবিতা লিখবে। আজই লিখবে সে কবিতা। কবিতা লেখার আনন্দে ও উত্তেজনায় নীলুর পদ চঞ্চল হয়, পদক্ষেপ দ্রুত হয়।

নীলুর পরিক্রমা শেষ হয়। সেই রাতে ফিরেই নীলু তুলির উদ্দেশ্যে এক কবিতা লিখল। নাম দিল—'ওগো নিঠুর'!

'বারে বারে দেখি স্মরণ-খাতায়—
আজো পড়ে মোর মনে—
দিয়েছিলে কথা, 'আমি যে তোমার
জীবন-মৃত্যুক্ষণে।'
চিরকাল তরে ধরা দিনু তাই,
আমিও দিলেম কথা,
আজি দেখি তাই আছ তুমি দূরে
(তবু) ছিঁড়ে নাই প্রেমলতা।

যবে থাক তুমি মোর কাছে,
তখনও যে বয় বিরহ-যমুনা
তোমার আমার মাঝে।
কাছে থেকে কেন সরে যাও, ওগো
এ কি গো নিঠুর খেলা !
আমার হৃদয়-সাগর-মাঝারে
ভাসায়েছ প্রেমভেলা।'

পরের দিন নীলু ইসকুলে গেল। ইসকুলে এখন বিশেষ ক্লাশ হচ্ছে না। উৎসবের আয়োজনে সকলে ব্যস্ত।

টিফিনের অবসরে নবনী আড়ালে ডেকে নিয়ে নীলুকে বলে—নীলু, কাঁথি গিয়েছিলাম। উদয়ন সিনেমা হলে ছবি দেখে এলাম। পংকজ মল্লিকের গাওয়া একটা যা গান শিখে এসেছি না! শোনাব চল ঐদিকে—।

ইসকুল ছুটি হয়েছে। নীলু আজ একটু পিছিয়ে পিছিয়েই হাঁটে। আজ সকলের মাঝে পথচলাতে সে আনন্দ পাচ্ছে না। সে একাই পথ চলতে চায়, অবশ্য সে ভাবে, একা সে আর কখনই নয়—তুলি রয়েছে সর্বক্ষন তার সাথে সাথে।

তখনও সূর্য ডোবে নি। খাসমহাল পেরিয়ে বাঁশবনের ভেতরে এল সে। এখানে এসে সে চিরকালের মত আজও পথ হারাল। এখানে এলে সে বিরহের স্বাদে ভরা মিলনের স্বপনমাধুরী উপভোগ করে। আজও এল সেই অনুভূতি, তবে তীব্রতর।

যেতে যেতে সে ভাবে, এই পথ ধরে আরো এগিয়ে গিয়ে সে তুলির দেখা পেয়েছে। তুলি তার। তুলি তার জন্মজন্মান্তরের, তাই এ জীবনেরও। তুলি তাকে বিশ্বাস করেছে। তুলি তার কবিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কবি তো সে আমন্ত্রন উপেক্ষা করতে পারে না। সে যাবে নিশ্চয়ই যাবে তার মুর্তিমতী কবিতার কাছে কবিতার উপহার নিবেদনের জন্য।

নীলু আরো ভাবে, তুলি তাকে মুখ ফুটে বলে নি। তবু তারা

চোখের তারায় সে ভাবের আখরে তুলির হৃদয়ের ভাষা পড়েছে। পড়ে বুঝেছে তুলি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এ জীবনে সে তারই পাশে পাশে থাকবে, যেমন ছিল আগের জীবনে আর যেমন থাকবে আগামী জীবনেও।

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষনে সে যা দেখেছিল, তা মিছে নয়। সত্যি বলে সে বিশ্বাস করেছিল। এখন আরো বেশী করে বিশ্বাস করে সে। বিশ্বাস করেছে তুলিও। আর তাই সে উপলব্ধি করে অনন্তকাল ধরে তুলিকে নিয়ে এই পৃথিবীতে সে তার মহাজীবনের পথ পরিক্রমা করে চলেছে, চলবেও।

আজ স্বাধীনতার প্রাক্‌লগ্নে তার মহাজীবনেরও এক মহা উত্তরণ লগ্ন সমাগত প্রায়। তার মহাজীবনের ধারায় তুলি অবিচ্ছেদ্য, অপরিহার্য্য। তার মহাজীবনের এই উত্তরণলগ্নে সে তুলিকে নিয়ে রচনা করবে একটি নিটোল মহাজীবনের গান। সে গান শুধু নিজেকে কাঁদায় না, সকলকে কাঁদায়।

হিজল গাছের কাছে আসতেই নীলু সহসা হিজল ফুলের তীব্র মদির গন্ধ অনুভব করে। অবাক হয়ে সে ভাবে, কি আশ্চর্য, এখনতো হিজল ফুল ফোটার সময় নয়। চেয়ে দেখে, গাছে একটাও ফুল ফুটে নেই। তবু সে অমন স্পষ্ট গন্ধ পাচ্ছে কেন ?

একটু পরেই সে হেসে ফেলে। মনে মনে নিজেকেই সে বলে— কি বোকা আমি। তুলি তো আমার কাছে নেই, তবু তার দেহের মিষ্টি ঘ্রাণ পাচ্ছি কেন ?

নীলু যেন নিজেকেই বুঝিয়ে বলে – ফুল ফুটলে তো সকলেই গন্ধ পায়। কিন্তু না ফুটেও ফুল যে গন্ধ ছড়াতে পারে সেই গোপন কথাটা কবি ছাড়া আর কে জানে ? কে বা পায় সে গন্ধ ?

তুলির ভালোবাসার টানে সে আজ সত্যই কবি। তাই তো সে বুঝতে পারে এ তো হিজল ফুলের গন্ধ নয়—এ যে তার তুলিফুলের গন্ধ।

আকাশের দিকে চেয়ে দেখে নীলু সন্ধ্যে হয়ে আসছে। পথে

লোকজন নেই। নির্জন বনপথে ঘনায়মান অন্ধকারে রয়েছে সে আর হিজল গাছ, অথবা তুলি আর তার কবি শুধু—মুখোমুখি।

নীলু গলা ছেড়ে নবনীর কাছে তার সদ্যশেখা গানটা গাইতে থাকে—

'তুমি কি জানরে বন্ধু কান্দাও যে আমায়,
বন্ধু কান্দাও যে আমায়,
আমার মনের বনে বাউরী বাতাস কান্দিয়া লুটায়,
বন্ধু কান্দিয়া লুটায়।
বন্ধু, তাকাই দূরের গাঁয়ের পানে, গাঁয়ের পানে
কার জলভরা চোখ আমায় টানে, আমায় টানে।
ভেসে যেন চলেছি হায়, চলেছি হায়,
কোন অচেনার নায় গো,
কোন অচেনার নায়॥
কি দোষে ছাড়িলে বঁধু, দিলে বিষম জ্বালা গো,
দিলে বিষম জ্বালা
হায়, অকালে শুকায় যে আমার হিজলফুলের মালা গো
হিজলফুলের মালা।
বঁধু, বিনি সূতার মালাখানি, মালাখানি
কেন গলায় দিলে নাহি জানি, নাহি জানি,
মালা ছিঁড়ে না যে—বুকে বাজে, বুকে বাজে,
করি কি উপায় গো, করি কি উপায়॥'

গান শেষ করে চোখের জল মোছে নীলু।

সে বুঝতে পারে, মহাজীবনের গান হল, আসলে ভালোবাসার গান। সে ভালোবাসার তুলির টানে টানে সেই মহাজীবনের গানের ছবি এঁকে যাবে।

॥ প্রথম খণ্ড শেষ ॥